“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

সম্পাদিকা — শ্রীকল্যাণী সেন, এম,এ,বি,টি

বৈশাখ

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩৴৹ আনা; ষাণ্মাষিক মূল্য ১৷৷৹ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৹ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

সূচি পত্র—বৈশাখ ১৩৪৮

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | বৈশাখ—১৩৪৮ | প্রথম সংখ্যা

'জাগো'

শ্রীকল্যাণী সেন।

বহুবর্ষ কেটে গেছে, আসিয়াছে বহু বর্ষশেষ ;
ব্যর্থ গত বৎসরের অসার্থক চেষ্টাহীনতারে
নূতন প্রতিজ্ঞাবলে একেবারে চূর্ণদীর্ণ করে
জেগে উঠিয়াছে কত শত নরনারী, শত দেশ।
হায় ভারতের নারি ! তুমি জেগে ওঠ নাই আজ,
চূর্ণ করে দাও নাই সমাকীর্ণ ব্যর্থতার ভার,
শান্ত কর নাই শত বৎসরের ক্ষুব্ধ হাহাকার,
মাঙ্গল্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে কর নাই নিজ কাজ।
আসিয়াছে নববর্ষ পুনঃ, নারি ! জাগো আজ,
ব্যর্থ বৎসরের সাথে চলে যাক্ সব ত্রুটী গ্লানি,
মুছে ফেল অজ্ঞতার কালী, ঘুচে যাক্ সব লাজ।
জাগো গৃহে লক্ষ্মীরূপা, জাগো তেজোময়ী মহারাণি
জাগো দুর্গমজীবনপথে পুরুষের সহচরি,
জাগো মৃত্যু হতে অমৃতের গানে জয়ধ্বজা ধরি !

অলৌকিক কাহিনী

(The man who could work miracles—H. G. Wells.)

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী।

জন্ম থেকেই হয় তো তার একটা অলৌকিক শক্তি ছিল; কিন্তু সে নিজেই সে বিষয় কিছু জানতো না। পঁচিশ বছর বয়স অবধি সে নিজেকে সন্দেহবাদী বলে প্রচার করত—কোন রকম অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করত না। বাঙলা দেশের ছোট একটা সহরে সে কেরাণীর কাজ করত আর সারাদিনের পর কোন বন্ধুর বাড়ী সান্ধ্য আড্ডায় গান বাজনা করে তাস খেলে, তর্ক করে. রাজা উজির মেরে, পাড়া সরগরম করে তুলতো। ভূতনাথ লোকটী রোগা পাতলা. ছোটখাট, শ্যামবর্ণ মুখে বসন্তের দাগ। বাপমায়ে আদর করে পদ্মলোচন বা ননীগোপাল গোছের কি একটা নাম রেখেছিলেন, কিন্তু পাড়ার লোকের কল্যাণে ভুতু, ভুতো, ক্রমে ভূতনাথে গিয়ে ঠেকল। ইস্কুলে ভর্তি হবার সময়েও তাদের পূর্বপরিচিত এক পণ্ডিত মশাই তার নামকরণের নামটি ফেলে ভূতনাথটিই পছন্দ করলেন। সেই থেকে সে ভূতনাথ; ওরফে ভুতুবাবু। তার চেহারাটিতে যে কিছু ভূতের আভাব ছিল না তা বলা যায় না—নিজের রুক্ষ রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুলগুলো নিয়ে সে বাহাদুরী করে বেড়াতো যে তার জ্ঞান হবার পর থেকে কেউ তার চুলে তেল বা চিরুণি ঠেকাতে কৃতকার্য হয়নি। যখন সে ইস্কুলে পড়তো তখন থেকে সে সঙ্গীদের কাছে প্রচার করতো যে যা সে স্বচক্ষে দেখেনি বা স্বকর্ণে শোনেনি তা সে বিশ্বাস করেনা। কলেজে পড়বার সময়ে সে ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ লিখে একটা পুরস্কার পেয়েছিল। তার বন্ধুরা কিন্তু তাকে ঠাট্টা করে বলতো, "তুই ভূতে বিশ্বাস করিস না কিরে—তুই নিজেই একটা ভূত।"

ক্রমে ভুতুবাবু আই এস্ সি. বি এস্ সি. এম এস্ সি পাশ করল। কিন্তু তার বিজ্ঞানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অসীম অনুরাগ সত্বেও সে কোনও পরীক্ষায় ভাল করতে পারলো না—অবশেষে বিজ্ঞানাকাশে উদীয়মান তারকা হবার আশা ত্যাগ করে এক কেরাণীর কাজ নিয়ে বসল।

সেদিন পাঁচুবাবুর বৈঠকে বসে নানান তর্ক বিতর্কের পর আলোচ্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছিল অলৌকিক ঘটনায়। ঘরের লোকেরা মোটামুটি তিন দলে বিভক্ত হয়েছিল। গৃহস্বামী, পাঁচুগোপাল চৌধুরী এবং আগন্তুক দুএকজন বলেছিলেন যে তাঁরা ভূতপ্রেত বিশ্বাস করেন; অলৌকিক দৈব শক্তিতেও বিশ্বাস করেন, কেহ কেহ বলেছিলেন যে তাঁরা অলৌকিক ঘটনা ঘটা সম্ভব এমন কথা বলেন না, আবার ঘটা অসম্ভব এমন কথাও বলেন না তবে তাঁদের চোখের সামনে যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে তবে তাঁরা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতে রাজি আছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের ধারা অনুসারে তৃতীয় দলের সংখ্যাই ছিল সকলের চেয়ে বেশী—বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি অকাট্য বলে মেনে নিয়ে তাঁরা জোর গলায় বলছিলেন যে তার বিপরীত কোনও কিছু কোনওদিন ঘটেনি, ঘটবেনা, ঘটতে পারেনা। ভূতনাথের সহানুভূতি ছিল তৃতীয় দলে। গল্পচ্ছলে আলোচনা সুরু হলেও ক্রমে বিবাদে পরিণত হবার জোগাড় হচ্ছিল তাই সে দ্বিতীয় দলের সঙ্গেও যোগ রেখে বলছিল, "হ্যাঁ আমি স্বচক্ষে যদি কোনও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তাহলে তাতে বিশ্বাস করব বৈকি, কিন্তু তা যতদিন না দেখছি ততদিন প্রমাণাভাবাৎ, আমি অলৌকিক শক্তিকে অবিশ্বাসই করে যাব।"

ঘরময় একটা সম্মতিসূচক ধ্বনি উঠল—কেউ কেউ আপত্তিও তুললেন—"কেন মশাই আপনি দেখেননি বলেই যে সে রকম হতে পারেনা, তা কে বলল!" আর একজন উত্তর দিল "হতে যে পারে সেটা প্রমাণ করেই দেখান না—মশাই তাহলেই আপদ চুকে যায়।"

ভূতনাথের ইচ্ছা ছিল না যে এরকম কলহের মধ্যে তাদের সান্ধ্য আড্ডাটি শেষ হয়—দুদলেরই মন রেখে সে বলল "অলৌকিক ঘটনা বলতে কি বোঝায় সেটা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। মনে করুন ওই যে লণ্ঠনটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে সেটা যদি হঠাৎ আমার হুকুমে উল্টো হয়ে ঝুলতে আরম্ভ করে তাহলে আপনারা সেটাকে অলৌকিক ঘটনা বলবেন তো!"

"কি সব আবোল তাবোল বকছেন মশাই।" ভূতনাথ জোরের সঙ্গে বলল আবোল তাবোল বকছি মানে—আপনি কি বলতে চান যে সেটা অলৌকিক হবেনা?"

"অলৌকিক হবে বৈকি—কিন্তু আপনি কি বলতে চান?" "সেটা দেখতেই পাবেন—ওহে লণ্ঠন তুমি এক্ষুনি উল্টো হয়ে ঝুলতে সুরু কর—আরে!!"

তারপর যা ঘটল তাতে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল—সকলের চেয়ে বেশী অবাক হল ভূতনাথ নিজে। লণ্ঠনটা নিঃশব্দে উল্টে গেল—আগুনের শিখাটা নিম্নমুখী হয়ে জ্বলতে লাগল।

ভূতনাথ "আর পারছিনা" বলে বসে পড়বামাত্র ঝন ঝন শব্দে বাতিটা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

ঘরে একটা তুমুল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। রামবাবু বাড়ীর ভিতর থেকে আর একখানা বাতি আনালেন। সবাই একবাক্যে বলল ভূতনাথ তাদের ঠকিয়েছে নিশ্চয় লণ্ঠনের সঙ্গে একটা সুতো বেঁধে সে টান মেরে ছিল।

চেঁচামেচি গালাগালির মধ্যে যখন ভূতনাথ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল তখন তার কান লাল হয়ে উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে আর মাথার মধ্যে একটী মাত্র চিন্তা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে "কি করে এরকম হল।" শীতের রাত্রে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে প্রায় একমাইল পথ হেঁটে যখন সে নিজের ঘরে বিছানায় এসে বসল তখনও সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে পরিস্কার হয়নি।

নিজের মনেই সে বিড় বিড় করতে লাগল "আমি হুকুম করবামাত্র বাতিটা উল্টে গেল—কিন্তু কেন ? আচ্ছা আমার ওই মোমবাতিটাও কি আমার কথা শুনবে। মোমবাতি তুমি জ্বলতো।" বলবামাত্র অন্ধকার ঘরে মোমবাতি জ্বলে উঠল।

"তুমি শূন্যে ওঠ তো বাছাধন "মোমবাতি শূন্যে উঠে স্থির হয়ে রইল—ভূতনাথের মনে ভয় হল—আর বুঝি মোমবাতিটি শূন্যে থাকবে না—ভয় হবামাত্র মোমবাতি মাটিতে পড়ে নিভে গেল।

অন্ধকারে ভূতনাথ দেশলাই খুঁজতে হাতড়াতে লাগল। হঠাৎ তার খেয়াল হল—সে হাত বাড়িয়ে বলল "এসো তো একবাক্স দেশলাই"—অমনি তার হাতে নতুন একবাক্স দেশলাই এল। একটা কাঠি সে জ্বালাতে চেষ্টা করল কিন্তু উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল সে জ্বালাতে পারল না। কিন্তু "জ্বলোতো ভাই মোমবাতি" বলবামাত্র আবার মোমবাতিটা জ্বলে উঠল।

এতক্ষণে ভূতনাথের খেয়াল হল যে যেমন করেই হোক তার মধ্যে একটা অলৌকিক শক্তি রয়েছে সে যা চাই:ব তাই পাবে—যা বলবে সেই ঘটবে। চিরকাল সে এরকম অলৌকিক শক্তিকে অবিশ্বাস করে এসেছে—জোর গলায় অস্বীকার করে এসেছে, কিন্তু

এখন নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে তাকে বিশ্বাস না করে উপায় নাই। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে সে তার অলৌকিক শক্তির নানারকম পরীক্ষা করল—কিন্তু অতি সন্তর্পণে। টেবিলের উপর এক গেলাস জল ঢাকা ছিল—সেটাকে সে লাল রঙ্ করল, নীল রঙ্ করল তারপরে চমৎকার সরবৎ বানিয়ে খেয়ে ফেলল।

নিজের টেবিলের ওপর সে একটা সুন্দর ফুলদানিতে করে গোলাপফুল তৈরী করে রাখল। নিজের পুরানো ছেঁড়া জামাগুলি নতুন করে নিল। তারপর রাত যখন প্রায় দুটো বাজে তখন সে বিছানায় শুয়ে একটা নরম রেশমের লেপ তৈরী করে তার তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে যখন ভূতনাথ ঘুম থেকে উঠলো তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়াছে। তাড়াহুড়ায় কোন মতে স্নান করে সে ভাত খেতে বসল। ততক্ষণে রাত্রের ঘটনাটা প্রায় স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে।

খেতে গিয়ে দেখে খাবার মুখে দেওয়া যায় না—মাছের ঝোলে নুন বেশী. ডালটা আধ পোড়া। হঠাৎ তার নিজের অলৌকিক শক্তির কথা খেয়াল হওয়াতে তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে একটা ছুতো করে দোকানে পাঠিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, "নিয়ে এস গরম গরম পোলাও, কোর্মা, কাটলেট, পায়েস, মিঠাই" দেখতে দেখতে চমৎকার খাবারের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

খুব তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাপ্ত করে ভূতনাথ যখন পোটাচারেক অলৌকিক মিঠাপান মুখে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল তখন মাইল খানেক পথ হেঁটে আপিসে যাবার পক্ষে বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে। অলৌকিক শক্তির বলে সে একেবারে আপিসের দরজায় গিয়ে হাজির হ'ল।

সেদিন আপিসে বসে ভূতনাথের নিজের কাজে মন লাগলো না। চুপচাপ নিজের টেবিলে বসে সে ভাবছিল এবার কি করা যায়। ইচ্ছা করলে সে নিজেকে অপরূপ সুন্দর করে নিতে পারে কিন্তু তাহলে তো তাকে কেউ চিনতেই পারবে না। নিজের বিষয় সম্পদ সে যত ইচ্ছা বাড়িয়ে নিতে পারে—কিন্তু হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেলে লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

তার চেয়ে বুঝে সুঝে অল্পে স্বল্পে নিজের সুখ সুবিধা বাড়িয়ে নিলে সব দিক দিয়ে ভাল হবে। চট করে কিছু করলে চলবে না। ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। আপিসে বসে বসে সে সারাদিন এই সব ভাবল—কোনও কাজ করল না—কিন্তু বাড়ী ফিরবার আগে অলৌকিক শক্তিতে সমস্ত কাজ শেষ করে রেখে এল।

সন্ধ্যাবেলা সে সহরের বাইরের একটা রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে চলল আর পথে নানারকম ছোটখাট জিনিষ তৈরী করতে লাগল।

রাস্তায় একটা কুকুর শুয়েছিল, তাকে সে বলল "তুমি কুকুর না হয়ে বেড়াল হও তো বাপু"—কুকুর তার কথা মতন বেড়াল হল।

রাস্তার ধারে একটা কাঁটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে বলল "তুমি হও একটা গোলাপ গাছের ডাল"—ডালটা তার কথা শুনল সঙ্গে সঙ্গে সারা রাস্তা ফুটন্ত গোলাপ ফুলের গন্ধে ভরে উঠল। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ পেয়ে ভূতনাথ এমনই থতমত খেয়ে গেল যে তার অলৌকিক গোলাপ গাছের ডালকে বলল "পালিয়ে যা পালিয়ে যা, সোজা পালিয়ে যা" ডালটা তার কথা মত পালাতে গিয়ে সটান আগন্তুকের সঙ্গে ধাক্কা খেল। বজ্র গম্ভীর গলায় একটা ধমক শোনা গেল "কেরে হতভাগা, কাঁটা গাছের ডাল ছুঁড়ছিস। দেখাচ্ছি তোকে মজা।"

ভূতো দেখে সর্বনাশ—সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বদমেজাজি পুলিশের দারোগা জনার্দন চন্দ্র হোড। ভদ্রলোক তার মুখে টর্চের আলো ফেলে খানিকক্ষণ দেখে বললেন "তুমিই না ছোকরা পাচুবাবুর বাড়ীতে সেদিন লণ্ঠন ফেলে ভেঙেছিলে—তোমার অনেক রকম বদখেয়াল আছে দেখছি" ভূতনাথ যথা সম্ভব বিনীত ভাবে বলল "মশাই আপনি কিছু মনে করবেন না।" "মনে করব না?" একশোবার মনে করব—তুমি দারোগার মুখে কাঁটা গাছ ছুঁড়ে মার—জানো তোমায় আমি এর জন্য পুলিশে দিতে পারি।" "না না, আপনি বুঝছেন না, আপনাকে মারা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।" "তবে উদ্দেশ্যটা কি ছিল শুনতে পারি—একটু রসিকতা করা? যত সব—" ভূতো বেচারী ততক্ষণ ঘেমে উঠেছে—কিছুতেই সে বুঝতে পারছেনা, কি করে এই কালো. মোটা. রাগী, এবং অত্যন্ত কাঠ খোট্টা দারোগাকে তার অদ্ভুত শক্তির কথা বুঝিয়ে বলবে— "মানে—বুঝলেনা কিনা—আমি অলৌকিক শক্তির বলে একটা গোলাপ গাছ তৈরী করেছিলাম—" "অলৌকিক শক্তি না তোমার মুণ্ডু। পাচুবাবর বাড়ীতে তো তুমি খুব তেড়ে তর্ক করেছিলে যে অলৌকিক শক্তি বলে কিছু নাই। তোমার ও সব গাঁজাখুরী গল্প আমার কাছে বলতে এসো না। যেমন বেয়াদব, তেমনি মিথ্যুক—ছোকরা একেবারে জাহান্নমে গেছে" বলে জনার্দন বাবু একটা অকথ্য গালাগালি উচ্চারণ করলেন। ভূতনাথের মেজাজও ততক্ষণে সপ্তমে চড়ে গিয়েছে রেগে সে বলল "আমি জাহান্নমে

যাব কেন মশাই, আপনিই জাহান্নমে যান।" বলবামাত্র জনার্দনবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সে রাত্রে ভূতনাথ আর নিজের শক্তির পরীক্ষা করল না—দারোগাবাবুর ব্যাপারে তার ভয়ে লেগে গিয়েছিল—এ রকম অলৌকিক শক্তি থাকা তো বিশেষ সুবিধের নয় —কোনদিন সে রাগের মাথায় কি কাণ্ড করে বসবে কে জানে!

আবার তার মনে হ'ল—জাহান্নম বলে সত্য সত্যই কোন যায়গা আছে নাকি? যদি না থাকে তাহ'লে জনার্দনবাবু গেলেন কোথায়? যদি থাকে তা'হলে দেশটা কি রকম কে জানে—সেইটাকেই কি নরক বলে? সেখানেই তো পাপীদের ধরে ফুটন্ত তেলের কড়ায় ভাজা হয়—তা'হলে দারোগার এতক্ষণে দফা শেষ! তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল "তার চেয়ে দারোগাবাবু হনলুলুতে চলে যান।

সারারাত সে স্বপ্ন দেখল যে জনার্দনবাবু হনলুলু থেকে ফিরে এসে তার নামে শমন বার করেছেন আর সে ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দুটো নতুন খবর শুনতে পেল—দারোগা জনার্দনবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা—আশে পাশে সব থানাতে খবর দেওয়া হয়েছে—আর রামলোচনবাবুর বাগানে কে যেন একটা চমৎকার গোলাপ ফুলের ডাল রেখে গেছে।

সারাদিন তার মন খারাপ হয়ে রইল—সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মিহিরবাবুর কথা মনে হল— "ঠিক হয়েছে, তিনিই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। বৃদ্ধ অতি সাধু সজ্জন, দর্শনচর্চা করে থাকেন—তিনি আমাকে বুঝে সুঝে চলতে শেখাবেন।"

মিহির বাবু তো ভূতনাথকে দেখে বেজায় খুসী—"এসো ভাই এসো, তোমায় যে বড় চিন্তিত বোধ হচ্ছে। মুখখানা শুক্‌নো শুক্‌নো কেন?" ঘরে গিয়ে ভূতো আর কিছুতেই আসল কথাটা পাড়তে পারছিল না।

"একটা কাজে আপনার কাছে এসে ছিলাম"—"তা তো বটেই, কাজ না থাকলে কি আমার ডাক পড়ে—আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি—তোমরা ছেলে ছোকরারা আর আমার কাছে আসবে কেন?"

"সে কি কথা, মিহিরবাবু আপনিই তো বিপদে আপদে আমাদের ভরসা—তাই সবার আগে আপনার কাছে উপদেশ নিতে ছুটে আসি।"

"তা আমার কি করতে হবে ভাই?"

"হয়েছে কি, মানে,—বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না মিহিরবাবু,—একটা কাণ্ড হয়েছে—"

"আরে কি হয়েছে, খুলেই বল না, আমাকে তোমার লজ্জা কিসের"

"না মানে,—আচ্ছা, আমার মতন সাধারণ লোকের কোনও অলৌকিক শক্তি থাকতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস হয়"

"থাকতে পারবেনা কেন, তবে—

"আচ্ছা একটা উদাহরণ দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাচ্ছি। ওই আপনার টেবিলের উপর নস্যদানটা রয়েছে না, ওটাকে আমি একমুহূর্তে পানের ডিবা করে দিতে পারি।.........নস্যের কৌটা তুমি পানের ডিবা হয়ে যাও তো।"

মিহির বাবু তাঁর বেতো শরীর নিয়েও সাতহাত এক লাফ মারলেন "কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, এযে সত্যি সত্যিই পানের ডিবা হয়ে গেল।"

ভূতনাথ গর্বের সঙ্গে বলল "শুধু পানের ডিবা কেন—আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আচ্ছা, পানের ডিবা তুমি এক প্যাকেট তাস হও তো।"

চমৎকার এক প্যাকেট তাস দেখা দিল।

"আচ্ছা এবার একটা টিয়া পাখী" বলবামাত্র তাসের প্যাকেট টিয়া পাখী হয়ে ঘর ময় উড়ে বেড়াতে লাগল।

"আরে, আরে থাম না বাবা।" পাখীটা শূন্যের মধ্যে ডানা মেলে স্থির হয়ে রইল।

এবার ভূতনাথ মিহির বাবুকে তাঁর নস্যদান ফিরিয়ে দিয়ে বলল—"কেমন দেখলেন মশাই?"

মিহিরবাবুর মুখে কথা ফুটতে একটু দেরী লাগল।—'আশ্চর্য, আশ্চর্য! কি করে এমন হয়?

"কি করে যে এরকম হয় সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা। আমার কোন কষ্ট করতে হয় না শুধু মুখের কথাতেই আমি যা চাই তাই হয়। আমার যে এরকম অলৌকিক শক্তি আছে সেটা আমি অল্পদিন আগে পর্যন্ত জানতাম না।"

তারপরে ভূতনাথ পাঁচু বাবুর বাড়ীর এবং তার পরের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

মিহির বাবু শুনে কেবল বললেন "আশ্চর্য, আশ্চর্য! শোনা যায় বটে মহাপুরুষদের যোগবলে অলৌকিক শক্তি হয়—কিন্তু তোমার মধ্যে এ শক্তি কেমন করে এল?"

ভূতনাথ বলে চলল "আমিও তাই ভাবছি দেখুন। তারপরে হয়েছে এক বিপদ—নিজের মাথা আমি ঠিক রাখতে পারছিনা এই ধরুন জনার্দনবাবুর কথা—তাকে তো আমি ঝোঁকের মাথায় জাহান্নমেই পাঠিয়ে দিলাম—সে জায়গাটা কি রকম কে জানে! যদিও পরে আমি তাকে হনলুলুতে পাঠালাম—তবু—মনে করুন—সে তো আমার অলৌকিক শক্তির বিষয় কিছু জানে না—সে বেচারি বুঝতেই পারবেনা কি হল। জনার্দন বাবুর কথা ভেবে ভেবে আমার মনে শান্তি নাই। মনে করুন—সে তো আবার ফিরে আসতে পারে—সেই ভয়ে আমি দশবারো ঘণ্টা অন্তর তাকে আবার হনলুলুতে ফিরিয়ে দিচ্ছি।—কিন্তু তার তাতে কিরকম কষ্ট হচ্ছে বলুন তো।"

মিহিরবাবু চিন্তিতমুখে বললেন "তাই তো, এ যে তুমি বেজায় জটিল ব্যাপার করে তুলেছ।"

"এখন কি করা যায় বলুন তো?"

"সেটা একটু ভেবে চিন্তে দেখতে হবে। এক কাজ কর, রাত্রে তুমি আমার কাছেই থাকো—দুজনে মিলে পরামর্শ করে দেখা যাবে। তবে আমার ঠাকুরটির রান্না খেয়ে তোমার তৃপ্তি হবে না—যেমন খারাপ রাঁধে, তেমনি আবার চোর"—

"সব ব্যাটাই সমান—আমারও তো সেই অবস্থা। তবে আজকে আপনার কোন ভাবনা নাই—যা খেতে চাইবেন তাই খাওয়াব।" মিহিরবাবু মুখে বললেন বটে "আর ভাই আমাদের কি আর খাবার বয়স আছে—তুমি যা যা খেতে ভালবাস, তাই আনো" কিন্তু তবু তাঁরও অলৌকিক নেমন্তন্ন খাবার কথায় উৎসাহ জেগে উঠল।

খেতে খেতে ভূতনাথ বলল "এক কাজ করলে হয় না—আপনার ঠাকুরটিকে যদি হঠাৎ খুব ভাল লোক বানিয়ে দিই

"কিন্তু সেকি সেটা পছন্দ করবে, বুঝলে কিনা ভূতু, চুরি বিদ্যা যে খুব লাভজনক বিদ্যা।"

"কিন্তু সে তো তখন সাধু হয়ে যাবে—কাজেই চুরি করতে তার ইচ্ছেও করবে না।"

শেষ পর্যন্ত ভূতনাথের কথাই রইল। মিহিরবাবুর ঠাকুর হঠাৎ নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন অনুভব করল। জীবনে যা কিছু অন্যায় কাজ করেছে তার জন্য তার ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হল। সেইদিন ভাঁড়ার থেকে সে যা কিছু চুরি করেছিল সমস্ত সে যথা-স্থানে ফিরিয়ে রাখল। তারপর বৈঠক খানায় এসে ভূতনাথের সামনে মিহির বাবুর কাছে তার সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে গেল।

আনন্দে মিহির বাবুর চোখে জল এসে গেল। ভূতনাথের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন "কি সম্পদ পেয়েছ তা তুমি ভাল করে বুঝতে পারছনা ভূতু, এই শক্তির বলে তুমি পৃথিবীর সমস্ত পাপীকে ভাল করে দিতে পার সমস্ত দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পার"

ভূতনাথ বলল "জনার্দনের কি হবে মিহিরবাবু"

"আহা হা—তার জন্য অত ভাবনা কেন—তাকে বরং সেই দেশেই বিয়ে টিয়ে করে ঘর কন্না করতে বল—এ দেশের কথা সে সব ভুলে যাক। আমরা দুজনে চল আমাদের কাজে লেগে যাই।"

সারারাত ধরে ভূতনাথের অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা চলল। মিহিরবাবু এক এক খানা কথা বলেন আর ভূতনাথ সেটাকে কার্যে পরিণত করে। তাদের দুজনের কৃপায় সহরের সমস্ত দুষ্টু লোক ভাল হয়ে গেল। সমস্ত মদের দোকান সরবতের দোকানে পরিণত হল সমস্ত রোগীর রোগ সেরে গেল – যার মনে যা দুঃখ ছিল সব দূর হয়ে গেল— সহরের রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সব নতুনের মতন চমৎকার হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত তিনটা বাজল। মিহিরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন "কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে কেউ সহরটাকে চিনতে পারবে না। ভূতু—কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হবার আগে সকাল হলে চলবে না তো।"

"চলবে না বললে কি করে হবে মিহিরবাবু—সময় তো আর আপনার জন্য বসে থাকবে না।"

"আমার জন্য বসে থাকবে না বটে কিন্তু তোমার জন্য বসে থাকতে পারে তো।"

ভূতু চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করল "তার মানে?" "তার মানে—সময়-টাকে তুমি একটু থামিয়ে রাখনা"—"সেটা একটু বাড়া বাড়ি হবে না মিহির বাবু?"

"বাড়াবাড়ি হবে কেন? চেষ্টা করেই দেখনা।" দুইজনে পা টিপে টিপে বাইরে মাঠে বেরিয়ে গেল। মিহিরবাবু বললেন "পৃথিবীটা ঘোরে বলেই তো দিন রাত হয়— তুমি পৃথিবীকে কয়েক ঘণ্টা স্থির থাকতে বল – তা হলেই সময় থেমে থাকবে।"

ভূতনাথ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে ডেকে বলল "স্থির হও।" পরমুহূর্তে কি এক প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল—তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ভূতনাথ প্রচণ্ড বেগে শূন্য পথে চলতে লাগল। কিন্তু দম বন্ধ হয়ে মরবার আগেই সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল" "আর যাই হয় হোক আমি যেন নিরাপদে মাটিতে নেমে আসি।"

বলামাত্র সে মাটিতে নেমে এল কিন্তু ধ্বংসলীলা চলতে লাগল। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে লোহা লক্কড়, ইঁটপাটকেল মানুষ জন্তু উড়ে, ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। ভূতনাথের মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল—"কি হল, এ কি হল? আমি তো ঝড় চাইনি—এরকম প্রলয়ও তো আমি চাইনি—কোথায় গেল সব বাড়ী ঘর গাছপালা—মিহির বাবুই বা গেলেন কোথায়?"

পৃথিবীকে থামতে বলবার সময় ভূতনাথ পৃথিবীর অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘণ্টায় হাজার মাইলেরও বেশী বেগে ঘুরছিল—ভূতনাথের কথায় পৃথিবী হঠাৎ স্থির হয়ে গেল—তারা কিন্তু থামল না—কাজেই ধাক্কা ধাক্কিতে পৃথিবীতে যা কিছু ছিল সব ধ্বংস হয়ে গেল। খালি নিজের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার গুণে ভূতনাথের প্রাণটি বেঁচে গেল।

সেই প্রলয়ের মধ্যে বসে ভূতনাথ যে মাথা ঠাণ্ডা করে এত কথা ভেবে দেখছিল তা নয়। সে বুঝতে পারছিল যে তারই দোষে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল—কিন্তু কেন হল, কি করে হল—তা সে বুঝতে পারছিল না।

নিজের অলৌকিক শক্তিকে উদ্দেশ্য করে সে বলল "আর একটা কাজ মাত্র তোমায় করতে হবে—মন দিয়ে শোন—আমি যেই বলব "এক দুই তিন" অমনি যেন আমি এই অলৌকিক শক্তিকে হারিয়ে ফেলি। তার আগে সময়টা দুইদিন পিছিয়ে দাও—আমাকে সেই পাঁচু বাবুর বৈঠকখানায় ফিরিয়ে দাও লণ্ঠনটা উল্টে যাবার আগে। আর পরে যা কিছু ঘটেছে সব দূর হয়ে যাক—সবাই ভুলে যাক - আচ্ছা—এক দুই তিন" ভূতনাথ চোখ বুজলো। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকের ঝড় ঝাপটা, প্রলয়কাণ্ড থেমে গেল।

কানের কাছে কে যেন বলল "অলৌকিক হবে বৈকি, কিন্তু আপনি কি বলতে চান শুনি?"

ভূতনাথ চোখ মেলে দেখল যে সে পাঁচুবাবুর সান্ধ্য আড্ডায় বসে আছে। অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমুল তর্ক চলেছে। তার মনের মধ্যে আবছা আবছা কি সব চিন্তা ঘুরতে লাগলো। কি যেন ঘটে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ভাবটাও কেটে গেল। সময়টা দুইদিন পিছিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর সব জিনিষ যেমন আগে যা ছিল তাই হয়ে গেল—ভূতনাথের অবস্থাও ঠিক আগে যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল, কেবল তার নিজের অলৌকিক শক্তির গুণে সে অলৌকিক শক্তি হারিয়ে ফেলল। সব চেয়ে মজা

হল এই যে সময় পিছিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই গল্পে বর্ণিত সমস্ত ঘটনার স্মৃতি মন থেকে মুছে গেল—আগের মতন অলৌকিক শক্তিতে দৃঢ় অবিশ্বাস ফিরে এল—জোর গলায় সে টেবিল চাপড়িয়ে বলল "কি আর বলতে চাইব মশাই –বাতিটা তো আর কেউ মুখের কথায় উল্টে দিতে পারে না—অতএব প্রমাণ হচ্ছে যে অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটতে পারে না।"

"বাংলার মেয়েমহল"

শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়।

১৯৩৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে "বাংলার মেয়েমহল" নামক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়। তখনও চারিদিকে মহিলা সমিতি গঠনের হুড়াহুড়ি পড়ে যায়নি, যে কয়েটি মহিলা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল "নিখিল ভারত নারী সম্মেলন", ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব উইমেন" এবং "নারী সত্যাগ্রহ সমিতির" ভেঙ্গেপড়া অংশটুকু তাদের মধ্যে অন্যতম। নারী আন্দোলন বলে আলাদা কিছু হয়নি আর সেজন্য কোন সমিতির প্রয়োজনও হয়নি, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কল্যাণে মেয়েরা যে যতটুকু পেরেছিলেন করেছিলেন। কাজে কাজেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যত স্তিমিত হতে লাগল মেয়েদের আলোড়ন ধীরে ধীর থেমে গেল, চতুর্দ্দিকেই একটা বিশৃঙ্খলা, হঠাৎ জমাট আসর ভেঙ্গে গেলে যেরকম অবস্থা হয় '৩৫ সালে ঠিক তাই হয়েছিল। যে সব মেয়েরা কর্ম্মি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তখন তাঁরা রাজবন্দিনী, আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষতি হওয়ার পর যে যার পথ দেখেন।

এরকম সময়ে হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল যে কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক নারী-সম্মিলনী হবে। আমরা যে ক'টি মেয়ে এদিক ওদিক পড়েছিলাম সকলেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম যে এবার একে কেন্দ্র করে একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই। তখন মেয়েদের জন্য "বাণী-মন্দির" বলে আমাদের একটি পাঠাগার ছিল, আমরা তা'র তরফ থেকে সকল মেয়েদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা ডাকলাম কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য স্থির হল যাতে কলকাতার সমস্ত মেয়েরা এই সম্মিলীতে যোগ দিতে পারেন এবং বাঙ্গালী মেয়েদের প্রকৃত অবস্থার সম্বন্ধে যাতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত-হতে-আসা প্রতিনিধিরা জেনে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করব; কিন্তু আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম যে উদ্যোক্ত্রীরা যে-সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন তার আলোচনা হওয়া নাকি সম্ভব নয়. তখন আমরা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে ডাকি এবং স্থির করি যে আলাদা করে একটি সমিতি গঠন করে আমাদের ভাবধারা দিয়ে একটী ইস্তাহার বার করা হবে ও কমলাদেবী যে বক্তৃতা দিবেন তাতেই আমাদের বক্তব্য খানিকটা প্রকাশিত হবে। এটুকু আমরা জানতাম যে, যে প্রতিষ্ঠান ড্রইংরুমে বসে মেয়েদের আন্দোলন করে তার

প্রতিনিধিত্বের উপর বেশী আস্থা রাখা উচিত নয়, তার পরিবর্ত্তে আমাদের কর্ত্তব্য হবে কথা না বলে কাজ করা, সকল শ্রেণীর মেয়েদের ভিতর গিয়ে মেলামেশা করা এবং সমাজের অধিকার সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা। সেই থেকে আমরা "মেয়েমহলের" কাজ সুরু করেছি।

প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম যে গোটা বাংলা দেশে একটা নারী আলোচনা জাগাব;—সেই হিসেবে আমরা আমাদের মতগুলি প্রকাশ করতাম এবং আমাদের প্রচার বিভাগ কিছু মন্দ কাজ করেনি। মেয়েদের ভিতর আন্দোলন করবে বলে, মেয়েদের বিরুদ্ধে যে সামাজিক একচোখামি আর অবিচার আছে তার বিরুদ্ধে লড়বে বলে যে সমিতি দাঁড়িয়েছিল তাকে চারিদিক থেকেই পুরুষ ও মেয়েরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে মেয়েমহলের ফাইল ঘাঁটলে; কিন্তু বরাবর যা হয়ে থাকে আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না—প্রথম হুজুগ কেটে যেতেই ভাটা পড়তে সুরু করল, কত মেয়ে চলে গেল। আর্থিক বাধাবিপত্তি, উপযুক্ত কর্ম্মির অভাব এসব মিলে আমরা কর্ণধারবিহীন তরনীর মতই টলমল করতে লাগলাম। সে সময়ে কি জানি কোথা থেকে মনের একটা দৃঢ়তা পেয়েছিলাম, তাই ভাবলাম যেমন করেই হোক একে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখব। দুচার জন সহকর্ম্মিনীর সাহায্যে একে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত রাখতে পেরেছি, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে।

এ কয়েক বছরের মধ্যে মেয়েদের মনস্তত্ব বিকলন করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু ফলাফল হয়েছিল ব্যর্থ—কোন কাজে লাগাতে পারিনি। এ দেশের মেয়েরা একেবারেই ঘরমুখো, এদের মোহ কাটবার এখনও অনেক বাকি, তাই এ দেশের যা আচার সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করতে সুরু করেছি।

এই ব্যর্থতার যে একটা মজার দিকও নেই তা নয়। প্রথমে সভা সমিতিগুলো খুব জমকালো হত, পরে ধীরে ধীরে জনসংখ্যা কমতে লাগল। একবার মিটিং ডেকেছি, বোধহয় মহাবোধি হলে, দেখা গেল শেষ পর্য্যন্ত কেবল তিনজন সম্পাদিকাই উপস্থিত আছেন। এরকম অনেকবার হয়েছিল। তখন বুঝলাম যে মেয়েরা নোটীশ পেয়ে মিটিংএ আসবে এ কথা ভাবাই আমাদের ভুল; তারপর থেকে আরম্ভ করলাম বৈঠকে। পাড়ায় পাড়ায় ভাগ করে শিক্ষা কেন্দ্র খুলে দুপুরে মেয়েদের ক্লাস করা আরম্ভ হল, দেখা

গেল যে সত্যিকারের মেয়েমহলের ভিতর যতক্ষণ না প্রবেশ করা যাচ্ছে ততক্ষণ কোন কাজই হবে না। আমরা "মেয়েমহল" থেকে কয়েকটি বিভাগ খুললাম, যথা—প্রচার বিভাগ, সাহিত্য বিভাগ, শিল্প-শিক্ষা বিভাগ, আমোদ-প্রমোদ বিভাগ, গ্রন্থাগার সর্ব্বশেষে আন্দোলন বিভাগ, অর্থাৎ যখন যে রকম অবস্থা হবে তৎপরতার সঙ্গে এই বিভাগ কাজ করে যাবে।

এর ভিতর শিক্ষা বিভাগটাই বেশ কার্য্যকরী হল। এর ভিতর দিয়ে আমরা অনেক মেয়ের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছি। বর্ত্তমানে "মেয়েমহলের কাজ হল প্রতি জায়গায় কেন্দ্র গড়া, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে মেয়েদের সচেতন করা যাতে প্রয়োজন হলে সবাই শিক্ষিত সৈনিকের মত এসে দাড়াতে পারে। কবে কি হবে তার বসে না থেকে আমরা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে কাজ চালাতে পারি, শরীর চর্চ্চা করতে পারি, সেবা শুশ্রূষার জন্য দল গঠনও করতে পারি, সবার উপর "সামাজিক বিপ্লব" করতে পারি,—এর ভিত গেছে ধসে, যা এখন আছে তার চারিদিকেই চূণ বালি খসে পড়েছে, বারে বারে সংস্কার না করে একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে ভিত গড়াই মঙ্গল। অনেক কিছু রং দিয়ে সমাজ আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে সেজন্য পরিস্কার চোখে দেখে এর বিচার করা দরকার। মেয়েরা যতক্ষণ না এই সমাজের বাধা, নিষেধ গণ্ডী নিজের হাতে কাটতে পারছে ততক্ষণ নারী স্বাধীনতা স্বপ্নই থেকে যাবে। "মেয়েমহলের" প্রধান উদ্দেশ্য হল আলোড়ন সৃষ্টি করা, গান, বাজনা ওগুলো উপলক্ষ্য মাত্র।

১৯৪১ সালে এটুকু বলা যেতে পারে যে "মেয়েমহলের" কয়েকটি শাখা প্রশাখা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। দেশের যেদিন চরম সঙ্কট উপস্থিত হবে সেদিন এ পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। যিনি এর কাজ করতে ইচ্ছুক হবেন তিনিই ঘরে বসে মেয়েমহল চালাতে পারবেন, পাড়ায় বসে এই কাজ করা কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। এখনও হয়ত বাংলার "মেয়েমহল" অনেকের কাছে অজ্ঞাত, আশা করি "মেয়েদের কথা" সকলের কাছে "মেয়েমহলের" বাণী পৌঁছে দেবে।

—ঘরকন্নার কথা*—

শ্রীপুষ্পলতা রায় চৌধুরী।

কেক্ না ভেঙ্গে বার করা—

অনেকেই বাড়ীতে কেক্ করতে অভ্যস্ত; কিন্তু কোন কোন সময়ে কেক্ টিন থেকে না ভেঙ্গে বের করার বড় অসুবিধা হয় টিনের গায়ে জড়িয়ে যায়। টিন সুদ্ধ গরম জলের বাষ্পের উপর খানিকটা ধরে রাখলে দেখবেন টিন যখন বেশ গরম হয়েছে তখন কেক্ আর না ভেঙ্গে অতি সহজেই ঢেলে নেওয়া যাবে।

বইয়ের মলাট ভাল রাখা—

ব্রাউন চামড়ার মলাটের বইতে অনেক সময়েই ছেতলা ধরে রং নষ্ট হয়ে যায় কাঠের আসবাবের যে কোন পালিস লাগিয়ে নিয়ে পরে শুকিয়ে ঘসে নিলেই আবার মলাটটা চক্‌চকে হয়ে যাবে।

ডিমের রং ভাল রাখা -

আজকাল অনেকেই স্যালাড খান, তাতে ডিম পূরো সিদ্ধ করে চাকাচাকা করে কেটে দিলে আরো সুস্বাদু হয়। ডিমের রং পরিস্কার রাখার জন্য খোলা ছাড়াবার আগে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডাজলে ডুবিয়ে রাখলে ভাল। খোলা আরো সহজে ছাড়ান যায় যদি সিদ্ধ করবার সময় একটু নুন জলে দেওয়া যায়, তাতে ডিমের সাদা, কুসুম, বা খোলা আর ভাঙ্‌বেনা।

---

* অনেক সময়ে সংসারের ছোটখাট কাজের মধ্যে নানারকমের অসুবিধা ভোগ করতে হয়; অথচ তা'র প্রতিকারের উপায় কত সহজ! তাই লেখিকা "ঘরকন্নার কথা" নাম দিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের কতকগুলি করে দরকারি কথা বলবার ভার নিয়েছেন। আশা করি এতে আমরা সবাই উপকৃত হ'ব।

সম্পাদিকা।

সাদা কাপড়ের রং পরিষ্কার রাখা—

ছোট ছেলেমেয়ের কাপড় কিম্বা সাদা রুমাল, কলর বা কোন সাদা ছোট জামা বাড়ীতে কেচে নেবার দরকার হ'লে সেগুলি কেচে বেশ টেনে টেনে শুকোতে দিতে হ'বে। তারপর একটু শুকিয়ে উঠলে বারবার অল্প করে জলছিটা দিতে হ'বে; এইভাবে সাদা কাপড় শুকালে সেগুলির রং আশ্চর্য্য সাদা থাকে আর খুব ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দেখায়।

ভেলভেটের কাপড়ে দাগ লাগা—

ছোটদের ভাল ভেলভেটের জামায় খেতে গিয়ে দাগ পড়ে গেলে মার ভাবনা হয় কি করে পরিষ্কাব করা যায়। দেখা যায় ঘষে উঠিয়ে দিলেও ভেলভেটের রোঁয়াতে কিরকম একটা দাগ বোঝা যায়। তাই সে জায়গাটা সমান করবার জন্য হাতে টান করে ধরে খানিকক্ষণ ফুটন্ত জলের গামলার উপরে বাষ্পে ধরে রাখলে খানিক পরেই কাপড়ের দাগটা মিলিয়ে যাবে।

কালচে রংএর ফেল্ট্ হ্যাটের ময়লা ভাবও এই বাষ্পে ধরে ঘষে বুরুশ করে দিতে হবে, কিন্তু রোঁয়ার উল্টো দিকে বুরুশটা ঘসতে হবে।

ডিমের কুসুম—

টাট্‌কা ডিম ফেটে গেলে সিদ্ধ করবার সময়ে কুসুমটা বেরিয়ে আসে। সেইজন্য খুব মিহি সাদা 'টিসু' কাগজে মুড়ে নিয়ে সেটা সিদ্ধ করলে কুসুমটা আর ভাঙ্‌বেনা।

জুতো পরিষ্কার

অনেক সময়ে আনাড়ি চাকরের দোষে জুতোর পালিশ বড়ো ময়লা দেখায়। সেজন্য মাঝে মাঝে চামড়ার জুতো পাৎলা একটুকরো কাপড় পেট্রোলে ডুবিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে রগড়ে নিলে পুরান, ময়লা পালিশ উঠে গিয়ে নূতনের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ফুল তাজা রাখা—

ফুলদানিতে ফুল অনেকক্ষণ টাট্‌কা রাখতে হ'লে তার ডাঁটাগুলি ছোট এক গামলা গরমজলে ডুবিয়ে রেখে জলটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন তুলে নিতে হবে; আবার ফুলদানির ঠাণ্ডাজলে ডুবিয়ে রাখবার আগে ডাঁটাগুলির ডগা সামান্য করে কেটে দিতে হবে।

জলের কেট্‌লির দাগ—

গরমজলের কেট্‌লিতে সাদা মাটির মত জিনিষ পুরু হয়ে জমে যায়, তখন ময়লাও দেখায় এবং জল সিদ্ধ হতেও দেরী হয়। কয়েকটা আলুর খোসা নিয়ে কেট্‌লিতে রেখে জল দিয়ে আধঘণ্টা ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর খোসাগুলো তুলে ফেলে দিলে দেখা যাবে ঐ শক্ত মাটি নরম হয়ে গেছে, তখন সেটা ফেলে কেটলি পরিষ্কার করে নিলেই হ'ল।

ছুরীর বাঁটের দাগ—

খাবার ছুরীর সাদা বাঁটে দাগ ধরলে এমেরি পাউডার (emery powder) দিয়ে ঘসলে উঠে যায়। আর একটা উপায় হচ্ছে হলদে দাগ না ধরতে দেওয়া—যদি মাঝে মাঝে সেগুলি তারপিনের তেল দিয়ে ঘসে রাখা হয়, তা হলেই রং ঠিক থাকবে।

এলুমিনমের বাসনের দাগ—

এলুমিনমের বাসনের আজকাল অনেক দাম বেড়ে গেছে সেজন্য পুরান বাসন যেগুলি ব্যবহার করে কালো রং ধরে গেছে, সেগুলি কি করলে ভাল হয় জানেন? অনেক সময়ই চাকরেরা না জেনে সেগুলি সোডা দিয়ে মাজে সেই কারণে বাসনের রং খারাপ হয়ে যায়। আবার পরিষ্কার রং ফিরাবার জন্য সেগুলিতে জল ভরে একটু ভিনিগর দিয়ে আস্তে আস্তে ৫।১০ মিনিট ফুটিয়ে নিলে ভাল। তারপর একটা ছোট্ট ফ্লানেলের টুকরা কাপড়ে নুন লাগিয়ে পালিশ করে নিলেই হোল।

পুরান রগের নূতন রং—

গরম রগের (rug) যদি রং খারাপ হয়ে যায় তবে একটু গরম জলে এমোনিয়া বা ভিনিগরে ন্যাকড়া বা স্পঞ্জ ভিজিয়ে মুছে দিয়ে (স্পঞ্জ করে) নিতে হবে। এইভাবে করলে রগের রংটা পরিষ্কার হবে এবং ফুলপাতার নক্সা থাক্‌লে তার রংও উজ্জ্বল দেখাবে।

সন্ধ্যাতারা

সান্ধ্যশশী মুখোপাধ্যায়।

কাহার লাগিয়া সাঁঝের দীপটি জ্বেলেছ সন্ধ্যাতারা ?
কার পথ চাহি জাগিছ নিশীথে একেলা তন্দ্রাহাবা ?
তোমার তরে ও রজনীগন্ধা জ্বেলেছে গন্ধধূপ,
জোনাকী জ্বেলেছে আরতির দীপ অপরূপ তার রূপ।
যূঁইয়ের গন্ধ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিছে আকাশপারে,
বেদনা মাখান বারতা তাহার পৌঁছেনি তব দ্বারে ?
ঝিঁঝিবা বাজায় সাহানায় বীণ,—কোকিল গাহিছে গীতি,
নীরব ভাষায় তোমায় ডাকিছে দূর বনানীর বীথি।
তোমার লাগিয়া সুনীলবসনা তারকায় উজ্জ্বল,
নিশীথিনী শুধু শিশিবেব রূপে ফেলিছে অশ্রুজল।
আঁধারের সাথে চুপে কথা কহ জানিনা সে কোন ভাষা,
তোমার ব্যথাব শেষ নাহি কিগো—নাহি কোন তার আশা ?
তোমাব ব্যথায় কালো হয়ে এল নীল আকাশের তল ?
তোমার ব্যথার কাহিনী গাহিছে স্বচ্ছ নদীব জল।
সারাটি বিশ্বে তোমাব ব্যথার কালো ছায়া শুধু হাসে,
তাই দেখে বুঝি অধরে তোমার বেদনার হাসি ভাসে ?
এ সবের মাঝে একা থাক তুমি ঘন ঘোর ধ্যানলীন
জান না কি তুমি কবে শেষ হবে তোমার তপের দিন ?
প্রদীপ জ্বালিয়া কাহার লাগিয়া আছ বাতায়নে চাহি'
হারান সে প্রিয় আসিবে কি ফিরি' দূর ছায়াপথ বাহি'।

প্রাচ্যে নারীপ্রগতি।

শ্রীরেণু রায়।

অনেকেরই ধারণা যে প্রাচ্যদেশগুলি পরিবর্তনশীলতার বাইরে, তাদের গায়ে নূতনত্বের হাওয়া লাগা সম্ভবপর নয়। তাই এখনও অনেকে অতীতের গৌরব কাহিনী নিয়েই মেতে থাকেন এবং সেই পুরাতন মাপকাঠির মোহ ছাড়াতে পারেন না। অনেক সময় তাঁদের মুখে এই কথা শোনা যায় যে অমুক দেশে অমুক ব্যাপার হ'তে পারে কিন্তু আমাদের দেশ অন্য বকম, সেখানে ওসব খাটেনা,—যেন আমরা অন্য প্রকারের জীব, অন্যদেশের লোকদের মত রক্ত মাংসের মানুষ নই! হতে পারে আমাদের সংস্কৃতি অন্য রকমের হতে পারে আমাদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এগুলি বাইরের আবরণমাত্র। মানুষের যা প্রকৃত আদর্শ, উন্নতির জন্য, প্রগতির জন্য যে আকাঙ্খা, খাওয়া পরা থাকার সুব্যবস্থার সমস্যার সমাধানের ইচ্ছা—তা সমস্ত বিশ্বের মানবকেই ব্যস্ত করে রেখেছে। একে কোন এক দেশের বা জাতির ভাবনা বলা চলেনা, তাই যতদিন এই এক ভিত্তির উপর মানবচরিত্র গঠিত হবে ততদিন সকল দেশের অধিবাসীকেই একটা মহান একতা ঘিরে রাখবে। তাছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ বিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীকে ছোট করে ফেলেছে; রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন দিয়ে সমস্ত জগৎটাকে ঘিরে ফেলে তার একতা বৃদ্ধি করেছে। এক দেশের লোক তাদের কৃষ্টি চিন্তাধারা, তাদের আচার ব্যবহার, সমস্তই অন্যান্য দেশের লোকদের জানিয়ে দিচ্ছে যাতে কেউ কারো অভিজ্ঞতা হতে বঞ্চিত না হয়। যখন এতবড একটা ঐক্যের ব্যূহে পড়েছি তখন কি আমরাও এর হাত থেকে নিস্তার পাব? ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আমাদেরও এগুতে হবে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে হবে। অনেক যুগের নিশ্চেষ্টতা ও আলস্য প্রাচ্য দেশগুলিকে আধমরা করে রেখেছিল, কিন্তু নূতন যুগে যখন চারিদিকেই পরিবর্তনের হাওয়া উঠেছে তখন নিদ্রিত প্রাচ্যকেও বাধ্য হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতে হয়েছে।

পরিবর্ত্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচ্যের নারী জগতে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের পার্থক্য নারীজগতের মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে বড় করে দেখা যেত। আমাদের দেশের মেয়েরা যেন পুরুষের কাছে দাসখৎ লিখে সবদিক দিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব তাদের পৃথক সত্তা, তাদের সব কিছুই বিসর্জ্জন দিয়েছিল। না ছিল তাদের চলাফেরা করবার শিক্ষাদীক্ষা পাবার স্বাধীনতা. না ছিল তাদের স্বাধীন চিন্তার অধিকার। শিশু অবস্থায় তার এবং তার কুলের মর্যাদারক্ষার নাম করে লোকে তাকে বেঁধে দিত বধূরূপে অজ্ঞ এক অপরিচিত পরিবারে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পাপের ফলে তাকে শ্বশুরালয়ে মোটা পণ এনে দিতে হ'ত, নয়ত তার কপালে থাকত জুতো ঝাঁটার ঠ্যাঙ্গানী আর গালিগালাজের অসহ্য অশান্তি। শিক্ষার বালাই তার ছিল না, কারণ মেয়েমানুষের একমাত্র ধর্ম্ম তার সংসার আর তার একমাত্র কাজ সন্তানের জন্মদান করা। পড়াশুনার অধর্ম্মের দ্বারা সে নিজে পরকালের সর্ব্বনাশ করতে সাহসী হতনা। এইভাবে সংসারের একঘেয়ে নিয়মের মধ্যে সমাজ. জ্ঞান এমন কি মুক্ত আলোবাতাসের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়ে সে জীবন কাটিয়ে দিত।

চীনদেশে মেয়ের সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে তার পা বাঁধার নিয়ম প্রচলিত হ'ল, যাতে সে কোন উপায়েই বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করতে না পারে। পা বাঁধার পদ্ধতি চীনদেশের মেয়েদের পরাধীনতার প্রতীক স্বরূপ ছিল। তুরস্কের মেয়েদের মধ্যেও অজ্ঞতা ও পর্দার অত্যাচার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু শুধু তুরস্ক, ভারতবর্ষ ও চীনদেশকে ধরলে প্রাচ্যের অনেক দেশের কথা বাদ দিয়ে যাওয়া হয়। ভারতবর্ষের নিকটে, অথচ একেবারে অপরিচিত অনেক ছোট ছোট দেশ আমাদের প্রতিবেশীদিগের সীমান্ত প্রদেশের আসেপাশে বর্তমান রয়েছে। পামীর পর্বতের পূর্বদিকে রয়েছে উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান তজেকিস্তান এবং আরও একটু পূর্বদিকে গেলে ক্যাসপিয়ান সাগরের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাকু, টিফলিস প্রভৃতি বড় সহর প্রাচ্য দেশেই অবস্থিত। দেশের নামগুলি খটমট শোনায় বটে কিন্তু এদের প্রধান সহরগুলির মধ্যে অনেক পরিচিত নাম শোনা যায়, যেমন শুধু উজবেকিস্থানেই পরিচিত সহর বোখারা, তাসকেশ, সমরখন্দ রয়েছে। এসব দেশের নারীজগতে আদর্শভাবে জাগরণ এসেছে এবং তাদের মধ্যে যেরকম উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে সেরূপ বোধহয় প্রাচ্যের আর কোথাও দেখা যায়নি।

এ সব মুসলমানপ্রধান দেশে কুড়িবৎসর আগেও মেয়েদের যে কি দুরবস্থা ছিল তা একটি প্রবাদ থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এরা বলে যে পুরুষ যদি কোন সদুপদেশের প্রয়োজন অনুভব করে তাহ'লে সে প্রথমে যায় মোল্লার কাছে, তার অনুপস্থিতিতে সে ক্রমানুসারে যায় তার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কাকা বা তার পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে; কাউকেই যদি সে খুঁজে না পায় তাহলে সে তার স্ত্রীর কাছে যায় এবং স্ত্রী যা উপদেশ দেয় তার ঠিক বিপরীত কাজ সে করে। এই ছিল মেয়েদের মর্য্যাদা! এখন দেশে যখন আস্তে আস্তে পরিবর্তনের হাওয়া এসে পৌঁছল তখন যেমন একদিক থেকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল মোল্লারা এবং পুরুষের দল, অন্যদিকে থেকে তেমনি মেয়েদের নিজেদের বংশপরম্পরাগত লজ্জা ও কুসংস্কারের অভ্যাস এসে দাড়ালে প্রকাণ্ড শত্রু হয়ে। কত বক্তৃতা, গান, নাটক, প্রহসনের মধ্যে দিয়ে বাড়িবাড়ি প্রচারের ফলে ক্রমশ মেয়েরা তাদের পারাঞ্জা (ঘোড়ার চুলের মুখ ঢাকনি) পরিত্যাগ করতে সম্মত হ'ল। সেই প্রথম অগ্রগামী স্ত্রীলোকদের সাহসের কথা মনে করে আজ ভক্তিতে মন ভ'রে যায়। পুরুষরা তাদের প্রথম প্রথম কি অপমানই না করেছে! অনেককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এমনকি ক্রুদ্ধ স্বামী অনেক সময়ে রাগের মাথায় স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে; কিন্তু মেয়েদের উৎসাহে তারা কোনমতে বাধা দিতে পারেনি, শিক্ষা ও উন্নতির দিকে তাদের মন ছুটে গেছে।

কুড়িবৎসর আগে এ সকল দেশে শতকরা দুইজনও লিখতে পড়তে জানতনা, অথচ ১৯৩৪ সালের প্রথমে শতকরা ৭০ জন শিক্ষা লাভ করেছিল। যেখানে মোটে ৪৬০টি স্কুল ছিল সেখানে ১৯৩৪ সালে ১১,১৮৬ স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এই সব স্কুলে হাজার হাজার মেয়েরা শিক্ষালাভের জন্য আসে এবং তাদের অধ্যবসায়ে সকলে চমৎকৃত হন। একবার-একটি স্কুলে একজন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা এসে কেঁদে পড়লেন যে তাঁকে ভর্তি করতেই হবে। তিনি বৃদ্ধা হলে হবে কি তাঁর চোখ তখনও যৌবনের আলোয় ভরপুর, তিনি অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে কিছুতেই মরতে রাজি নন, তিনি দৈনিক কাগজ পড়বার জন্য, বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসবার জন্য পাগল। কৃষিদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা বিশেষভাবে করা হয়েছে। অনেক সময়ে মাঠেতেই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; আবার অনেক সময়ে শোনা গেছে যে কোন কোন মেয়েরা মাসে দশদিন কাজ করে যা রোজগার করে তাই দিয়ে বাকি কুড়িদিন তারা সহরে শিক্ষালাভ করে।

যে উজবেকিস্তানে আগে একটিও শিক্ষিতা মেয়ে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ সেখানে ১৯২৫ সালে ১২০০ বয়স্কা মেয়ে শিক্ষালাভ করেছিল। এদেশের মেয়েরা এখন তাদের নিজেদের ভাষায় আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকদের অনুবাদে রত; তা'ছাড়া দেশের যে সব অতি পুরাতন লোকগীতি, গল্পগুচ্ছ এতদিন লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে সেগুলিকে পুস্তকবদ্ধ করতে তা'রা চেষ্টা করছে। যে মেয়েরা আগে বদনামের ভয়ে রঙ্গমঞ্চে উঠতে সাহস পেতনা তারাই আজকে নৃত্যে, গানে, নাট্যকলার উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে কজগিস্তানে আগে একটিও নাট্যনিকেতন ছিলনা সেখানে আজ বাইশটি স্থাপিত হয়েছে; তা'ছাড়া চারটি ষ্টুডিও, একটি দেশী যন্ত্রের অর্কেষ্ট্রা এবং একটি গীতনাট্য শেখাবার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। টানারা খানুম নাম্নী একজন এদেশী গায়িকা এবং নৃত্যশিল্পী বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। ১৯৩৪ সালে প্যারিতে এবং ১৯৩৫ সালে লণ্ডনে তার নৃত্য দেখে পাশ্চাত্য জগত বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল।

কাজকর্মেও এরা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তুলা চাষের কৃষিদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জন মেয়ে এবং অন্য সর্ব্বত্রও ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা অধিক। তা'ছাড়া কলকারখানাতেও মেয়েরা স্থান পেয়েছে। সুতা বা রেশম শিল্পে শতকরা আশি বা নব্বই জন মেয়ে; বাকুর তেলের কারখানায় ১৯৩১ সালেই ১৮০০০ জন মেয়ে কাজে নিযুক্ত ছিল। মিলালোভা নামে একটি মেয়ে ছেলে এবং মেয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সবচাইতে ভাল শিল্পী হিসেবে সাতবার পুরস্কার পেয়েছে এবং তেল কোম্পানীর নিকট হতে মানপত্র পেয়েছে। তাশখন্দের সবচেয়ে বড় সুতার কারখানায়। তাশখেন্দের সবচাইতে বড় তেলের কারখানায় শতকরা ৭৫ জন মেয়ে কাজ করে এবং মিলের ম্যানেজারও মেয়ে। এদের অধিকাংশই সম্প্রতি পারাঞ্জা ছেড়ে বার হয়েছে। এতদিন যারা সকল আনন্দ ও স্বাধীনতা হতে বিচ্যুত ছিল আজ তারা শিক্ষায়, কাজকর্মে, খেলা-ধূলায় সবদিকে এগিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে রেশারেশি লেশমাত্র নেই এরা শুধু জীবনের উন্নতি চেয়েছে।

তুরস্কেও নূতন যুগের নূতন আবহাওয়া সৃষ্টির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তুরস্কের সঙ্গে ভারতের অনেকদিনের পরিচয়। সেখানে ঠিক আমাদের মত বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা কুসংস্কার, অজ্ঞতা, মেয়েদের দুর্গতির কারণ হয়ে বসেছিল, কিন্তু কেমাল আতাতুর্কের আশ্চর্য ক্ষমতার ফলে প্রায় রাতারাতিই মেয়েদের সামনে এক নূতন জগত খুলে গেল। ১৯০১

সালের পূর্ব্বে মেয়েদের শিক্ষার জন্ম প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। ১৯১৩ সালে প্রথম এদিকে মন দেওয়া হয় এবং এ কাজে হালিদে এদিব; বায়ান নাকিয়ে, এলগুন প্রভৃতি মহিলারা অগ্রগামিনী হন। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে বিদ্যার্থিনীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে সেই পরিমাণে ইস্কুলের বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন ১৯২৫ সালে এই সমস্যার সমাধানের জন্ম এক বিপ্লবাত্মক উপায় নির্দ্ধারণ করা হল। সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে সমগ্রভাবে এবং শিক্ষার অন্যান্য বিভাগেও কিয়দংশে সহশিক্ষা আরম্ভ হল। যে তুরস্কে মেয়েরা ছেলেদের সামনে মুখ খোলাটাই মহাপাপ বলে গণ্য করত সেখানে এরকম একটা আইন গৃহীত হওয়াকে বিপ্লব ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এর আগে সব ইস্কুলই মোল্লাদের অধীন ছিল এবং কোরাণ পঠনই তা'দের উদ্দেশ্য ছিল। আজকাল স্কুলে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়না, —ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এই বিশ্বাসেই এ নিয়ম করা হয়েছে।

গ্রামে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সব চাইতে বড সমস্যা হয়েছিল সুশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব! তা ছাড়া এদের অনেকে সহুরে অভ্যাস ছেড়ে একা গ্রাম্য জীবন যাপন করতে পারতনা। তাই আজকাল অনেক ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় গ্রাম বেছে নিয়ে স্কুল, ছোট হাসপাতাল ও সঙ্গে হয়ত একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করে আশেপাশের গ্রামগুলির উন্নতি করা হয়।

এইভাবে মেয়েরা সমাজ ও শিক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে, আর্থিক ক্ষেত্রেও তারা পিছপা হয়নি। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে মেয়েদের সব চাইতে বেশী সমাদর এবং তুরস্কের শিক্ষকদের মধ্যে অর্ধেকের বেশীই মেয়ে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচণ্ড চেষ্টায় তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট বলেছেন যে মেয়েরাই সবচাইতে বেশী কাজ করতে পারে। তাই আজ তারা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেয়ে সমান মাহিনায় শিক্ষার কাজ করছে। ১৯২৭ সালের পূর্ব্বে তুরস্কে কোন মেয়ে ডাক্তার ছিলনা, সেই বৎসর ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ছয়টি মেয়ে ডাক্তারি পাশ করে বেরোয়। তারপর থেকে ক্রমশঃই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আজ সমাজে তারা সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে বসেছে। স্কুলের স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রথম কর্ম সচীব একটি মেয়ে হন। ইস্তানবুলের শিশু চিকিৎসালয়ের প্রধান ডাক্তারও মেয়ে। ঐ সহরেই তিনজন মেয়ে অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে এবং আঙ্কারায় ছয়জন মেয়ে ডাক্তার কাজ করছে। মেয়েরা আইন শাস্ত্রেও দক্ষতা দেখিয়েছে। ইস্তানবুল

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অনেক ছাত্রী আছে। প্রায় চল্লিশজন ইতিমধ্যে আদালতে কাজ করছে আর চারজন বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছে। ইস্তানবুলের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে যে তিনজন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে তা'দের মধ্যে দুইজনকে সহরের সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। নার্স, টাইপিষ্ট, ট্রামকণ্ডাক্টর, ট্যাক্সি চালক সব পদেই মেয়েরা স্থান পেয়েছে। হাতিজে রাফিক নাম্নী একজন অভিজ্ঞা রমণী ইস্তানবুলের এক প্রধান ব্যাঙ্কের কর্মসচীব হয়েছেন। তিনি শুধু কর্মী হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেননি, তিনি কর্মপটু গৃহিনীও। তাঁর স্বামী এবং ছয়টি ছেলে বর্তমান। এই প্রতিভা-শালিনী, বুদ্ধিমতী ও মর্য্যাদাবোধসম্পন্না মেয়েদের দক্ষতার সঙ্গে হাসপাতালে আদালতে, ব্যাঙ্কে, রাস্তায় ঘাটে কাজ চালাতে দেখে যখন মনে করি যে এরাই কিছুদিন আগে বাড়ীর পর্দার বার হতে ভয় পেত, পুরুষের সামনে মুখ খুলতনা, তখনই এদের অসীম সাহস, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়।

তুরস্কের পর আর একটি দেশের দিকে দৃষ্টি পড়ে সেখানে আজ তিন বৎসর ধরে মহা সংগ্রাম চলেছে, সেখানে হাজার হাজার শিশু ও নারী মরেছে। সেখানে অতি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বার বার বোমার দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু সেখানে আজও নিরাশা আসেনি। সে দেশ আজও দাসত্ব স্বীকার করেনি—সেই বিজয়ী দেশের নাম চীনদেশ। চীনদেশের মেয়েদের অবস্থা আমাদের দেশেরই সামিল ছিল। পা-বাঁধার প্রথার কথা বলা হয়েছে; তা'ছাড়া তারাও অল্প বয়সেই সংসারের চক্রে বাঁধা পড়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিত। চীন দেশের কৃষক আমাদের দেশেরই মত দরিদ্র। তা' ছাড়া দুর্ভিক্ষের অভাব এদেশে লেগেই থাকত বলে নিদারুণ অভাবের চাপে কন্যা বিক্রয় করা একটা সাধারণ রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছিল। যখন ডাঃ সুন-ইয়াৎ-সেন চীন দেশকে নূতন করে গড়ে তুলতে উদ্যত হলেন তখন তাঁর বিখ্যাত নয়টি মূল নীতির তৃতীয়টি ছিল যে চীনদেশের মেয়েদের সম্পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে এবং সেই থেকে মেয়েদের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করল।

আসল পরিবর্তন আরম্ভ হ'ল যখন জাপান তার অমানুষিক শক্তি চীনদেশের উপর প্রয়োগ করল। চীনের একধার থেকে আরেক ধার পর্য্যন্ত জাপানী বোমারু ও বিমান এনে দিল নবজাগরণের বাণী। জাপানী বোমা যে মুহূর্ত থেকে তাদের সংসার, গৃহ, স্বামী, সন্তানাদি সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে গেল সেই মুহূর্ত হতে তার জীবন থেকে মুছে গেল

যুগ-যুগান্তরের নিশ্চেষ্টতা, সঙ্কোচ ও ভয়। আজ চীন যুদ্ধে মেয়েদের সহায়তা দেখে সকলেই আশ্চর্য হচ্ছে। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা চাষ করছে যাতে তাদের বীর যোদ্ধারা ক্ষুধায় কষ্ট না পায়। চীনদেশে আগে সৈন্যরাই রাজত্ব চালাত আর গরীব কৃষকদের উপর অত্যাচার করত তাই চীনদেশের গ্রামের সাধারণ লোকেরা আগেকার সৈন্যদলকে বড় ভয় পেত এবং এই ভয় এখনও মন থেকে মুছে যায়নি বলে অনেক সময়ে সৈন্যদল আসছে শুনলেই গ্রামের লোকরা ঘরবাড়ী ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাত। একবার চাষারা চাষ না করে পালানোতে একটি সৈন্যদল বড়ই খাবার কষ্ট পাচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে একদল স্বেচ্ছাসেবিকা এসে উপস্থিত হ'ল। সৈন্যদের দুরবস্থা দেখে তারাই কৃষকদের গিয়ে বুঝায় যে চীনদেশে আর সেই পুরাতন রাজত্ব নেই, আজ নূতন চীন জেগে উঠেছে। যোদ্ধারা অত্যাচার করতে চায়না লোকের বন্ধু হতে চায়। এইভাবে তারা লোকদের ফিরিয়ে এনে সৈন্যদের থাকবার আর অসুস্থদের সেবাশুশ্রূষা করবার ব্যবস্থা করে দিল।

মেয়েরা শিক্ষা বিস্তারেও যে কি আশ্চর্য্য কাজ করছে তা বলে শেষ করা যায়না। জাপান যেমন বারে বারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করছে, চীন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অমূল্য বই ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে তা'রা গ্রাম্য লোকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টায় নিজেদের নিযুক্ত করছে, একতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছে, জাপানের লোকরা যে তাদের শত্রু নয় জাপান গভর্ণমেণ্ট যে আসল শত্রু একথা তারা বক্তৃতায়, নাটকে, বইয়ের দ্বারা শেখাবার চেষ্টা করছে। অনেক মেয়ে রেড-ক্রশ প্রতিষ্ঠানে সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষা করছে, এমন কি অনেকে যুদ্ধও করছে। কাংসিতে দু'হাজার মেয়ে একটি মেয়ে সৈন্যদল গঠন করবার জন্য চেষ্টা করেছিল; পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে দেড়শ' জনকে নিয়ে তাদের উপর কৃষকদের গুপ্তযুদ্ধ (গরিলা যুদ্ধ) শেখাবার ভার দেওয়া হল। তারা দেশের আভ্যন্তরীণ গ্রামগুলিতে এই যুদ্ধের কায়দা শেখাবার জন্য ৫০ পাউণ্ড ওজনের জিনিষপত্র ঘাড়ে করে প্রায় ৬০০ মাইলের পথে বেরিয়ে পড়ল। মাদামচাও বলে ৬০।৭০ বৎসরের একজন মহিলা এই কায়দায় যুদ্ধ করতে এত পটু যে, তিনি "গরিলাদের মাতা" এই নাম অর্জন করেছেন। এইভাবে চীনা মেয়েরা তাদের শিক্ষা, শক্তি, এমন কি প্রাণ দিয়েও দেশের স্বাধীনতা ও পুরাতন কৃষ্টি বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

আমাদের দেশেও কি পরিবর্ত্তন আসেনি? এই শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আমাদের মধ্যেও একটা জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম জাগরণ আসে রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে, ব্রাহ্ম সমাজের চেষ্টায়। তখন থেকেই মেয়েদের জন্য শিক্ষা, সাম্য, পর্দা নিবারণ প্রভৃতি আদর্শ গৃহীত হয়। যদিও আমাদের দেশের শতকরা ৯৩ জন মেয়ে নিরক্ষর তবু অনেকেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শিখেছে,—এইটাই পরিবর্ত্তনের মস্ত লক্ষণ। বড় বড় সহরের মেয়েরা আজকাল স্বচ্ছন্দে রাস্তায় ঘাটে চলে ফিরে বেড়ায়। এতে পুরুষরা বিরক্ত হয়, কিন্তু তা হবেইবা না কেন? যেখানে তা'রা একচ্ছত্র রাজা ছিল সেখানে ভাগীদার এলে কার না রাগ হয় বলুন? তা' ছাড়া মেয়েরা আজকাল কাজের ক্ষেত্রেও নেমেছে। তাদের রোজগার করে সংসারও চালাতে হয়। শিক্ষায়তনে, হাসপাতালে. ডাক্তারখানায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ব্যবসাক্ষেত্রে, এমনকি রেডিও আপিসে পর্য্যন্ত মেয়েরা হানা দিয়াছে ছেলেমহলে বিরক্তির উদ্ভব হবেনা কেন বলুন? আজকাল মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে, ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য হয়েছে এমন কি প্রদেশের মন্ত্রীপদও বাদ দেয়নি। মেয়েদের দাবীরক্ষাও সমাস্যা সমাধানের চেষ্টায় মেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। সে সব বিষয় নিয়ে কাগজপত্রে একটু টিট্‌কারি দেওয়া হয়, কিন্তু উজবেকিস্থানে. তুরস্কে, চীনদেশে এবং ভারতবর্ষেও মেয়েরা ঐ ঠাট্টা বিদ্রূপে পিছপা হয়নি। তাদের পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করা আর সম্ভব নয়।

তবে একথা সত্য নয় যে মেয়েরা পুরুষদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। মেয়েরা চায় যে, পুরুষ ও মেয়ে একসঙ্গে মিলিতভাবে পা ফেলে নূতন জগত, নূতন জীবন গড়ে তুলবে, সেখানে থাকবে না ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বা বুভুক্ষুর ক্রন্দনধ্বনি। এই তাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্ত্তিত প্রাচ্যের নূতন যুগের আশা ও লক্ষ্য।

বর্ত্তমান সমাজ ও বীমা ব্যবসা।

শ্রীপ্রতিমা রায়।

যদিও বীমার প্রচলন আমাদের দেশে সম্প্রতি বেশ প্রসারলাভ করিয়াছে কিন্তু বীমার পদ্ধতি এদেশে সম্পূর্ণরূপে নূতন জিনিষ নয়। একথা ঠিক যে, বিজ্ঞান সম্মত বীমা পদ্ধতি আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতেই পাইয়াছি কিন্তু এই জিনিষটি নানাবিধরূপে আমাদের দেশে বহুদিন হইতেই ছিল। মা, ঠাকুরমাদের আমলে শুনিয়াছি যে, লক্ষীর কৌটাতে অবস্থা বিশেষে অর্থ সঞ্চয় করা পারিবারিক নিয়ম ছিল, এখনও অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, বৎসরান্তে বিজয়া দশমীর দিন সাধ্যানুযায়ী কিছু অর্থ প্রত্যেক স্ত্রীলোকই সিন্দুর কৌটাতে রাখেন। এ সঞ্চয় শুধু অসময়ের সাহায্যের জন্য। খাঁটি বীমার নীতিও অতীতকালে নানারূপে দেখা যাইত। গ্রামের বৃদ্ধা বিধবা মহিলারা অনেক সময় সঞ্চিত অর্থ গ্রাম্য জমিদারের হাতে গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থক্ষেত্রে জীবন যাপন করিতেন এবং গ্রাম্য জমিদার গচ্ছিত অর্থের বিনিময়ে আজীবন মাসোহারা দিতেন। আজকাল যাহাকে Annuity বা পেন্সন বীমার ব্যবস্থা বলে এ ছিল সম্পূর্ণ তাহাই।

অনেক সময় মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে যে সকল ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিগণ সমাজ ও শাসন প্রণালীর নানাবিধ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জীবন বীমার অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই কেন? রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের দূরদর্শিতার তো কোন অভাব ছিলনা? প্রকৃত প্রস্তাবে অতি প্রাচীন ভারতে বীমার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। তখনকার দিনের ব্যবস্থা ছিল,—দেশের রাজাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার প্রতিপালক। রঘুবংশের কবি কালিদাস নরপতির বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে কোনও প্রজার পিতা ছিল কেবল জন্মদাতা মাত্র, দেশের রাজাই পিতার মত সর্ব্বপ্রকার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতেন। এই যেখানে সমাজের ও রাষ্ট্রের আদর্শ সেখানে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্ত ব্যবস্থাই করিবেন দেশের রাজা। আগুনে যদি ঘর পুড়িয়া যায়, ভরা নৌকা যদি জলে ডুবে, উপার্জ্জনক্ষম গৃহকর্ত্তা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে সেই সমস্ত বিনষ্টির অভাব পরিপূর্ণ করিতেন রাষ্ট্রনায়ক নরপতি। বৃদ্ধ

বয়সের গ্রাসাচ্ছাদন, সন্তান-সন্ততির পরিপালন ও শিক্ষাদান এসবই ছিল রাজার কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে দেখা যাইত যে, গ্রামবাসীর মধ্যে কেহ অভাবে পড়িলে গ্রামবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া বা গ্রাম্য জমিদারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দুঃস্থকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সমাজের ও দেশের এই ভাবধারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এখন সমাজে কেহই কাহারও আপনার নয়। "Everybody for himself or herself and God for all." এখন প্রত্যেকেরই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ও বিপদের দিনের সংস্থান নিজেকেই করিতে হইবে। কাজেই প্রাচীন ভারতে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন একেবারেই ছিলনা আজ তাহাই হইয়াছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রের নিয়ম পরিচালনায় বীমা ব্যতীত ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার আর কোন উপায় নাই।

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ স্বামীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করেন কাজেই যদি স্বামী দীর্ঘদিনের জন্য অসুস্থ হন বা মৃত্যুমুখে পতিত হন অসহায়া স্ত্রী শিশুদের লইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসেন। অর্থাভাবে সন্তান-সন্ততির শিক্ষা হয়না, চিকিৎসা হয়না, এমনকি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার অভাবে কত জীবন অকালে ঝরিয়া পড়ে।

সুসময়ের সামান্য চিন্তা ও ব্যবস্থা হয়ত অনেকখানি দুঃখ লাঘব করিতে পারিত।

তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধারণ জীবন বীমা থাকা সত্বেও দুংখের লাঘব হয়না। অসহায়া রমণী বীমার টাকা পাইবার পরে দুষ্টলোভী আত্মীয় স্বজনের কবলে পড়িয়া হৃত সর্ব্বস্ব হন এবং শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিতে পারেন না। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা দৃষ্টে জীবন বীমায় আজকাল এমন কতকগুলি পদ্ধতি হইয়াছে যাহাতে শিশুদিগের লালন পালনের ব্যয়ভার গ্রহণ করা, উচ্চশিক্ষার বা বিবাহের আর্থিক দায়িত্ব বীমা কোম্পানী গ্রহণ করিবে। ঐসব পদ্ধতির জীবন বীমা করিলে সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। পিতামাতার অকাল মৃত্যুতে অর্থ ও ব্যবস্থা অভাবে পুত্র কন্যাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। ঐ সব বীমা গুলির নিয়ম—শিশুরা নির্দ্দিষ্ট বয়সে টাকা পাইবে, বা মাসে মাসে নির্দ্ধারিত টাকা পাইবে, যদি মেয়ের বিবাহের জন্য ব্যবস্থা থাকে তবে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বীমা কোং নির্দ্দিষ্ট টাকা কন্যাকে দিবে।

ইহা ব্যতীত বৃদ্ধ বয়সের সংস্থানরাখিবার ব্যবস্থাও জীবনবীমা কোম্পানী গুলিতে থাকে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে অল্পবয়সে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াও বৃদ্ধ বয়সে সঞ্চয় অভাবে কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ৫৫ বৎসর বা নিদ্ধারিত বয়সের পর হইতে আজীবন চুক্তি অনুযায়ী মাসে মাসে মাসোহারা পাওয়া যাইবে।

এসব গেল জীবন বীমারব্যবস্থা এ ব্যতীত অগ্নিবীমা, নৌবীমা নানাবিধ আকস্মিক দুর্ঘটনায় বীমার ব্যবস্থাও আছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা যে কোন বিপদ সম্বন্ধেই করা যায়। প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক প্যাড্রোইস্কি (padre waski) তাঁহার হাতের আঙ্গুল গুলি বহুলক্ষ টাকার জন্য ইনসিওর করিয়াছিলেন, কারণ আঙ্গুল নষ্ট হইলে প্রভূত উপার্জ্জন একেবারে নষ্ট হইবে। অনেক নর্ত্তকী পায়ের আঙ্গুল গুলি ইনসিওর করিয়া রাখেন, কারণ এই আঙ্গুল গুলির কর্ম্মক্ষমতার উপরেই তাঁহাদের উপার্জ্জন নির্ভর করে। যমজ সন্তানের জন্মে খরচের দায়িত্ব অনেক বেশী কাজেই বিলাতে একজন বীমা কোম্পানীর সহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে তিনি কিছু টাকা প্রিমিয়াম দিবেন এবং যমজ সন্তান হইলে বীমা কোং তাহাকে এক হাজার পাউণ্ড দিবে সময় মত তাঁহার যমজ সন্তানই হইল ও তিনি ১ হাজার পাউণ্ড পাইলেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে নানারূপ বীমার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বোমা বর্ষণের ফলে ঘরবাড়ী জিনিষ পত্র প্রভৃতি অনেক সময় একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় তাহার জন্য বিলাতে গভর্ণমেণ্ট সামান্য প্রিমিয়ামে বীমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিলাতের রাজস্ব সচীব স্যার কিংস্লিউড্ (sir kingsloy wood) বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে নূতন বীমার ব্যবস্থায় বিলাতের প্রত্যেকটী গৃহই সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। তাঁহার এই উক্তি বর্ণে বর্ণেই সত্য, সম্যক বীমারব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেকটী লোকই হইবে ধনশালী প্রত্যেকটী শিশুই হইবে রাজপুত্র বা রাজ কুমারী এবং প্রত্যেকটী গৃহ সুরক্ষিত দুর্গ।

আমাদের কথা।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ দিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করি। যে মহা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এবারের বর্ষারম্ভ তার আশু শান্তি পার্থনা করবার ও যেন ভরসা পাচ্ছিনা আমাদের নিবেদন শুধু এই যে, বিপদ যদি সত্যই ঘনিয়ে আসে তবে বাংলার নারীসমাজ যেন হীনতার পরিচয় না দিয়ে নির্ভীকভাবে, উন্নতমস্তকে তার সম্মুখীন হতে পারে।

এবার আমাদের কৈফিয়ৎ। মাসিক পত্রবহুল বঙ্গদেশে আবার একটি পত্রিকার প্রকাশ দেখে অনেকে বিস্মিত হবেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে ঠিক এমনটি আর নেই। আমরা এর মধ্য দিয়ে একাধারে বাংলার নারীসমাজের ঘরে বাইরের সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচয় দিতে চাই। এতে যেমন একদিকে সাধারণ গল্প, কবিতা. প্রবন্ধ ইত্যাদি থাকবে তেমনি অন্যদিকে থাকবে সংসার, রান্নাবান্না, সেলাই. ছেলেপিলে, সাজপোষাক, গৃহস্থালির খুঁটিনাটি প্রভৃতি নানা বিষয়ের খবর; আবার বাইরের জগৎকে অবজ্ঞা করবার ইচ্ছাও আমাদের নেই পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল দেশের নারীসমাজের বিবরণ আমরা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করব।

যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তা সুসম্পন্ন করবার মত ঐশ্বর্য আমাদের নেই, কিন্তু আমরা জানি

"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে,
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে"

তাই পাঠিকাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যেন তাঁরা এই পত্রিকাটিকে তাঁদের আপনার জিনিষ করে নেন। তাঁরা যেন একে তাদের মুখপত্ররূপে ব্যবহার করে পরস্পর আদান প্রদানের দ্বারা বঙ্গের সমস্ত নারীসমাজকে একত্রিত করে ফেলেন। তাঁদের দাবী প্রশ্ন বা অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানকে প্রকাশ করে আমরা যেন কৃতার্থ হতে পারি।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন নারীপ্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ প্রকাশ করা আমাদের একটি উদ্দেশ্য গ্রাহিকারা যদি এ বিষয়েও আমাদের সাহার্য্য করেন তো বাধিত হব।

আমাদের পত্রিকার উপযুক্ত মটো বা মন্ত্র এখনও আমরা পাইনি তাই উপযুক্ত মন্ত্রের জন্ত ৫৲ টাকা পুরস্কার ঘোষনা করছি। পয়লা জৈষ্ঠের মধ্যে পরিষ্কার করে মন্ত্রটি লিখে সঙ্গে সঙ্গে নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে দিয়ে আমাদের অপিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। খামের মধ্যে পত্রিকার এই ঘোষণার অংশটি কেটে ভরে দিতে হবে নাহলে মন্ত্র গ্রাহ্য করা হবেনা। খামের মাথার বাঁদিকের কোনায় "মন্ত্র" এই কথা লেখা থাকা চাই। প্রবেশ মূল চার আনা মনি অর্ডার যোগে রসিদ সহ পাঠাতে হবে (M.O. to Manager Meyeder Katha) যদি যোগ্য মন্ত্র পাওয়া যায় তো "মেয়েদের কথায়" প্রথম পৃষ্ঠায় সেটি ব্যবহার হবে, আব না পাওয়া গেলে কাউকেই পুরস্কার দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে সম্পাদিকার বিচারের পরে আর পত্র ব্যবহাব চলবে না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আমাদেব নিবেদন এই যে আবেদন কবলে আমাদেব পত্রিকাব পৃষ্ঠায় তাঁদের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা কবা হবে। এতে যে শুধু তাঁদেবই লাভের সম্ভাবনা তা নয় এই পবিচয়ে গ্রাহিকাবাও উপকৃত হতে পাবেন।

———

Printed at Bhowanipur Art Press, 82-A, Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar Chakravartty

প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মেয়েদের কথা

সম্পাদিকা — শ্রীকল্যাণী সেন, এম, এ, বি, টি

বার্ষিক ৩, | জ্যৈষ্ঠ | প্রতি সংখ্যা ।০

"জে. বি, মাঙ্খারামের
নূতন বিস্কুটেরকারখানা দেখে
চমৎকৃত হয়েছিলাম। আমি
মাঙ্খারামের পরিবারবর্গকে
জনহিতৈষী ও প্রতিষ্ঠানটীকে
জনহিতকর বলে শ্রদ্ধা করি।"
মহামান্য সিন্ধের
গভর্ণর বাহাদুর
৩।১।৪১
সুগন্ধি, মুখরোচক, অতিশয়
পুষ্টিকারক এবং সহজেই
হজম হয়।
J. B
Biscuits
J.B

সচিত্র ভারত
যদি
হাসতে চান
সচিত্র ভারত
পড়ুন।
প্রতি সংখ্যা দুই আনা
নমুনার জন্য পত্র লিখুন।
২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সূচি পত্র—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ { জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮ } ২য় সংখ্যা

শাশ্বত।

শ্রীঅরুণা সিংহ।

তুমি আসিও আমার জীবনে, সন্ধ্যাক্ষণে,
আমি বলিবনা কিছু, ফিরিবনা পিছু,
চকিতে চাহিয়া আঁখি হবে নীচু,
মুগ্ধ মিনতি প্রণতি রচিবে
তব দুটি শ্রীচরণে,
আসিও বন্ধু, জীবনে সন্ধ্যাক্ষণে!

তুমি এসোনা কাজের মাঝে
এসোনা যখন হাটের মাঝারে
পশরা কক্ষে ফিরি দ্বারে দ্বারে,
এসোনা যখন অন্তর মন
কোলাহলে রূঢ় বাজে,
এসোনা দিবসে কঠিন কাজের মাঝে।

আসিও স্তব্ধ, শান্ত নিশীথ রাতে,
আসিও তোমার উত্তরী দোলাইয়ে,
আসিও অঙ্গে কেতকী সুবাস নিয়ে,
আনিও চম্পা, রজনীগন্ধা
কণ্ঠমালার সাথে,
আসিও নয়নে, জীবনে সন্ধ্যারাতে।

যে কথা মিশায়ে গেছে জনতার ভীড়ে,
সে কথাটি তুমি চয়ন করিয়া,
নিও নিও তব নুপুরে ভরিয়া
যদিবা অশ্রু পড়েগো ঝরিয়া
পড়িবে হৃদয় নীড়ে
ব্যাহত, বেদনা ব্যাকুল, মুখর মীড়ে।

প্রথমবার একটি ছেলে হওয়ার পর বৌমার পর পর দু'বার যমজ খোকা হয়েছিল, এবারে একটি খুকী হওয়াতে ঠাকুরমা তাকে সগর্বে তুলে ধরে সবাইকে দেখাচ্ছিলেন। বড়খোকা খানিকক্ষণ উস্‌খুস্ করবার পর জিজ্ঞাসা করল—"আরেকটা কোথা ?"

অসভ্য সমাজে নারী।

শ্রীরেণু রায়।

সভ্যতা নিয়ে আমরা সকলেই গর্ব করে থাকি। আমাদের জাতি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের মনোভাব যে সভ্য এ ধারণাটা আমাদের মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে গেছে যে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখবার কথা আমাদের কখন মনেও হয়না। আমরা যে সভ্য একথা আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে প্রচার করে এবং মেনে নিয়ে গর্বান্বিত হই এবং আগেকার সকল যুগের লোকদের অসভ্য বর্বর বলে ঘৃণা করে থাকি। কিছুদিন আগে আমার পরিচিত একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"আচ্ছা বলুনতো, আমরা যে এত সভ্যতা সভ্যতা করি, এই সভ্যতার মানে কি?" তিনি একটু ঘাবড়িয়ে গিয়ে আমার দিকে এমন করে তাকালেন তাতে মনে হ'ল যে, আমার মাথা ঠিক আছে কিনা সে বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ সন্দেহ করছিলেন; পরে একটু ত্যক্ত হয়ে তিনি বল্লেন—"সভ্যতার মানে আবার কি, সভ্যতা মানে সভ্যতা!" শুনলে হাসি পায় বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই এই কথার প্রকৃত মানে বোঝাতে পারবেন না। আমরা যে ট্রামে, বাসে, রেলে চড়ি, রেডিও, গ্রামোফোন, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করি এগুলি যে আমাদের সভ্যতার নিদর্শন তা স্বীকার করি, কিন্তু অপরদিকে যে মারামারি, কাটাকাটি, অত্যাচার, অবিচার চলেছে তারদিকে, আর আমাদের মেয়েজগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে বর্বরতার চিহ্নগুলিকে অস্বীকার করতে পারবনা।

তাই মনে হয় যে সভ্যতা সেই প্রতিষ্ঠানেই উপস্থিত যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়মগুলি যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পেরেছে। সেই সমাজকেই সুগঠিত, সভ্য ও সর্বাঙ্গপূর্ণ বলা যেতে পারে যে জীবন্তভাবে তার নিত্যকার অভাবের পূরণ করছে। সভ্যতাকে এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে যে যেমন আমাদের সভ্যতার মধ্যে অনেক অসভ্যতার চিহ্ন রয়ে গেছে তেমনই আমরা যাদের অসভ্য জাতি বা যাকে অসভ্য যুগ বলে থাকি তার মধ্যে অনেক প্রথাই আমরা খুঁজে পাই যা আমাদের চাইতে অনেক বেশী সভ্য, সুবিধাজনক ও সময়োচিত।

তথাকথিত অসভ্য জাতিদের বিষয় আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে বর্বরজাতির মেয়েদের জীবন যতটা কষ্টকর বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তার অনেকখানিই অত্যুক্তিমাত্র। তাদের জীবন যে মোটেই আরামপূর্ণ ছিলনা একথা সত্য ; তাদের যথেষ্টই খাটতে হ'ত, কিন্তু কাজ করাটাই তো মানুষের কষ্ট নয়, কাজ করতে না পারাটাই তার সর্বনাশের মূল। তা ছাড়া তখনকার সমাজে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককেই জীবন সংগ্রামে সমান উদ্যোগী হতে হত, নয়ত তারা হিংস্র পশুপক্ষী ও দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক নিয়মের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতনা। তাই আমরা দেখি যে সেই প্রাচীন সমাজ একটি অতি সহজ ও স্বাভাবিক কার্যবিভাগ করে নিয়েছিল,—মেয়েরা বাড়ীর সমস্ত কাজকর্ম করছে, বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষবাস করছে, আবার পুরুষেরা বাড়ী তৈরী করছে, কাঠ কেটে আনছে, পশুপক্ষী শিকার করছে, হিংস্র জন্তু মেরে নিজেদের রক্ষা করছে। এইভাবে তাদের শারীরিক বল ও সুবিধা অনুসারে মেয়ে পুরুষ নিজেদের কর্মক্ষেত্র বেছে নিত। আফ্রিকার বাণ্টুদের মধ্যে এখনও এই কাজের ভাগাভাগি দেখা যায়। বছরের সর্বঋতুর কাজই স্ত্রী-পুরুষের শক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

ফসলের সময় যখন নয় তখন মেয়েরা কাছের নীচু জমির নরম মাটি কুপিয়ে অল্পস্বল্প ধান উৎপন্ন করে, আর পুরুষরা বনে গিয়ে শিকার করে, ফলমূল ও মধু সংগ্রহ করে, নুন তৈরী করে আর জাল ফেলে মাছ ধরে। তারপর ফসলের সময়ে পুরুষ দূরের জমিতে গাছ কেটে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করে, বেড়া দিয়ে ফসলের ক্ষেত তৈরী করে ; মেয়েরা তাতে বীজ বপন করে, আগাছা তোলে আর কাছের জমিতে রাঙ্গা আলু ইত্যাদি যা সহজে উৎপন্ন করা যায় তার চাস করে। ফসলের যত্ন করা আর তা তৈরী হলে তুলে আনা মেয়ে-পুরুষের সমান কাজ। তারপর মেয়েরা ধান ভানে, ঢেঁকিতে ছাঁটে আর পুরুষেরা গোলা তৈরী করে। মেয়েরা যখন সেই ধান গোলাতে তোলে তখন পুরুষেরা লোহার কাজ করতে থাকে। পুরুষ ঘর তৈরী করে, মেয়েরা সেগুলি নিকিয়ে পরিষ্কার করে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার দুজনে একসঙ্গেই করে কিন্তু সেতু বাঁধা প্রভৃতি ভারি কাজ পুরুষের করণীয়।

এই চিত্র থেকেই বোঝা যায় যে কাজের ভাগ স্ত্রীপুরুষের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক শক্তির দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে। দু'জনকেই সমান খাটতে হত, কেউ কারু উপরে বা নীচে ছিল-না, তাই একটা সুন্দর সাম্য এই চিত্রকে ঘিরে রেখেছে।

তারপর, জমির উর্বরতার জন্যই হোক বা কৃষি পদ্ধতির উন্নতির জন্যই হোক, ক্রমশ যখন মানুষের প্রয়োজনাধিক ফসল হতে লাগল এবং সমৃদ্ধির প্রয়াস মাথা জাগিয়ে উঠল তখনই ন্যূনাধিকের মধ্যে রেষারেষি দেখা দিতে লাগল। সেই রেষারেষির ফলে মেয়েরা ক্রমে অবনতির দিকে চলেছে এবং পুরুষ তার আধিপত্য স্থাপন করেছে।' তাই আমরা যখন সেই প্রাচীন যুগের মেয়েদের দুঃখের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করি তখন একবার নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখতে যেন না ভুলি। যদিও সেই যুগের মেয়েদের খাটুতে হত অনেক, তাহলেও তারা দু'মুঠো খেতে পেত, ছোট পর্ণ কুটিরে মাথা গুঁজতে পারত, কাপড় বুনে পরতে পেত, বাড়ীর আশেপাশের সব কিছুরই তারা ছিল একছত্র সাম্রাজ্ঞী। তারা জানত না আমাদের সময়কার ভবিষ্যতের ভাবনা, খাওয়াপরার জন্য দুর্দান্ত সংগ্রাম, আমাদের সমাজের মেয়েদের প্রতি অবিচার।

এ কথা অবশ্য সত্য যে এই অসভ্য জাতির মেয়েদেরও নানারকম সামাজিক নিয়মকানুন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল; কিন্তু এই নিয়মগুলির মূল মেয়েদের অসহায়তা নয় বরং তার অলৌকিক শক্তিকে ভয় পেয়েই পুরুষরা তাদের এই সব নিয়ম দিয়ে ঘিরে বিপদ হতে বাঁচতে চেয়ে ছিল।

মানব জাতির শৈশবকালে যখন অজ্ঞতার অন্ধকার তাদের ছেয়ে রেখেছিল তখন তারা কার্যকারণ সূত্র বা অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের কিছুই জানত না। তখন মানুষ পরস্পরের মধ্যে এবং প্রকৃতির প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যে একটা অদ্ভুত রহস্যময় শক্তি দেখতে পেত এবং সেই শক্তিই তার সকল কাজের ফলাফল নিয়ন্ত্রিত করছে বলে মনে করত। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে যদি কোন লোকের ঘাড়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ত তাহ'লে সে বলত সে তার নিরাপদে যাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই গাছের ডালটি ভেঙ্গে পড়তে ইচ্ছা করল এবং দুইটি ইচ্ছার সংঘর্ষে এই ঘটনাটি ঘটল। এই শক্তিকে তারা "মানা" বলত। এই "মানা" শক্তি মানুষের চারিপাশ ঘিরে থাকে এই তাদের বিশ্বাস ছিল। কখন সে মানুষকে সাহায্য করত, কখন বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। "মানা"র বিরোধিতা দূর করবার জন্য মানুষ তাই নানা মন্ত্র, নানা নিয়ম আবিষ্কার করে তাকে সন্তুষ্ট করতে, বা তার শাপ কাটাতে চেষ্টা করত।

মেয়েদের মধ্যে নাকি "মানা" শক্তি অতি তীব্র। কি ভাবে এ বিশ্বাসের উদয় হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। মেয়েরা পুরুষের কাছে অতি সুলভ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সংস্পর্শে এসে পুরুষ যে সাময়িক মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্য অনুভব করত সেটাই তাদের মধ্যে একটা ভয় জাগিয়ে তুলেছিল। সেই ভয়কে ভিত্তি করে নানা বিচিত্র নিয়মকানুন গড়ে উঠেছিল যার দ্বারা মানুষ মেয়েদের মোহিনীমায়া কাটিয়ে নিজেদের শক্তি অক্ষয় করতে আশা করত। তাই মেয়েরা যা-কিছুর সংস্পর্শে এসেছে তারই মধ্যে "মানা" ঢুকে গিয়েছে। অতএব যতক্ষণ সেই মানাকে না বিতাড়িত করা হয় ততক্ষণ সেই বস্তু পুরুষের পক্ষে ছোঁয়া নিরাপদ বলে মনে করা হয় না।

অনেক গোত্রে পুরুষরা কখন জাল ফেলে মাছ ধরে না, জাল রিপু করে না বা জল ভরে না, কারণ এ-গুলি মেয়েদের কাজ, এবং মেয়েদের কাজ করলে তাদের শক্তি ক্ষয় হবে এই তাদের ভয়। অনেক গোত্রে মেয়েরা সর্ব্বদা স্বামীর আগে আগে হাঁটে কারণ সে বিপজ্জনক বস্তু বলে তাকে চোখে চোখে রাখা প্রয়োজন; আবার অন্যান্য গোত্রে মেয়েরা সর্ব্বদা পুরুষের পিছনে হাটে যাতে মেয়ের অনিষ্টকর শক্তি স্বামীর ঘাড়ে পড়ে তাকে বিনষ্ট করতে না পারে।

সব চাইতে বিপজ্জনক তাদের বিবাহ মিলন। তাই পুরুষ যখন তিমিমাছ ধরতে যেত তার কিছু দিন আগে থেকে সে তার স্ত্রীর সংস্পর্শে আসত না। বিশ্বাস ছিল যে এ বিধি পালন না করলে তিমিমাছ কিছুতেই তাকে ধরবার অনুমতি দেবে না এবং তার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। শুধু যে পুরুষের নিজের আচারের উপর তার সাফল্য নির্ভর করত তা নয়। তার স্ত্রীকেও অতি সাবধানে থাকতে হত—যখন স্বামী মাছ ধরতে বেরুত তখন স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকতে হ'ত। এত সাবধানতা সত্ত্বেও প্রত্যাগমনের সময়ে পুরুষ নিজেকে এতই অপবিত্র বলে মনে করত যে যতক্ষণ ন' অন্য পুরুষেরা এসে তাকে কোলে তুলে নৌকা থেকে নামিয়ে বাড়ীর দোর গোড়ায় পৌছে দিয়ে আসত ততক্ষণ সে মাটি ছুঁতে পেত না এবং তার অপবিত্রতা শেষ হত শুধু তখনই যখন সে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হত। এই ভাবে একই শক্তি এক সময়ে ভয়ের কারণ এবং অন্য সময়ে পবিত্র এবং কামনীয় হয়ে উঠেছে। বর্বরদের মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভয় এই দুই মনোভাবেই সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বিবাহ অনুষ্ঠানেও এই কামনীয় অথচ ভয়াবহ স্ত্রীলোকের ক্ষতিকর প্রভাবকে বিনষ্ট করবার জন্য নানা রীতির প্রচলন ছিল। বিবাহের পূর্বে বরের মুখ মেহ্‌দী দিয়ে রঙিয়ে দেওয়া হত যাতে তার উপর কোন কু-প্রভাব এসে না পড়ে। এই একই উদ্দেশ্যে বরের অবিবাহিত বন্ধুরা তাকে স্নান করিয়ে, কামিয়ে তারপর ধরে মারত। মোঁমবাতি জ্বালিয়ে ও একবোতল জল রেখে তারা বিশ্বাস করত যে অনিষ্টকর ভূত প্রেত বিতাড়িত হচ্ছে। কনেকে পবিত্র করবার জন্য তাকে তিনবার নদীর এপার ওপার করাত এবং গৃহত্যাগের সময়ে ঢিল ছুঁড়ে মারত। এইসব রীতির একমাত্র উদ্দেশ্য মেয়েকে তার অনিষ্টকর শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। যখন সে স্বামীর গৃহে পৌছত তখন তাকে আরও নানারকম অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হত। তাকে অনেকবার গৃহের চারিদিকে ঘোরান হত এব তার মাথার উপর দিয়ে ধান ছুড়ে ফেলা হত যাতে ক্ষতিকারী প্রেতাত্মারা দূরে সরে যায়। এই ভাবে তারা নানা প্রচেষ্টাদ্বারা মেয়েদের "মানা" শক্তির বিরোধিতা দুর করতে রত থাকত।

মেয়েদের তারা যেমন ভয় পেত তেমনি শ্রদ্ধাও করত। মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা অসভ্য সমাজের নিকট বিশেষভাবে পূজ্য ছিল। তারা বিশ্বাস করত এই শক্তি মেয়েরা মাটি, গাছ, প্রভৃতি সব কিছুতেই বিস্তার করতে পারে, তাই মেয়েদের সংস্পর্শে এলে জমিতে ভাল ফসল হয়, গরুর অধিক সংখ্যক বাছুর হয়,—সব কিছুতেই উর্বরতা উপস্থিত হয়। যে সমাজ প্রধানতঃ কৃষিকার্যে রত সে সমাজে উর্বরতার বিশেষ সমাদর হবে এতে আর আশ্চর্য কি? এই উর্বরতার প্রয়োজনীয়তা কি ভাবে কোন কোন সমাজে মেয়েদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে তা আমাদের দেশের খাসিয়াদের মধ্যেই দেখা যায়। খাসিয়ারা আসাম প্রদেশের খাসী ও গারো পাহাড়ের অধিবাসী এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ধান চাষ করা। এদের সমাজে বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাতার গৃহে বাস করে এবং যতদিন তারা সেখানে থাকে ততদিন স্ত্রীর সব উপার্জনই তার মায়ের কাছে জমা হয় এবং তিনি সকলের খরচ তাই দিয়ে চালান, স্বামীকে বিশেষভাবে কিছুই উপার্জন করতে হয় না। পরে যদি তারা আলাদা বাড়ী করে থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের উপার্জন মিলিয়ে সংসার চলে। পারিবারিক সম্পত্তির মালিক স্ত্রীই এবং তার দিক দিয়েই উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ভার পায়। মেয়ের দিক দিয়ে গোত্র স্থাপিত হয় কারণ পুরুষ বিয়ে করে অন্যত্র চলে যায়। স্বামী শুধু

সন্তানদাতা, এ ছাড়া তার আর কোনই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। এই ভাবে যারা সন্তান গর্ভে ধারণ করে গোত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে, যারা স্বীয় প্রজনন ক্ষমতা দ্বারা কৃষিকার্যে সাফল্য দান করে তারাই সমাজের প্রধান কর্মী, তারাই সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালিনী।

অবশ্য খাসিয়ারা মাতৃকেন্দ্র সমাজের অতি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নিদর্শন। অন্য অনেক সমাজে দেখা যায় যে যদিও তারা নামে মাতৃকেন্দ্র সমাজ আসলে সমস্ত ক্ষমতা ভাই অথবা মামাদের হাতে সঞ্চারিত। সে যাই হোক, মোটামুটি ধরতে গেলে অসভ্য সমাজের মেয়েদের অবস্থা যতটা দুঃখময় ভাবা হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। তারা অনেক বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সুবিবেচনাপূর্ণ সমাজনিয়মে বাস করত। তাদের কার্য ক্ষমতা ছিল এবং সেই ক্ষমতা দেখে লোকে যেমন একদিকে তাদের ভয় করত অপরদিকে তেমনি শ্রদ্ধাও করত। যেখানে ভয় করত, সে ভয়ের মূল কারণ ছিল অজ্ঞতা কিন্তু আমাদের মধ্যে যে অবিচার, কুসংস্কার আজও রয়েছে তার পক্ষে অজ্ঞতার অজুহাতও নেই। তাই আমরা যেন অন্যদের অসভ্য বলে নিজেদের হাস্যাস্পদ না করি।

ছোট্ট খোকন মায়ের সঙ্গে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাড়ীর ফটক থেকে বেরিয়েই সে একবার মাকে জিজ্ঞাসা করল—"মা, দুষ্টু লোকেরা আমাদের ধরে নিয়ে যাবে না?" —মা উত্তর করলেন "না"—খোকন তখন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল —"তা'হলে আমার বন্দুকটা সঙ্গে নেবার দরকার নেই?" —মা বল্লেন—"না"।

কালিদাস-সাহিত্যে নারী

শ্রীসুকুমারী দত্ত।

সাহিত্যকে কখন কখন জীবনের দর্পণ বলা হইয়া থাকে; কিন্তু সাহিত্য ইহা অপেক্ষা বড়। দর্পণে বস্তুর বাহিরের মূর্ত্তিই প্রতিবিম্বিত হয়, সাহিত্যে তাহার ভিতরের ভাবকে রূপ দিবার একটা প্রয়াস থাকে। এইখানেই যথার্থ সাহিত্যের বিচার। যে সাহিত্য বাস্তবের দাবী গ্রাহ্য করিয়াও বস্তুর অতীত যে মন, যে আদর্শ তাহার চিত্র যত ভাল আঁকিতে পারে, বিশ্বের রূপ-সৃষ্টির সভায় তাহার আসন তত গৌরবের। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, এই বাস্তব ও অতি বাস্তবের যথার্থ সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই সাহিত্যের অগ্রগতি। তাই যে সকল সৃষ্টি বিশ্ব-সাহিত্য অক্ষয়, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি দিকই বিদ্যমান। সেক্‌সপীয়রের ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ্, হ্যামলেট্ প্রভৃতি একদিকে যেমন বস্তু জগতের মানুষ, অপরদিকে তেমনই কবির ভাবলোকের অধিবাসী। কালিদাসের দুষ্যন্ত শকুন্তলা, মালবিকা ও অগ্নিমিত্র ও তেমনই মর্ত্তের নরনারী হইয়াও কবির ধ্যান ধারণা তাঁহার স্বপ্ন আদর্শের প্রতিচ্ছবি। এই সকল অমর সৃষ্টির মধ্যে তাই একদিকে আছে দেশকালের দাবী, সমাজ ধর্ম্মের প্রভাব, অন্যদিকে আছে চিরন্তন মানবতা। এই দিক হইতে শকুন্তলার সহিত ডেস্‌ডিমোনার, মালবিকার সহিত জুলিয়েটের একটা শাশ্বত সাম্য আছে। এখানে ইহাদের পরিচয় সামান্য মানবীরূপে নহে, এখানে ইহারা কবির মানসী প্রতিমা।

সাহিত্যে নায়ক নায়িকার খণ্ড পরিচয় যেখানে, সেখানে দেশ ও কালের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, সমাজের দাবীকে সেখানে সাহিত্যকার অস্বীকার বা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাই কাব্যের নরনারীকে তাহাদের দেশ ও কালের পরিবেশের মধ্য দিয়াই দেখিতে হইবে, নতুবা বিশিষ্ট দেশকালের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করিলে তাহাদের প্রতি অবিচার হইবে। কালিদাসের সাহিত্যে নারী যে রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যেও দেশকালের প্রভাব যথেষ্ট। কবি নারীকে বলিয়াছেন, "অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা"। যেখানে নারী কবির কল্পনা. শিল্পীর কল্প-লোকের সৃষ্টি, সেখানে তাহার একটা চিরন্তন রূপ আছে—দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া সেখানে তাহার শাশ্বত পরিচয়।

কিন্তু মানবী যে নারী, যুগে যুগে, দেশে দেশে সে রূপ হইতে রূপান্তরের মধ্যে বিচিত্র মূর্ত্তিতেই না দেখা দিয়াছে। তাই আজ বিংশ শতকের দৃষ্টিতে কালিদাসের যুগের নারীকে দেখিলে বসনে ভূষণে, কথায় আচরণে সহসা তাহাকে অপরিচিতাই মনে হয়, কিন্তু আর একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার চিরন্তন নারী মূর্ত্তি ধরা পড়ে।

* * * * *

সমালোচকেরা বলেন, কালিদাসের সর্ব্বস্ব অভিজ্ঞান শকুন্তলা। এই নাটকের প্রধান নায়িকা শকুন্তলা স্বয়ং। শকুন্তলাকে দর্শকের সম্মুখে আনিবার পূর্ব্বে কবি স্থান কালের একটু আভাস দিয়াছেন। রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া শুনিলেন মালিনীর তীরে কণ্ব মুনির তপোবন, হেমকূট পর্ব্বতের সানুদেশে শান্ত আশ্রম। বৈখানসের মুখে শুনা গেল, পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রতিকূল ভাগ্যের খণ্ডন করিতে কুলপতি কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন ; আশ্রমের ভার শকুন্তলার হাতে। ভারতের স্বাধীন যুগের চিত্র ! নগরে না হউক অন্ততঃ তপোবনে নারীর স্থান কতকটা স্বাধীন ও সম্মানের ছিল। শাঙ্গরব শারদ্বত থাকিতেও আশ্রমে সমাগত অতিথি সজ্জনের পরিচর্য্যার ভার তরুণী শকুন্তলার হাতে। রাজা প্রবেশ করিলেন। লতা মণ্ডপের অন্তরাল হইতে রাজা শকুন্তলার যে বর্ণনা করিলেন তাহাতে দর্শক জানিল শকুন্তলা সুন্দরী, অপরূপ সুন্দরী। তাঁহার অলোক সামান্য রূপে মুগ্ধ দুষ্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন—"এমন প্রভাতরল জ্যোতিঃ বসুধাতল হইতে উত্থিত হয় না।" তারপরেই যবনিকা উঠিল শকুন্তলা, অনসূয়া প্রিয়ংবদার সহিত আলবালে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহাদের আশ্রম জীবনের একটু আভাস পাওয়া গেল। মহর্ষি কণ্ব এ কাজে তাঁহাদের নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল মহর্ষির আদেশে নহে, তরুলতার প্রতি যথার্থ স্নেহের টানেই শকুন্তলা এত যত্নে আশ্রমপাদপের পরিচর্য্যা করেন। তাই প্রিয়ংবদা যখন পরিহাস করিয়া বলিলেন, "মহর্ষি বোধ হয় তোমার অপেক্ষা আশ্রম বৃক্ষগুলিকে অধিক স্নেহ করেন, নহিলে তোমার যত পেলবাঙ্গীকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন কেন ?"—তখন শকুন্তলা হাসিয়া কহিলেন, "শুধু পিতার নিয়োগেই নহে, আমারও ইহাদের প্রতি সোদর-স্নেহ আছে।" শকুন্তলা চরিত্রের একটা দিক পাঠকের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মিরাণ্ডার সহিত শকুন্তলার তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, প্রকৃতির আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও মিরাণ্ডা প্রকৃতির অন্তরঙ্গ হইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলার সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক অতি

নিবিড়। বনজ্যোৎস্না অথবা নবমালিকার সহিত শকুন্তলার কি ঘনিষ্ঠ পরিচয়! কবে কোন্ লতাটিতে কিশলয় জাগিল, কোন্ তরুশাখায় মঞ্জরী দেখা দিল, অথবা কোন বালবৃক্ষে পত্রোদ্গম হইল, এ সমস্ত সংবাদই শকুন্তলার নখাগ্রে এবং ইহাতে তাঁহার আনন্দও যথেষ্ট। তপোবনের বৃক্ষলতার সহিত শকুন্তলার সম্বন্ধ যে কত দৃঢ় ও অচ্ছেদ্য তাহা চতুর্থ সর্গে আরও স্পষ্ট। সমালোচকেরা বলেন, 'কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম্ তত্রাপ্যঙ্কশ্চতুর্থঃ স্যাদ্ যত্র যাতি শকুন্তলা।" বাস্তবিক এমন মর্ম্মস্পর্শী, করুণ চিত্র বিশ্বসাহিত্যে বোধ হয় দুর্লভ। সেখানে সমগ্র তপোবন যেন শকুন্তলার বিদায়ে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, মানুষের সুখে দুঃখে বনের হরিণী অথবা উদ্যানের লতা যে এত গভীর স্পন্দন অনুভব করিতে পারে তাহা "শকুন্তলা" না পড়িলে ঠিক বুঝা যায় না। শকুন্তলা আবাল্য আশ্রমেই লালিতা, প্রকৃতি তাঁহার চরিত্রে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তাঁহার জীবনের এই দিকটায় যেন পূর্ণচ্ছেদ পড়িল ; পতিগৃহে যাত্রার সময় ; তাই সে দৃশ্য এত করুণ এত মনোরম। দুষ্যন্ত পরে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন—"হরিণ শিশু ও শকুন্তলা উভয়েই আরণ্যক" পরিহাস হইলেও কথাটা মিথ্যা নহে। তাই বোধ হয় পতিগৃহে যাইবার সময় যে তপোবনের শান্ত অনাবিল পরিবেশের মধ্যে তাঁহার কুমারী জীবনের দিনগুলি নির্ঝরের ন্যায় সহজ আনন্দে বহিয়া গিয়াছে—তাহাকে বিদায় দিতে শকুন্তলা এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অনসূয়া প্রিয়ংবদা দুষ্যন্তের কাছে সখীর জন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছে,—তপোভঙ্গে তাহার জন্ম। বিশ্বামিত্র কঠোরতপা ঋষি, মেনকা স্বর্গের অপ্সরা, একদিকে দৃঢ় সংযম, অপরদিকে উদ্দাম বিলাস। শকুন্তলার মধ্যেও এই দুইটি ভাবই সমান অংশে বিদ্যমান। জননী তাঁহাকে আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর হইতে তিনি কণ্বকে পিতা এবং গৌতমীকে মাতৃকল্পা বলিয়া জানেন। আশ্রম তাঁহার গৃহ হইয়া উঠিয়াছে। সংযমের এই নির্ম্মল পরিস্থিতির মধ্যে পালিতা হইয়া শকুন্তলার মধ্যেও শুচিতা বোধ ও নিষ্ঠা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে দেখি শকুন্তলা জ্বরাতুরা, এ জ্বর তাঁহার অন্তরের দ্বন্দ্বের প্রকাশ মাত্র। দুষ্যন্তের প্রভাবকে তিনি হৃদয়ে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অথচ তপোবন বিরোধী ভাবের উদ্রেকেও তাঁহার মন বিচলিত। সখীদের কাছে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিতে তাঁহার বাধা নাই। এমন কি তাহাদের প্ররোচনায় দুষ্যন্তকে পত্রও লিখিলেন, অথচ রাজা স্বয়ং যখন পার্শ্বে উপস্থিত তখন স্বভাবজাত সংযমের বশে বলিয়া উঠিয়াছেন—

"পৌরব বিনয় রক্ষা কর।" এই শোভন শুচিতা, এই নম্র মধুর ভাব শকুন্তলার চিত্রখানিকে এত মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে! প্রথম অঙ্কের লজ্জাজড়িত কম্প্রকোমল ভাব তাহাকে নব পরিচয়ের স্বাভাবিক ব্রীড়া বলা যাইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে মদন জ্বরে তপ্ত তনু শকুন্তলা যখন বলিয়া উঠে, "পৌরব বিনয় রক্ষা কর," অথবা "গুরুজনের নিকট অপরাধিনী হইতে পারিব না" তখন তাহার সংযমনিষ্ঠ চরিত্রের প্রতি সত্যই সম্ভ্রম আসে। অথচ শকুন্তলার হৃদয়াবেগ যে স্বভাবতঃই সংযত ছিল তাহা নহে। সখীদের নিকট তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে, এবং তাঁহার আধি ব্যাধির দুরূহতা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, তপোবনের বিধি-লঙ্ঘনে প্রতিকূলতার মূলে তাঁহার কত সংযম। কিন্তু পৌরব তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিতে চাহে নাই। অমনই নেপথ্যে শুনা গেল—"চক্রবাক্‌বধূ প্রিয় সহচরকে সম্ভাষণ জানাইয়া লও,—রাত্রি সমাগত।"—কি দীর্ঘ রজনী! চক্রবাক্‌বধূ শেষবার আমন্ত্রণ জানাইল বটে, কিন্তু সে যে ঋষিশাপে খণ্ডিতা, তাই সহচর বিয়োগের কাল রজনী কি গভীর অন্ধকারেই না ঘনাইয়া আসিল।

চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার প্রকৃতির প্রতি প্রীতি অপেক্ষাও আর একটী দিক স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এ তাঁহার সখী প্রীতি। অনসূয়া প্রিয়ংবদা তাঁহার জীবনে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে গিয়া শকুন্তলা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সখীদের নিকট গোপনতম সংবাদটি পর্য্যন্ত বলিতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নাই। হাস্যচপলতার মধ্য দিয়া কি সম্পর্ক যে তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পূর্বে কেহ বুঝে নাই,—বুঝিল বিদায়ের দিনে।

সুখে দুঃখে, শাপে আশীর্ব্বাদে বিরহে মিলনে এই দুইটি তরুণী কখনও তাহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করে নাই বিদায়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নাতা শকুন্তলা যখন বসিয়া আছেন, তখন গুরুজনের নানা আশীর্ব্বাদের পরে সখী দুইটি নিকটে আসিয়া বলিলেন—"এ স্নান সারা জীবনে তোমার সুখস্নান হউক।"

সখীকে পুষ্পচন্দন বসন ভূষণে সাজাইবার পর যখন যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল তখন সমস্ত আশ্রম অধীর হইয়া উঠিল। শকুন্তলার এতদিনের লীলা-নিকেতন, তাঁহার বাল্যের, কৈশোরের স্বচ্ছন্দ লীলার তপোবন, তাঁহার যৌবনের উপবন, তাঁহার নিত্য স্নানের মালিনীনদী,—তপোবনের সহকার তরু,—নবমালিকা, বনজ্যোৎস্না, মৃগশিশু, সকলে যেন অব্যক্ত ভাষায় বারে বারে তাঁহার যাত্রাপথ রোধ করিয়া বলিতেছে—"যেতে নাহি দিব।"

অবশেষে তাত কাশ্যপ যখন যাইবার পথ দেখাইয়া বলিলেন—"এই দক্ষিণ দিকে" তখন অনসূয়া প্রিয়ংবদার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—উভয়ে বলিয়া উঠিল—"আমাদের কাহার হাতে দিয়া যাইতেছ?" লতা ভগিনীর, হরিণ শিশুর পর্য্যন্ত একটা ব্যবস্থা হইল, কিন্তু যাহারা তাঁহার সকল সুখদুঃখের সহভাগিনী তাহাদের কি গতি হইবে?

আশ্রমের প্রান্তসীমায় যখন সখীরা সত্যই ফিরিয়া যায়, তখন অশ্রুমুখী শকুন্তলা একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। আজ হইতে শকুন্তলা একাকিনী,—তপোবনের নীড়ে যে স্নেহ, যে আশ্রয় তাহা শেষ হইয়া গেল। শেষ ভরসা ছিল যে সখীরা তাহারাও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল; শকুন্তলা সহসা বড় অসহায় হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম অঙ্কে প্রত্যাখ্যান। এতক্ষণ পর্য্যন্ত শকুন্তলার পরিচয় ছিল স্বভাবকোমলা নতনেত্রা একটি তরুণী; এইবার তাঁহার চরিত্রের অপর একটি দিক উদ্ঘাটিত হইল। রাজা তাঁহাকে না চিনিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত। সাধারণ রমণী হলে, মালবিকাগ্নিমিত্রের ইরাবতী অথবা ধারিণী দেবী হইলে তিনি নানা যুক্তিতর্কে কটূক্তি ও ভৎ‍র্সনায় রাজার চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু শকুন্তলা প্রথমে আত্মগত হইয়া বলিয়াছেন—"হৃদয় আশ্বস্ত হও, রাজার প্রীতি স্মরণ করিয়া শান্ত হও।" রাজার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান বাক্য শুনিয়াও তিনি রুষ্ট হন নাই, মনে মনে শুধু বলিয়াছেন, "ইঁহার কথা যেন জ্বলন্ত অগ্নি।" এ সেই আশ্রম সুলভ সংযম ও কোমল প্রাণের পরিচয়। দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলার সহিত পরিণয় অস্বীকার করিলেন তখন গভীর ক্ষোভে শকুন্তলা মনে মনে বলিয়াছেন,—আর্য্যপুত্রের পরিণয়েই সন্দেহ? —হায়রে আমার সুদূরগামিনী আশা!' গৌতমী ও ব্রহ্মচারীদের সমস্ত অনুনয় অভিসম্পাত, সমস্ত ব্যর্থ হইল, এমন কি শকুন্তলা অবগুণ্ঠনমুক্ত হইলেন তথাপি ধর্মভীরু দুষ্যন্ত যখন কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না, তখন শারদ্বত শকুন্তলাকে সপ্রমাণে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। শকুন্তলা জনান্তিকে বলিলেন, 'যখন অনুরাগ বিকৃত হইয়াছে তখন স্মরণ করান'তো বিড়ম্বনামাত্র! তথাপি আপনাকে কলঙ্কমুক্ত করিব।" এ সেই তপোবনের প্রভাব।—উগ্রতপা বিশ্বামিত্রের কন্যা প্রকাশ্য রাজসভায় স্বামীর মিথ্যা অভিযোগ সহিতে পারিলেন না। প্রথমে অভ্যাসমত সম্বোধন করিলেন, 'আর্য্যপুত্র!' অর্দ্ধ উচ্চারিত বাক্য মুখেই রহিল, অভিমানিনী গভীর খেদে বলিয়া উঠিলেন, 'যেখানে পরিণয়েই সংশয়, সেখানে এ সম্বোধন অপমানিত হয়।' তাই বহুদিনের বিস্মৃত নামে—সাধারণ প্রজার ডাকে ডাকিলেন—"পৌরব!" অমনি ক্ষুব্ধ অভিমানে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল; —দুষ্যন্তের

বধূ হইয়া রাজসভায় অপমানিতা হইয়াছেন। সরলা আশ্রমকন্যা তিনি, চতুর নাগরিকের ছল কেমন করিয়া বুঝিবেন? তাই শঠ দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন'—এই সকল কথা গভীর আবেগে বলিয়া গেলেন। শারদ্বত বলিয়াছিলেন. প্রমাণসহ কথা বলিতে, তাই মাঝে মাঝে রাজাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন; কিন্তু রাজা অটল। অঙ্গুরীয়টি পর্য্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে, দৈবই যেন প্রতিকূল! তাই ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রাজার সম্মানে আঘাত দিবার বাসনায় তাঁহাকে অনার্য্য বলিয়া সম্বোধন করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে পথশ্রমে, এবং এই পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া—নিরুপায় অবলার একমাত্র গতি আশ্রয় করিলেন—অঞ্চলে নয়ন ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গৌতমী, শারদ্বত, শার্ঙ্গরব দেখিলেন রাজাকে অনুরোধ করিয়া ফল নাই, তাই তাঁহারা শকুন্তলাকে রাখিয়া ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে গমনে উদ্যত দেখিয়া শকুন্তলা একবার সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—'কি, এই শঠ ও বঞ্চনা করিল, তোমরাও ফেলিয়া যাইতেছ?' বলিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। রাজসভায় হৃদয়হীন জনতার সমক্ষে সকলের প্রত্যাখ্যাত রমণী একা কতক্ষণ অবিচল থাকিতে পারে? আশ্রমের সেই ভীরু তরুণী যখন সখীদের বলিয়াছিলেন—"দুইজনেই ফেলিয়া গেলে?" —তখন সখীরা উত্তর দিয়াছিলেন,—'পৃথিবীর যিনি আশ্রয় তিনি তোমার নিকটে।' আজ যাইবার সময় গৌতমী বা ব্রহ্মচারীরা সেরূপ কোন আশ্বাস দিতে পারিলেন না। আজ পৃথিবীর আশ্রয় দুষ্মন্ত তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আজ তিনি সত্যই নিরাশ্রয়। একদিকে এই অভিমান, অপরদিকে গভীর লজ্জা ও আহত সম্মান—শকুন্তলা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মনে পড়িল সখীরা যখন শঙ্কিত মনে রাজাকে বলিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি রাজারা বহুপত্নীক হন,'—দেখিবেন মহারাজ, আমাদের এই সখীটি যেন দুঃখ-দশায় না পড়েন"—তখন কত আশ্বাস দিয়া দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন, সিন্ধুমেখলা ধরণী আর আপনাদের এই সখী, এই দুইজনেই আমার চিত্ত অধিকার করিয়াছেন।' যখন পুরোহিতের মন্ত্রণায় রাজা ইঁহাকে অন্তঃপুরে সামান্য নারীর স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন শকুন্তলার প্রাণে বড় বাজিল। যেখানে তাঁহার রাজলক্ষ্মীর আসন, সেখানে এই করুণার দান বড় মর্ম্মান্তিক, বিশেষতঃ এখানে তাঁহার সতীর মর্য্যাদা অস্বীকার করা হইয়াছে। সাধ্বী শকুন্তলা অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না; রুদ্ধ অভিমানে বলিয়া উঠিলেন, 'ভগবতি বসুধে, কোলে আশ্রয় দাও মা' মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, একটু পরেই সংবাদ আসিল এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী আসিয়া শকুন্তলাকে অপ্সরাতীর্থে লইয়া গিয়াছে। মনে পড়ে অভিমানিনী সীতার কথা। সেখানে

তবু সান্ত্বনা ছিল, স্বামী তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন, অভাগিনী শকুন্তলার শুদ্ধতায় স্বয়ং দুষ্মন্তই সন্দিহান।

* * * * *

একেবারে শেষ অঙ্কে শকুন্তলা পুনরায় দেখা দিলেন। এবার তাঁহার তাপসীবেশ; রাজা মুগ্ধনয়নে চাহিয়া আছেন; ধূসর বসনা ব্রতশীর্ণমুখী, একবেণী ধরা শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যা। কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ফলে তাঁহার রূপলাবণ্য এখন ম্লান। এ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল প্রত্যাখ্যানের সময়; প্রিয়জনের উপেক্ষা তাঁহার যে ক্ষণিক অসংযমকে নির্ম্মম বিদ্রূপ করিয়াছিল—এতদিন মারীচের আশ্রমে দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে দুষ্কর তপস্যার দ্বারা সেই অপরাধ খণ্ডন করিতেছিলেন। আজ তাঁহার ক্ষোভ নাই, অভিমান নাই, রাজার দুঃসহ অবিচার স্মরণ করাইয়া রাজাকে একবার অনুযোগ পর্য্যন্ত করিলেন না। তপোবন-বিরুদ্ধ ভাব একবার তাঁহার জীবনে যে বিপর্য্যয় আনিয়াছিল, এবার আর তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে দিলেন না। রাজা যখন পরিচয় দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন তখন শান্ত-শীলা শকুন্তলা আত্মস্থ হইয়া বলিলেন হৃদয়, আশ্বস্ত হও, দৈবের রোষ এতদিনে শান্ত হইল, এবার বুঝি তিনি তোমার প্রতি অনুকম্পা করিলেন, এই তো অর্য্যপুত্র!' সেবার রাজসভায় দৈবের অদৃশ্য হস্ত তিনি দেখিতে পান নাই, দোষ দিয়াছিলেন রাজাকে। এবার তাঁহার চিত্তে চাঞ্চল্য অভিমান নাই, তাই ধন্যবাদ দিলেন দৈবকে। "আর্য্যপুত্রের জয় হোক" বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। শেষ যেদিন "আর্য্যপুত্র" উচ্চারণ করিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন, সেদিনের কথা মনে পড়িল। বালক সর্ব্বদমন জিজ্ঞাসা করিল—'মা কে এ?' শকুন্তলা নিজে পরিচয় দিলেন না, বলিলেন, 'বাছা, তোমার ভাগ্যকে প্রশ্ন কর।' আজিকার সৌভাগ্য তাঁহার কতদিনের প্রতীক্ষিত, তাই আনন্দে বিস্ময়ে তাঁহার বাক্‌রোধ হইতেছিল। রাজা যখন কাতরবচনে নিজের মোহজনিত অপরাধ স্বীকার করিলেন তখন শকুন্তলা বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র, দোষ আপনার নয়, এ সমস্তই দৈবের অধীন,.........নতুবা আপনার মত কোমলপ্রাণ ব্যক্তি কেমন করিয়া আমার প্রতি বিরূপ হইবেন?, কত উদার মন! ইচ্ছা করিলে কত ভর্ৎসনা, কত অনুযোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু সে সকলে তাঁহার অভিরুচি হইল না; দৈবকে স্বচ্ছন্দে শিরোধার্য্য করিয়া প্রসন্ন মনে দুষ্মন্তকে ক্ষমা করিলেন। তপস্যা যাঁহাকে এতদূর উদার করিয়াছে দৈব তাঁহার প্রতিকূল হইবে কেন?

বিস্মৃতির কাহিনী আদ্যন্ত বিবৃত করিবার পর দুষ্মন্ত যখন অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দিতে উদ্যত হইলেন তখন শকুন্তলা সভয়ে বলিলেন,—ওটি আপনার হাতেই থাকুক, আমার আর বিশ্বাস হয় না ? আশ্রমের সেই ভীরু তরুণী ! তাহার পর দুষ্মন্তের অনুরোধে স্বামী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মারীচকে প্রণাম করিতে চলিলেন। সেখানেও লজ্জা, কি স্বাভাবিক, অথচ কি সুন্দর !

মারীচ যখন শকুন্তলাকে শ্রদ্ধার সহিত উপমিত করিয়া পুত্রবতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন তখন মনে পড়িল আশ্রমের সেই মিলনের কথা। কালিদাস সহৃদয় কবি ; আশ্রমের সেই তৃতীয় অঙ্কের অমর্য্যাদা করেন নাই, সে চিত্রকে রঞ্জিত করিতে তাঁহার তুলিকার কোন কার্পণ্য নাই, কিন্তু নারী সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ মহত্তর, তাই এই ব্রতকর্শিতাঙ্গী শকুন্তলার সহিত বিরহ-ক্লিষ্ট দুষ্মন্তের যে মিলন ইহাতে তিনি এমন একটা শুচি-শুভ্র নির্ম্মল রূপ দিয়াছেন, যে ইহার পার্শ্বে আশ্রমের সেই বাসনা-উচ্ছল শকুন্তলার চিত্র-স্বতঃই ম্লান হইয়া যায়। মর্ত্ত্যের মিলনকে যোগ্য মূল্য দিয়া তিনি স্বর্গের এই মিলনকে মহিমায় উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। সমালোচক শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ বলেন, "মর্ত্ত্যের মালিনী তীর হইতে স্বর্গাধিপতির রাজসভা পর্য্যন্ত এই নাটকের চিত্রপট প্রলম্বিত। ....একদিন সেই প্রথম যখন দেখিলাম, মালিনীতীরের এক উদ্যানবাটিকার নিকুঞ্জপ্রান্তে দুষ্মন্তের পার্শ্বে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া, তখনকার সেই মূর্ত্তি, তখনকার সেই রসোচ্ছল নরনারীর হাস্যময়ী মূর্ত্তির সহিত আজ একবার এই বিরহ-শীর্ণ পবিত্র হৃদয় দুষ্মন্তের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ব্রতকর্শিতাঙ্গী মলিনবেশা পতিধ্যানরতা যোগিনী শকুন্তলার মূর্ত্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারি যে, মর্ত্ত্যের সেই পূর্ণকাম নরনারী অপেক্ষা স্বর্গের এই নিষ্কাম নরনারী কত অনুপম.........। ....স্থূলদেহে যাহা সুন্দর ছিল, আজ বিশীর্ণ দেহে স্থানমাহাত্ম্যে তাহা সুন্দরতম। তাই মনে হইতেছে যে, কি দেখিয়াছিলাম, আর এই-ই বা কি দেখিতেছি।"

(ক্রমশ)

"যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং"

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী।

ফুল উঠেছিল ফুটে,
শাখা আলো করে,
গন্ধে আকুল হয়ে উঠেছিল বনভূমি,
ঘুরেছিল অলি ;
ঝরে গেল ফুল,
নিরাশ ভ্রমর দল খুঁজে ফিরে গেল।
পাশে শিলাস্তূপ,
লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরে নিশ্চল নিশ্চুপ।
কিন্তু পাষাণে,
ফোটেনা কুসুম কভু আসেনা ভ্রমর,
ঘোরেনা বসন্ত বায়ু সৌরভ সন্ধানে

মায়েরা সব "ক্লাব" খুলেছেন, চাঁদার খাতা হাতে "মেম্বার" সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। তাই দেখে এ বাড়ীর খুকুরও সখ হ'ল, সে পাশের ও বাড়ীর খোকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—"আমি একটা ক্লাব করেছি, তুই তার মেম্বার হবি ?" —খোকা পৌরুষ গর্ব্বে মাথা উঁচু করে উত্তর দিল—"দুৎ বোকা, আমি মেম্বার হ'তে যাব কেন, আমি তো সাহেব্‌বার হব।"

শাস্তি।

(ইংরাজির ছায়া অবলম্বনে)

ভাল ঘর দেখেই সুধার মা বাবা তা'র বিয়ে দিয়েছিলেন, টাকারও তা'র অভাব হয়নি, কিন্তু ভগবান বোধ হয় তা'র কপালে সুখ বা আরাম লেখেননি। বিয়ের তিন বছর পরে যখন তা'র স্বামীর যক্ষার সূত্রপাত হ'ল তখন তখন সবাই তা'র দুঃখের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল; সুধাও হয়ত গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কিন্তু বাইরে তা'র অক্লান্ত সেবা সবাইকে অবাক্ করে দিল। স্বামীর ওষুধ, পথ্য, স্নানাহারের সমস্ত ব্যবস্থা সে একা নিজে করতে লাগলো, আর কারো, কোন প্রয়োজনে, কোন কাজ করবার ছিদ্র রইল না।

এমন অক্লান্ত সেবার কোন ফল হ'ল না, একদিন, এক মুহূর্ত্তে তা'র হাতের শাঁখা, পেড়ে কাপড়, সিঁথের সিঁদুর সব ঘুচে গেল। তা'র দু'টি শিশু পুত্রকন্যা ছাড়া কোন অবলম্বন এবং এক বহুদিনের পুরোনো বুড়ী ঝি ছাড়া কোনও সহায় রইল না।

নিঃসহায় হয়েও সুধাকে নিঃসম্বল হতে হয়নি। স্বামীর প্রচুর পৈতৃক অর্থ এবং কলকাতার উপকণ্ঠে ফুল বাগানের মধ্যে বসান ছবির মত সুন্দর ছোট একটি বাড়ী তা'র রইল।

ছেলেমেয়ে নিয়ে সুধা একা থাকতে লাগল। তা'র বঞ্চিত, বুভুক্ষ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে সে দুটি শিশুর স্নেহনীড় রচনা করল। সংসারে অন্য কোন কাজ না থাকলেও এদের সেবা করে সে যেন মুহূর্ত্তও অবসর পেতনা। ঝি বলত—"রোগীর সেবা এতদিন করলে, এবার একটু না জিরোলে মরে যাবেযে!" সুধা শুনত না,—তা'র ছেলেমেয়েদের সেবা সে না করলে কে করবে? তা'র সমস্ত অন্তর মমত্বে ভরে যেত।

ছেলেমেয়ে দুটি মায়ের অশ্রান্ত মনোযোগের আড়ালে কাঠের বাক্সে তুলায় মোড়া আঙ্গুরের মত বড় হতে লাগল। ছেলে অজিত তা'র বাপের মত দুর্বল দেহ পেয়েছিল, সেবার আতিশয্যে সে দিন দিন পঙ্গু হতে লাগল, কিন্তু মেয়েটি এত অযথা আদরের মধ্যেও সুস্থ সবল হয়ে উঠল।

ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে দিতে মায়ের হৃদয় যেন ভেঙে যেতে লাগল, নয়নের মণি দুটিকে আড়াল করে কেমন করে দিন কাটে ? সারাদিন ধরে তা'দের জন্য নানা রকম দুষ্পাচ্য সুখাদ্য তৈরী করেও হাতে যখন সময় ভারি হয়ে উঠতে লাগল, তখন মেজাজও ক্রমে খারাপ হ'তে লাগল। তা'র সন্তান দুটিকেই তা'র অকারণ মান অভিমানের পালা সইতে হ'ত। এমনি করে দিন কাটতে কাটতে ছেলেমেয়েরা বড় হ'ল।

মেয়ে সুস্মিতা স্বার্থপর ছিল ; ঘরে তা'র দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তা'র মনে হ'ত যেমন করে হোক তাকে বাইরে যেতে হ'বে, বহির্জগতে, উন্মুক্ত আকাশের তলায় যেখানে পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে প্রতিহত হতে হয়না যেখানে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে নিজের স্থান করে নিতে হয় সেই সমরাঙ্গনে তা'কে যেতেই হবে। পড়াশুনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে বৃত্তি নিয়ে সে বিলেতে চলে গেল ; সেখান থেকে তার করল যে মিঃ কেলকার বলে এক মান্দ্রাজী যুবকের সঙ্গে তা'র বিয়ে হয়ে গেছে।

অজিত তা'র দুর্বল শরীর নিয়ে অসাধারণ কিছু করতে পারেনি, মায়ের অখণ্ড স্নেহের একমাত্র কেন্দ্র হয়ে ঘরে বসে থেকে সে নানারকম অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বপ্ন দেখত, খবরের কাগজে দিদির নাম দেখে তা'র নিজেরও ইচ্ছা দুর্বার হয়ে উঠত।

বানীর মধ্যে চোখে পড়বার মত কিছু না থাকলেও তার সরল শিশুর মত মুখশ্রী অনেককেই আকর্ষণ করত ; অজিতকেও করল। বানীর কেউ ছিলনা, তাই তার অসহায় দুর্বল নারীত্ব অজিতের সুপ্ত পৌরুষকে জাগিয়ে তুল্ল ; সে সহসা একদিন প্রতিজ্ঞা করল যে একে রক্ষা করাই তার জীবনের মহত্তম কর্ম হবে।

সুধার এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি হল। মা-বাপমরা মেয়ে, পরের আশ্রয়ে মানুষ হয়েছে. না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, না আছে রূপ, একে পুত্রবধূ করে তিনি সমাজে নাম ডোবাতে পারবেন না। অজিত মুখে কিছু বল্লনা কিন্তু তার স্থির প্রতিজ্ঞা রইল যে বানীকে সে কিছুতেই ছাড়বেনা।

সেদিন রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, অজিত তখনও ফেরেনি, বারবার ঘর ও বাহির করে সুধা অস্থির হয়ে পড়ছিল ; এমন সময়ে মেঘের ফাঁকের ঝাপসা চাঁদের আলোয় সে একটি ছেলেকে আসতে দেখল—কিন্তু সে তো অজিত নয়—তবে অজিতের কোন বিপদ ঘটেনি তো ? সহরের রাস্তা দিয়ে কত গাড়ী ঘোড়া চলে—ভাবতেও সুধার বুকটা কেঁপে উঠল। ছেলেটি বারন্দায় উঠতেই সে ছুটে এসে বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করল—''কি-কি-কি

হয়েছে আমার অজিতের?" ছেলেটি নিঃশব্দে তার হাতে একটা খাম দিল, ভিতরে অজিতের লেখা চিঠি। অজিত লিখেছে—

"মা,

"ভালবাসার অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। তোমার জীবনের সার্থকতা খুঁজে আমার জীবনকে অস্বীকার করতে আমি রাজি নই। তোমারও একদিন বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সেই দিনকার স্মৃতি মনে রেখে যদি পার তো আমায় ক্ষমা কোরো।

" অজিত।"

সুধার চোখে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

সুধা যে কেন আত্মহত্যা করলনা তা ভগবানই জানেন। কয়েকদিন আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকার পর সে যখন উঠে আবার আগেকার মত খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা করতে আরম্ভ করল তখন সে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। আগে যে সারাদিন ধরে ঘরের কাজ করে তৃপ্তি পেতনা আজ তার কুঁড়েমি সবাইকে অবাক করল; আগে যে পরের জন্য এত বেশী ভাবত যে নিজের কথা ভাববার অবসরই পেতনা আজ সে সম্পূর্ণরূপে আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠল। সুধা এখন ভাল খায়, ভাল থাকে, ভাল পরে, বিলাসিতার সহস্র উপকরণে নিজেকে সে ঢেকে ফেলেছে—গাড়ী না হ'লে তার চলেনা, প্রতি সপ্তাহে সিনেমায় যাওয়া চাই। সে বলে যে রুগ্ন স্বামী আর ছেলের সেবা করে করে জীবনের একটা দিনও তার শান্তিতে কাটেনি, তাই আজ সে শান্তি চায়—গা ঢেলে দিয়ে আরাম করতে চায়।

কয়েকবছর কেটে গেছে। সুখে থেকে সুধা যে শান্তি পেয়েছে তা'র চেহারা দেখে তা মনে হয়না। তখন সকাল আটটা, সুধা তখনও বিছানায় বসে আছে, পাশে ছোট টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। চা খেয়ে সে সবে খবরের কাগজটা হাতে টেনে নিয়েছে এমন সময়ে বুড়িঝি এসে একখানা চিঠি দিল। একমুহূর্তের জন্য সুধার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখের মধ্যে জমা হ'ল, পরমুহূর্তে তা'র মুখ কাগজের মত শাদা হয়ে গেল; সে জিজ্ঞাসা করল—"এ চিঠি কোত্থেকে এল?"

"একজন দিদিমণি এনেছে - বল্লে চিঠি পড়ে' আপনি তা'র সঙ্গে দেখা করবেন।"

চিঠিটা অজিতের লেখা, সেই মা সম্বোধন, সেই হাতের লেখা, সেইরকমই আরেকটা চিঠি যা ক'বছর আগে তা'র বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়েছিল।

"মা—

"তোমার কাছে অনেক দোষ করেছি, তার জন্য অনেক সাজাও পেয়েছি। একদিন তোমার যত্নে অবহেলা করেছিলাম কিন্তু আজ তা'র অভাবে তা'র মূল্য বুঝতে পারছি।

"আমি আর বাঁচবনা। আমার শেষ অনুরোধ এই যে যাকে একদিন ছেলের বৌ বলে ঘরে তুলতে রাজি হওনি, আজ অসহায়া, অনাথা, বিধবা বলে দয়া করেও অন্তত তাকে আশ্রয় দিও।

"অজিত।"

সে তবে আর নেই! সমস্ত পৃথিবী ছায়ামূর্তির মত নিরর্থক হয়ে গেল; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সুধার স্বভাবের কঠিন আবরণ ফিরে এল। সে শ্রান্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। কারো কোন অনুরোধ সে রাখবেনা, চিরদিন স্বামীপুত্রের দাসীবৃত্তি করে' এখন তা'র আরাম করবার দিন এসেছে—পুত্রবধূর দাসীবৃত্তি সে করতে পারবেনা।

আয়া তা,কে খবর দিল, "মিস্‌বাবা' দুঘণ্টা হ,ল বসে আছে। সে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বল্ল—"চলে যেতে বল্ তা'কে।"—ঝি তা'কে হয়ত কিছু বলে দিয়েছিল—সে মুখে "জি" বলে সম্মতি দিলেও কাজে আজ্ঞাটি পালন করবার কোন উদ্যোগই করলনা।

সুধা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বল্ল—"তা'কে এই ঘরে নিয়ে আয়।"

বানী ঘরে ঢুকল। সুধা জানত তা'র বয়স বাইশ বছর, কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় আঠেরো কি উনিশ। তা'র স্বভাব গৌর মুখ রক্তের অভাবে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, রাত জেগে, কেঁদে আরক্ত চোখের নিচে কালী পড়ায় চোখদুটিকে অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। পরণে বিধবার বেশ।

আঙ্গুল দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সুধা রুক্ষ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল "কি চাও?"

বাণীর চোখে জল আসছিল কিন্তু আহত আত্মসম্মান তা'কে আত্মসংবরণ করবার ক্ষমতা দিল; দুহাতে চেয়ারের পিঠটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে সে বল্লে—"কিছু চাইতে আসিনি, কেবল আপনার ছেলের চিঠিটা দিতে এসেছি—ওটা আপনারই।"

"চাইনা, চাইনা, ছেলে কেড়ে নিয়ে এখন একটা কাগজ দিয়ে ভোলাতে এসেছ! যেদিন আমার ছেলে কেড়ে নিয়ে গেলে সেদিন মনে ছিলনা যে অসহায়া বিধবার শেষ সম্বল নিয়ে যাচ্ছ—আজ যে বড় অনাথা বিধবা সেজে আশ্রয় নিতে এসেছ?" —চীৎকার করে উঠে সুধা চিঠিখানা বাণীর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"আমি আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসতাম না, তাঁ'র ইচ্ছায় এসেছিলাম; আপনার ছেলেকে আমি কেড়ে নিইনি, আপনিই তাঁকে পর করেছিলেন; ছোটবেলা থেকে নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছি, আজ দুমুঠো অন্নের জন্য আপনার দয়া ভিক্ষা করবনা।" —বাণী গর্বিতভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেল, রোগে শোকে জর্জরিত হ'য়েও তা'র তেজ মরেনি।

সুধা শ্রান্ত হয়ে শুয়ে রইল—কিছু ভাববার ক্ষমতা তা'র ছিলনা।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন মিসেস নন্দী সুধাকে দেখতে এসেছিলেন। বাণী যাবার পর আর সুধা বিছানা থেকে উঠতে পারেনি ঝি তাই ব্যস্ত হয়ে লেডি ডাক্তারকে ডেকে এনেছে।

রোগীকে দেখবার পর মিসেস নন্দী তা'রই ঘরে বসে বসে গল্প করছিলেন। তিনি একটি অল্প বয়সী মেয়ের দুরবস্থার বর্ণনা করছিলেন। দুদিন আগে কলকাতার এক অন্ধকার গলিতে একটা টিচারদের মেসে তাঁ'র ডাক পড়েছিল, সেখানে একটি সদ্যোবিধবার দুঃখ তাঁ'কে আঘাত করেছে। মেয়েটি চাকরীর সন্ধানে কলকাতায় এসে অসুখে পড়েছে। সে তা'র স্বামীর যক্ষ্মার সেবা করেছিল বলে তা'র ভয় খুব বেশী। তা' ছাড়া যে কুৎসিত, অন্ধকার বাড়ীতে সে আশ্রয় নিয়েছে তা'তে অত্যন্ত সুস্থ লোককেও রোগে ধরবার সম্ভাবনা। সুধা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল—"সে মেয়েটির নাম কি বলতে পারেন মিসেস নন্দী?"

"ঠিক বলতে পারিনা—বোধ হয় বীণা—কিন্তু বড় মিষ্টি মেয়েটি।"

"তা'র নাম বাণী নয়?"

"ঠিক বলেছেন বাণী, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?"

"আমাদের এক আত্মীয়ের বৌএর বড় দুর্দশা হয়েছে শুনেছিলাম তাই মনে হ'ল। তা'র ঠিকানাটা দেবেন?"

"ঠিকানাটা আমার ঠিক মনে নেই, তবে ড্রাইভার বোধ হয় বলতে পারে।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন সুধার মস্ত বড় মোটরটা বাণীর হষ্টেলের সামনে গলির সমস্তটা জুড়ে দাঁড়াল তখন সে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছে।

বাণীর যখন জ্ঞান হ'ল তখন সে একঘর আলোর মধ্যে শুয়ে আছে, চারিদিকের অন্ধকার করা শেওলাভরা দেওয়ালগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। এখন তা'র ঘরের যে দেওয়ালে সূর্য্যের আলো ঝলমল করছে, তা'র রং খোলা আকাশেরই মত হাল্কা নীল। তা'র বিছানাটা ধবধবে শাদা, পনেরদিন ব্যবহারকরা, কলের ধোঁয়ায় কালো তা'র নিজেরটা কে যেন সরিয়ে নিয়েছে।

দরজা খুলে কে এল; চোখকে বিশ্বাস করাণ কঠিন, কিন্তু সেদিন কি এই মহিলাই তা'কে অপমান করে' তাড়িয়ে দিয়েছিল? আজ যে তা'র মুখে হাসি, চোখে উৎসাহের আলো, মুখের উপর থেকে রূঢ়তার প্রত্যেকটি চিহ্ন মুছে গিয়েছে। সাধ্যসাধনা করে', আদর করে' তা'কে একবাটি দুধ খাইয়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে আলমারি খুলে সে তা'র মেয়ের পুরোনো কাপড়ের মধ্যে বাণীর ব্যবহারোপযোগী কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে লাগল।

বাণী শুয়ে ছিল, তা'র কানে কাজকর্ম্মের শব্দের সঙ্গে সুধার মৃদু কণ্ঠস্বরে গানের শব্দ ভেসে আসছিল। মা কেমন হয় বাণীর মনে ছিলনা, তার মনে হ'ল মা থাকলে মায়ের শব্দ নিশ্চয়ই ঠিক এমনি হয়।

শিশুর খেলা ও খেলনা।

মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রত্যেক সুস্থ শিশু খেলতে চায়। খেলাটা তার মানসিক ও শারীরিক পরিণতির জন্য পড়ার সমানই প্রয়োজনীয়। খেলায় উৎসাহ স্বাস্থ্যের পরিচায়ক; শিশু খেলায় অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বুঝতে হবে হয় তার অসুখ করেছে, নয়ত তার শরীরের কোথাও কোন খুঁত আছে।

শিশুকে যে-সমস্ত খেলনা দেওয়া হয় সেগুলি তার পরিণতির সহায়কও হতে পারে, আবার অন্তরায়ও হতে পারে। বাড়ন্ত শিশুর পরিণতির বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয়ে যদি গুরুজনের স্পষ্ট জ্ঞান থাকে তবে তাঁরা তাকে তার উপযোগী খেলনা বেছে দিতে পারবেন। পত্রিকার পরিমিত স্থানের মধ্যে শিশুর সমস্ত প্রয়োজনের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় তাই আমি এখানে কেবল চার থেকে আট-বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী কয়েকরকমের খেলা এবং খেলনা সম্বন্ধে কতকগুলি মতামত প্রকাশ করব।

খেলা এবং খেলনাগুলিকে মোটামুটিভাবে চারটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে যথা—

১। যে-সব খেলা বা খেলনা প্রত্যক্ষ ভাবে শিশুর শারীরিক পরিণতির সহায়তা করে, যেমন খেলাচ্ছলে নানারকমের ব্যায়াম বা জিমনাষ্টিক করাণ। বাড়ীর বাগানে যদি এমন সব নীচু গাছ থাকে যাতে, তাতে বেয়ে চড়া এব তার থেকে লাফিয়ে নামা শিশুর পক্ষে সহজ হয় তাহ'লে খেলার আনন্দের সঙ্গে ব্যায়াম সুচারুরূপে মিলে যাবে।

২। যে-সব খেলা বা খেলনা শিশুর মানসিক পরিণতির সহায়তা করে, যেমন কিছু বানাবার বা গড়বার খেলা। ঘর, গাড়ী ইত্যাদি বানাবার জন্য ছোট বড় নানা আয়তনের কাঠের ইটের সেট, বালি, শিমবীচি প্রভৃতি ওজন করবার জন্য দাঁড়িপাল্লা প্রভৃতি জিনিষ পেলে তাই দিয়ে খেলা করবার সময়ে শিশুর মন সক্রিয় ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়।

৩। যে-সব খেলা বা খেলনা শিশুর কার্যকরী শক্তির উন্নতি করে, যেমন বালি, মাটি, কাদা, কাগজ প্রভৃতি জিনিষ তৈরী করবার উপাদান অথবা কাঠের ইঁট বা রঙিন পুঁতি প্রভৃতি সাজাবার বা গাঁথবার জিনিষ।

৪। যে-সব খেলা বা খেলনা শিশুর কল্পনা শক্তির উদ্বোধন করে যেমন পুতুল, কাঠের জন্তু, খেলবার গাড়ী ইত্যাদি।

এর পর বয়ঃক্রমানুসারে চার থেকে আট-বছরের পর্য্যন্ত শিশুর উপযোগী খেলা এবং খেলনার বিবরণ দেব।

চারবৎসর বয়স্ক শিশুর খেলনা।

চার বছর বয়সের মধ্যে শিশুর শারীরিক শক্তিনিচয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য (balance) হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়; এখন তার পেশী সমূহ পরস্পরের সহায়তায় (co-ordination) সিদ্ধ হয়েছে এবং তার হাতের কার্যকরী শক্তিও যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে।

দৌড়ান, লাফান, কোন কিছু বেয়ে ওঠা, দোলনায় দোলা প্রভৃতি ছাড়া সে এখনও খেলার গাড়ী ঠেলে বেড়াতে বা বোঝাই করতে ভাল বাসবে। এই সময়ে তার শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন করবার উপযুক্ত খেলনার দরকার। একটা পুরোনো কাঠের বাক্স পেলে শিশু তাতে বেয়ে উঠে এবং তার থেকে লাফিয়ে নেমে খেলা করবে। যেখানে ইচ্ছা টেনে নিয়ে বেড়াতে পারে এরকম একটা তক্তা পেলে সে তার উপরে এদিক ওদিক দৌড়াদোড়ি করে বা সেটাকে কাঠের বাক্সটাতে উঠবার সিঁড়ির মতন করে ব্যবহার করে খুব আনন্দ পাবে; এই তক্তাটাকে কাঠের বাক্সের উপর রেখে সে দোলনাও (See Saw) তৈরী করে নিতে পারে। এর উপর একটা ছোট মজবুত মই পেলে তার আনন্দ শতগুণে বেড়ে যাবে। শিশুর বেয়ে উঠবার বা ঝুলবার জন্য সমান্তরালভাবে স্থাপিত ডাণ্ডাসমেত একটা মজবুত কাঠের ফ্রেম দেওয়ালে লাগিয়ে দিলে শিশুর ব্যায়াম আর আনন্দ একসঙ্গে হবে। দোলনাও শিশুর খুব প্রিয় খেলনা। শিশুকে কাঠের জিনিষ দেবার সময়ে সেগুলিকে খুব ভাল করে ঘসিয়ে নিতে হবে যাতে

তার হাতে কাঁটা বা খোঁচা ফুটবার কোন সম্ভাবনা না থাকে। গাড়ীর মধ্যে ঠেলাগাড়ীর চেয়ে তিনচাকাওয়ালা ছোট্ট সাইকল্ শিশুর পক্ষে বেশী উপকারী। বাগানে যদি একটা পুরোনো গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে দেওয়া যায় তাহ'লে শিশু তাতে বেয়ে উঠে এবং তার উপর দাঁড়িয়ে (Balance) খুব আমোদ পাবে।

বাড়ীতে বাগান থাকলে শিশুকে সেখানে সমবয়সীদের সঙ্গে অথবা একা খেলতে দেওয়া বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে ভাল। বেড়াতে গেলে শিশুকে হাত ধরে পার্কের সোজা পথে পায়চারি করানো একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়, ইচ্ছামত দৌড়োদৌড়ি করে, লাফিয়ে, দোলনায় দুলে সে তার আনন্দের পূর্ণতা লাভ করবে।

শিশুর মানসিক ও কার্যকরী ক্ষমতার পরিণতির সহায়তার জন্য ডাঃ মন্তেসরির মতানুমোদিত কতকগুলি খেলবার সরঞ্জাম আছে সেগুলি খেলা ও শিক্ষা উভয় দিক্ দিয়েই ফলপ্রদ। এর মধ্যে দশটা কাঠের চৌকোর সেট আছে যাকে "টাওয়ার" (Tower) বলা হয়ে থাকে; নানা আকৃতির খোপ ওয়ালা কাঠের বোর্ড আছে এবং এই খোপে বসাবার জন্য অনুরূপ আকৃতির কাঠের টুকরো আছে তা ছাড়া বড় বড় রঙিন পুঁতি এবং সেগুলি গাঁথবার জন্য মোটা সুতো বা জুতোর ফিতে আছে। এসব খেলনাগুলি যে শুধু শিশুর পক্ষে উপকারী তা নয়. এগুলি শিশুর খুব প্রিয়বস্তু।

তিন বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের শিশুর পক্ষে জল ও বালি নিয়ে খেলার মত আনন্দ-দায়ক আর কিছু নেই। এর জন্য খানিকটা জমি নীচু করে কেটে, ইঁট দিয়ে ঘিরে তাতে বালি ঢেলে (sand pit) দেওয়াও সবচেয়ে সুবিধাজনক, কিন্তু বাগানের যে কোন কোণে বালির স্তূপ করে দিলেও শিশু সমান আনন্দই পাবে। শিশুকে এমনি একটা বালি নিয়ে খেলবার জায়গা করে দিয়ে তার সঙ্গে কতকগুলি বালতি, বালি এদিক ওদিক নিয়ে যাবার জন্য ঠেলাগাড়ী, কাঠের খোন্তা. গোল গোল টিনের চাকতি (এর কানা যেন ধারাল না হয়), কয়েকটি পুরোনো চামচ-বাটি প্রভৃতি সংসারের বা রান্নাঘরের পরিত্যক্ত বাসনপত্র দেওয়া হয় এবং তার উপর যদি জল রাখবার জন্য পুরোনো স্নানের টব বা অন্য কোন বড় বাসন আর তাতে ভাসাবার জন্য ছোট ছোট সেলুলয়েডের জন্তু দেওয়া হয় তবে শিশু তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনের আনন্দে খেলা করবে।

মাটির জিনিষ গড়বার পক্ষে গঙ্গামাটিই সবচেয়ে ভাল। এই বয়সে শিশু প্রথম প্রথম নানা আকৃতির মাটির ঢেলা বানিয়ে সেগুলিকে নানা নামে অভিহিত করবে। পাঁচ বছরের কাছাকাছি এসে সে হয়ত গুলি বানিয়ে তাকে রসগোল্লা বলবে, সেটাকেই একটু লম্বা করে পান্তুয়া বলবে আর একটু চেপ্‌টা করে সন্দেশ বলবে। আরো পরে সে থালা, পেয়ালা, বাটি প্রভৃতি বাসন গড়তে চেষ্টা করে খুব আনন্দ পাবে।

ছোট শিশুর পক্ষে পেন্‌সিল দিয়ে ছবি আঁকার চেয়ে রং ও তুলি দিয়ে চিত্র করা ঢের ভাল। বেণের দোকানে যে সাধারণ গুঁড়ো রং পাওয়া যায় সেগুলিকে জল দিয়ে গুলে ব্যবহারের উপযোগী করে ছোট ছোট বোতলে রেখে দিতে হবে। সাধারণ মোটা জিনিষপত্র মুড়বার কাগজ আর সবচেয়ে মোটা যে তুলি পাওয়া যায় তাই শিশুর পক্ষে ভাল। যেমন মাটির জিনিষ গড়বার সময়ে, তেমনি ছবি আঁকবার সময়েও শিশু প্রথম প্রথম সমস্ত কাগজময় নানা রকমের আঁচড় কেটে কেটে পরীক্ষা করতে থাকবে। পরে সে হয়ত ছোট ছোট ফুটকি বা দাঁড়ি এঁকে সেগুলিকে বৃষ্টি বলবে, তারপর ক্রমে সে বড় বড় আঁচড় কাটতে আর সোজা রেখা টানতে শিখবে। এগুলির অর্থ বুঝতে না পারলে নিরাশ হবার কারণ নেই, এই আঁচড় শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের অপরিণত ও অনিশ্চিত অবস্থার চিহ্ন এবং তার শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কাঠের তৈরী যে সমস্ত চারকোণা. গোল. সরুলম্বা (Cubes, rods, discs) প্রভৃতি আকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় ছুতোরই সেগুলি তৈরী করে দিতে পারে। এ ছাড়া শিশুকে বড় ফাঁপা কাঠের ইঁট তৈরী করিয়ে নিতে পারলেও ভাল। এই গুলিকে গাড়ী, বাড়ী প্রভৃতি নানা রকমের জিনিষ বলে কল্পনা করে নিয়ে শিশু খেলতে থাকবে। দর্জির কাছে খালি স্থতোর লাটিম চেয়ে নিয়ে সেগুলিকে নানা উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে দিলে শিশু সেগুলিকে মোটা স্থতোয় বা সরু কাঠিতে গেঁথে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসবে।

এই বয়সে শিশু কাঁচি ব্যবহার করতে আরম্ভ করতে পারে, কিন্তু তাকে যে কাঁচি দেওয়া হবে তার মুখটা যেন গোল হয়। কাগজ কেটে তার খুব আনন্দ হবে, তাই তার খেলার বাক্স বা আলমারিতে একগোছা পুরোনো কাগজ রেখে দেওয়া খুব ভাল।

খেলবার জায়গায় দেওয়ালে একটা ছোট ব্ল্যাকবোর্ড খুব নীচু করে ঝুলিয়ে দিয়ে শিশুর হাতে কতকগুলি মোটা রঙিন খড়ি দিলে সে নানা রকমের চিত্র এঁকে সময় কাটাবে।

পুতুল, পুতুলের বাড়ী, কাঠের বা অন্য কিছুর তৈরী গাড়ী, জন্তু প্রভৃতি খেলনা শিশুর কল্পনা শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করে। পুরোনো বাক্স পেলে শিশু তাতে জিনিষ ভরে এবং সেগুলিকে পুতুলের আসবাব বলে কল্পনা করে খুব আনন্দ পাবে। তার এই সমস্ত সরঞ্জাম রাখবার জন্য তাকে বড় বড় রঙিন থলি তৈরী করে দিতে পারলে খুব ভাল

শিশু যখন খেলবে তখন সমস্ত খেলনা একসঙ্গে তার হাতে ধরে দেওয়া ভাল নয়। অতিরিক্ত বেশী সংখ্যক খেলনা পাওয়ার চেয়ে বরং কিছু কম খেলনা পাওয়াও ভাল। শিশুকে বেশী খেলনা দিলে সে তার চিন্তাধারার খেই হারিয়ে ফেলবে এবং অখণ্ড মনোযোগ সহকারে কোন কাজ করতে শিখবে না।

(ক্রমশঃ)

হরিবাবুর ছেলে আর হয়না, সবগুলিই মেয়ে। মেয়েদের নাম—সান্ধ্যশশী, শুদ্ধশশী, পূর্ণশশী ইত্যাদি। পঞ্চমীর নাম যখন তিনি ক্ষান্তশশী দিলেন তখন পাড়ার লোকেরা একটু মুচকে হাসল; ষষ্ঠীর নাম আন্নাশশী হওয়াতে পাড়ার লোকে তাকে আরনাশশী বলে ডাকতে আরম্ভ করল; সপ্তমীর বেলায় পাড়ার লোকেরা নিজেরাই নামকরণ করে দিল—হোক্‌গেশশী।

———

স্বাস্থ্য সহায় সৌন্দর্য।

(সম্মতিক্রমে অনূদিত)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সৌন্দর্যই স্বাস্থ্য লাভের প্রধান ঔষধ। সৌন্দর্য বলতে শরীর ও মুখশ্রীর সেই সরল ও আনন্দময় রূপকে, মানব দেহের সেই চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতাকে বোঝায় যার দর্শনে নয়নের আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের সুখ হয় এবং মনে খুসীর হাওয়া বয়ে যায় :—সৌন্দর্য শান্তি ও সন্তোষের মূর্তিমান কারণ স্বরূপ এবং মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন যুগসমূহের শ্রেষ্ঠ মণীষার উন্নততম অবদান! সৌন্দর্যই সত্যের চরম বিকাশ।

অবশ্য সৌন্দর্যকে স্বাস্থ্যের প্রধান সহায় বল্লে এই বোঝায় না যে যখনই কোন মেয়ের হৃদয় ভারাক্রান্ত বোধ হবে তখনই তাকে মানসিক উৎসাহ ফিরিয়ে আনবার জন্য তাড়াতাড়ি আধুনিক ফ্যাসান সম্মত কোন শাড়ী বা আভরণ কিনে আনতে হবে। আমার বক্তব্যের মূল সত্যটি এই যে, যেহেতু প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ থেকেই সর্ববাদী সম্মতি ক্রমে নারী সৌন্দর্যের আধার বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে তাই যতদিননা নারী সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সুখী না হয় ততক্ষণ সমাজ তার সৌন্দর্যের স্বাস্থ্যপ্রদ ও উৎসাহ বর্ধক প্রভাব থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর কোন কারণ না থাকলেও অন্তত এইজন্যেও বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। জীন ব্যারি বলেছেন—"কোন কর্মশীলা নারীর মেজাজ খারাপ করবার মত অবসর থাকে না।"—মেজাজ খারাপ হলে সৌন্দর্যরূপ ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় বলেই এই কথাটা লক্ষ্য করা উচিত। আমাদের জীবনের অন্ধকার যে সৌন্দর্য অতি সহজে দূর করতে পারে সেই যখন নিজ প্রকৃতি হারায় তখনই ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করবার প্রয়োজন হয়!

জীবন আমাদের এত প্রিয় যে এই জীবনের সামঞ্জস্যের সাময়িক হানি থেকে যা-কিছু আমাদের বাঁচাতে পারে তার প্রতি স্বভাবতই আমরা যত্ন নিয়ে থাকি। সৌন্দর্যকে যখন সকল আধিব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে ধরে নিয়েছি তখন সমাজের পক্ষে

এই সৌন্দর্যের আধার নারীকে বদমেজাজ ও দুষ্টখেয়াল থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

পুরুষদের মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখাবার যে নানাপ্রকার রীতিপদ্ধতি চলে এসেছে তার মূলে বোধহয় এইরকম কোন একটা কারণ ছিল। বহুপূর্ব যুগ থেকেই পুরুষ নারীর মধ্যে এমন একটি জীবন সুধা খুঁজে পেয়েছে যা তাকে আনন্দ এবং জীবনসংগ্রামে সকল কুটিলতা ও আবিলতার সম্মুখীন হবার প্রেরণা দিয়ে এসেছে। তারপর কালক্রমে পুরুষ নারীকে তার নিজের মনুষ্যত্ব ও অহঙ্কার প্রতিফলিত করে দেখবার মুকুরস্বরূপ ব্যবহার করেছে; এবং ক্রমশ এই মুকুরে পরস্পরের তুলনা করে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষার সূচনা করাতে তার ফল বড় বিষময় হয়ে উঠেছে।

প্রথম প্রথম পুরুষ যোদ্ধাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষবিচারের ভারটুকু নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তখন নারীমর্যাদার সেই স্বর্ণযুগে পুরুষ সত্যই তার শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির বিকাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করত। তাই তখন রক্তপাত ঘটলেইমেয়েদের শ্রেয়োবুদ্ধির গুণে রক্তপিপাসা সমাজকে সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

এই মঙ্গল নিয়ম কিছুদিন চলেছিল কিন্তু শীঘ্রই লোভরাক্ষস তার সহায়ক ধ্বংসদানবের সাহায্যে মানব সমাজের এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য নাশ করবার পথ উন্মুক্ত করে দিল। যে দিন পুরুষ মেয়েদের হস্তে ন্যস্ত এই শেষ বিচারের অধিকারটুকু কেড়ে নিল, সেদিন সে এই নিয়মের বশ্যতা অস্বীকার করে এমন এক সমরপদ্ধতি প্রচারিত করল যার দ্বারা বিজয়ী বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে অন্য সকলকে নিঃশেষে পরাজিত করে সংগ্রামের কারণভূতা অসহায়া নারীর উপর স্বীয় ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারত।

ফলে মানবের দারুণ দুর্দিনের উদয় হ'ল। স্বর্গীয় প্রেমের যা উচ্চতম বিকাশ সেই আনন্দময় আত্মিক সহানুভূতির স্বাভাবিক শান্তি ও সান্ত্বনা থেকে এই যথেচ্ছাচারী পুরুষ হ'ল বঞ্চিত। প্রকৃত সুখ না পেয়ে এই মোহমত্ত দুর্বৃত্তেরা তা'দের পশুধর্মের কলঙ্কে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমাময় করে তুলতে লাগল। তবু পুরুষ এই নিষ্ঠুর অভিনয়ের সমাপ্তি চায়নি এবং নিজের পতনের দ্বারা নারীকেও তার সেই প্রাথমিক পবিত্রতার আসন থেকে টেনে নামিয়েছে। নারী যখন আর সংসারের সকল কর্মে সুখময়ী সন্তোষদাত্রী সাম্রাজ্ঞী রইলনা তখন শান্তি ও সৌন্দর্য মানবগৃহ ছেড়ে চলে গেল। মানব সমাজ যেন অনন্ত নরকভোগের শাস্তি পেল।

এ থেকে সমাজকে উদ্ধার করবার জন্য বহু শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ, সমাজ সংস্কারক এবং অভিজ্ঞ ও সুশাসক রাজা নানা উপায়ের উদ্ভাবন করেছেন। যারা কামনার বশবর্ত্তী হয়ে যুদ্ধ করেছিল তাদের রক্তপিপাসা দমন করবার জন্য বিধিবিধান প্রস্তুত করা হ'ল, এবং তাদের জিঘাংসাবৃত্তি সুবুদ্ধি পরিচালিত হয়ে রাজা ও সম্রাটের দিগ্বিজয়ের ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। কিন্তু মূলীভূত কারণের উচ্ছেদ হ'লনা।

একটি নূতন সমস্যা ঐতিহাসিক ধারার প্রকৃতি পরিবর্তিত করে দিল। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সমাজে পুরুষ সংখ্যা এমন কমে গেল যে মেয়েদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেশী হয়ে রইল। এতে সমস্যাটি বিপরীতরূপ ধারণ করে আবার নবীভূত হ'ল। অবশ্য আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে স্ত্রী ও পুরুষ নিরপেক্ষভাবে হত হয়। এরূপ হতেই হবে, আমরা সাম্রাজ্যবাদের যে উন্নতিশীল যুগে বাস করছি—সে যদি ইতিহাস থেকে এ শিক্ষাটুকুও গ্রহণ করতে না পারত তবে তার নিজকে উন্নতিশীল বলে ঘোষণা করবার কোন অধিকার থাকত না।

ইতিমধ্যে নারী বহুল সমাজের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটি নানা নূতনভাবে ঘোরতর হয়ে উঠতে লাগল। আজকের অবস্থা ঠিক তেমনিই রয়েছে। এই ঐতিহাসিক ধারার কিছু আলোচনা করলেই মেয়েদের অসুখী হবার কারণটা বুঝতে পারি।

আধুনিক সুন্দরীদের মনস্তত্ত্ব বিচার।

ট্রয়নগরের বন্দিনী হেলেনকে অনেকেই ঈর্ষা করে থাকে! এর কারণও আছে। আধুনিক যুগের গৃহিনী তাঁর একটি স্বামীকে তাঁর আড্ডা থেকে যথাসময়ে ঘরে ফেরাবার উপায় খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েন আর সেই সুন্দরী কিনা তিনটি মহা বীরপুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়ে নিজের ঘরে টেনে এনেছিলেন! আজকাল আমাদের মেয়েরা যে অসুখী ও অব্যবস্থিতচিত্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কেবলমাত্র চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে যে অমিল রয়েছে তার জন্যই যে আমাদের মেয়েরা তাদের ভাগ্যের নিন্দা করে তা নয়। মেয়েদের মন তখনই দুঃখ ও অশান্তির বশীভূত হয়ে পড়ে যখন তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের ও আনন্দ দান করবার ক্ষমতার উপর আস্থাহীন হবার কারণ ঘটে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের পক্ষেই জীবন যন্ত্রণাপূর্ণ হয়ে উঠবার গূঢ় কারণ এই।

কিন্তু যে ঐতিহাসিক কারণপরম্পরা প্রাচীন যুগের ভাব ও প্রবৃত্তিসমূহের পরিবর্তন সাধন করে আজকের যুগকে উপস্থিত করেছে তাকে অতিক্রম করে হেলেনের সেই প্রাচীন গৌরবময় যুগকে ফিরিয়ে আনতে চাওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবেনা; শুধু যে যুক্তিসঙ্গত হবেনা, তা নয়, একান্ত নিষ্ঠুরও হবে। যোগসূত্রগুলিকে ভাল করে না বুঝে কেবল দুঃখে হাহুতাশ করলে সমস্যার কোন কার্যকরী সমাধানের প্রেরণা পাওয়া যাবেনা। সে ইচ্ছা কল্পনাবিলাসমাত্র।

জীন ব্যারি তাঁর দুঃখভারাক্রান্ত বোনদের পরামর্শ দিয়েছেন—"চোখের পাতা কালো কর কিন্তু মনের মধ্যে আলো রেখো"—; তাঁর এই উক্তি সমস্যার কারণবোধের পরিচয় দেয়। এই বাণী আমাদের একেবারে রহস্যময় প্রাচ্যের কোলে, ভারতীয় প্রসাধনরীতির মাঝখানে এনে ফেলে। আমাদের মেয়েরা বহু সুদূর অতীত যুগ থেকে চোখের পাতা ছায়াচ্ছন্ন করবার পদ্ধতিটি শিখে রেখেছে।

সমস্ত জগতের সর্বদেশের মেয়েদের যে সমস্যা আক্রমণ করেছে ভারতে তার পরিণতি ও ফলাফলের আলোচনা এখানে উপযোগী হবে। একথা সত্য যে আমাদের দেশেও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভারতীয় সুন্দরীদের কাজলকালো চোখে প্রেমের আলো জ্বালিয়ে দেবার জন্য পুরুষের হৃদয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষার ফলেই তাদের শ্রেষ্ঠ বীর্যের অভিব্যক্তি হয়েছে। কালোচোখের এই অতলরহস্যের মধ্যে থেকেই রামায়ণ মহাভারতের উদ্ভব হয়েছে; এবং এই দুই মহাকাব্যই নিঃসঙ্কোচ নারীশক্তির এই বিশ্বজগতের ভাগনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের আদি ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে।

প্রেম কিভাবে মানবকে জীবনের বৃহত্তম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে রাধাকৃষ্ণের ভুবনবিখ্যাত স্বর্গীয় প্রেমকাহিনী তারই সুন্দর দৃষ্টান্ত। এর দার্শনিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়, কিন্তু একথা সত্য যে বৃন্দাবনের গোপীদের প্রেমঅভিসারে সাড়া দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করেছিলেন তার কাহিনী আজও অনেক দুঃখিনী চিন্তাভার-জর্জরিতা নারীর হৃদয়ে স্বর্গীয় আলোর রশ্মিপাত করে তাদের জীবন সমাজশাসনের যে সহস্র কঠোর পরীক্ষা ও যন্ত্রণায় পূর্ণ, তার কিয়দংশ লঘু করতে সাহায্য করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক আদর্শে প্রতিপালিতা যুবতীদের পক্ষেই আধুনিক জীবনযাত্রা সবচেয়ে বেশী দুঃখ ও নৈরাশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শের

স্বাভাবিক সান্ত্বনা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ অনুকরণের অবাস্তব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্থাপিত হয়ে তাদের নারীজীবনের শান্তিময় পূর্ণতার পরিবর্তে কেবল সংশয় ও অনির্দেশ্য কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এ অবস্থা বিপদসঙ্কুল ও অবাঞ্ছনীয় এবং সামাজিক ও জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে এ অতি ভয়ানক বাধা।

এ দুর্ভাগ্যদেশের তরুণদলের এই অশেষ পরীক্ষা ও উন্মত্ত প্রয়াসের আবর্তে জড়িয়ে মরবার কোন কারণ নেই। ভাগ্যচক্র যে ক্রমশ তাদের প্রেম, আনন্দ ও শান্তির পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে তা দেখবার আমাদের কোন অধিকার নেই। সামাজিক পরিণতির পথ আমাদের এমনভাবে পরিবর্তিত করে নিতে হবে যাতে আগামী-দলের জীবনে যৌবনকাল সুখশান্তিপূর্ণ হয়ে জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যারা তাদের প্রধান ও প্রাণময় অংশটুকুকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবর্জনাক্ষেত্রে পতিত হওয়া থেকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। আমাদের চিরবিস্মৃত একান্ত নিজস্ব আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে সেগুলির দ্বারা আবার আমাদের জীবনকে সম্পন্ন ও সন্নিবদ্ধ করতে হবে, আমাদের জীবনের পরিচালক শক্তিরূপে সৌন্দর্যকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মোটকথা এই যে আমাদের নারী সমাজকে বহুদিনের পরিত্যক্ত অনন্ত সৌন্দর্যের পীঠস্থলে আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। আমাদের গৃহসংসারে শান্তি ও সন্তোষ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমাদের আবার নারীমাধুর্যের ব্যবহার শিখতে ও শেখাতে হবে। এই আজকের তরুণ-তরুণীদের সম্মুখস্থ একমাত্র সমস্যা এবং এর সমাধানের উপরই জগতের ভাগ্য নির্ভর করছে।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য।

সৌন্দর্যধর্ম কি, এবং মনমুগ্ধ করবার ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহার কিভাবে হতে পারে তার উত্তর পেতে হ'লে আমাদের আগে বুঝতে হবে সৌন্দর্য কাকে বলে।

এ বিষয়ের সকল আধুনিক বিশেষজ্ঞই এই সত্য উচ্চারণ করে থাকেন যে স্বাস্থ্য-ই সৌন্দর্য এবং শরীরের যত্ন নেওয়াই তাকে লাভ করবার একমাত্র পথ। যত্নটা কিভাবে নিতে

, হবে সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ থাকলেও সকলেই একথা বিশ্বাস করেন যে শরীর মনের পরিপূর্ণ অনবদ্যতা ছাড়া অন্য কোন সৌন্দর্য বা স্বাস্থ্যের আদর্শ নেই।

আসল কথা এবার প্রকাশ হয়ে পড়ল। পাঠিকাদের তাঁদের অজ্ঞাত সারেই কিছু স্বাস্থ্যতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এতটা যখন অগ্রসর হওয়াই হয়েছে তখন আরো কিছু বলতে দোষ নেই।

যদিও শাস্ত্রে বলে যে আদমের পঞ্জরাস্থিতে নারী সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু ভগবানের সুব্যবস্থায় সেই নারীই আদমকে তার হৃদয়, মস্তিষ্ক, পঞ্জর, মুখ, সর্বসমেত গ্রাস করতে শক্তিশালিনী। মূর্তিমতী স্বাস্থ্যরূপিনী সেই প্রথমা নারীই মানুষের জীবনের পরিচালনপথের জীবন্ত প্রতীক। তারই মধ্যে তার অনিশ্চিতজীবনযাত্রার আদর্শ সঙ্গিনী পেয়েছে যার সহায়তায় সে এ সংসারেই নূতন জগত সৃষ্টি করতে পারে। আবহমান কাল থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ অবধি সকল দেশেই নারী এই প্রকৃত আসন অধিকার করে এসেছে এবং আসবে।

ভারতেও এর অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়; সুন্দরী পার্বতী মহাদেবের মহাশক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন, সাবিত্রী স্বয়ং যমকেও তাঁর স্বামী কুমার সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন। মূলতঃ প্রাচ্যপ্রতীচ্য উভয় দেশই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পুরুষের জীবননিয়ন্ত্রণে নারীশক্তির প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে, কেবল প্রকাশের ভঙ্গিটাই ভিন্ন।

আজ সব তরুণতরুণীকে এই মন্ত্রে আহ্বান করতে হবে—"নিজের মধ্যে, নিজের শক্তিতে, নিজের মাধুর্যে বিশ্বাস রাখ; নিজের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের এমন পূর্ণতা লাভ কর যাতে অন্যে তোমার মূল্য বোঝে, তোমাকে বিশ্বাস করে। …………সৌন্দর্য সাধনায় নিজের রূপ ধারণ করে নিজের বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ কর।"

কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের সহয়তায়, দেহ মনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যেই সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে।

সৌন্দর্য চিরজয়ী।

টীচার্স ক্লাব

শ্রীবাসনা সেন।

সম্মিলনই বলা হোক বা বৈঠকই বলা হোক সকলেরই একটা কিছু আছেই। কিন্তু নিতান্ত একাকিত্বের মধ্যে নীড় বেঁধে যারা দিব্যআরামে নিশ্চিন্তে অবসর সময়গুলো দিনের পর দিন ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন তাঁরা হচ্ছেন বাংলার শিক্ষয়িত্রী সমাজ। মানি তাঁদের খাটুনি অনেক সময় মানুষের যোগ্যতার অতীত, পারিশ্রমিক তেমনি কম এবং সম্মানও হয়ত ক্রমশ ততোধিক কমে আসছে। কিন্তু অসুবিধা যাদের যত বেশী সুবিধার জন্য আবেগ ত তাদেরই তত প্রবল হওয়া দস্তর। শিক্ষয়িত্রীরা কুলি অথবা নারী মজুর হলে তবু বোঝা যেত যে শিক্ষার অভাবে তাঁদের সম্বিৎ নেই। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীরা সবাই শিক্ষিতা, অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্যা এবং "মাষ্টারি" করেন বলে সকলেই পণ্ডিতম্মন্যা, তবে তাঁদের এ দুর্দ্দশা কেন? একটা কারণ হতে পারে—নারীদের ঐতিহ্য সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে প্রধানত স্বাধীনচিন্তা হতে বিবর্জ্জিত থাকায় তাদের সংস্কারগত রক্ষণশীলতা। "এই কেটে যাচ্ছে" বলতে পারলেই যেন তাঁদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হ'ল। শিক্ষয়িত্রীদের অভাব অভিযোগ আছে, সুখদুঃখত আছেই, আর না হোক হাসি-ঠাট্টা ও খেলাধূলাও ত মানুষের জীবনে একান্তভাবেই প্রয়োজন। সেকেলে পশ্চিম দীঘির উত্তর বাঁধান ঘাটও ত নেই। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁদের দাবী ও কর্ত্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথের—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী উর্ব্বশী ও তাঁরা কেউ নন। তাই স্ত্রী, কন্যা ও জননীরূপে ও তাঁদের দাবী ও কর্ত্তব্য সমাজ দেশ ও বিশ্বমানবের নিকট রয়েছে। আশ্চর্য তবুও যেন কিছুই দানা বেঁধে উঠছেনা।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (A. B. T. A.) আছে, সেখানে তাঁদের দাবী দাওয়া আছে, কর্ম্মপদ্ধতি ও বর্ত্তমান। তাঁরা সেখানে অনেক লড়েছেন, অনেক কিছু করেছেন। রাজনীতির দাবীও বোধ হয় তাঁদের থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে নারী সদস্য তেমন কেউ আছেন কিনা জানিনা, বোধ হয় নেই। শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে কাজকরা শিক্ষকরা তেমন দরকার বোধ করেন কিনা এবং করলেও তাঁদের এই নির্জ্জীব সহকর্ম্মিনীদের সজীব করে তোলবার

উপযুক্ত সুষ্ঠুপথে চলবার পাথেয় তাঁদের আছে কিনা জানিনা। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীরা যেখানে একটা ক্লাব করে একটু প্রাণ খুলে হাসতে এবং রসিকতা ভরে তাঁদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে পারেনা সেখানে A. B. T. A. কোন্ সাহসে এগিয়ে আসবে? যেখানে সাড়া পাওয়া যায় উৎসাহ সেখানেই উত্তরোত্তর আগুন হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষক সমিতির (A. B. T. A.) কর্ত্তৃপক্ষের যদি কখনও আশাভঙ্গ হয়ে থাকে দায়ী তাঁরা মোটেই নন, যদি আমরা শিক্ষয়িত্রীদের পর্ব্বত প্রমাণ নির্জ্জীবতাকে দায়ী করতে ভুলে যাই।

তাই আমাদের "টীচার্স ক্লাব" করা হয়েছে, একটু প্রাণ খুলে হাসা ও ঠোঁট টিপে দুচারটে সুখদুঃখের কথা বলার জন্য। মস্ত বড় দাবী দাওয়া আমাদের এখানে আপাততঃ নেই। তার কারণ আমরা প্রথমত মানুষের অতি স্বাভাবিক প্রাথমিক ভাবাবেগের চাহিদার উপরই দুদশজনে মিলতে চাই। এই ক্ষুদ্র মিলন গাঢ় নিবিড় হয়ে যদি একটা বিরাটরূপ পরিগ্রহ করে তবে আমাদের আনন্দের অবধি থাকবেনা, কৃতার্থতাও সেইখানে। তাই আমরা যেদিন প্রথম মিললাম তখন আমাদের কার্য্যসূচি ছিল ঠাট্টার কথা লেখা কাগজ ছোঁড়াছুড়ি করে পরস্পরকে বেয়াকুব বনিয়ে খুব কতক্ষণ পেটে খিলধরা হাসি হাসা এবং চা পান। এই জন্যই সেদিনকার অনুষ্ঠানের নামকরণ করেছিলাম—Teachers' Tea। উচ্চাঙ্গের কথাও দুএকটা উঠেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেখানকার আকাশে হঠাৎ হস্তপ্রমাণ হয়ত একখণ্ড রাজনৈতিক মেঘের আবির্ভাব দেখে আমরা হাসিমুখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলাম।

দ্বিতীয়বারের কর্ম্মসূচি ছিল আমাদের "বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক।" ছোটদের নৃত্যকলা, গীতবাদ্য, ব্রতচারী নর্ত্তন, জনৈকা বালিকা কর্ত্তৃক লৌহদণ্ড বাঁকান, হাতকে বাঁশী করে বাজান প্রভৃতি বেশ কতক্ষণ উপভোগ করা গেল। নতুন নতুন অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়াদিও হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসমাগম হয়নি তেমনটা। শিক্ষয়িত্রী সমাজ তাঁদের স্কুল-কলেজের মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসমুখে পাথর চাপা দিতে দিতে অজান্তিকে নিজেদের সব উৎস পথ রুদ্ধ করে বসে আছেন কিনা তাই ভাবছি।

সংগঠন ও প্রচারের সুবিধার জন্য সেইদিন আমরা আমাদের টীচার্স ক্লাবের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করেছি। এর সভানেত্রী হয়েছেন Principal মীরা দত্তগুপ্ত M. A. M. L. A. এবং সম্পাদিকা হয়েছেন প্রফেসার কল্যাণী সেন M. A. B. T.

এই প্রসঙ্গে আমরা একটু কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য বোধ কচ্ছি। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন—নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি থাকতে আবার একটা টীচার্স ক্লাব কেন? আমরা

বলি সমিতি সমিতিই এবং ক্লাব ক্লাবই। সমিতির পূরো কাজ ক্লাব করতে পারেনা, ক্লাবের পূরো কাজ সমিতি করতে পারেনা। সমিতি উচ্চাঙ্গের সাধনা, আমোদ প্রমোদ তার ত্রিসীমানায় নেই বল্লেই চলে। ক্লাবের স্ফূর্ত্তিরসপরিবেশনে, উচ্চাঙ্গের সাধনা তার আনুষঙ্গিকমাত্র। আমরা মনে করি এই রসপরিবেশনের ভিত্তিতেই শিক্ষয়িত্রীদের বৈঠকী করে তুলতে হবে। তবেই তাঁরা অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে পাঁচজনে বসে মাথা ঘামাবার মনোবৃত্তি অর্জ্জন করতে পারবেন। এই দিক দিয়ে আমাদের কাজ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নয়ই, বরং ভবিষ্যতের নরনারীর সম্মিলিত শিক্ষক সমিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। বড় কিছু করতে পাচ্ছিনা বলে ছোট কিছু আরম্ভ করবনা এই মনোবৃত্তির খেই পাইনা।

নারীরা পুরুষের সঙ্গে মিলে মিশে পার্কে ভ্রমণ করতে সরম বোধ করে বলে তারা নিজেদের মহিলা উদ্যান গঠন করবেনা কেন? হয়ত একদিন আসবে যখন ঐ মহিলা উদ্যানের বেড়া—লতার বেড়া ক্ষীণতর হ'তে হ'তে ক্ষীণতম হয়ে যাবে। সঙ্কীর্ণ বোরকা যারা ছাড়তে চায়না তাদের প্রশস্ত ঘেরা মাঠে ছেড়ে দিলে কালক্রমে খোলা মাঠে বেরিয়ে আসার দ্বিধা ভেঙ্গে যাবে। নতুন যখন আসে পুরাতনের পিঠে ভর করেই আসে। শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধেও একথা খাটে।

দ্বিতীয়ত আমাদের ক্লাব যদি এর আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তির গতিবেগে জাতির সর্ব্বপ্রকার উদ্যমের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করতে চায় এবং করতে থাকে তবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সত্যিকারেরভাবে আমাদের কাছে অভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে।

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের দাবী দাওয়ার মধ্যে বাস্তব কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য যদি শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ শিক্ষয়িত্রী এবং অধ্যাপিকাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে না করেন। তা ছাড়া নারীদের কায়েমী স্বার্থ বলে বিশেষ কিছু না থাকাতে পুরুষ প্রধান প্রতিষ্ঠান নারীদের প্রভাবে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও সাম্যভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। অবশ্য এ সবই ভবিষ্যতের কথা। আমাদের ক্লাবের অনেকেরই মনে এই দুটি উদ্দেশ্যই রয়েছে। আমরা ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ করেছি এবং বিনা আড়ম্বরেই চালিয়ে যাব। যাঁরা আমাদের বন্ধু তাঁদের ভয় পাবার কিছুই নেই, তাঁদের পাশে আমরা সর্ব্বদাই আছি, অবশ্য খুব ক্ষুদ্রভাবে।

উপসংহারে শিক্ষয়িত্রীদের কাছে আমাদের প্রার্থনা—আপনারা আসুন, সবাই মিলে আমোদ আহ্লাদ হাসি-ঠাট্টা করা যাক, সম্মিলিতভাবে পরস্পরের সুখদুঃখের কথা বলুন এবং যাঁরা পারেন আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে চলে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা উন্নত করে তুলুন এবং জনসেবার কাজও কিছু কিছু হাতে নিন। আমরা যথাসাধ্য আপনাদের সেবা করে কৃতার্থ হব।

মেয়েদের খবর।

মার্চ্চমাসে নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা শাখা সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে ধার্য হয় দক্ষিণ কলিকাতায় কর্মজীবী মহিলাদের কোন বাসা বা বোর্ডিং নাই এবং এরূপ একটি বাসা স্থাপনের ভার মহিলা সম্মেলনের নেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে আয়ব্যয়ের একটি খসড়া প্রস্তুত করে তাকে কার্যকরী করার ভার একটি "সাব-কমিটির" উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মহিলাসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যের আশা পেলে আগামী জুলাই মাস থেকে ওই বাসা খোলা যেতে পারে। বাসার মাসিক চার্জ ১৬৷৷০ ভর্তি ফি ২৲ ও ডিপোজিট ৮৲ দিতে হবে। যাঁরা উক্ত বাসায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাঁরা ৩০শে জুনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করবেন—

শ্রীঅপর্ণা সেন, ৯১।১১এ টালিগঞ্জ রোড।

* * * *

"এ-আর-পি" ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই আমাদের অভ্যাসগত হয়ে পড়েছে, অথচ কেন যে এড়াতে হবে তা আমরা আলোচনা করে দেখতে পরাঙ্মুখ। যাঁরা সামরিক আয়োজনে সাহায্য না করবার জন্য একে এড়িয়ে চলেন তাঁরা জানুন যে এর মধ্যে তাঁদের ধর্মের হানিকর কোন প্রস্তাব নেই। ভারত সরকার "এ-আর-পি" ব্যাপারে কিছু অর্থব্যয় করে থাকেন, সেই অর্থ সাধারণের, বাঙালীরা যদি তার ব্যবহার না করেন তবে তাঁদের অর্থদ্বারা ক্রীত "এ-আর-পি" সরঞ্জাম অন্য জাতি ব্যবহার করবে। এইভাবে

স্বেচ্ছান্ধ হয়ে আমরা বহু ক্ষতি স্বীকার করে এসেছি। এখন চোখ খোলবার সময়। যাঁরা সরকারী কাজে ধরা পড়বার ভয়ে "এ-আর-পি" বিরোধী তাঁদের জানা ভাল যে এ কাজ সম্পূর্ণ বেসরকারী ও স্বাধীনভাবে করা যায়। যাঁরা ভারতে যুদ্ধের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলে এ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন তাঁরা জানুন যে যুদ্ধের আশঙ্কা বিনাও এ শিক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে উপযোগী ও প্রয়োজনীয়। কলিকাতায় মহিলাদের "এ-আর-পি" দল গঠনের চেষ্টা হচ্ছে। যাঁরা এ সম্বন্ধে জানতে চান ১৩নং তারকদত্ত লেনের ঠিকানায় শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি লিখুন।

* * * *

গত শীতকাল থেকে টীচার্স ক্লাব বলে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা চলছে গত ২৬শে এপ্রিল, শনিবার, তার একটি বিশেষ অধিবেশনে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সিনেমাযোগে—"স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্যলাভের পথ"—এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আনুমানিক ৫০।৬০ জন মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৫৪নং বকুলবাগান রোডের ঠিকানায় শ্রীবাসনাসেনের কাছে এই ক্লাবের সব খবর পাওয়া যাবে।

আমাদের কথা

"মেয়েদের কথার" দ্বিতীয়সংখ্যা প্রকাশিত হল। এর বিষয়ে নানারূপ সমালোচনা আমাদের কর্ণগোচর হয়েছে। অনেকে পত্রিকাটির ক্ষুদ্রতা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধের বাজারে এই প্রথম প্রচেষ্টা বহু ব্যয়সাধ্য হয়েছে বলেই বাধ্য হয়ে আপাতত আমাদের নানা উচ্চাশা দমন করে অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ আকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তবু দ্বিতীয় সংখ্যার কলেবর প্রথম সংখ্যার চেয়ে বড় করতে পেরেছি, আগামী সংখ্যা থেকে ছবি দিতে আরম্ভ করব ও পূজাসংখ্যা থেকে এর সম্পূর্ণ নূতন আকার ও প্রচ্ছদপট দিতে পারবার আশা করছি। গ্রাহিকা ও পাঠিকারা সহানুভূতির সঙ্গে প্রতীক্ষা করলে ঠকবেন না এই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের রাজনৈতিক মতামতের বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর এই যে আমরা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনপ্রকারে সংশ্লিষ্ট নই।

আমরা নারী, এই আমাদের একমাত্র পরিচয়। নারীসমাজ ভারতের অবনত ও অনুন্নত শ্রেণীসমূহের মধ্যে অন্যতম, তাই আমাদের কাজ দলবদ্ধ হয়ে আমাদের "শ্রেণীস্বার্থ" রক্ষা করবার জন্য জাগ্রত হওয়া, জ্ঞানলাভ করা। আমরা মা তাই শিশুপালন ও শাসনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা গৃহিণী, তাই সংসারের সুব্যবস্থার ও গৃহকে শ্রী ও শান্তিমণ্ডিত করে তুলবার বিষয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করে উপকৃত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা নারী, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা আমাদের চরিত্রের অপরিহার্য দুর্বলতা তাই রূপচর্চা ও ফ্যাশান সম্বন্ধে যে আমরা আলোচনা করব না এমন কথা হলফ্ করে বলতে পারিনা।

সর্বশেষে কিন্তু সর্বোপরি আমরা মানুষ, তাই আমাদের পত্রিকায় হাল্কা ও গভীর নানা বিচিত্র ভাবপূর্ণ গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। এর মধ্যেও আমরা একটি বিশেষত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করব। এ পত্রিকায় সর্বশ্রেণীর, সর্বমতাবলম্বী মেয়েদের মতামত (অবশ্য যদি তার প্রকাশ আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক না হয়) পক্ষপাত শূন্য ভাবে প্রকাশ করব। নানা আলাপ-আলোচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে "মেয়েদের কথার" পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করবার জন্য আমরা মেয়েদের আহ্বান করছি।

ভারতের বিভিন্নস্থানের নারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ ছাপা আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকারা যদি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রবন্ধাকারে লিখে আমাদের কাছে পাঠান তাহলে আমরা প্রকাশ করব, ও তাঁদের মাসিক অনুষ্ঠানের বিবৃতি বা বিজ্ঞাপন "মেয়েদের খবর" এই অংশে ছাপাব।

বৈশাখের প্রতিযোগিতার উপযুক্ত উত্তর এখনও পাইনি বলে জ্যৈষ্ঠ মাসেও সেটা খোলা রাখলাম, আশা করি এবার বিফলমনোরথ হবনা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের পরিচয় দেবার জন্য আষাঢ় সংখ্যা থেকে পত্রিকার "পরিচয়" অংশ প্রকাশিত হবে। এই অংশে বইএর ও সিনেমার সমালোচনাও থাকবে। এ সম্বন্ধে পত্রিকার সম্পাদিকার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করবেন।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।৴৹ আনা; ষাণ্মাষিক মূল্য ১।৹ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৹ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৹ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। **গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।**

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

Printed at Bhowanipur Art Press, 82-A, Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar ...

প্রথম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

মেয়েদের কথা

মেয়েদের কথা

সম্পাদিকা—শ্রীকল্যাণী সেন, এম,এ,বি,টি

বার্ষিক ৩৲

আষাঢ়

প্রতি সংখ্যা ।

পি, সরকারের দাঁতের মাজন

(দাঁত ও মাড়ীর জন্য)

ইহা আয়ুর্ব্বেদ মতে দেশীয় গাছ গাছড়া ও শিকড় প্রভৃতির সংমিশ্রণে প্রস্তুত।

ইহা ব্যবহারে দাঁত শুভ্র ও মাড়ী সুদৃঢ় ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

ঠিকানা—৫০ডি সদানন্দ রোড, কালীঘাট।

প্রত্যেক ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

লেক ডেয়ারী

১ নং পরাশর রোড (লেক মার্কেটের পূর্ব্বে)

মাখন—রুটি-ঘি তৈল

প্রত্যহ প্রাতে মেসিন প্রস্তুত রুটির সহিত আমাদের স্নিগ্ধ মাখন খাইলে আপনার সৌন্দর্য্য দেখে লোকে অবাক হবে।

ফাউণ্টেন্ পেনের শ্রেষ্ঠ কালি

১৯২৪ সালে প্রথম —

১৯৪১ সালেও অগ্রণী

শ্রেষ্ঠতায় আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ— জননায়ক সুভাষচন্দ্র, বৈজ্ঞানিক ডাঃ এইচ, কে, সেন, সাংবাদিক রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই

একমত

সূচি পত্র—আষাঢ় ১৩৪৮

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | আষাঢ়—১৩৪৮ | ৩য় সংখ্যা

অনির্ণেয়।

শ্রীপুষ্প মুখোপাধ্যায়।

দূর গিরিপথে নির্ঝরধারা সিন্ধুরে চিনে লয়,
আকাশ কেমন ধরার আঁখিতে ধরা দেয় সহজেই
দিনে আর রাতে, মধুসন্ধ্যাতে মানুষেই বসে রয়—
কিছুতে তাদের চেনার সীমানা নেই !

কত দুখ আসে ঘন বেদনায় প্লাবিয়া,
কত সুখদোলা দোঁহাকার প্রাণ দোলায়ে
শিহরণ তুলে দুটি দেহতট ছাপিয়া
ভিতর বাহির সব কিছু ভেদ ভোলায়ে।

আবার আবার প্রেতের মতন মিলনের সেতু নাশিয়া
বিচ্ছেদ নদী ওঠে খল খল হাসিয়া !

হৃদিতরঙ্গ চাহে উচ্ছ্বাসে আবরিতে হৃদিতটে—
চোরা বালু কোথা সে স্রোতে লুকায়, শুকায় সে উচ্ছ্বাস।
যাহা চাওয়া যায় তারি বিপরীত বারেবারে শুধু ঘটে,
মিলনবাসরে দেখা দিয়ে যায় বিধবা সর্বনাশ।

চাহি সব দিতে, দেওয়া কেন যেন হয়না ;
চাহি পূরো পেতে, ফাঁক ভরেনাকো কিছুতে ;
বলিবারে হই আকুল, তবুও বোবামন কথা কয়না ;
আগুসরি যাই বরণ করিতে, তবু পড়ে রই পিছুতে !

ছোঁওয়া পাওয়া হায় মানুষে হয়না বুঝি,
ফুরাবেনা তবু জীবনে মরণে শতবার খোঁজাখুঁজি।

পরীক্ষার হলে রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীনলিনী চক্রবর্তী।

পাঠিকারা নাম দেখে অবাক হয়ে যাবেননা, এটা গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়, রচনা নয়, কল্পনা নয়, পরীক্ষা দিতে বসে ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি ধরণের কথা লিখে থাকে তার উদাহরণ !

প্রশ্ন—ব্যাখ্যা কর:—

"শুনে মহারেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে,
বলি তারে—"পাজী, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে !"
ধীরে চলে যায়, ভাবি "গেল দায়," পরদিন উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।"

(পুরাতন ভৃত্য)

উত্তর :— রবিবাবুর বড় বড় ভৃত্যেরা ছুটিয়া যায় ও রবিবাবু তাহাদের টিকি ধরিয়া টানিয়া আনেন। তাহারা আসিয়া রবিবাবুর হুঁকাটি বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। .. (৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

"আজকালকার পারিবারিক জীবন"

(বেতারের সৌজন্যে)

শ্রীলীলা মজুমদার।

লোকে ব'লে থাকে পৃথিবীর আর সমস্ত দেশের দিন দিন পরিবর্ত্তন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই বাংলা দেশটাই তা'র পুরোন চালচলন রীতি-নিয়ম আঁকড়ে পড়ে আছে। কিন্তু একথা কোন দেশের সম্বন্ধেই বোধ করি বলা যায় না। পৃথিবীর প্রথম প্রতিষ্ঠান, মানুষের সামাজিক জীবনের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পারিবারিক জীবন; এই পারিবারিক জীবনও আমাদের গত চল্লিশ বছরে কিরকমভাবে বদ্‌লে গেছে ভাব্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। সেই আদ্যিকালের বাপ-মা ছেলে বৌ মেয়ে জামাইয়ের সম্বন্ধ সবই রয়েছে, সেই উৎসব অনুষ্ঠান পুজোপরব সবই রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ একরাশী নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সেকালের বাঙ্গালীদের সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রই ছিল আলাদা। মেয়েরা থাক্‌তেন অন্তঃপুরে রাঁধাবাড়া ঘরকন্না নিয়ে, আর পুরুষেরা থাক্‌তেন বাইরে, আর সেখান থেকেই পরিবারের সব দায়িত্বের কাজই করতেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা, এমন কি সব সময়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা পর্য্যন্ত নিয়ম ছিলোনা। পরিবারের মধ্যে কর্ত্তার কথার উপর কথা বলা, কি ব্যবস্থার উপরে ব্যবস্থা করা কেউ ভাবতেও পারতো না। এখন এই সহজ ব্যবস্থা আর চলে না। কারণ শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, নির্ব্বিচারে বাপ জ্যাঠার মতকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মেনে নিতে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা নারাজ। তারা এখন অন্যান্য দেশের ভালোমন্দ দেখ্‌ছে, আর যে সনাতন নিয়মসব বহু পুরুষ ধ'রে আমাদের দেশে চলে আস্‌ছে সেগুলিকে আর অকাট্য অপরিবর্ত্তনীয় ব'লে মান্‌তে চাচ্ছে না। তাদের চলাফেরা শোয়াবসা খাওয়াপরা সবই বদ্‌লে গেছে। মেয়েরা আর অন্তঃপুরে থাক্‌তে চাচ্ছে না, কাজেই যে সমস্যাগুলো নিতান্তই পারিবারিক ছিলো, বাড়ীর কর্ত্তাই যা'র সমাধান ক'রে দিতে পারতেন, এখন সেগুলো সামাজিক সমস্যায় দাঁড়িয়েছে, কর্ত্তারা আর অত সহজে সেগুলোর ব্যবস্থা করতে পারছেন না। তাই নিয়ে

দুঃখ ক'রে লাভ নেই, এমন কি এতে ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তাই নিয়েও মতভেদ আছে। তবে একথা সত্যি যে, যে জিনিষটা সহজ সেটাই যে শ্রেয়ঃ তার কোন প্রমাণ নেই। যে সময়ে বাপজ্যাঠা ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, খাওয়াপরা থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের বিবাহ, তাদের পুত্রকন্যার বিবাহ, এমন কি তা'দের ধর্ম্মবিশ্বাস পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে দিতেন, আর বয়সে বড়, কাজেই অভিজ্ঞতায়ও বড় ব'লে তাঁদের কথা ছেলেমেয়েরা বিনা বাক্যে মেনে নিতো, পারিবারিক জীবন হয়তো তখন নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো, কিন্তু শ্রেয়ঃ ছিলো কিনা সন্দেহ, এমন কি মানসিক শান্তি বেশী ছিলো কিনা তাও সন্দেহ। কারণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে সেই চিন্তা প্রকাশ না করলে মানুষের বুদ্ধির ক্ষতি হ'বেই, সৎসাহসের ও আত্মনির্ভর শক্তির হানী হবেই। সমস্ত জাতটাই দুর্ব্বল হ'য়ে যা'বে, যেমন আমাদের বাঙ্গালীজাত হ'য়েছে। অতএব সেকালের মতন আর আজকালের ছেলেমেয়েরা বাধ্য নয় এ নিয়ে দুঃখ করা উচিত নয়। বরং আজকালকার বাপমায়ের পারিবারিক দায়িত্ব এইজন্য বেড়ে গেছে, যে ছেলেমেয়েকে এমন শিক্ষা ও সংযম দিয়ে তা'দের মানুষ ক'রে দিতে হ'বে, যা'তে ভবিষ্যতে যখন তারা বাঁধাধরা পথে না চলে নিজের স্বাধীন ভালোমন্দ বিচার অনুসারে, স্বাধীনভাবে চল্‌বে, তখন সমস্ত বাংলাদেশের অনিষ্ট না হয়। কারণ এক আধজন বড়লোক দিয়ে দেশের ভালোমন্দ হয়না, লক্ষ লক্ষ সাধারণ পরিবারের সাধারণ ছেলেমেয়ের রোজকার সাধারণ কথাবার্ত্তা ও সাধারণ কাজ দিয়ে হয়।

এটুকু বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আমাদের জীবন থেকে অনেকখানি সরলতা চ'লে গেছে। আমরা সৌখীন হ'য়ে গেছি, অনেক কৃত্রিম জিনিষকে অযোগ্য আদর দিচ্ছি। খুব সম্ভব একটু স্বার্থপরও হ'য়ে গেছি। নিজেদের নিয়ে থাক্‌তে চাই। অন্য দেশের মতন সামাজিক কাজতো করিই না, অনাথ আশ্রম কি দরিদ্রসেবা, কি বিধবাশ্রম সমস্তই সন্ন্যাসী ও মিশনারিদের কাজ ব'লে বহুদিন থেকে ধ'রে নিয়েছি। আবার আমাদের পিতৃপুরুষদের যে পারিবারিক দায়িত্ব ছিলো, ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যে দায়িত্ব এড়ান অসম্ভব ছিলো, একান্নবর্ত্তী পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়ে ছাড়া পরিবারের আর সকলের প্রতি সেই দায়িত্ব বোধটাও দিন দিন কমিয়ে আনছি। আমরা আরামপ্রিয় ও বিলাসী হ'য়ে যাচ্ছি। এতে আমাদের স্বাধীনভাবে চল্‌বার ইচ্ছাটা অনেক সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। স্বাধীনভাবে চলার উদ্দেশ্য যেন কেবল নিজের আরামটুকুই না হয় এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।

এ কথা আমাদের মেয়ে মহলে আরও বেশী ক'রে খাটে। আমরা অধিকাংশই খাওয়াপরার জন্য পরিবারের পুরুষদের উপর নির্ভর ক'রে থাকি; তার বদলে তাদের প্রতি আমাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে বৈকি। তারা যেমন আমাদের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, আমাদের ও তাদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া উচিত। স্বাধীন ও শিক্ষিত মেয়েরা যেন ভুলে না যায় যে সেবার মতন মহৎ ধর্ম্ম আর কিছু নেই। পরের সেবা করা, পরিবারের সেবা যত্ন করা, দাসীর কাজ নয়, সৌভাগ্যবতী নারীর কাজ।

আমাদের ঠাকুরমারা বিছানাথেকে উঠ্‌তেন সবার আগে, নিজেদের কাজ সেরে ঘর পরিস্কার ক'রে রান্নাঘরে ঢুক্‌তেন। ফেন্‌সা ভাত হোত, কেউ খেতো মুড়ি মুড়কি ও দুধ। সে পাট সেরে আবার দুপুরের রান্নার পাট আরম্ভ হোত। বাড়ীর চাকরদের পর্য্যন্ত সন্তানের মতন যত্নে খাইয়ে তবে মেয়েরা খেতেন। তারপর গা ধুয়ে বিশ্রামের আর কতটুকু সময় পেতেন? বিকেলের জল খাবারের যোগাড় করতে হোত, তা'তে আবার রাত্রের রান্নার সময় হ'য়ে যেতো। সকলকে খাইয়ে দাইয়ে, নিজেরা খেয়ে, গা ধুয়ে গভীর রাত্রে শুতে যেতেন। তাঁরা ছিলেন সেবা ও নিষ্ঠার আদর্শ। কিন্তু তাঁদের জীবনে তাঁদের ন্যায্য সুখ ও আরাম টুকুও তাঁরা পেতেন না, ৩৫ বছর বয়সে তাঁরা বুড়া হ'য়ে যেতেন, শরীর ভেঙ্গে পড়তো। তাঁদের মতন কঠিন জীবন আমাদের জন্য চাই না কিন্তু সেই সেবা ও নিষ্ঠার একটুখানি স্থান আমাদের জীবনে দরকার। আমরা সকালে উঠে চা রুটি খেয়ে পড়তে বসি, স্নান ক'রে ঠাকুরের রান্না ভাত খেয়ে স্কুল কলেজে যাই, কিম্বা গল্পের বই পড়ে ও ঘুমিয়ে দিন কাটাই। স্কুল থেকে ফিরে এসে খেয়ে উঠে বিশ্রাম করি কি বেড়াতে যাই, সন্ধ্যেবেলা আবার খেয়ে দেয়ে, পড়াশুনো ক'রে ইচ্ছে মতন শুতে যাই। আর যারা পড়াশুনো করি না, তাদের তো আয়েসের আর অন্ত নেই, অন্ততঃ যা'দের ঝি চাকর রাখবার মতন অবস্থা। আমার সব কথাই একটু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের বিষয়ে হচ্ছে, দরিদ্রের কষ্ট এ যুগে বাড়েওনি কারণ বাড়বার জায়গা নেই, আর কমেও নি কারণ কমাবার উপায় করা হয় নি। অবিশ্যি লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে, আর যে লেখাপড়া শিখে ক্লান্ত হ'য়ে যাচ্ছে তার অন্যের সেবার সময়ই বা কোথায়, আর সাধ্যই বা কোথায়। তবে ঐ লেখাপড়া শেখাটা যদি শেষ অবধি আত্মসুখীই থেকে যায়, নিজের ছাড়া অন্য কারু কাজে না লাগে তবে অনুতাপের কথা। অর্থ দিয়ে পরের সেবা করবার ক্ষমতা আমাদের গরীব দেশে আর ক'জনার আছে,

কিন্তু সেবা ও সহানুভূতি সবাই দিতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে এই সেবা ও সহানুভূতি আদর্শ ছিলো। তার কুফল হচ্ছিল যে যদিও পরিবারের সকলেরই আরাম ও খাওয়াপরার সমান অধিকার ছিলো, যে অলস সে নির্ব্বিকার ভাবে তার দায়িত্ব কর্ম্মিষ্ঠের উপর তুলে দিতো, একজনের অনিষ্ঠ ক'রে আরেকজন আরাম করতে পারত। এখন ব্যক্তিগত দায়িত্বের দিন এসেছে, প্রত্যেকেই নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রের জন্য দায়ী হয়; এতে হয়তো পারিবারিক বন্ধন একটু আল্গা হয়ে গেছে কিন্তু দায়িত্বজ্ঞান বেড়েছে।

দু এক পুরুষ আগে পারিবারিক জীবন ছিলো কানা, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কোন আমোদে কি কাজে একসঙ্গে যোগ দিতে পারতো না। এখন একসঙ্গে খাওয়া, বেড়ানো, বায়োস্কোপ দেখা ছাড়াও, একটা গভীরতর চিন্তার আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক আবহাওয়াটা আরও পরিস্কার ও সুন্দর হ'য়েছে। অধিকাংশ পরিবারেই আজকাল ছেলে বুড়ো ও মেয়েরা সবাই মিলে আধুনিক নানা সমস্যা আলোচনা ক'রে থাকেন, এতে একসঙ্গে কাজকরবার ও আনন্দের সঙ্গে আনন্দের অন্তরঙ্গতার সহায় হয়। একসঙ্গে খাওয়াপরা ও সুখদুঃখ অনুভব করার মতন একসঙ্গে চিন্তা করারও একটা উপকারিতা আছে।

পরিবারের প্রত্যেকেই নিজের মত প্রকাশ করতে চায়, আজকালকার পরিবারের এটা একটা বিশেষত্ব। আমাদের মারা ছোটবেলায় শুনেছিলেন যে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখ্‌তে পাওয়া যাবে কিন্তু শোনা যাবে না। এই আদর্শ আর চল্‌ছে না, আমাদের ছেলেমেয়েরা এমন কোন আজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত নয় যেটার একটা যুক্তি সংগত কারণ না দেখানো যায়। এর কারণ এদের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের থেকে শীগ্‌গিরই পাক্‌ছে; এতেও দুঃখের কোন কারণ নেই; কারণ এমন কোন আজ্ঞা দেবার আমাদের অধিকার নেই যার একটা যুক্তি সংগত কারণ না দেখাতে পারি। ভাবের যুগ শেষ হ'য়ে গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হয়েছে। অযথা কথা কি কাজের আর স্থান নেই।

আমাদের পারিবারিক জীবন এতে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে না, বরং দুই পুরুষের মাঝের ব্যবধানটা এত কমে যাচ্ছে। পারিবারিক সম্বন্ধ অনেক সরল ও স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে। এর আগে আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বাপ ও ছেলের, মা ও মেয়ের মধ্যে এমন একটা গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেউ ভাবতেও পারতো না। পুত্রকে ও কন্যাকে

শাসন করা শুধু ততদিন বাপমায়ের কর্ত্তব্য যতদিন তাদের নিজেদের বুদ্ধি পাকে নি, তারপর তাঁরা বন্ধুভাবে পরামর্শ দেবেন মাত্র, ছেলেমেয়েকে আজ্ঞাধীন মনে করবেন না। যতদিন ছেলেমেয়ে নাবালক আছে ততদিন ধরে নেওয়া যেতে পারে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয় নি, তখন তাদের শাসন করা, ও দরকার হ'লে দমন করা বাপমায়ের ও গুরুজনের কর্ত্তব্য; কিন্তু তারপর তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের হাতে, আর জোর করা চলে না। এই জ্ঞান যখন আমাদের সকল বাপমায়ের হবে তখনই দেখা যাবে বাপ ও ছেলে, মা ও মেয়ের মধ্যে প্রাচীন রেষারেষির ভাবটা কমে যাবে। মনের প্রসারতা চাই, নতুন যুগের নতুন রীতির উপর খানিকটা বিশ্বাসও চাই। আমাদের আধুনিক বাঙ্গালী পরিবারে আস্তে আস্তে এই প্রসারতা আর এই বিশ্বাস আসছে। ছেলেমেয়েরা যে সব সময়ে বাপমায়ের হুকুম ও পরামর্শ মানছে না, তার কারণ নয় যে তাঁদের উপর তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি কমে গেছে, বরং তা'তে প্রমান হ'চ্ছে তাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি বেড়েছে। আর এই বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য তারা বাপমায়ের কাছে অনেকসময়েই নিজেদের সত্যিকারের ঋণী মনে করে, তাঁরা তাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন ব'লে।

কেবল বাপ ছেলে ও মা মেয়ের মধ্যে নয়, এই স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করবার ইচ্ছা স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যেও এসেছে। স্ত্রীরা আর সব সময়ে স্বামীদের বাধ্য থাকছে না; তাদের নিজস্ব একটা জীবন গড়ে তুলছে। এতেও ক্ষোভের কোন কারণ নেই, কারণ বয়স্কা ও শিক্ষিতা স্ত্রীর স্বামীর সম্মান ও আত্মসম্মান রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে, কাজেই তারা স্বামীর অধীনা না থেকে সঙ্গিনী হ'য়ে দাঁড়ালে আনন্দেরই কথা। মতভেদ হ'লেই যে মনভেদ হ'বে, ঝগড়া ঝাটি হ'বে একথা সত্য হ'লে বুঝতে হ'বে সে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ বড় ঠুনকো; বাস্তবিক পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নেই। আজকালকার স্ত্রীরা হয় তো অনেকসময়েই সেকালের মেয়েদের মতন রন্ধনপটু ন'ন ও অত সহজেই তুষ্ট হ'ন না। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না আজকাল মানবজীবনেরই চারদিক দিয়ে চোখ কাণ ফুটে গেছে। মেয়েদের ও সৌন্দর্য্য বোধ ও জ্ঞানপিপাসা আছে, তা'কে চরিতার্থ করতে হ'লে আর কয়েকটা জিনিষ ত্যাগ করতে হয়েছে। জীবনের বাহুল্য বেড়ে গেছে, সভ্য হ'লে যেমন সব মানুষের জীবনেরই বাহুল্য বাড়ে। আগে যেটা না হ'লেও চলতো, এখন সেটাকে অতি প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়। আগে যেটাতে কোন অধিকার ছিলোনা,

এখন সেটাকে ন্যায্য প্রাপ্য ব'লে মনে হয়। এর বদলে আধুনিক স্ত্রীরা স্বামীদের ও পরিবারের যথার্থ বন্ধু, ও বিপদের সময় যথার্থ সহায় হচ্ছেন। এমন কত পরিবার দেখা যায় যেখানে কোন কারণে স্বামীর আয় বন্ধ হয়ে গেছে কিম্বা কমে গেছে, সেখানে স্ত্রী খুসিমনে উপার্জ্জন ক'রে পরিবারের অর্দ্ধেক কষ্ট কমিয়ে দিচ্ছেন। এতকাল মেয়েরা যতই কাজ করুন না কেন শেষ অবধি স্বামীদের আশ্রিতাই ছিলেন, এখন বিপদের সময়ে দরকার হ'লে তাঁরাই আশ্রয় হয়ে দাঁড়ান। এতে পারিবারিক সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়া দূরের কথা আরও নিগূঢ় হ'য়ে দাঁড়ায়।

আমাদের পারিবারিক জীবনে আরেকটা গুরুতর পরিবর্ত্তন এসেছে যেটা সমস্ত মানব জাতির মধ্যেই এসেছে, আর যে জন্য অনেকে বিশেষ চিন্তিত ও ভাবিত হচ্ছেন। সেটা হচ্ছে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসিন্য। এতদিন আমাদের পারিবারিক জীবনে ধর্ম্মের একটা প্রধান স্থান ছিলো। অনেক হিন্দু পরিবারেই নিজেদের ঠাকুর ও তার নিত্য সেবার ব্যবস্থা ছিলো। পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানই প্রায় ধর্ম্মের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো না, ভগবানের নাম না নিলে কোন কাজই সফল হ'বে না, এই রকম বিশ্বাস মানুষের ছিলো। বিলেতেও চল্লিশ বছর আগে নিত্য পারিবারিক উপাসনা ও খাবার আগে ভগবানের নাম নেওয়া রীতি ছিলো। এখন আস্তে আস্তে এমন একটা ঔদাসিন্য এসেছে যে কোন কোন ধার্ম্মিক পরিবার ছাড়া অধিকাংশ পরিবার অনেকটা ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। বিবাহাদি কাজে অবিশ্যি ধর্ম্মের প্রধানতা এখনও রয়েছে, কিন্তু অনেক জায়গায় সেগুলিকেও কুসংস্কার বলা হয়, এবং যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা হয়। আমি অনেককে বলতে শুনেছি—এই যে জগৎজোড়া ঔদাসিন্য এসেছে এতে পারিবারিক শান্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে, কর্ত্তব্যবোধ একেবারে চলে যাবে। এর কিন্তু কোন কারণ নেই ; আমার বোধ হয় আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের প্রভাব অনেকটা কমে গেলেও, পারিবারিক জীবনের কোন অনিষ্ট হ'বে না, যতদিন মানুষের মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ আর জীবের প্রতি দয়া আছে। ভগবানকে মানব কি না, আর যদি মানি তা হ'লে কি ভাবে মানব, এ হ'ল নিতান্ত আমার নিজের মনের কথা, আমার ভালো মন্দ বিচার করবার শক্তির মতন। অন্যের প্রতি আমার ব্যবহারে যতদিন সততা, ন্যায়, সহানুভূতি ও ক্ষমার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পারিবারিক সম্বন্ধ নষ্ট হ'বার কোন ভয় নেই।

পৃথিবীর সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সব থেকে পুরোন, সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে রক্তসম্পর্ক সব থেকে প্রাথমিক। ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে রক্ত হচ্ছে জলের চেয়ে

বেশী গাঢ়। অর্থাৎ পাতান সম্পর্ক থেকে রক্ত সম্পর্কের টান বেশী। এই রক্তের টান আমাদের অনেক সময়ে স্বার্থপর করে দেয়, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়। পরের জন্য যেটা করতে প্রস্তুত থাকি না আত্মীয়ের জন্য সেটা ক'রে থাকি। আবার তেমনি এই রক্তের টান আমাদের পরের প্রতি কর্ত্তব্য মনে করিয়ে দেয়, স্নেহ করতে শেখায়, স্বার্থত্যাগ করতে শেখায়। মানুষ একা থাক্‌তে চায় না, সুখে দুঃখে সঙ্গী খোঁজে, আর নিজের পরিবারের মধ্যে সেই সঙ্গী তৈরী করা অবস্থায় পায়। পারিবারিক সম্বন্ধ এক কথায় ফেলে দেওয়া যায় না, পরিবারের সকলের সঙ্গে সকলের রক্ত সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু এক সঙ্গে বাস করার, এক সঙ্গে দুঃখ ও আনন্দ অনুভব করার যে গূঢ়তর সম্বন্ধ সে ইচ্ছা করলেই ফেলে দেবার নয়। মানুষ দেখে শুনে বেছে নিয়ে বন্ধু করে, কিন্তু যে পরিবারে সে জন্মায় সেটা পছন্দ ক'রে নেবার তার কোন ক্ষমতাই নেই। এ জন্য নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে দোষও দেওয়া যায় না, কৃতজ্ঞতাও জানান যায় না। বড় জোর নিজের মনের মতন্ ক'রে গড়ে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে ; কিন্তু এই গড়ে নেওয়ার সঙ্গে পরিবারের আর সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমন ভাবে জড়ানো, যে প্রত্যেকের সম্মতি পাওয়া একরকম অসম্ভব। এই কারণেই পারিবারিক কোন নিয়ম বদ্‌লাতে এত সময় লাগে, যতদিন না কালের গতিকে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায় ততদিন অর্থহীন অনুষ্ঠান হ'য়ে অনেক নিয়ম টিকে থাকে। যেমন ভাসুরের মুখ না দেখা, অবস্থায় না কুলোলেও তত্ত্ব পাঠানো ইত্যাদি। কতকগুলো নিয়ম ভালো না লাগ্‌লেও ঝগ্‌ড়া ঘটাবার ভয়ে মানুষ পালন ক'রে থাকে। পারিবারিক সম্বন্ধেও এই রকম বহু লৌকিকতা এসে গেছে। এই সব অর্থহীন নিয়ম অনেকে ছেঁটে দিচ্ছেন। এমন কি অনেক ইয়োরোপীয় উপন্যাসে দেখি পারিবারিক জীবনকে কয়েদ্ খানার তুল্য ব'লে আক্রমণ করা হয়েছে, মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির পথে বাধা বলা হয়েছে। ইয়োরোপে অনেকে ঘরকন্না তুলে দিয়ে হোটেলে বাস করেন, অবিশ্যি তাঁদেরও একটা অন্য ধরণের পারিবারিক জীবন আছে, সংসারের মধুর ঝঞ্ঝাট থেকে বিচ্ছিন্ন করা একটা পারিবারিক জীবন। কিন্তু আমাদের দেশে আজও আমরা পরিবারকে আঁকড়ে থাকি। আমাদের মেয়েরা যখন বিয়ে করে, একটা মানুষের সঙ্গে তার সমগ্র পরিবারবর্গকে গ্রহণ করে। পারিবারিক জীবন আমাদের কাছে এখনও আদরের জিনিষ ; কি ক'রে পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিকতা সরলতা ও মধুরতা রক্ষা হ'বে তাই আমরা নানান্ ভাবে চেষ্টা করি। অনেক অনুষ্ঠান আমরা রেখেছি যে গুলি নিষ্প্রোয়োজন হলেও যাতে অনেক মাধুর্য্য আছে, যেমন আমাদের জামাই ষষ্ঠি,

ভাই-ফোঁটা। ইয়োরোপে এমন গূঢ় পারিবারিক সম্বন্ধ কোন দিন ছিলোওনা, এখনও নেই তারা Aunt, Uncle, Cousin, Sister-in-law বলে ছেড়ে দেয়। আমরা Aunt বল্‌তে কাকিমা না জ্যেঠিমা না মামিমা না মাসিমা না পিসিমা পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিই। Sister-in-lawতে আমরা খুসি নই, আমরা বৌদি না শ্যালিকা না ভাদ্দরবৌ পরিষ্কার ক'রে দিই। কারণ আমাদের সম্পর্কগুলিকে বেশী ভারী ও প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি। তা'রা পরিবার বল্‌তে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে বোঝে, আমরা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এক বিরাট ব্যাপার বুঝি। অবিশ্যি একথাও ঠিক, একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট স্বাধীন পরিবার গড়ে উঠ্‌ছে অনেকটা ইয়োরোপীয় ধরণের। আরও দু এক পুরুষ বাদে আমরাও হয়তো পরিবার বল্‌তে ছোট পরিবার টুকুই বুঝ্‌বো। পৃথিবীতে মানুষের তৈরী নিয়মগুলি ক্রমাগত বদ্‌লায় আর ভগবানের বিধিগুলি হাজার হাজার বছর না বদ্‌লিয়েও টিকে থাকে। পারিবারিক জীবনটাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের কীর্ত্তি বলা চলে না, যদিও এর মধ্যে প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশী আছে। এমন কি জীব জন্তুদের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক জীবন আছে। মানুষের চেতনা জানোয়ারের থেকে বেশী উঁচুদরের ব'লে আমরা পারিবারিক জীবনের ভালোমন্দ বিচার ক'রে ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করি। মানুষের সমস্ত কাজই অগ্রসরবান ব'লে আমাদের পারিবারিক জীবনও ক্রমাগত উন্নতির দিকে যাবে এরকম আশা করা যায়। মানুষ যতই বিপরীত ব্যবহার করুক না কেন, যতই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম শেখাক্ না কেন, সারাদিনের ক্লান্তির পর সন্ধ্যেবেলা পাখীর মতন বাসায় ফিরে আসতে চাইবেই।

পরীক্ষার হলে রবীন্দ্রনাথ। (৭৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্ন :—ব্যাখ্যা কর :—"মহারাজ, কোন মহারাজ্য কোনদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে।" (তাজমহল)

উত্তর :—শাজাহান এত বড় যোদ্ধা ছিল যে কোন মহারাজা কোনদিন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন নাই, এমনকি স্বয়ং সমুদ্রগুপ্তের ভ্রাতা পৃথ্বিরাজও না।

(৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

মেয়েদের কথা।

শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়।

আমার বিশিষ্ঠা বান্ধবী, এই পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যানী সেন তাঁর কাগজে একটি সাধারণ লেখা দেবার জন্য আমায় বলেছিলেন বলে কদিন হতেই ভাবছিলাম যে কি লিখি। আমার মস্তক এত স্থূল যে সূক্ষ্ম কোন জিনিষই কোনদিন তাতে প্রবেশ লাভ করেনা; কাজেকাজেই সাধারণ ছাড়া অসাধারণ কিছুই আমার পক্ষে লেখা সম্ভবপর নয়। যাহোক, একটা কথা আমার বরাবরই মনে হয়েছে, নিজে শুধু ভেবেইছি, কিন্তু উপায় খুঁজে বার করতে পারিনি।

"মেয়েদের কথা" নানাদিক দিয়ে মেয়েদের ভিতর কথা বলবে বলেই প্রকাশিত হয়েছে, অতএব এতে সকল শ্রেণীর মেয়েদের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার আর দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের পরিচয় থাকা উচিত; তাই আমি আজ কয়েকটি কথা লিখব।

আমাদের দেশে যে সব মেয়েরা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন তাছাড়া অন্যান্য অনেক মেয়েও বর্ত্তমানে বিভিন্ন দিকে শিক্ষা লাভ করছেন; তাঁদের ভিতর বোধহয় খুব কম সংখ্যকই নিজেদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, বলতে গেলে সকলেই নিজের নিজের চিন্তা ছাড়া অন্য সব বিষয়েই উদাসীন। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে ঘটুক কোথায় কোন মেয়ের কি হচ্ছে তার জন্য মাথা ঘামাবারও দরকার নেই, এমনি করে করে আমাদের মেয়েদের অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রদীপের মত, উপরে আলো, নীচে অন্ধকার। বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্রে, পথেঘাটে, মেয়েদের একটা অংশকে দেখেই অনেকে ভেবে থাকেন বুঝি এবার ভারতললনা সত্যই জেগে উঠল; সস্তা হাততালিও পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বিরাট একটা অংশ কত যে আত্মগ্লানি, অপমান সয়ে মানুষ নামের বাইরে চলে গিয়ে শুধুমাত্র মেয়েমানুষ হয়ে অন্ধকূপে পচে মরছে সে কথা সবাই বোধহয় ভুলে যান।

আমি পুরোপুরী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করছি, অনেক রকম পরিবারই দেখেছি কিন্তু আমি প্রতিদিন কি দেখি? দেখি রোজ মেয়েদের অপমান, লাঞ্ছনা, উদয়াস্ত সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, শিক্ষার সব সংস্পর্শবিহীন জীবনযাত্রা। শিশুসন্তানদের মানুষ

করতে গিয়ে করে সমাজের জঞ্জাল তৈরী। বছরে একটি দিনও এই মেয়েরা প্রাণ খুলে হাসতে পারে কিনা সন্দেহ। যাদের জীবনে কোন প্রেরণা নেই তারা হাসবে কি করে? সকাল হলেই আগে কানে আসে প্রতিবেশীদের বাড়ীর কলকোলাহল, সুরু হয় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। দারুণ একটা হট্টগোলের ভিতর দিয়ে যে কাজটি সমাধা হয় সেটি হচ্ছে কোনরকমে দুইবেলার আহার। এর জন্য যা আলোচনা করতে হয় তার বেশী কিছুই এরা বলেনা। মাঝে মাঝে অবনতির কথাও যে হয় না তা নয়, প্রতিবেশীর কুৎসা, কাননবালা প্যাটার্নের জামা এবং কালে কস্মিনে দেখা বায়োস্কোপের গল্প, এর বেশী কিছু নয়। এ কয়বছরে আমার প্রতিবেশীনি সমূহকে ছেলেমেয়েদের প্রতি ভদ্র এবং মিষ্টি শব্দ প্রয়োগ করতে খুবই কম দেখলাম। নিমতলা আর কেওড়াতলার ঘাটে দুইবেলাই ছেলেরা প্রেরিত হয়, আদরের ডাক হল—যম, মুখপোড়া। ছেলে এসে মায়ের কাছে আব্দার জানায়, মা তার সমস্ত অনুভূতি নষ্ট করে দিয়ে তাড়া দিয়ে ওঠে উপরিউক্ত সম্বোধনে! বেশীর ভাগ বাড়ীতেই একেকটি করে বৌএর পাঁচসাতটি করে ছেলে মেয়ে, নিজের হাতে সমস্ত কাজ করতে হয়—জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত, রাত্রে আর দিনে খানিকক্ষণের জন্য ছাড়া বিশ্রামলাভ ঘটেনা, সংসার টানতে টানতে জীর্ণশীর্ণ শরীর, অসুখ বিসুখ, অশান্তি লেগেই আছে। ছেলেমেয়েরা মায়ের কাছে না পায় ন্যায্য আদর আর না পায় মনুষ্যোচিত শিক্ষা, ফলে তারাও হয়ে দাঁড়ায় কিম্ভূত কিমাকার। পুরুষদের বেলাও তাই, তাঁরা অবসর পেলে নিজ নিজ আড্ডায় চলে যান, ভাবতে পারেননা যে স্ত্রীদেরও খানিকটা সময় দেওয়া চলে। এই অধিকাংশ মেয়ের জীবনযাত্রা, এরা না পায় বাঁচবার মত অবসর, না পৌঁছায় এদের কাছে বিশ্বজগতের খবর, দিন এদের এমনি করেই চলে।

শতকরা নিরানব্বইটি মেয়ের জীবনধারার ইতিহাস হল এই, অথচ আমরা মেয়েদের আন্দোলন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, সভাসমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করি, কিন্তু ভুলে যাই এদের মাঝে যেতে, এদের জাগাতে, এদের সচেতন করতে। একথা সবাই জানে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কাজই হয়না, সমষ্টির দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের উপর; জানি, দেখছি, বুঝছি যে জোর করে না নিলে বা করলে কিছুই পাওয়া যায়না, তবু নীরব থেকে যাই!

একটা দিনের ঘটনা বলি, সন্ধ্যাবেলায় চুপ করে বসেছিলাম হঠাৎ পাশের বাড়ীতে খুব একটা গোরগোল উঠল, কি হল জানতে গিয়ে শুনলাম সেই বাড়ীর বৌটি মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি করেছে, সব কটি ছেলেমেয়েকে উত্তমমধ্যম দিয়েছে, জ্বলন্ত উনোনে জল ঢেলে

বিপদ কাটিয়া যাইবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত উর্ব্বশী প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। সখী চিত্রলেখা পরিহাস করিয়া বলিলেন,—'এ যে অনপ্সরার মত হইল বন্ধু!' একথায় বুঝা যায় উর্ব্বশী স্বভাবকোমলা, সাধারণ অপ্সরাদের মত আত্মনির্ভরশীল নহেন। জ্ঞান হইবার পর প্রশ্ন করিলেন,—'ইন্দ্রই কি তাঁহাদের উদ্ধার করিয়াছেন?' চিত্রলেখার মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার দিকে চাহিলেন,—নির্নিমেষ-নয়নে কিছুক্ষণ দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—'দানবেরা বড় উপকারই করিয়াছে।'

রাজার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য উর্ব্বশীর আকর্ষণের একমাত্র কারণ নহে; স্বর্গে কার্ত্তিকেয় কন্দর্প থাকিতে সুপুরুষের তো অভাব ছিল না। উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া কৃতজ্ঞতাবশেই যে একথা বলিলেন, তাহাও নহে, কারণ সাধারণ অপ্সরার মত তিনিও নিজেকে উচ্চশ্রেণীর জীব জানিয়া মৌখিক ধন্যবাদ জানাইয়া যাইতে পারিতেন। এ তাঁহার রূপ-গুণ-নিরপেক্ষ যথার্থ অনুরাগ।

সখীদের সহিত পুনর্মিলনের পর আদেশ আসিল, দেব সভায় যাইতে হইবে। বিদায়ের সময় ধন্যবাদ জানাইবার জন্য উর্ব্বশী স্বয়ং অগ্রসর হইলেন না, চিত্রলেখাকে পাঠাইলেন। এই অপ্সরা-দুর্লভ লজ্জানম্র ভাবটি উর্ব্বশীর 'দেব-নটী' পরিচয়ের উপর একখানি কোমল অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে। পুরাণে যত অপ্সরার পরিচয় আছে, সকলেই অতিমাত্রায় সরলা এবং প্রগল্‌ভা,—উর্ব্বশী যেন ইহাদের ব্যতিক্রম। 'উষার-উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা' যাহার পরিচয়, ইনি সে উর্ব্বশী নহেন। বিদায় হইয়া যাইবার সময় চিত্রলেখাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'সখি, একটু দাঁড়াও, লতার জালে আমার একাবলী বৈজয়ন্তিকা হারটি জড়াইয়া গেল।'—মনে পড়ে এমনই সময়ে শকুন্তলার পায়েও অভিনব কুশাঙ্কুর ফুটিয়াছিল, কুরুবকের শাখায় বল্কল বাধিয়া গিয়াছিল;—নারীচরিত্রের এই সকল কোমলদুর্ব্বল দিকও কবির দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

দ্বিতীয় অঙ্কে চিত্রলেখাকে লইয়া উর্ব্বশী আকাশযানে রাজার 'প্রমদবনে' উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিরস্করিণী-বিদ্যার সাহায্যে তিনি তখন অদৃশ্য। রাজাকে দেখিয়াও আত্মপ্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, বয়স্যের সহিত নিভৃত যে আলাপ তাহা শুনিয়া রাজার প্রকৃতমনোভাব জানিয়া পরে দেখা দিবেন। বিদূষক রাজাকে বলিতেছিলেন 'সেই দুর্লভ জনের' কথা। উর্ব্বশী ঘোর সংশয়ে পড়িলেন,—কে সেই ভাগ্যবতী? চিত্রলেখা পরামর্শ দিলেন, ধ্যানদৃষ্টি ত আছেই, ইচ্ছা করিলেই ত সমস্ত জানা যায়। কিন্তু উর্ব্বশী সম্মত হইলেন না, বলিলেন, 'সখি, সহসা ধ্যানবলে জানিতে ভরসা হয় না।' গভীর সংশয়ে

তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল, যদি ধ্যানে জানিতে গিয়া কোন নিষ্ঠুর সত্য জানিতে পারেন? উপায় থাকিতেও তাই স্বেচ্ছায় তাহা পরিহার করিলেন। উর্ব্বশী এখন অতি-ভীরু অবলা নারী,—অপ্সরার বিশেষ সুবিধাটুকু ত্যাগ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় দুর্ব্বল হইয়া রহিলেন। নারী চরিত্রের দুজ্ঞের্য় রহস্যেও কালিদাসের কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি!

রাজা যখন স্পষ্ট উর্ব্বশীর নাম করিলেন, তখন উর্ব্বশী নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, 'হীনস্বভাব হৃদয়, আশ্বস্ত হও.........।' রাজার উৎকণ্ঠা এবং উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিপি লিখিয়া নিক্ষেপ করিলেন। মনে পড়ে শকুন্তলার পদ্মপত্রের লিপি। রাজার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া অবশেষে উর্ব্বশী আত্মপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার বিরূপ, প্রথমবার স্বর্গ হইতে আহ্বান আসিয়াছিল, স্বল্প আলাপের পরই বিদায় লইতে হইয়াছিল, এবারও দেবদূত আসিয়া জানাইল অভিনয়ের জন্য শীঘ্র যাইতে হইবে। অতি দুঃখিত চিত্তে উর্ব্বশী বিদায় লইলেন।

আবার এক পূর্ণিমা-রজনীতে উর্ব্বশী স্বর্গে রাজাকে স্মরণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মুক্তার আভরণে সুনীলবসনে সাজিয়া চিত্রলেখার সহিত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবার উর্ব্বশীর দিকে চাহিয়া মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা মনে পড়ে—তাহাকেও এমনই প্রয়োজনের দাবীতে সাহসিনী হইতে হইয়াছিল। এবারও উর্ব্বশী তিরস্কারিনীর বলে অদৃশ্য। সুযোগ বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে যাইবেন, অমনি শুনা গেল দেবী আসিতেছেন। স্বর্গের রোষ যেন অভিশাপের মত তাঁহার পশ্চাতে ফিরিতেছে। দেবী আসিলেন। তাঁহার কান্তি এবং গাম্ভীর্য্য দেখিয়া উর্ব্বশী মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন—'দেবী-পদের যোগ্য ইনি, আকৃতি-গাম্ভীর্য্যে শচী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন।' এ উদারতা স্বর্গনারীর উপযুক্তই বটে। কোন হীন ঈর্ষায় মন কলুষিত হইল না, দেবীর যথার্থ মর্য্যাদাটুকু সানন্দে স্বীকার করিলেন। মহিষীর প্রতি রাজার অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার চিত্ত দুর্ব্বল হইল, কিন্তু কোন রোষ বা অভিমান প্রকাশ করিলেন না; চিত্রলেখাকে বলিলেন, 'বন্ধু, রাজার দেখিতেছি মহিষীর প্রতি গভীর অনুরাগ, দেবীও পতিব্রতা, কিন্তু কি করিব উপায় নাই, বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি।' এবার নিয়তি সদয় হইল,—কোন বাধা আসিল না। স্বর্গের অপ্সরা মর্ত্ত্যের রাজবধূ হইলেন —গন্ধমাদনবনে উর্ব্বশী রাজার সহিত প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অঙ্কে—সহজন্যা ও চিত্রলেখার আলাপে জানা গেল গন্ধমাদন বনে বিহার করিতে করিতে একদিন রাজার সাময়িক চাঞ্চল্য দেখিয়া উর্ব্বশী রোষবশে রাজাকে

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; রাজার সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া কার্ত্তিকেয়ের কুমারবনে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় অপ্সরা হইলে কার্ত্তিকেয়ের প্রভাবে তাঁহার কিছুই হইত না; কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করিবার কালে যখন তিনি 'পুরুষোত্তম' বলিতে গিয়া 'পুরূরবা' বলিয়াছিলেন, তখন নাট্যাচার্য্য ভরতের অভিশাপে তিনি অপ্সরাপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সামান্য মানবীতে পরিণত হন। সেদিন পুরূরবার প্রতি রুষ্ট হইয়া যখন তিনি কুমারবনে প্রবেশ করেন তখন একথাটা তাঁহার মনে ছিল না। কিন্তু কার্ত্তিকেয়ের তপোবন নারীবর্জ্জিত, তাই তাঁহার প্রভাবে কুমারবনে প্রবেশ করিবামাত্র উর্ব্বশী একটি লতায় পরিণত হইলেন। তাহার পর আরম্ভ হইল কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। নববর্ষের সূচনায় পুরূরবা উন্মাদের ন্যায় কুমারবনে বিলাপ করিতে লাগিলেন; এবং লতা হইয়াও উর্ব্বশীর চৈতন্য অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া তিনিও নিরুপায় ভাবে রাজার বিরহ বিলাপ শুনিতে লাগিলেন। কি দারুণ যন্ত্রনার অবস্থা! উন্মত্ত রাজা হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, গজরাজ, সকলকেই কাতরভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন 'কোথায় উর্ব্বশী?' অতি নিকটে থাকিয়াও উর্ব্বশী রাজার ব্যস্ততা দূর করিতে পারিতেছেন না। এই রুদ্ধ ক্ষোভের যন্ত্রনাতেই উর্ব্বশীর প্রায়শ্চিত্তের সাধনা হইতে লাগিল। আত্মকেন্দ্র স্বার্থপর যে প্রেম, যাহা রাজাকে কর্ত্তব্য ভুলাইয়া প্রমোদবনে মত্ত রাখিয়াছে, তাহার ধ্বংসের বীজ আপনার মধ্যেই নিহিত। উর্ব্বশীকে এ ভোগ বাসনার ফল ভুগিতে হইল। হউন তিনি অপ্সরা, মর্ত্ত্যের কল্যাণকে লঙ্ঘন করিলে স্বয়ং মহাকাল তাহার প্রতীকার করিবেন, তাই এই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়াই উর্ব্বশীকে প্রেমের সত্য-নিরঞ্জন রূপটিকে চিনিয়া লইতে হইল। দীর্ঘ-বিরহের অবসানে যখন দৈব পুনরায় অনুকূল হইল তখন উর্ব্বশী মানবী-রূপ ফিরিয়া পাইলেন। এবার তাঁহার কত পরিবর্ত্তন! এবার তাঁহার প্রেমে ঘূর্ণা-চাঞ্চল্য নাই তাই তাহাতে ধর্ম্ম ও কল্যাণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। মিলনের পরই তিনি রাজাকে বলিলেন, 'প্রিয়ংবদ, বহুদিন আমরা রাজধানী হইতে বাহির হইয়াছি, প্রজারা না জানি কত অসন্তুষ্ট হইয়াছে চলুন, ফিরিয়া যাই।' প্রথম মিলন তাঁহাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিয়াছিল, দ্বিতীয়, মিলনে কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়া উঠিল। এবার আর উদ্দাম মত্ততায় নহে, এবার শান্ত অনাবিল আনন্দে তাঁহারা রাজধানীতে ফিরিলেন।

শেষ অঙ্কে উর্ব্বশীর গৃহিণী মূর্ত্তি; এখন তিনি রাজবধূ – রাজ্যের কল্যাণলক্ষ্মী। তিনি যে পুত্রবতী এ সংবাদ প্রকাশ পাইল, যখন তাপসী সত্যবতী স্বয়ং কুমারকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। পাছে ইন্দ্রের বাক্য অনুযায়ী পুরূরবা কুমারকে দেখিলে উর্ব্বশীর

পৃথিবী প্রবাস শেষ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় কুমারের জন্মের পরই তিনি তাহাকে চ্যবন-ঋষির আশ্রমে সত্যবতীর নিকট রাখিয়া আসেন। তখন তিনি ভোগবাসনায় মত্তপ্রায়, তাই তখন মোহকলুষিত দৃষ্টিতে পুত্র অপেক্ষাও রাজা অধিক কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তিনি গৃহিণী-পদে সমসীন, ভোগের কলুষ কাটিয়া গিয়াছে, তাই দৈবই যেন নির্ব্বাসিত পুত্রকে জননীর ক্রোড়ে দিয়া গেল। প্রথমটা আসন্ন বিচ্ছেদের শঙ্কায় উর্ব্বশী কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের পরে সত্যই তাঁহার চিত্ত তমোমুক্ত হইয়াছিল, তাই দণ্ডের আর বড় প্রয়োজন ছিল না। নিয়তিও এবার প্রসন্ন হইল, নারদ আসিয়া জানাইলেন বিচ্ছেদ-দণ্ড প্রত্যাহার করা হইয়াছে। উর্ব্বশীর হৃদয় এখন মাতৃত্বের গৌরবে পূর্ণ। কল্যাণের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সিক্ত, তাই পুত্রকে বলিলেন,—'চল বৎস, জ্যেষ্ঠ জননীকে প্রণাম করিবে।' যাঁহার উদার স্বার্থত্যাগের ফলে উর্ব্বশীর জীবন ব্যর্থতা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, আজ এই অভ্যুদয়ের দিনে উর্ব্বশীর প্রসন্ন প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা তাঁহারই উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মর্ত্তের সংকীর্ণ ঈর্ষ্যার আবিলতা হইতে চিত্রখানি স্বর্গের নির্ম্মল উদারতায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শেষ অঙ্কের এই গৃহিণী উর্ব্বশীকে দেখিলে, তিনি যে কখনও স্বর্গ-নটী ছিলেন একথা মনেই পড়ে না। কবি অতি-কৌশলে তাঁহাকে স্বর্গের বিলাসিনী হইতে মর্ত্তের গৃহলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন, দেখাইয়াছেন বিশুদ্ধ প্রেমের কল্যাণ-প্রভাবে মত্ত বাসনা ও ভোগ-উচ্ছলতা ধীরে ধীরে সংহত হইয়া আসে।

(ক্রমশ)

সন্ধ্যায়।

(গান) *

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী।

কত দূরে তুমি এমন মধুর
সোনালী সাঁঝের বেলায়'
তোমারি মতন চপল মলয়
অলক দুলায়ে পালায়।

তোমারি মতন চাহনি নিমেষহারা,
ধুসর আকাশে ফুটিছে সন্ধ্যাতারা,
যত স্মৃতি তব ডানা মেলে ফেরে
আমার মনের কুলায়।

অদূরে আঁধার বেণুবনশিরে
উঠি উঠি করে চাঁদ;
আমার পরাণ সিন্ধুকুলের
ভাঙে ধৈরয বাঁধ।

একে একে নভে কোটী তারা দিল দেখা,
আমার যামিনী জাগিয়া পোহাবে একা,
যত সাধ ছিল, শেফালীর মত
সকলি ঝরিবে ধুলায়।

---

*স্বরলিপি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রতুল বাবুর গোমো প্রাপ্তি।

শ্রীসুবিমল রায়।

এক শনিবারের বৈকালে কলিকাতায় কার্জন পার্কে দুই ভদ্রলোক গল্প করিতেছিলেন। একজন নির্দন্ত বৃদ্ধ, মুখে গোঁফ-দাড়ির বালাই নাই। দ্বিতীয়জন প্রৌঢ়। বয়স আন্দাজ ৫০ হইবে। পরিমিত গোঁফ-দাড়ি রাখিয়া বসন্তের দাগ অনেকটা ঢাকিয়াছেন।

বৃদ্ধ—শুনেছ? প্রতুলবাবুর গোমোপ্রাপ্তি ঘটেছে। স্বাস্থ্যের জন্য গোমোতে বেড়াতে গিয়েছিলেন; ঘটনাচক্রে গোমোপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রৌঢ়—গোমো-প্রাপ্তি? অনেকের কাশীপ্রাপ্তির খবর পেয়েছি, গয়াপ্রাপ্তির কথাও শুনেছি, কিন্তু গোমোপ্রাপ্তি ব্যাপারটা কি? গোমোতে বেড়াতে গিয়ে তিনি কি মারা গিয়েছেন?

বৃদ্ধ—তা ঠিক নয়, দেহেই বর্ত্তমান আছেন। তবে তিনি ক্ষেত্রপতি গোমোনাথের কৃপালাভ করেছেন। গোমোনাথ তাঁকে অন্তরঙ্গ দলে গ্রহণ করেছেন, নিজজন ব'লে স্বীকার করেছেন।

প্রৌঢ়—গোমোনাথ কে? ইনি কি বৈদ্যনাথের কেউ হ'ন?

বৃদ্ধ—গোমোনাথ কে তা এখন পর্য্যন্ত নির্ণয় হয়নি। তবে **একজন** সেখানে আছেন তা'তে সন্দেহ নাই। তিনি দেবতা, না উপদেবতা, না অপদেবতা, মানুষ না অমানুষ তা কেউ ঠিক জানেনা। প্রতুলবাবু তাঁর টানেই গোমোক্ষেত্রের রহস্যপুরীতে ঢুকেছেন। তিনি এখন গোমোধামের প্রকৃত অধিবাসী হয়েছেন।

প্রৌঢ়—ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বলুন।

বৃদ্ধ—আমার সঙ্গে একখানা খবরের কাগজ আছে, প'ড়ে শোনাচ্ছি। কাগজটার নাম "আসানসোল-প্রভাকর।" এতে প্রতুলবাবুর গোমোপ্রাপ্তির বিবরণ আছে।

এই বলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন—

আসানসোল-প্রভাকর।

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত সুসংবাদ)

উদীয়মান সাহিত্যিক প্রতুলচন্দ্র মৈত্র মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের আশায় গোমো গিয়াছিলেন। একে গোমোর স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু এবং মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাহার উপর বাড়ীও পাইয়াছিলেন অতি সুন্দর। ছোট বাড়ীটির সামনে পশ্চিমদিকে কিছু দূরেই সবুজ গাছ-পালায় ঢাকা ছোট ছোট টিপি, পিছনে পরেশনাথ পাহাড়ের গম্ভীর দৃশ্য, উত্তরে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের ফলের বাগান, দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত ফাঁকা ; তবে প্রায় আধ ক্রোশ দক্ষিণে একটি ভগ্ন পরিত্যক্ত ভাঁটিখানা। প্রতুলবাবুর বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও একজনের পক্ষে যথেষ্ট। পাচক আর ভৃত্য স্থানীয় লোক। ভৃত্য দিনরাত থাকে, পাচক দুইবেলা আসে। স্থানীয় কবিরাজ সত্যবাদী সেন মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া নাড়ী দেখেন এবং উৎসাহ দিয়া যান।

প্রতুলবাবু দুইবেলাই বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চিমে সবুজ সবুজ টিপির দিকে বেড়াইতেই তাঁহার বেশী ভাল লাগিত। মধ্যে মধ্যে টিপির উপরে উঠিয়া বহুদূরে হাজারিবাগের উপকণ্ঠের নিবিড় জঙ্গল দেখিতেন। শ্রীযুক্ত মকরন্দ চৌধুরী প্রায়ই তাঁহার সঙ্গ লইতেন। মকরন্দবাবু গোমো ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারী। অনেক খবর রাখেন। বয়স প্রায় চল্লিশ হইবে। ইনিই প্রথম প্রতুলবাবুকে বলেন যে, গোমোর একটি সজীব কেন্দ্র আছে। হাজারিবাগ, ধানবাদ প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু এমন সজাগ, এমন হুঁসিয়ার, এমন আশ্রিত বৎসল নয়। গোমোর চীল-শকুন নানাস্থানে ঘুরিয়া শেষে গোমোতেই ফিরিয়া আসে—বুঝিতে পারে যে, তাহাদের উপর এই স্থানের দাবী তাহারা তখনও মিটাইতে পারে নাই।

এইসব কথা শুনিতে শুনিতে প্রতুলবাবু বাড়ী ফিরিতেন। স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চাও কিছু কিছু চলিতেছিল। প্রবন্ধাদি লিখিয়া দুই তিন ঘণ্টা কাটাইতেন।

একদিন প্রতুলবাবু স্বপ্ন দেখিলেন যে, পরেশনাথ পাহাড়ের দিক হইতে কে যেন তাঁহাকে ফিশ্ ফিশ্ ফিশ্ করিয়া ডাকিতেছে। স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে রাত্রে আর ঘুম হইল না।

পরদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে মকরন্দবাবুকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন। মকরন্দবাবু থামিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রতুলবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাস্তব? আপনি যা বলছেন তা বাস্তব?" প্রতুলবাবু বলিলেন, "স্বপ্নে যেমনটি দেখেছি তেমনটিই বলছি।" মকরন্দবাবু বলিলেন, "আপনি গোমোনাথের আহ্বান শুনেছেন।" প্রতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?" মকরন্দবাবু উত্তর দিলেন, "তিনি গোমোধামের রহস্যময় সজাগ কেন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ। গোমোবিদ্যুৎ পুঞ্জীভূত হয়ে গোমোনাথের আকার ধারণ করেছে। খুব কম লোকই তাঁর আকর্ষণ অনুভব করে। ইতিপূর্ব্বে একজন চিত্রকর, একজন ডাক্তার, একজন এঞ্জিনিয়ার আর একজন গানের ওস্তাদ সেই অজানা পুরীতে ডাক শুনে ঢুকেছেন। তাঁরা আর লোকসমাজে আসেন না। শুনেছি তারা গোমো-রসে ভরপূর হয়ে আছেন, একেবারে কেন্দ্রবাসী হয়ে গিয়েছেন।" প্রতুলবাবু প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কোথায় থাকেন?" মকরন্দবাবু বলিলেন, "অতটা অবহিত নই, তবে সমাধানের একটা উপায় আছে; যেদিক থেকে ফিশ্ ফিশ্ শব্দ শুনেছেন সেই দিকে ভরসা ক'রে এগিয়ে যাবেন। তা হ'লে গোমোবিদ্যুতের আকর্ষণে পড়বেন আর আপনা থেকেই সব হয়ে যাবে।"

বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহারা একটি অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িলেন। প্রায় এক মাইল দূরে একটি বিচিত্র হরিদ্রাবর্ণের মঠ দেখা যাইতেছিল। মঠটি ক্ষুদ্র হইলেও দূর হইতে মঠ বলিয়া বুঝা যায়। প্রতুলবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন. "ঐ বুঝি গোমোনাথের মঠ?" মকরন্দবাবু বলিলেন, "না, আমার বোধ হয় ওটি গোমোবিদেহী মোহন্ত মহারাজের মঠ। মঠের চেহারার কথা যা শুনেছি তা'তে এইরকম অনুমান হয়। গোমোবিদেহী মোহন্তমহারাজ অনেকটা গোমোনাথের ছায়ার মতন। তাঁর কাছে যেতে ইনি সাহায্য করেন। মোহন্তমহারাজের মঠ আছে, কিন্তু গোমোনাথের বাসস্থানটি ঠিক মঠ না। সে এক রহস্যময় অদ্ভুত ধাম। আপনি ক্ষেত্রপতির ডাক শুনেছিলেন, তাই এত সহজেই পথপ্রদর্শকের সন্ধান পেলেন। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার সঙ্গে ছুটে যাই, কিন্তু আমি তো আহ্বান শুনতে পেলাম না! আপনিই যান।" প্রতুলবাবু বলিলেন, "সূর্য্য ডুবে এল। এখন প্রায় এক মাইল পথ এগিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?" মকরন্দবাবু বলিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং। আমি বরং এক ঘণ্টা এই পাথরে ব'সে আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ব। এক ঘণ্টার মধ্যে ইফিরবেন তা হ'লেই হ'বে। আজ শুধু মোহন্তমহারাজের সঙ্গে দুই-চার কথা ব'লে রাখুন।"

প্রতুলবাবু দৃঢ় পাদক্ষেপে চলিলেন। আগ্রহ, সন্দেহ, উৎসাহ, ভয়, সব মিলিয়া তাঁহার মন তোলপাড় করিতে লাগিল। মঠের কাছে গিয়া মোহন্তমহারাজের চেহারা দেখিয়া তাঁহার সব দ্বিধা চলিয়া গেল। মুণ্ডিতমস্তক, মুণ্ডিতশ্মশ্রুগুম্ফ, শান্তমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ সাধু বাহির হইয়া আসিলেন। প্রতুলবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "আহ্বান শুনেছি, ব'লে বিশ্বাস; এখন পথ চিনবার জন্য আপনার কাছে এলাম। আপনি কবে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?" মোহন্তমহারাজ বলিলেন, "ধামযাত্রীর পক্ষে দিন আর রাত সমান অনুকূল। ক্ষেত্রপতি গোমোনাথ চব্বিশ ঘণ্টাই প্রসন্ন। আমি তাঁর ছায়া মাত্র। ছায়া দেখে আসল বস্তুর ধারণা করা যায় না। ক্ষেত্রপতি দিব্যকান্তি অমানব পুরুষ। প্রবল তাঁর ব্যক্তিত্ব, আহ্বান তাঁর আদেশের নামান্তর মাত্র। তাঁর নিমন্ত্রণ কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।" প্রতুলবাবু বলিলেন, 'আজ তো মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ এসে পড়েছি।" মোহন্তমহারাজ বলিলেন, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে ভিতরে বসিয়ে ধামপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ যাপন করি, কিন্তু আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনার এখন বাড়ী ফেরা দরকার। কাল সকালেই না হয় আসবেন।" প্রতুলবাবু বলিলেন, "একটি বন্ধুকে পথে রেখে এসেছি, তিনি অপেক্ষা করছেন, সেইজন্যই তাড়াতাড়ি। কাল সকালেই আপনার সঙ্গে কথা হ'বে।" মোহন্তমহারাজ বলিলেন; "শুধু কথা নয়, শুভযাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসবেন। মনকে প্রস্তুত করলেই হ'ল, অন্য কিছু আয়োজনের দরকার নাই।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া নমস্কার করিয়া প্রতুলবাবু বিদায় লইলেন।

ফিরিবার পথে মকরন্দবাবু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "সন্ধান কি ঠিক-ঠিক দিয়েছিলাম?" প্রতুলবাবু বলিলেন, 'ঠিক না হয়ে যায় কোথায়? আপনি তো বলেই ছিলেন যে, ডাক যখন এসেছে তখন আর যা কিছু সব সহজেই হয়ে যাবে! কালকেই যাত্রার দিন। আপনি সঙ্গে যাবেন তো?" মকরন্দবাবু বলিলেন, "মোহন্তমহারাজকেই মুখ দেখাতে সাহস পাই না, আবার গোমোনাথের কাছে যাব কোন্ ভরসায়?"

প্রতুলবাবু মোহন্তমহারাজের চেহারার প্রশংসা করিলেন। মকরন্দবাবু বলিলেন, "মহারাজের চেহারা কিন্তু মানুষকে আশ্বস্ত করে, অভিভূত করে না। গোমোনাথের চেহারা কিন্তু মানুষকে অভিভূত করে, পলায়নের শক্তি হরণ করে।' দুই তিন মিনিট চিন্তামগ্ন থাকিয়া প্রতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ফিরে আসতে পারব তো?" মকরন্দবাবু দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "শোনা যায় এই যাত্রার আদিতে অন্তের পরিচয় পাওয়া

যায় না। এদিকে আমরাও আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের দৃঢ় টানেই আপনি ফিরে আসবেন।" আশ্বাস পাইয়া প্রতুলবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। বাড়ী পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে অন্ধকার হইয়া গেল।

পরদিন সকালে প্রতুলবাবু একাকী মোহন্তমহারাজের মঠে উপস্থিত হইলেন। মন হইতে সব সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। মহারাজের সাহায্যে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আপনাতে গোমোবায়ুর আবেশ হয়েছে. সুতরাং আপনি যে ভূতাবিষ্টের মতন আবার ফিরে আসবেন তা আগেই জানতাম। আপনাকে দিয়ে গোমোনাথের এক গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'বে। আপাততঃ একটু ঘোলের সরবৎ খেয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করুণ। পরে শুভযাত্রা সুরু হ'বে।"

ঘোল পানান্তে তাঁহারা রওনা হইলেন। যাইতে যাইতে মোহন্তমহারাজ বলিলেন, "গোমোনাথের সভায় অনেক কৃতবিদ্য গুণী লোক আছেন, কিন্তু একজন সাহিত্যিকের অভাব। আপনাকে দিয়ে সেই অভাব দূর হ'বে। আপনি তাঁর আস্তানায় থেকে গুপ্তভাবে ছদ্মনামে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে গোমো-রস পরিবেশন করতে পারবেন।" প্রতুলবাবু বলিলেন, "নিজেকে সেখানকার অবস্থার সঙ্গে কতদূর খাপ খাইয়ে নিতে পার্‌ব তা সেখানে গেলেই বোঝা যাবে।" মহারাজ বলিলেন. "আপনাকে খাপ খাইয়ে নিবে, আপনি ক্রমেই খাপ খেয়ে আসছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যেই আপনার স্নায়ুতে গোমোবিদ্যুতের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, আপনি আপনার অজ্ঞাতসারেই গোমোধর্মী হয়ে আসছেন।" প্রতুলবাবু দেখিলেন মহারাজের চেহারা অত্যন্ত নিরীহ হইলেও তাঁহার কথাগুলি আজ যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে। তিনি যেন প্রতুলবাবুকে গোমোনাথের একজন স্থায়ী সভাসদ্‌রূপে দেখিতেই ইচ্ছুক।

পথের ধারে ধারে পাতায় ঢাকা ছোট ছোট নালা আর নানারকম জঙ্গলী গাছ। মোহন্তমহারাজ বলিতে লাগিলেন, "এই দেখুন, আপনার মধ্যে গোমো-দশার লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পাচ্ছে। আপনার শরীর এখন আপনার দখলে নাই। এর পরে আপনার মন গোমোভাবে ভাবিত হয়ে উঠবে।" প্রতুলবাবুর বুদ্ধি স্থির ছিল, তবু তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপুঞ্জ অধিকারের চেষ্টায় আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোমো-দশার কত রকম লক্ষণ আছে?" মহারাজ বলিলেন,

"এ সব ব্যাপার নিজবোধগম্য, নিজেই সব বুঝতে পারবেন। অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পারছেন যে, আপনি একটা স্নায়বিক বিপ্লবের মধ্যে পড়েছেন। গোমোবায়ু আপনাকে পেয়ে বসেছে, ছাড়তে চাইছে না। সে অশোভন জেদের সঙ্গে আপনার সঙ্গ নিয়েছে। এখন থেকে পথ সেই একমাত্র গম্যস্থানের দিকে। কাছাকাছি এসেছেন, প্রস্তুত থাকুন। সেখানে পরীক্ষা নাই, তবে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেতে পারেন; একটা আকস্মিকতার ধাক্কা। বিস্ময়ের হয়তো সীমা থাকবে না। অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আলোয় এসে মানুষ যেমন অভিভূত হয়ে পড়ে, হঠাৎ সেই রকম হ'তে পারে। তারপর? তার পরেই গোমোগ্রস্ত হ'লেন ....." এই বলিয়াই মোহন্তমহারাজ ক্ষিপ্রহস্তে প্রতুলবাবুকে ধরিয়া ডান দিকের মোড়ে ফিরাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন! প্রায় দুই শত হস্ত দূরেই দেখা যাইতেছে একটি সুগোল অপার্থিব মুখমণ্ডল আকর্ণবিস্তৃত শুভ্র ভ্রূসংযুক্ত দুইটি হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু; তাহার নিচেই আকর্ণবিস্তৃত বিরাট শ্বেত গুম্ফ; তাহাতেই বিলীন হইয়া আছে এক সৃষ্টি বহির্ভূত, রহস্যময়, আকর্ণবিস্তৃত হাস্যরেখা! ভক্ত ও সহচরগণ পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি যায় না। আকাশে হঠাৎ বৃহৎ উল্কার আবির্ভাব হইলে যেমন মেঘ ও চন্দ্রের প্রতি কাহারও লক্ষ্য থাকে না, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। এমন কি গোমোনাথের সমুন্নত দেহের অন্যান্য বিশিষ্ট লক্ষণগুলির প্রতিও দৃষ্টি যায় না। সেই অবিস্মরণীয় মুখমণ্ডল সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লয়।

প্রতুলবাবুর সমস্ত মন ও বুদ্ধি সেই দৃষ্টিবহির্ভূত মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হইয়া গেল। নিশির ডাকে মানুষকে যেমন টানিয়া লয় গোমোনাথের অব্যর্থ নিমন্ত্রণ প্রতুলবাবুকে সেইরূপ টানিয়া লইয়া চলিল। পরিণামে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল—প্রতুলবাবু অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সহিত অন্তরঙ্গ দলে গৃহীত হইলেন। প্রশ্ন করিবার অনুমতি পাইলেন না, হাস্য ব' ক্রন্দনের এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইলেন না। প্রগাঢ় রহস্যময় শুভদিন তাঁহাকে গ্রাস করিল। প্রতুলবাবুর কয়জন আত্মীয় এবং মকরন্দবাবু তাঁহার সন্ধানে কিছুদিন ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু পথ প্রদর্শক মোহন্তমহারাজের সন্ধান পাওয়া গেল না। মহারাজ মঠ ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতুলবাবুকে বাহির করা হইল না। তবে গোমোনাথের সেবক দলের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে ইঁহাদের আকস্মিকভাবে আলাপ হয়। এই ব্যক্তি নেউল ধরিতে গিয়া পথ ভুলিয়া গোমোনাথের আস্তানা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। কিছুতেই আর ফিরিয়া যাইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই ব্যক্তির কাছে তাঁহারা প্রতুলবাবুর অনেক খবর জানিতে পারিলেন। মোহন্ত

মহারাজের সঙ্গে প্রতুলবাবুর কি-ভাবের আলাপ হইয়াছিল আর কেমন অবস্থায় তিনি গোমোনাথের কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই ব্যক্তিই সব জানাইলেন।

প্রতুলবাবুর লেখা এখনও দুই চারিটি পত্রিকায় ছদ্মনামে বাহির হইয়া থাকে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লেখায় হাস্য-করুণ-বীভৎসাদি রস একীভূত হইয়া এক অভিনব রসে পরিণত হইয়াছে। গোমোনাথের ভাণ্ডারে এমন সুখাদ্য আছে যাহাতে মিষ্ট লবণাদি বিভিন্ন রসের সমন্বয় হইয়াছে, অথচ সেই রস কোনও নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে পড়ে না। সেই খাদ্যের গুণ প্রতুলবাবুর মনে ছড়াইয়া গিয়াছে আর তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার লেখা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সৃষ্টিছাড়া দান।

'আসানসোল-প্রভাকর' পত্রিকা পড়া শেষ হইলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কেমন সহজে প্রতুলবাবু দুর্গম পথ পার হয়ে গেলেন!" তখন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের মধ্যে আবার কথোপকথন সুরু হইল।

প্রৌঢ়—একটা জিনিষ ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রতুলবাবুর বর্ত্তমান অবস্থার পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া গেল না। তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার ফল যে খুব সুখকর হয়েছে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল না।

বৃদ্ধ—তিনি যে এক অতি অদ্ভুত, অতীব দুর্ল্লভ, নিরতিশয় নিগূঢ় অবস্থা লাভ করেছেন তাতে সন্দেহ নাই।

প্রৌঢ়—কিন্তু তাঁর উন্নতি হ'ল না অবনতি হ'ল?

বৃদ্ধ—গোমোনাথ যখন তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করেন নি তখন তাঁর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই। গোমোনাথ দেবতা না হ'লেও উপদেবতা তো বটেন! আর যদি উপদেবতা না হয়ে অপদেবতা হ'ন তা হ'লেও তিনি বন্ধুগোছের লোক। তিনি প্রতুলবাবুর সাহিত্যচর্চ্চায় বাধা দিচ্ছেন না! শুধু ধারাটা বদলিয়ে দিয়েছেন। ভাবনার কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অবনতি হয় নি।

প্রৌঢ়—তা বটে, তা বটে। লোকের অগোচরে থেকে তিনি সাহিত্যসেবা করছেন, এটা আনন্দের কথা।

——

মুখোস

(উপন্যাস)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্ত।

উমার জীবনে দুঃখের দিন ঘনাইয়া আসিল। গরীবের ঘরে জন্মিয়া শুধু রূপের জোরেই সে এত বড় ধনীর সংসারে ঠাঁই পাইয়াছিল। শুধু ঐশ্বর্য্যই নয়, স্বামীর বুকভরা ভালবাসারও সে অধিকারিনী হইয়াছিল। সে দিন গুলি যেন পালতোলা নৌকার মত হু হু করিয়া চলিয়া গেল! এখন সে সব কথা উমার কাছে স্বপ্ন।

জন্মিয়াছিল সে গরীবের সংসারে। তাহার উপর শৈশবেই সে পিতাকে হারাইয়াছিল। বিধবামাতা অনেক দুঃখে তাহাকে বড় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সব দুঃখ কষ্টের অন্তরালে মায়ের প্রাণের অফুরন্ত স্নেহভাণ্ডারের সেই ছিল একমাত্র অধিকারিণী। মায়ের অসীম স্নেহলাভ করিয়া একদিকে তাহার প্রাণ যেমন কোমল হইয়া গড়িয়া উঠিল, সংসারের দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তেমনি ধৈর্য্যশীল হইয়া উঠিল। তাই রাজার ঘরে রাজঐশ্চর্য্য স্বামীর অসীম আদরেও সে যেমন তলাইয়া গেল না, আজ আবার এই অসহ্য উপেক্ষা সহিয়াও ভাঙ্গিয়া পড়িল না।

বিধবা হইয়া উমার মা দূরসম্পর্কের এক দেবরের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেবরের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, তাহার উপরে অনেকগুলি কাচ্চা, বাচ্চা; স্ত্রী ও রুগ্ন। গোয়ালঘরে গরু বাছুরে চার পাঁচটিছিল, ঢেঁকী ঘরে ঢেঁকি, মরাইয়ে ধান কলাই ছিল। এ স্থলে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল, কর্ত্তৃত্বটুকু হাতে রাখিয়া উমার কাকী বাকিটুকু সব বড় জায়ের হাতে ছাড়িয়া দিলেন। সাংসারিক সমস্ত কাজই উমার মায়ের হাতে আসিয়া পড়িল, আর বাল্যকাল হইতেই মায়ের সাহায্য কারিণী হইল উমা।

তাহাদের গ্রাম খানা ছিল ছোট, কয়েকঘর বামুন কায়েত ছাড়া শ্রমিক অধিবাসীর সংখ্যাই ছিল অধিক। গ্রামের উত্তর দিকে গভীর অরণ্য ছিল, সেই অরণ্যে বুনো হাস মুর্‌গী ছাড়া দুই চারিটা বন্য শূকরও দেখা যাইত। শিকারলুব্ধ যুবকগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া সেই সব বন্য প্রাণীর শান্তিভঙ্গ করিয়া নিজেদের শিকারের স্পৃহা মিটাইয়া লইত।

সেই অরণ্য অতিক্রম করিলেই জলাভূমি। তাহার পরেই একখানা বর্দ্ধিষ্ণুত গ্রাম, নাম মধ্যপাড়া। সে গ্রামের জমিদার অন্যান্য জমিদারের ন্যায় সহরবাসী না হইয়া গ্রামেই বাস করিতেন। কলিকাতায় বালিগঞ্জে তাঁহার সুরম্য অট্টালিকা সর্ব্বদাই বাসোপযোগী হইয়া সজ্জিত থাকিত, কখনও কখনও তিনি সপরিবারে সেখানে গিয়া বাস করিতেন; কিন্তু সে অতি অল্পসময়ের জন্য। পিতা, পিতামহের ভিটার উপর তাঁহার আন্তরিক টান্ ছিল তাই গ্রামের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধনে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসীর সুখে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার একটি কন্যা ও একটি পুত্র। কন্যাটির অনেক দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুত্র চুণীলাল কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া বি, এ পড়ে।

গ্রামের চক্‌মিলানদালান, বাগান পুকুর, কিন্তু বাস করিবার লোকের অভাবে সব যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। আশ্রিতাপরিজনবর্গ ও দাস দাসীরাই কোনোরকমে বাড়ী সর্‌গর্‌ম করিয়া রাখিয়াছে।

পুত্রের বিবাহের জন্য পিতা মাতা নিতান্ত ব্যগ্র হইলেও, পুত্রের বিবাহে অনিচ্ছার জন্য এখনো উহা স্থগিত হইয়া আছে। মাতার অনুরোধ উপরোধে বাড়ী আসিলে চুণীলাল বিব্রত হইয়া পড়িত। মাতা দুঃখের নানা কারণ উপস্থিত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন :- "গোলাপী ঠাকুরঝির কেমন বউ হয়েছে, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়" "হারাণী ভাসুরঝির ঘর আলোকরা নাতি হয়েছে, আমার যেমন পোড়াবরাৎ"—ইত্যাদি মন্তব্যে চুণীলাল পলাইবার পথ পাইত না। তারপর বি, এ পাশ করিয়া, ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া সে-ও ওদের চেয়ে বাড়া টুক্‌টুকে বউ আনিয়া দিবে এই সান্ত্বনা বাক্যে মাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু বর্ত্তমান ছাড়িয়া সুদূর ভবিষ্যতের আশায় মায়ের মন প্রবোধ মানিত না।

প্রতি ছুটিতেই চুণীলাল বাড়ী আসিত, সঙ্গে আসিত দুই চারিজন বন্ধু। গ্রামের পার্শ্বস্থ সেই জঙ্গলে তাহারা শিকার করিতে যাইত। ছুটির এই স্বল্পকালের মধ্যেই চুণীলাল ও তাহার বন্ধুবর্গের অত্যাচারে অরণ্য প্রায় পশু পক্ষী শূন্য হইয়া পড়িত।

সেবার গ্রীষ্মাবকাশে দশজন বন্ধুসহ চুণীলাল বাড়ী আসিল। দু'এক দিন পরেই তাহারা শিকারে যাওয়ার তোড় জোড় করিতে লাগিল।

বিনোদ ও হরীশ কলিকাতার ছেলে, জীবনে তাহারা গ্রামে আসে নাই। এখন গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় কোন্ বন বাদাড়ে শিকার করিতে যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহাদের গা' ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল, অথচ কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিবার সময় ইহাদেরই উৎসাহ ছিল বেশী। শ্যামল বনভূমি, মাঝে মাঝে সপুষ্প লতিকা বৃক্ষের শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছে, কোনো শাখায় রক্ত বর্ণ ফল ঝুলিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী কলরব করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, তুলার মত কোমল শুভ্রদেহ খরগোস্ একটা কান খাড়া করিয়া গা' ঘেঁসিয়াই ছুটিয়া পলাইতেছে, পুথীগত বিদ্যালাভ করিয়া শিকারের নামে তাহারা এই সব রঙ্গীন কল্পনা করিত। কিন্তু বাস্তব জগতে সঙ্গিগণ যখন বন্দুক সাফ্ করিতে লাগিল। তখন তাহাদের উৎসাহ যেন হু হু করিয়া কমিয়া আসিতে লাগিল। যাত্রার সময় শুষ্ক মুখে তাহারা বলিল "চ'ল্লাম তো, ঈশান কোণে মেঘ করেছে, দেখেছিস ?"

অন্য সকলে তাহার কথা তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়া হৈ হৈ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু সত্যই বিপদ ঘটিল। ঈশান কোণের মেঘ পরিব্যক্ত হইয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বন্ধুগণ যখন গোটা দুই চার বেলে হাঁস মাত্র মারিয়াছে, তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিজিতে ভিজিতে একটু আশ্রয়ের আশায় তাহারা উমাদেব গ্রামে প্রবেশ করিল।

তখন দ্বিপ্রহর বেলা, বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে, বৃষ্টির পরে একটু রৌদ্রের আভাস পাইয়া আকাশে আধখানা রামধনু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পুকুরে স্নান করিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া উমা সিক্তবস্ত্রে সিক্তকেশে বড় একটা পিতলের কলসীতে কবিয়া মায়ের জন্য জল আনিতেছিল। মা মাছের হেঁসেলে রাঁধিতে যান, সকলকে খাওয়াইয়া স্নান করিতে বেলা গড়াইয়া যায়, তাই উমা স্নান করিয়া জল আনিয়া মায়ের জন্য রান্না করে। কিশোরী কন্যার দিকে চাহিয়া মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন, অর্থহীনা বিধবা তিনি, কেমন করিয়া কন্যা দায়ে উদ্ধার হইবেন এই চিন্তা করিয়া গ্রামের দুই চারিজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহারা যেন খোঁজ রাখেন বিনা পণে কেহ যদি তাঁহার উমাকে গ্রহণ করে। মোটা ভাত কাপড়ে থাকিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁহার মত লোকের অধিক আশা করা শোভা পায় না।

সবন্ধু চুণীলাল উমার মুখামুখি হইয়া পড়িল। চুণীলাল থমকিয়া দাঁড়াইল, একটী নিরাভরণা কিশোরীর দেহে যে এত রূপ থাকিতে পারে, তাহা তো সে এতদিন জানিত না। তাহার অপলক দৃষ্টি ও মুগ্ধতা দেখিয়া বন্ধুবর্গ ব্যাপার কতকটা অনুমান করিয়া লইল। অসিত বলিল "মদনভস্মের দ্বিতীয় পর্ব্ব দেখ্‌বার বুঝি সময় এল রে—"

নেপাল থিয়েটারী ঢঙে বলিল "ও ধনি কে কহ বাটে, গোরোচনা গোরী, নবীনা কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে।"

ভূপাল ঠোকর মারিয়া বলিল "গয়না নেই, সাড়ী ছেঁড়া, তবু মেয়েটী কী সুন্দর! কিন্তু আমাদের চুণী তো বিয়ে কোর্‌বেনা ধনুর্ভঙ্গ পণ, তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের আর কি কোর্‌বার আছে?"

মৃত হাঁস গুলিকে ভালো করিয়া ধরিয়া লইয়া বারিদ্ বলিল "বসন ভূষণে কাজ কি দাদা? ভূষণের ভূষণ অঙ্গ—"

তখন বেশ রোদ্ উঠিয়াছে, সুতরাং আশ্রয়ের সন্ধানে বিরত হইয়া তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিল, আসিবার পূর্ব্বে উমার পরিচয় নিয়া আসিতে ভুলিল না।

অতঃপর যাহা ঘটিল, না বলিলেও চলে। চুণীলাল মাতাকে বলিল, "যদি তাহার মনোনীতা কন্যার সহিত বিবাহ হয়, তবে বর্ত্তমান মাসের প্রথম শুভদিনের প্রথম লগ্নেই সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে।"

এ সব কথা উমা স্বামীর কাছে কতবার শুনিয়াছে। উমাকে দেখিবার পর চুণীলাল যতদিন উমাকে পায় নাই, কেমন করিয়া সময় কাটাইয়াছে, সে সব কথা শুনিতে শুনিতে উমার প্রায় মুখস্ত হইয়া গিয়াছে।

উমার মায়ের দারিদ্র্য ব্যতীত এ বিবাহে অন্য কোন বাধা ছিল না। চুণীলালের পিতার অর্থের কোন অভাব ছিল না, সুতরাং এ বিবাহে তাঁহার বিশেষ অমত হইল না, যেটুকু আপত্তি হইল, চুণীলালের মায়ের চোখের জলে সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। অবশেষে পুত্রের মনোবাঞ্ছা পূরণে তিনি সম্মতি দিলেন। চুণীলালের সহিত উমার বিবাহ হইয়া গেল।

একমাত্র পুত্রের বিবাহ নিরাভরণা কন্যার সহিত হইবে, ইহা মাতার মনঃপীড়ার কারণ হইল, সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বেই গায়ে হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে হীরা মুক্তার গহনা আসিয়া উমার গৌর অঙ্গে ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল।

গ্রামের লোক, উমা ও উমার মায়ের সৌভাগ্যে তাক্ লাগিয়া গেল। প্রচুর বাদ্য কোলাহলের মধ্যে উমা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল।

মায়ের কোল হইতে উমা শ্বশুর শাশুড়ীর কোলে আশ্রয় পাইল। এত যত্ন, এত ভালবাসা যে তাহার জীবনেই সে পাইতেছে প্রথম প্রথম সে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। শ্বশুর বলিতেন "উমা মায়ি", শাশুড়ী বলিতেন "মা মণি" দাসদাসী আত্মীয় পরিজন সকলেরই কী প্রাণঢালা মমতা! উমা যেন সে গৃহের সাধনার ধন হইয়া উঠিল। আর স্বামীর ভালবাসার মাতামাতিতে সে তো একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। বধূর সঙ্গে সারাক্ষণ কাটাইয়াও চুণীলালের তৃষ্ণা মেটে না। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে বধূ যখন শ্বশুরের পাকা চুল তুলিবার জন্য শিয়রে আসিয়া বসে বালকভৃত্য মহেশ তখন মায়ের কাছে দাদাবাবুর মাথাধরার সংবাদ দিয়া অডিকোলন চায়। ছেলের ঘরে ও আল্‌মারিতে অ-ডি-কোলনের শিশি ঠাসাঠাসি করিয়া আছে জানিয়াও মা আল্‌মারি খুলিয়া শিশি বাহির করিয়া দেন। মহেশ আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিষ্কার রুমাল প্রার্থনা করিলে তিনি গিয়া তন্দ্রাতুর স্বামীকে বলেন যে "মা মণি এই খেয়ে উঠ্‌ল, এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নিক্, মহেশ বরং তোমার চুল তুলে দিক্।"

ঘরে গিয়া উমা স্বামীর ছলনা বুঝিয়া প্রণয় কলহ আরম্ভ করিত। উমার কপালে টোকা মারিয়া চুণীলাল বল্লে "সত্যি মাথা ধরেছিল উ, তোমাকে দেখে ছেড়ে গেছে।"

ছুটি ফুরাইয়া গেলেও চুণীলালের কলিকাতা যাত্রার কোনো আয়োজন দেখা গেল না, এত দিন পরে কলিকাতার স্বাস্থ্য তাহার পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী বলিয়া সে মনে করিল। ইয়োরোপ ভ্রমণের প্রস্তাবও তাহার মুখে আর শোনা গেল না।

উমার মায়ের জীবনের কাজ শেষ হইয়া গেল বলিয়াই বুঝি তিনি অমর ধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার একমাত্র ধন উমার অতুল সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া তিনি তৃপ্তির সহিত শেষ নিশ্বাস ফেলিলেন।

উমা খবর পাইল, কিন্তু কাঁদিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য চুণীলাল হাতীতে চড়াইয়া মহলে ঘুরাইয়া আনিল, চড়িভাতি করিবার জন্য বজরায় করিয়া নদীর চরে লইয়া গেল, কিছুদিন কলিকাতায় নিয়া রাখিয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাইয়া আনিল। উমাকে চোখের জল ফেলিতে দেখিলে চুণীলাল এমন হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া

তুলিত যে উমা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিত। আর আজ ? উমার ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসি ও চোখে জলের ধারা বহিয়া যাইতেছে।

তারপর উমার জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সে হইল শিশুর জননী। সমস্ত গ্রামে সে দিন কি আনন্দ কোলাহল ! কি উৎসব ! শ্বশুর শাশুড়ীর সে কি হর্ষ তাহার শিশুকে লইয়া ! পিতা আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিল 'তন্দ্রা'। শ্বশুর রাখিলেন 'গঙ্গা' শাশুড়ী রাখিলেন 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। গ্রামের লোক যে যখন দেখিতে আসিল সে-ই একটা নতুন নাম বলিয়া যাইতে লাগিল।

কন্যাকে লইয়াও স্বামীর সহিত উমার কৃত্রিম কলহের শেষ ছিল না। কন্যার ফুলের মত একখানা হাত ধরিয়া চুণীলাল বলে এখন তো মেয়েই তোমার সব, আমি তো পর।"

মেয়ের ঠোঁটে চুমা খাইয়া উমা বলে "আর মেয়ে পেয়ে দিন দিন যে আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছ, সে কথা কে বলে ?"

আবার কন্যার চেহারার সাদৃশ্য নিয়া কখনো তর্ক বাধিয়া যায় চুণীলাল বলে, "মুখখানা কার মত হবে ? তোমার মতন ঠিক্—" "হ্যাঃ আমার মতন আবার কোথায় ? একেবারে তোমার মতন। বাপ গঠনের মেয়ে ভাগ্যবতী হয়।"

"বা, ওর মধ্যেই যে আমি তোমাকে দেখ্‌তে চাই।"

"তবে আমারই বা সে সাধ হবে না কেন ? কী স্বার্থপর !"

এই ভাবে উমার জীবনের মধুমাস গত হইয়া গিয়াছে। তারপর উমার জীবনের আরেক অধ্যায়ের যবনিকা উত্থিত হইল। একদিন আগে পরে শ্বশুর শাশুড়ী চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন। উমা দ্বিতীয়বার পিতৃমাতৃহারা হইল। কিন্তু নিজের শোক বুকে চাপিয়া রাখিয়া সদ্য পিতৃমাতৃহীন শোকাতুর স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

"উমা তোমারও মা বাবা নেই, আমিও মা বাবাকে হারালাম, আমাদের দু'জনের ব্যথাই এক হ'ল।"

"স্বামীর মাথা কোলে লইয়া আঁচলে তাহার চোখের জল মুছাইয়া উমা নিজে চোখের জলে ভাসিতে থাকে।" শ্রাদ্ধের সময় চুণীলালের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি আসিলেন। খুব ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইয়া গেল।

তারপর বিষয় সম্পত্তির সুব্যবস্থার বিষয় আলোচনা আরম্ভ হইল। চূণীলালের এষ্টেটের নায়েব মশায় তাহার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনপুরুষ হয় তাঁহারা এই এষ্টেটের নায়েবী করিয়া আসিতেছেন। চূণীলালের পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার বুদ্ধিপরামর্শ লইয়া নায়েব মশায় জমিদারী পরিচালনা করিতেন। চূণীলাল বলিল "নায়েব কাকাই তো চির দিন সব ক'রে আস্ছেন, এখনো কোরবেন। আমি কি-ইবা জানি, কি-ই বা বুঝি।"

নায়েব মশায় বলিলেন, "তা' বল্লে কি হয় বাবা! এতদিন যা' করেছি, তোমার বাবা মাথার উপরে ছিলেন, তাঁর উপদেশমতই করেছি। এখন তুমি যোগ্য হ'য়েছ, নিজের বিষয় সম্পত্তি নিজের বুঝে দেখা উচিত। আমিও বুড়ো হ'য়েছি। দাদা বৌদি চ'লে গেলেন, আমারই বা ডাক পড়্তে কতক্ষণ?"

চূণীলালের দিদি, ভাই যে বউএর আঁচল ধরিয়া রাতদিন ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, ইহা কোনদিনই পছন্দ করিত না। সবই যেন সৃষ্টিছাড়া, বউ না থাকে কার? তাই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া সেই বৌএর আঁচলের তলায় বসিয়া থাকিতে তাহার ভাই ছাড়া সে আর কাহাকেও দেখে নাই বি, এ, পরীক্ষাটা পর্য্যন্ত দিলনা, ঘরে আসিয়া বসিল, মায়ের কাছে সর্ব্বদাই এই সব উক্তি করিত। এখন সে উচ্চস্বরে বলিল, "তাই তুমি বল নায়েবকাকু, তোমার একার কী সাধ্য চূণী যদি কিছুই না দেখে। আর দেখ্বেই বা না কেন? ওকি বোকা, না মুখ্খু?"

তখন স্থির হইল নায়েব মশায়ের সকল কার্য্যে চূণী সহায়তা করিবে ও নিজের বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইবে।

ননদ বউকেও অনেক বুঝাইলেন, "এতদিন ছোট ছিলে যা' করেছ সেজেছে। এখন মার অভাবে এ সংসার তোমার। মা যেমন ক'রে সংসারটী মাথায় ক'রে ছিলেন এখন তোমাকেই তা' থাকতে হ'বে। বিগ্রহ সেবা, বার মাসে বার ব্রত, অতিথি সজ্জন সেবা কিছুতেই যেন ত্রুটি না হয়, তাতে সংসারের অমঙ্গল হবে।"

ইহার পর বিশাল সংসারের জমিদার হইলেন চূণীলাল বিশাল সংসারের গৃহিণীপদ পাইল উমা।

এখন আর চূণীলালের স্ত্রী কন্যা লইয়া সর্ব্বক্ষণ মাতামাতি করিবার অবসর হয় না, বেশীর ভাগ সময়ই তাহার বাহিরের ঘরে থাকিতে হয়, কখনও স্থানান্তরে গিয়াও দুই চারিদিন থাকিতে হয়। স্বামীকে সর্ব্বক্ষণ কাছে পাইয়া উমা অভ্যস্ত ছিল, প্রথম তাহার

বড় একলা বোধ হইত, তখন নিজের মনেই ভাবিত এখন কত বড় জমিদারীর মালিক তিনি, কত দায়িত্ব তাঁহার মাথায়, সারাক্ষণ আমার কাছে বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন।

এমনি করিয়া স্বামীর সঙ্গে উমার বিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। উমাও আস্তে আস্তে তাহার জীবনকে কর্ম্মজালে জড়াইয়া ফেলিল। শাশুড়ীর পরিত্যক্ত সমস্ত কর্ত্তব্যই সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

প্রত্যূষে উষার আলো যখন দরজার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিবার জন্য ঠেলাঠেলি করে, খোলা জানালার পাশে শিউলি গাছের ডালে বসিয়া বউকথাকও পাখী বউকে কথা বলাইবার জন্য সাধ্যসাধনা আরম্ভ করে, উমা তখন স্বামীর বাহু-বেষ্টন ছিন্ন করিয়া ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসে, চুণীলালেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সে খপ্ করিয়া উমার আঁচল ধরিয়া বলে, "এত ভোরে উঠ্ছ কেন? এস, কাছে এস।"

উমা স্বামীর হাত সরাইয়া দিয়া বলে, "স্নান করে পূজোর ঘরে গিয়ে পূজোর আয়োজন করতে হবে যে! ঠাকুর মশাই এসে পড়বেন।"

চুণীলাল দুইহাতে তাহাকে কাছে সরাইয়া আনিয়া বলে, "বাড়ীতে লোকের ত অভাব নেই, পূজোর যোগাড় তারাই ক'রতে পারে। তার জন্য তোমার এত ভোরে উঠ্‌বার কি দরকার?"

উমা ব্যস্ত হইয়া বলে, "পূজোর কাজ কি সকলকে দিয়ে হয়? চিরকাল মা ক'রে এসেছেন, এখন আমাকেই কর্‌তে হবে।"

চুণীলাল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, "কিন্তু আমিতো আটটার সময় বাইরে চলে যাব, ফিরতে বারটা একটা হবে, এখন এই সময়টুকু তুমি আমার কাছে থাক।"

জিভ কাটিয়া উমা বলে, "সে কি হয়? পুরুৎঠাকুর এসে ব'সে থাক্‌বেন—" স্বামীকে বিরক্ত করিয়াই সে উঠিয়া যায়।

দুপুরে আহারান্তে উমার প্রতীক্ষা করিয়া চুণীলাল ঘুমাইয়া পড়ে, বৈকালে জাগিয়া দেখে উমা মেয়ে কোলে নিয়া কাছে বসিয়া আছে। অভিমান করিয়া বলে, "সারাদুপুর পথ চেয়ে ছিলুম, খেয়ে আস্‌তে এত দেরি হল? নায়েবকাকু এখনই ডেকে পাঠাবেন, তোমাকে কত টুকু কাছে পাব?"

উমা বলে, "নতুন কাকীর অসুখ ক'রেছে, ডাক্তার ডেকে ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা কোরতে হ'ল। ন' পিসি কাল উপোস ক'রেছিলেন তাঁর খাবার একটু তদ্বির কোর্‌লাম।

মহাল থেকে চার হাঁড়ি দই এসেছিল, চাকর বাকর পেয়াদা গোমস্তা সকলকে ভাগ ক'রে দিয়ে আসতে দেরি হ'য়ে গেল।"

বিরক্ত হইয়া চুণীলাল বলে, "সবই যদি তুমি ক'রবে, তবে বাড়ী ভর্ত্তি এত লোক থেকে কি কাজ?"

উমা স্বামীর মুখে করতল চাপা দিয়া বলে, "ওকথা বোলোনা, লোক দিন দিন বাড়ুক। মা যে এ সব নিজে হাতে কোরতেন।"

বাহির হইতে বার বার তাগিদ আসে, নায়েব মশায় কাগজ পত্র নিয়া বসিয়া আছেন, চুণীর যাওয়ার তাড়া দেখা যায় না, অবশেষে পর্দ্দার অন্তরালে নায়েব মশায়ের গলার শব্দ শুনিয়া লজ্জায় উমা মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়, পায়ে চটী জুতা গলাইয়া তরুণ জমিদার চট্‌পট্ বাহির হইয়া পড়েন।

কোনোদিন দরবার কক্ষ হইতে কোনোমতে পলাইয়া চুণীলাল অন্তঃপুরে পলাইয়া আসিয়া অনেক খুঁজিয়া রান্নাঘরে উমার দেখা পান। পাচক সরাইয়া দিয়া উমা রান্না করিতেছে। নিরাশ হইয়া চুণীলাল বলে, "একি, তুমি রান্না ক'রছ কেন? ইস্, আগুনের তাতে মুখ খানা কি লাল হ'য়েছে! ঘেমেও গেছ। উঠে এস শীগ্‌গীর উঠে এস। অসুখ ক'রবে যে!"

উমা কপালের ঘাম মুছিয়া সাবধানে মাছ উল্টাইতে উল্টাইতে বলে, "রেঁধে আমার খুব অভ্যেস্ আছে, কিচ্ছু হবে না। পুকুর থেকে প্রকাণ্ড একটা মাছ ধরেছে, মাছের চপ্ করছি।"

"কেন, ঠাকুর পারেনা?"

"ঠাকুরের হাতে খেলে কি আর তোমার পেট্ ভরবে?"

সর্ব্বক্ষণ পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে এইরূপে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

রূপচর্চ্চার খুঁটিনাটি।

শ্রীসরস্বতী চক্রবর্ত্তী।

সৌন্দর্য্য সবাই চায় যদিও প্রকাশ্যে সেটা অস্বীকার করতেই ভাল লাগে। উদ্ভট রকমের সাজপোশাক বা বিলাসিতা না করে সামান্য পরিশ্রমে ও ব্যয়েই যে আমরা সুন্দরী হতে পারি তা অনেকেরই হয়ত জানা নেই। নাকমুখ থ্যাবড়া হলে অবিশ্যি ভগবানের দান বলে মেনে নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশে আর উপায় নেই কিন্তু সেই থ্যাবড়া মুখই সামান্য মনোযোগ ও পরিশ্রম দ্বারা মনোমোহন করে তোলা যায়

প্রথমতঃ রঙের জৌলুস নিয়েই আলোচনা করা যাক। অনেকেরই মুখে একটা তেলতেলে ভাব লেগেই থাকে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে সেটা বেশী দেখা যায়। বাইরে পাউডার মেখে সেটা কিছুক্ষণ চাপা থাকে বটে কিন্তু তার সত্যি প্রতিকার কিছু হয় না।

প্রধানতঃ যকৃতের দোষে মুখের রং তেলতেলে হয়, তাই কিছুদিন ত্রিফলা খাওয়া আবশ্যক, বেশী তেলঘী না খাওয়া ও ফল বেশী করে খাওয়া উচিত। এই ত গেল আহারের নিয়ম, তাছাড়া সপ্তাহে একদিন একচামচ লেবুর রস ও এক চামচ গরম দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে তার প্রলেপ মুখে লাগাতে হবে। এইরূপে তৈরী ছানা যেন বেশ গরম থাকে। একবার প্রলেপ দিয়ে সেটা শুকিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে, তারপর দ্বিতীয়বার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে গেলে সেটা মুখে ঘষতে হবে। মুখ সর্ব্বদা ওপরের দিকে টান দিয়ে ঘষতে হয় এটা মনে রাখা দরকার, তা নইলে মুখের পেশী ঢিলে হয়ে যায়। যাদের মুখ বেশী তেলতেলে তারা সপ্তাহে দুবারও এই প্রলেপ লাগাতে পারে। এই সব মুখে যত কম স্নো, পাউডার ও ক্রীম মাখা যায় ততই ভাল ও রাত্রে শোবার সময় ঈষদুষ্ণ গরম জলে সাবান মেখে মুখ ধোওয়া উচিত। অনেক সাবান বেশী দামী হলেও চামড়ার পক্ষে বিষবৎ। দেশী সাবানের মধ্যে চন্দন ও বিলাতীর মধ্যে লাক্স ও পাম-অলিভ চামড়ার পক্ষে প্রশস্ত। এই সাবান তিনটির মধ্যে যে-কোন একটি ব্যবহার করা সকলের পক্ষেই ভাল। মাঝে মাঝে ছানার জল দিয়ে মুখ ধোওয়া তেলতেলে চামড়ার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

কারো কারো মুখের চামড়া আবার অত্যন্ত খসখসে ও শুখনো, এদের পক্ষে কোন ভাল ক্রীম মাখা প্রয়োজন। সময় ও সুবিধা থাকলে ঘরে তৈরী ক্রীমই সবচেয়ে ভাল। পাঁচটি ভেজানো বাদাম, অল্প দুধের সর বা কাঁচা দুধ, ছোট একটুকরো কমলালেবুর খোসা ও চারটি কালোজিরা বেটে এ মলম প্রস্তুত করতে হয়। স্নানের আগে এ মলম মুখে ঘষে কিছুক্ষণ শুকোতে দিতে হয়, তাহলে আর সাবান মাখার দরকার হয় না। বাস্তবিক, সাবান যত কম মাখা যায় ততই ভাল. কারণ বেশীর ভাগ সাবানই চামড়ার নিজস্ব জৌলুষ নষ্ট করে দেয়। বাদামবাটা মাখবার ও তৈরী করবার ধৈর্য্য যাদের নেই তারা খাঁটি বাদামতেল মাখতে পারে। এই তেল বড় ওষুধের দোকান ছাড়া কেনা ঠিক নয়, অন্য দোকানে ভেজাল বা গন্ধ মিশিয়ে দিতে পারে। রাত্রে এই তেল মেখে শুলে খুব অল্পদিনেই খসখসে চামড়া সুন্দর হয়ে ওঠে। বেশী দুধ খাওয়া খসখসে চামড়ার পক্ষে খুব দরকার। বাস্তবিক, আহার ও স্বাস্থ্যের উপর আমাদের রঙের জৌলুষ অনেকখানি নির্ভর করে।

এর পরের সংখ্যায় মুখের ব্রণ ও দাগ সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। যাঁরা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে চান তাঁরা আমাকে প্রশ্ন পাঠালে "মেয়েদের কথা"তে তার উত্তর পাবেন।*

---

*প্রশ্নকারিণীরা "রূপচর্চ্চা" এই নামে সম্পাদিকার ঠিকানায় চিঠি পাঠাবেন।

ঘরকন্নার কথা।

শ্রীপুষ্পলতা চৌধুরী।

গরম জলের ব্যাগ।

আমরা সবাই গরম জলের রবারের ব্যাগ ব্যবহার করি, বিশেষতঃ বাড়ীতে অসুখ হলে। কিন্তু অনেক সময়েই ব্যাগগুলি অনেকদিন পর ব্যবহার করতে হলে দেখা যায় কেমন যেন শক্ত মতন হয়ে গিয়েছে। সেজন্যই ব্যাগগুলো প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার করেও যদি ঠাণ্ডা জলে একটু এমোনিয়া (ammonia) দিয়ে সেই জল দিয়ে ধুয়ে রাখা যায় তাহলে অনেকটা গরম থাকে, রবারটাও সহজে নষ্ট হয় না।

মাছির দাগ।

মাছি বসে প্রায় ল্যাম্পের শেডে বা সিল্কের টেবিলের কাপড়ে কালো কালো দাগ করে রাখে। এগুলির বা কোন সুন্দর রঙ্গীন কাপড়ের কুশনের, যেটা ধোপাকে দিলে নষ্ট হতে পারে, দাগ পেট্রল দিয়ে সহজেই তোলা যায়। পেট্রল একটা ছোট গামলায় বা বাসনে ঢেলে তাতে কাপড়টা বার বার ডুবিয়ে তুলে নিতে হয় যতক্ষণ না দাগগুলি যায়। পেট্রলে ডুবালে কাপড়টা নষ্ট হবে না। পেট্রল সহজেই জ্বলে ওঠে সেইজন্য যেখানে উনুন বা অন্য কোনরকম আগুণ রাখা হয়েছে সে ঘরে এ সব কাজ করা উচিত নয়।

ঘি-তেলের দাগ।

এক চায়ের চামচ এমোনিয়ার সঙ্গে যদি ঠিক অতটাই এলকোহল মিশিয়ে নেওয়া হয় তবে উলের কাপড়ে যে অনেক সময়ে ঘি-তেলের দাগের মত পড়ে তা সহজে উঠান যায়।

চায়ের দাগ।

ভাল করে পাউডর বোরাক্স (powdered borax) জলে গুলে তাতে যে কাপড়ে চায়ের দাগ পড়েছে সেটা অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে অনেক সময়ে সে দাগটা সহজে উঠে যায়।

জলের দাগ।

ফুলদানিতে জল ভরে যদি একমিনিট একটা ব্লটিং কাগজের উপর রেখে তারপর কোন পালিশ করা আসবাবের উপর রাখা যায় তাহলে আর সেটাতে দাগ পড়ে না।

ভেলভেটিনের জামা।

ভেলভেটিনের জামা অনেকেই পরেন কিন্তু কাচতে অনেকেই জানেননা। ঠিকমত কাচতে পারলে কাপড়টা একটুও নষ্ট হয়না। অল্প-গরম জলে (warm water) সাবানের ফেনা করে বার বার কাপড়টা ডুবিয়ে তুলতে হবে, হাত দিয়ে চটকে তার ময়লা বের করে দিতে হবে, শেষে পরিষ্কার অল্প-গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে জলশুদ্ধ সেটা দড়িতে শুকোতে দিতে হবে, আর বেশ শুকিয়ে গেলে উল্টো দিকে ইস্ত্রী করে নিতে হবে।

গরম কাপড়।

উলের কাপড় বা নূতন গরম কাপড় কিনে এনেই পরলে দেখা যায় গায়ের

চামড়ায় কি রকম অস্বস্তি লাগছে। ওই কাপড় ঠাণ্ডা জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখবার পর একবার কেচে নিলে আর কুটকুট করবে না।

চোখের পাতা।

চোখের পাতা কালো, ঘন আর সুন্দর করতে হলে একটা মোলয়েম ছোট্ট ব্রস দিয়ে সাবধানে একটু ক্যাষ্টর-অয়েল লাগালে ভাল হবে; তেলটা চোখের ভিতরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিচয়।

বিলাত ভ্রমণ :

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র নন্দীর বহুপরিচিত পুস্তকটির নূতন পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তবু মেয়েদের দিক থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। লেখক ব্যবসায়ী, তিনি কবির দৃষ্টি নিয়ে দেশভ্রমণ করেননি বলেই তাঁর বই থেকে আধুনিকভাবাপন্ন মেয়েরা বিলেতের মেয়েদের ঘরকন্না, সন্তান পালন, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কাজের কথা জানতে পারবেন; সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ও দেশের মেয়েদের কাজকর্ম ও আমোদপ্রমোদের যে সকল বিশেষ সুব্যবস্থা আছে তার কথা পড়ে একটু ঈর্ষাও হবে।

বাংলার কবি :

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মজুমদার প্রণীত এই বইটি কিশোরসাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করল। বাঙালী বালককে নিজের জাতি ও সংস্কৃতিবিষয়ে সম্মান ও গৌরববোধ নিয়ে মানুষ করে তুলতে হলে অল্প বয়স থেকেই তাকে তার জাতীয়সাহিত্যের সহিত পরিচিত করে দেওয়া চাই; অথচ বালোচিত সরস ও সরল সাহিত্যালোচনার বই বাংলায় এ ছাড়া আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ!

বালিগঞ্জ।

প্রগতির মুখপত্র ও একটি বিশিষ্ট মতবাদের পরিপোষক হিসেবে এই পত্রিকাটি এবার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। এঁরা যে সস্তা ভাবোচ্ছ্বাসের গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে আত্মরক্ষা করে নিজেদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নাই; তবে মেয়েদের "বেশ ও আবেশ" সম্বন্ধে ভাবাতুরতা একটু কমলে পত্রিকাটির উন্নতি হবে বলে মনে হয়।

আমাদের কথা।

বর্ষার প্রাক্কালে "মেয়েদের কথা" সকলকে তার তৃতীয় অভিবাদন জানাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেরী হওয়ায় কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে এই সঙ্কটপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে বোধহয় আমরা আর আত্মরক্ষা করতে পারলাম না। কিন্তু দেরীর কারণ অন্যরূপ :—সম্পাদিকা গিয়েছিলেন শিলং পাহাড়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে। সেখান থেকে তিনি "আমাদের কথা" কে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, পথে, কেন জানা যায়নি, তার অত্যন্ত দেরী হয় তাই সমগ্র পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে থাকলেও কেবল ওই অংশটুকুর জন্য আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।

গরমের ছুটির জন্য শ্রীমিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পূর্বানুবৃত্তি এ মাসে প্রকাশ করা সম্ভব হলনা, ছুটির পর শেষাংশ বেরোবে। আশা করি এতে পাঠিকারা ক্ষুণ্ণ হবেননা।

এ মাসে অনিবার্যকারণে ছবি প্রকাশ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হলনা ; আগামী মাস থেকে "মেয়েদের কথা" কে সচিত্র করবার আশা রইল।

এবার "মেয়েদের খবর" অংশের পরিবর্ত্তে "পরিচয়" অংশ মুদ্রিত হল ; প্রতিবারে দুই অংশ একসঙ্গে প্রকাশিত করতে হলে পত্রিকার মূল বিষয়ের স্থান সঙ্কীর্ণ করতে হয়, তাই একমাস অন্তর পাল্টাপাল্টি করে ওই দুই অংশ বেরোবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে আবেদন করলে আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁদের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হবে। এতে যে শুধু তাঁদেরই লাভের সম্ভাবনা তা নয় এই পরিচয়ে গ্রাহিকারাও উপকৃত হতে পারেন।

"মেয়েদের কথা"র এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। অগ্রিম টাকা জমা দিলে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় পত্র দাখিল করিলে "মেয়েদের কথার" এজেন্সী লইতে পারা যায়। প্রতি মাসের প্রাপ্য প্রতি মাসে শোধনীয়। তিন মাসের টাকা বাকী থাকিলে এজেন্সী থাকিবে না।

২। মাসিক পাঁচখানার কম সংখ্যা লইতে হইলে প্রতি মাসে অগ্রিম মূল্য Stampএ পাঠাইতে হইবে।

৩। "মেয়েদের কথা" বিক্রীর কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা। ১০% অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় এজেণ্টের ব্যয়ে।

ম্যানেজার—"মেয়েদের কথা"

১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩৵৹ আনা ; যাণ্মাষিক মূল্য ১৷৹ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৵৹ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন ; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েদের কথা

সম্পাদিকা — শ্রী কল্যাণী সেন, এম, এ

যদি
হাসতে চান
সচিত্র ভারত
পড়ুন।
প্রতি সংখ্যা দুই আনা
নমুনার জন্য পত্র লিখুন।
২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

'অমিয় মলম'
চর্ম্ম রোগের
মহৌষধ।
১৩, ছকু খানসামা লেন।

সূচি পত্র—শ্রাবণ ১৩৪৮

সাওতালী মা

শিল্পী—সত্যজিৎ রায়,
শান্তিনিকেতন।

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৪৮ | ৪র্থ সংখ্যা

ব্যথা।

শ্রীসত্যেন্দ্র মজুমদার

আজি মম মর্ম্মনিকুঞ্জে
ধ্বনিল নব কার সুবর্ণ মঞ্জীর,
অতি ধীর॥

বাহিরে বরষা আসে
সুরভিত ফুলবাসে,
স্বপ্নমগন বীথি
আঁধার জড়ানো বনানীর॥

মেঘের কাজল ছায়া
আনিল সুদূর মায়া,
ওগো চলে চলে যায়
ভাসায়ে আমার মনতটিনীর তীর
আকুলি কাঁদিয়া যায় সজল সমীর
অতি ধীর॥

কালিদাস সাহিত্যে নারী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুকুমারী দত্ত।

মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়িকা মালবিকা। কিন্তু নায়িকা হইলেও সে নাটকের প্রধান চরিত্র নহে, বরং অন্যান্য নায়িকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। উর্ব্বশী অথবা শকুন্তলার একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, মালবিকার সেরূপ কিছু নাই বলিলেই হয়; ঘটনার স্রোতকে সে সাহায্যও করিতে পারে নাই, বাধাও দেয় নাই। ইহার একটি কারণ বোধ হয় মালবিকা পরাধীনা। এক দিক হইতে অবশ্য শকুন্তলা এবং উর্ব্বশীও পরাধীনা, একজনের অভিভাবক কণ্ব, অপরের ইন্দ্র; কিন্তু মালবিকার পরাধীনতা একটু অন্য প্রকার। যে প্রবল পরাক্রান্ত ধারিণী দেবীর অনুগ্রহে সে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পাইয়াছে তাঁহারই স্বামী অগ্নিমিত্র তাহার প্রতি অনুরক্ত, এ অনুরাগ যদি সে প্রকাশ্যে শিরোধার্য্য করিত তবে তাহার অবস্থা সত্যই বিপন্ন হইয়া উঠিত। তাই বোধ হয় সে এত নীরব, এত নিষ্ক্রিয়। তাহার উপর সে নিতান্ত তরুণযৌবনা।

নাট্যাচার্য্যে মুখে শুনা গিয়াছে মালবিকা নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পটু, এবং বুদ্ধিমতী। রাজা অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার প্রথম সাক্ষাৎ প্রেক্ষাগৃহে। নৃত্যরতা মালবিকা রাজাকে দর্শকের আসনে দেখিয়া গাহিয়া উঠিল "হৃদয়,—নিরাশ হও,—তোমার বাঞ্ছিতজন দুর্লভ।......আমি পরাধীনা তবু উদাসীনা নহি।" এ গান নাট্যাচার্য্য আর্য্য-গণদাসের রচনা নহে, মালবিকার হৃদয়ের রচনা। ইহার সহিত সাদৃশ্য আছে শকুন্তলার পদ্মপত্রের আর উর্ব্বশীর ভূর্জ্জলিপির। তবে মালবিকা ইহাদের অপেক্ষাও বালিকা তাহার উপর চতুর্দ্দিকে সমাজের কঠোর শাসন, রাজপ্রাসাদের গণ্ডী-বন্ধন সর্ব্বোপরি ধারিণী দেবীর রোষকটাক্ষ; তাই স্বভাবতঃ মালবিকা বড় ভীরু,—বড় অসহায়।

তৃতীয় অঙ্কে প্রথম মালবিকাকে স্পষ্ট দেখা গেল। একাকিনী কাননে আসিয়াছে দেবীর আদেশে রক্তাশোকতরুকে দোহদ দিতে। দেবী বলিয়াছেন দোহদ দেওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে যদি পুষ্পোদ্গম হয়, তবে মালবিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাহার মনোবাঞ্ছা! মালবিকার সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। একটু নিভৃতে কাঁদিয়া মনের ভার লঘু করিবার অভিলাষে সে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে একটি

সখী পর্য্যন্ত নাই, থাকিলে বোধ হয় সে লজ্জায় নীরব রহিত. পাঠক তাহাকে বুঝিত না। এই একাকিনী তরুণীর হৃদয়বেদনার উচ্ছ্বাস শুনিলে সত্যই করুণা হয়। প্রথম কথাই সে বলিল,—"মহারাজকে মনোগত কথা বলিয়া নিজের কাছেই লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।" হায় স্বল্পভাষিণী! পরাধীনতার দুঃখে যক্ষবধূও বুঝি এত ব্যাকুল হয় নাই। অথচ এত মধুর স্বভাব ইহার যে ধারিণীদেবীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পর্য্যন্ত নাই। বিধিলিপি বলিয়া সে সমস্ত অবস্থাচক্রকে নীরবে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া নিজের বেদনায় একাকিনী দুঃখভোগ করিতেছে। মনে পড়ে 'রত্নাবলী'র সাগরিকার কথা সে-ও এমনই এক অন্তঃপুরিকা, মদনের চক্রান্তে এবং দুর্ণিয়তির ফলে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইত,—এমনিই নির্জ্জন তরুকুঞ্জে আসিয়া সে-ও দুঃসহ হৃদয়বেদনায় অশান্ত হইয়া উঠিত। তবু মালবিকা যেন সাগরিকা অপেক্ষাও অসহায়,—সে যে কি চায়, তাহা সে নিজেও স্পষ্ট বুঝে না। এই কারণেই বোধ হয় মালবিকার মূর্ত্তি এত করুণ, এত দুর্ব্বল, অথচ এত সুন্দর! মহিষীর আদেশে দোহদ দিবার জন্য সে রক্তাশোকের কাছে আসিল, কিন্তু অশোকবৃক্ষটি দেখিয়াই তাহার রুদ্ধবেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অশোকের দিকে চাহিয়া সজল-নেত্রে বলিল,—'এই ত সেই অশোকতরু:—ফুলের সাজ নাই, আমারই মত কি এক অভিলাষে কাহার দিকে যেন চাহিয়া আছে!' সে দোহদ দিয়া গেলে অশোকের ফুল ফুটিবে, কিন্তু তাহার অন্তর কি চিরদিনই রিক্ত থাকিবে,—সেখানে দোহদ দিতে কেহ আসিবে না? অশোকের ছায়ায় শিলাফলকে বসিয়া আবার আত্মগত হইয়া বলিতে লাগিল,—'হৃদয় দুর্লঙ্ঘ্য-লঙ্ঘনের নিরবলম্বন বাসনা ত্যাগ কর।'

সখী বকুলাবলিকা আসিয়া দোহদের নিমিত্ত নূপুর-অলক্তকে তাহাকে সাজাইতে বসিল। হৃদয় অশান্ত,—নানা সংশয়ে সংক্ষোভে আন্দোলিত, এ অবস্থায় এত সাজসজ্জা মালবিকার ভাল লাগিল না, কিন্তু কি করিবে—দেবীর আদেশ। মনে মনে শুধু বলিল,—'এ তবে আমার মরণ-সজ্জা হউক।'

বকুলাবলিকা ধীরে ধীরে কথাটা পাড়িল। এমনই চিত্ত অস্থির ছিল তাহার উপর বকুলাবলিকাও সময় বুঝিয়া সঙ্কেত করিল; মালবিকা আর আত্মগোপন করিতে পারিলনা, রুদ্ধ উৎসের মুখ খুলিয়া গেল। কতকটা কথা কহিয়া হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া আসিতেছে, এমন সময় সহসা মহারাজ স্বয়ং দেখা দিলেন। মালবিকা লজ্জায় নম্রনয়না হইয়া রহিল,—মৃদুস্বরে শুধু বলিল,—'মহারাজের জয় হউক।' সে জানে, সে সামান্য পরিচারিকা মাত্র,—তাই স্বেচ্ছায় অধিকার লঙ্ঘন করিল না। মালবিকার এই চিত্রটি বড়ই মনোরম।

রাজার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের সম্মুখে শান্তস্মিত মুখে কম্প্রতনু ভীরু তরুণী দাঁড়াইয়া আছে। —স্বভাবতঃই সে স্বল্পভাষিণী, তাহার উপর প্রার্থিতদুর্লভ মহারাজ স্বয়ং এত নিকটে,—কুণ্ঠায়-দ্বিধায় বেপথুমতী এই তন্বীর আলেখ্যটি সত্যই মনোরম,—নারীচরিত্রের মধুর লজ্জা জড়িয়া যেন রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পর কোথা হইতে সহসা ইরাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি যেন মালবিকাগ্নিমিত্রের দুর্ব্বাসা! ব্যর্থ প্রণয়ের রুদ্ধ ক্ষোভ অভিশাপের মত বর্ষণ করিয়া ইরাবতী চলিয়া গেলেন; কালবৈশাখীর এই অকাল আবির্ভাবে বসন্তের সমস্ত আয়োজন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

ইরাবতীর রোষে পড়িয়া মালবিকাকে পাতালকক্ষে বন্দিনী হইতে হইল। শকুন্তলা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন কতকটা নিজের দোষে, উর্ব্বশীকেও নিজের অন্যায়ের প্রতীকার করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু মন্দভাগিনী মালবিকা দণ্ড পাইল কাহার অপরাধে?

পাতালকক্ষে চিত্রগত রাজাকে দেখিয়া সরলস্বভাবা মালবিকা সত্য রাজা মনে করিয়া কখনও রাগ করিল, কখনও দুঃখ করিল কখনও বা অভিমান করিল; কিন্তু প্রকৃত অগ্নিমিত্র যখন দেখা দিলেন তখন সেই পূর্ব্বের ন্যায় লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিল।

মালবিকার চরিত্রে শকুন্তলা বা উর্ব্বশীর ন্যায় নারীর মহিমা জয়যুক্ত হইয়া উঠে নাই। সে ভীরু, সামাজিক অনুশাসনের ভ্রূভঙ্গকে হেলাভরে উপেক্ষা করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই, তাই অনুরাগ প্রবল হইলেও বাসনা তাহার কখনও উদ্বেল হইয়া উঠে নাই। এই জন্যই শেষ দৃশ্যে যেখানে মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের মিলন, সেখানেও মালবিকা ভয়কম্পিত মনে অভাবনীয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র; মিলন হইল বলিয়া সে বিহ্বলভাবে আবেগ প্রকাশ করিতেও পারে নাই, আবার না হইলে কাহারও বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগও থাকিত না। এই দ্বিধাজড়িত লজ্জাকাতর ভাবটিই মালবিকার চিত্রটিকে এত কোমল, এত সুকুমার করিয়া তুলিয়াছে। তাহার প্রেমে পূর্ণতার ঐশ্বর্য্য নাই,—কেবল প্রথম বসন্তের নব-উদ্গত কিশলয়ের মত একটা তরুণ লাবণ্য আছে, উজ্জ্বলতা নাই, শুধু নবোন্মেষিত অরুণরাগের মৃদু দীপ্তিটুকুই আছে।

তিনখানি দৃশ্যকাব্য ব্যতীত কালিদাসের আর তিনখানি শ্রব্যকাব্য আছে,—কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত। মেঘদূতের যক্ষবধূকে নায়িকা বলা চলে না, কাব্যের মধ্যে তাহার কোন কথা বা কার্য্যের ইঙ্গিত নাই, বিরহোন্মত্ত যক্ষের উচ্ছ্বসিত প্রলাপের মধ্যেই তাহার যাহা কিছু পরিচয় এবং এ পরিচয়কেও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

কুমারসম্ভবের নায়িকা হিমালয়ের দুহিতা গৌরী। মহাদেব তপস্যা করিতেছেন জানিয়া গৌরী পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহার সেবা উপচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে পার্ব্বতীর সেবা গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাতে পার্ব্বতীর সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। তাই একদিন তিনি মদনের শরণ লইলেন। পুষ্পের আভরণে সাজিয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় ধীরে ধীরে তপোবনে দেখা দিলেন। আবার সেই তপোবনে তাপস-বিরোধীভাব—তাহার অনিবার্য্য ফলও দেখা দিল। মদন সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিল বটে কিন্তু রুদ্রের প্রচণ্ড হুঙ্কারে সে বাণ ব্যর্থ হইল, সে স্বয়ং ভস্ম হইয়া গেল। বসন্তের অজস্র ঐশ্বর্য্য নিফল হইল। যৌবনের প্রগল্‌ভ সৌন্দর্য্যের মর্ম্মান্তিক অপমান সহিয়া পার্ব্বতী ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু ইহাতে তাঁহার রোষ নাই, ক্ষোভ নাই, অভিমান আছে, কিন্তু সে অভিমান আত্মঘাতী নহে, প্রিয়জনকে লাভ করিবার বাসনায় এবার তাহা তপস্যার আকারে দেখা দিল। কঠিন ব্রতে পার্ব্বতী দীক্ষা লইলেন গ্রীষ্মে চতুর্বহ্নির মধ্যে বসিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া, বর্ষায় ভূমিশয্যায় শুইয়া, শীতে সরোবরে আকণ্ঠ নিমগ্ন রহিয়া, সেই ক্ষণিক বিভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। মদনভস্মে তাঁহার জীবনের যে অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছিল, এবার তিনি তাহাকে তপস্যার পুণ্যধারায় ধুইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন। তাই পূর্ব্বে মদনও বসন্তের মিলিত চেষ্টায় যাহা হয় নাই, পঞ্চতপা পার্ব্বতীর একাগ্রনিষ্টায় এখন তাহা সহজেই সম্ভব হইল। এবার পার্ব্বতীর প্রেম অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায়, মদনের সমস্ত প্রভাবের বহির্ভূত, তাই স্বর্গে মর্ত্তে কেহ তাহার বিরোধী হইল না, এমন যে মহাদেব কালভৈরব বেশে মদনকে দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিলেন এবার তিনি স্বয়ং প্রার্থিবেশে দ্বারে উপস্থিত।

ছদ্মবেশী মহাদেব যখন নিজের নিন্দা করিতে লাগিলেন, তখন পার্ব্বতী বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না, সামান্য কয়েকটি যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেষ উত্তর দিলেন—'আমার হৃদয় মহাদেবের উদ্দেশে একনিষ্ঠ।' মনে পড়ে সাবিত্রীর কথা, তিনিও বলিয়াছিলেন—'সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে'—কন্যার সম্প্রদান একবারই হয়। এত গভীর প্রেমকে মহাদেব অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না, হাসিয়া স্বরূপ ধারণ করিলেন। হিমালয় মেনকার অনুমতিক্রমে হরগৌরীর বিবাহ হইল;—উর্দ্ধলোক হইতে সপ্তর্ষির আশীর্ব্বাদ আসিয়া এ মিলনকে অভিষিক্ত করিল। (ক্রমশঃ)

* * * *

মুখোস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

(২)

অপ্রাপ্তবয়স্ক চুণীলাল বিপুল সম্পত্তির মালিক হইলেন। মাথার উপর তেমন অভিভাবক কেহ ছিল না দেখিয়া মধুর চারিপাশে মক্ষিকা যেমন অনাহুত আসিয়া উপস্থিত হয়, কুসঙ্গীগণ তাহাকে করতলগত করিবার জন্য তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু জমিদার দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করিতেছিলেন একদিকে উমা ও তন্দ্রা, অন্যদিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নায়েব মশায়। কাজেই তাহাদের সাধুসঙ্কল্প প্রতিহত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা হাল ছাড়িল না, অসীম ধৈর্য্যসহকারে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিল।

কিছুদিন হয় তন্দ্রার স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছিল, ডাক্তারের পরামর্শ মত তাহাকে ও উমাকে কিছুদিনের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে পাঠানো হইল। শিমুলতলায় তাহাদের বাড়ী ছিল, চুণীলালের পীসতুতো ভাই অধর ও পুরাতন দরোয়ান চাকর সঙ্গে দিয়া চুণীলাল তাহাদের পাঠাইয়া দিলেন। তখন নায়েবমশায় খুব অসুস্থ, সদর খাজনার তারিখ সমীপবর্ত্তী সুতরাং চুণীলাল সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। কিস্তির সময় অতীত হইয়া গেলেই যাইবেন স্থির হইল।

স্বামীকে ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া উমার বড় একা একা মনে হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার মন টিকিতে চায় না। সে চুণীলালকে সত্বর চলিয়া আসিবার জন্য মাথার দিব্যি দিয়া চিঠি লিখিল। উমা বিবাহের পর স্বামীকে ছাড়িয়া দুই চারিদিনের বেশী থাকে নাই; স্বামীর সহিত পত্র বিনিময় তাহার জীবনে এই প্রথম। তাহার জীবন এই নতুনত্বের আস্বাদ পাইয়া মাতিয়া উঠিল। প্রতিদিন আট দশ পৃষ্ঠার একখানা করিয়া চিঠি আসিত, চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে সে কি অনুরাগ, সে কি উচ্ছ্বাস, সে কি ভাষা! পড়িয়া প'ড়িয়া উমার আশা মিটেনা। স্বামী যে দূরে আছেন, তাহাও সে ভুলিয়া যায়, চিঠির প্রতিটি ছত্র যেন স্বামীর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার অঙ্গে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যায়।

উমা আর তন্দ্রা দূরে, নায়েবমশায় অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আছেন এই পরম সুযোগ লইয়া গ্রামের সেই হীনচেতা অধঃপতিত যুবকগণ জমিদারকে গলাধঃকরণ করিবার জন্য তাহাদের সমুদয় কৌশল প্রয়োগ করিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইল। পাপের রঙ্গীন নেশায় চুণীলাল লুব্ধ হইলেন, অবশেষে তাঁহার পদস্খলন হইল।

প্রথম প্রথম তিনি অনুতপ্ত হইতেন, উমার কাছে অবিশ্বাসী হইলেন ভাবিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন, কিন্তু পাপের পথ অতি পিচ্ছিল, সে পথ হইতে ফিরিতে পারিলেন না; নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুসঙ্গিগণ তাঁহার হাত ধরিয়া অধঃপতনের ধাপে ধাপে নামাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিয়া গেল।

বিদেশে উমা স্বামীর বিরহ ব্যথা স্বামীর প্রেমপূর্ণ চিঠির দ্বারা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতেছিল।

ক্রমে চিঠির আকার ছোট হইয়া আসিতে থাকে, সময় মত চিঠি আসেও না, উষাকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উমা পথের দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর চিঠি পায় না। তার পর চিঠি আসা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। উমা ত ব্যস্ত হইয়া কত কান্নাকাটি করিয়া কত অভিমান করিয়া চিঠি লেখে, কিন্তু উত্তরে মানভঞ্জনের সেই সব মধুর সম্ভাষণ, বুক জুড়ান ভাষা, কিছুই আসে না। উমা ভাবিয়া পায় না কেন এমন হইল।

একটু সুস্থ হইয়া নায়েবমশায় গ্রামে আসিয়া চুণীলালের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি চেষ্টা করিলেন ওই সব আব্‌হাওয়া হইতে তাঁহাকে দীর্ঘদিনের জন্য উমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া উমাকে চলিয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস উমা আসিলেই সমস্ত ঠিক্‌ হইয়া যাইবে।

উমা আসিল, ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই স্বামীর দর্শনাশায় তাহার দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথায় স্বামী? গাড়ী লইয়া কর্ম্মচারী আসিয়াছে। তন্দ্রাকে দিয়া উমা স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাইলেন কর্ম্মচারী "হ্যাঁ একরকম ভাল—" এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলিতে বলিতে সরিয়া গেল।

গাড়ীতে বসিয়া উমার সময় যেন আর ফুরায় না। দারুণ উৎকণ্ঠায় তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল, আর কত দেরি? সেই চিরবাঞ্ছিত ধন লাভ করিতে আর কত দেরী?

দীর্ঘ সময় পরে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর ফটকে ঢুকিল আগ্রহদৃষ্টিতে উমা ফটকের

ভিতরে চাহিল, নিশ্চয়ই স্বামী সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু স্বামী সেখানেও নাই। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে উমা শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিল, কাহার দুইটী ব্যগ্র বাহুর আলিঙ্গনের আশায় তাহার দেহ মন পিপাসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথায় স্বামী ? অভাগা নারী অস্নাত. অভুক্ত, অবস্থায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল, রাত্রি হইল, আবার প্রভাত আসিল, উমা তাহার স্বামীর দেখা পাইল না।

উমা আসিলেই নায়েব মশায় চুণীলালকে সংবাদ পাঠাইলেন। চুণীলালের বুকের মধ্যে শোণিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, উমার কাছে ছুটিয়া যাইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে দমন করিয়া রাখিলেন। উমা তাঁহার পুণ্যময়ী দেবীপ্রতিমা উমা! তাহার কাছে এ জীবনে গিয়া দাঁড়াইবার চুণীলালের অধিকার আছে কি? তাঁহার এই কলুষিত দেহ লইয়া উমাকে স্পর্শ করিবার তাঁহার আর অধিকার নাই। নিজের দোষে উমাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই।

চুণীলাল তখন যদি উমার কাছে আসিয়া উমার হাত ধরিয়া নিজের দুর্ব্বলতার কথা বলিয়া ক্ষমা চাহিতেন, হয়তো উমা ক্ষমা করিয়া হাত ধরিয়া পাপের পিচ্ছিল পথ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিত। কিন্তু স্ত্রীর সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। সেই অধঃপতিত বন্ধুগণের সংসর্গে কদর্য্য আবহাওয়ার সময় সময় তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিত, তখন উমার মধুময় সঙ্গের স্মৃতির দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি অধিক পরিমাণ মদ্য পান করিয়া মাতাল হইয়া থাকিতেন।

উমা স্বামীর অধঃপতনের সংবাদ পাইল. কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার সেই স্বামী! একি সম্ভব! দেখা হইলে একটিবার জিজ্ঞাসা করিবে এই আশায় সে অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় শয়ন গৃহে একভাবে বসিয়া রহিল। একটিবার দেখা, তাহা হইলেই সব মিটিয়া যাইবে। ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটিয়া সে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর একটিবার তাকে দেখতে দাও।" কিন্তু স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ভয়ে চুণীলাল কলিকাতা পলাইয়া গেলেন। শুনিয়া উমা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "একটিবার দেখা দিয়েও গেলেন না? তিনি কি ভাবেন তাঁর সুখের পথে আমি কাঁটা হব? এত দিনেও কি তিনি তাঁর উমাকে চিনিতে পারেন নাই?" সে কাহারো কাছে কোনরূপ অভিযোগ করিল না পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের কাজে ও কন্যার সেবায় নিজেকে নিমগ্ন করিয়া রাখিল।

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ভয়ে চুণীলাল কিছুদিন কলিকাতায় গিয়া রহিলেন, তারপর

গ্রামের বাহিরে ষ্টেশনের কাছে বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন এবং মদ্যপানে মাতাল হইয়া নিজের অতীত জীবনের সুখ শান্তি ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যাবেলা উমার বন্ধু অলকা তাহাকে দেখিতে আসিল। উমাদের বাড়ীর কাছেই অলকার শ্বশুরবাড়ী। উমা ও অলকার একদিনেই বিবাহ হয়। অলকার স্বামী বিদেশে কাজ করে, অলকা তাহার স্বামীর কাছেই থাকে। এখন কিছুদিন ছুটি লইয়া তাহারা দেশে আসিয়াছে।

অলকার সহিত উমার অত্যন্ত ভাব ছিল। তাহাদের বধূ জীবনের কোনো একটা ঘটনাও পরস্পরের কাছে অবিদিত থাকিত না। অলকা কাল আসিয়াছে, আসিয়াই উমার স্বামীর অধঃপতনের সংবাদে বিস্মিত হইয়াছে। অত ভালোবাসা! তাহার এই পরিণতি! প্রভাতেই ব্যাপার জানিবার জন্য সে উমার কাছে ছুটিয়া আসিল।

বসিবার ঘরে দুই সখী মুখোমুখী হইয়া বসিল। উমা একটু ম্লান হাসিয়া অলকার হাত ধরিয়া বলিল "কবে এলি অলকা?"

"কাল এসেছি। এসেই তোর কাছে আসবার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি। কেমন আছিস্‌ উমা?"

নতনেত্রে মৃদুস্বরে উমা বলিল, "ভালোই আছি।" অলকা দেখিল তাহার সদা হাস্যময় মুখের উপর বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া চোয়াল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়া সেই লাবণ্যময়ী যুবতীকে বৃদ্ধার ন্যায় দেখাইতেছে।

অলকা ব্যথিতা হইল। কিছুক্ষণ উমার আনত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যা, শুনলাম, সে কি সব সত্যি? আমার কাছে লুকোস্‌নে উমা।"

উমার নত মস্তক আরো নত হইয়া পড়িল। তাহার বিবাহিত জীবনের কত সুখ সৌভাগ্যের গল্প নিরিবিলি বসিয়া সে এই সখীর কাছে বলিয়াছে, "তোর কাছে আস্‌ব কি, চব্বিশ ঘণ্টাই তোর বর তোকে আগ্‌লে ব'সে আছে" এই সব খোঁটার মধ্যে উমার স্বামীসৌভাগ্যই সূচিত হইত। আর আজ সেই সখীর কাছে তাহার জীবনের

দীনতা সে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? তাহার নীরবতা দেখিয়া অলকা বলিল, "তবে সব সত্যি। কি ক'রে এ সম্ভব হ'ল উমা?"

উমা চকিতে একবার দৃষ্টি তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল। অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমার ভাগ্য!"

অলকা সখীর হাতের চুড়ী বালা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ফেরাবার জন্য চেষ্টা করিস্ নি?"

উমা মৃদু হাসিল, কথা বলিল না।

অলকা উমার কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া বলিল, "শরীর তো গেছে, এ দেখেও তাঁর চৈতন্য হয় না?"

"কি ক'রে দেখ্‌বেন? ভিতরে তো আসেন না।"

"তুই ডেকে পাঠাস্‌নে কেন?"

উমা আবার ম্লান হাসিল।

উমার দুই হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া অলকা বলিল, "এমন ক'রে অভিমান ক'রে থাকিস্‌নে উমা! তোর স্বামী এমন ক'রে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছেন, তুই সহধর্ম্মিণী হ'য়ে কোনোই প্রতীকার কোর্‌বিনে? তুই তো শুধু তাঁর বিলাসসঙ্গিনী নোস্, তুই তাঁর সহধর্ম্মিণী। অভিমান ছেড়ে তুই তাঁকে উদ্ধার কর উমা! তোর স্বামীকে তুই সুপথে ফিরিয়ে আন্।

উমা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, "আমার কি সাধ্য আছে বল্?"

অধীর হইয়া অলকা বলিল, "তোর সাধ্য নেই তো কার আছে? যদি কেউ তাকে পাপের পথ থেকে ফেরাতে পারে, তবে সে তুই পারিস্। আমাকে কথা দে উমা, তুই চেষ্টা কর্‌বি?"

এমন সময় চারি বৎসরের বালিকা কন্যা তন্দ্রা ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কোলের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। খুসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিল, "বলতো মা মণি আজ কিসের দিন?" মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া মা বলিল জানিনে তো মা!" "তুমি কিছু জান না মা!" মেয়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল "আজ আমার জন্মদিন। বাবা বল্‌লেন চার বছর আগে এম্‌নি দিনে আমি জন্মেছিলাম। আর আজ জন্মদিনে বাবা আমাকে এই বেনারসী

আর হীরের দুল দিয়েছেন, কোলে নিয়ে তিনটা পাঁচটা চুমু দিয়ে বলেছেন সুখী হও। বাবার চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছিল, কেন মা— ?"

অলকা ও উমা কোনোরকমে চোখের জল সাম্‌লাইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

তন্দ্রা মায়ের চিবুক ধরিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দেখেছ মা, কি সুন্দর বেনারসী, আর কেমন ঝক্‌ঝকে দুল" তন্দ্রা বেনারসীর আঁচলের একাংশ তুলিয়া মাকে দেখাইল, হীরার দুলের প্রতিও মার মনোযোগ আকৃষ্ট করাইল।

"তুমি আমাকে কি দেবে মা ?" মেয়ের কণ্ঠে আব্‌দার ফুটিয়া উঠিল।

পুলকে উমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উমাকে ভুলিয়া গেলেও তনুকে ভোলেন নাই ; তবে আর উমার কিসের দুঃখ ? মেয়ের মস্তক চুম্বন করিয়া উমা বলিল, "কি তোমার চাই বল।"

"আচ্ছা বাবাকে জিজ্ঞেস্ করে আসি—" মায়ের কোল হইতে নামিয়া তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেছিল, অলকা হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল জন্মদিনে বাবা কেমন সাড়ী, কেমন দুল দিলেন, কই, আমাকেতো দেখালে না ?"

তন্দ্রা এতক্ষণে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি দেখিয়া সঙ্কুচিত হইল এবং নিজের পরিহিত সাড়ীর দিকে বার বার চাহিয়া হাত দিয়া কানের দুল স্পর্শ করিয়া তাহাকে বুঝাইল যে এই শাড়ী আর দুল সে আজ পাইয়াছে।

উমা বলিল, "তনু, তোমার অলকামাসীকে প্রণাম কর।"

ডাগর চোখ্ চাহিয়া প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইতেই অলকা তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলিল, খাসা সাড়ী দুল হয়েছে তোমার। তোমার বাবাকে এখানে ডেকে আন্‌তে পার তনু ?"

তন্দ্রা বলিল, "বাবাতো এখানে নেই, অনেক দূরে গেছেন, তাঁর যে অনেক কাজ, তাই আস্‌তে পারেন না।"

অলকার চক্ষু জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। হায়রে একদিন উমার সঙ্গ লাভের চেয়ে বড় কাজ উমার স্বামীর ছিল না। জগৎটা কি এমনি পরিবর্ত্তনশীল ? ভালোবাসা কি এমনি ভঙ্গুর ?"

আরো কিছুক্ষণ কথোপকথনের পরে অলকা চলিয়া গেল। অবসন্ন দেহে উমা গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

পাঠশালা।

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী

স্থান :—পাঠশালা ঘর—টিচারের বসবার জন্ত চেয়ার বা টুল—মেয়েদের জন্ত বেঞ্চ ও ডেস্ক্ এক কোণে একখানা ঝাঁটা। অন্ত কোণে ব্ল্যাক্ বোর্ড—তাতে লেখা আছে :—

"স্কুল বাড়ীটা শাদা,
ছাত্রীগুলো গাধা,
বেঞ্চিগুলো সরু,
টিচারগুলি গরু।"

কাল :—পাঠশালা বসবার ঠিক পুর্ব্বে।

পাত্রী :

টিচার ও ছাত্রী :—

১। কুসুমকুমারী।
২। মাতঙ্গিনী।
৩। পাঁচি।
৪। ফুলটুসী।
৫। খেঁদুমণি।
৬। পুটি।

পোষাক :—

টিচারের খুব ফুলিয়ে কুঁচিয়ে মাড় দেওয়া "ধোপদস্ত" শাড়ী পরা। ব্রহ্মতালুতে "উবৃদো" খোঁপা। চোখে চশমা। কনুই অবধি জামার হাতা। লেস্ বসানো শাদা জামা। কালো পাড় শাদা শাড়ী। হাতে কোনও গয়না নাই (একটা ছেলেদের "হাতঘড়ি" থাকতে পারে)। পায়ে খুব ছেঁড়া (দরকার হ'লে কালি দিয়ে বাঁধা) উঁচু হীলের জুতো। ছাত্রীদের সাধারণ করে পরা, কাঁধে গিঁট বাঁধা বা মস্ত "সেফ্‌টিপিন" লাগানো, অথবা "গাছকোমর" বাঁধা শাড়ী। শাড়ী যেন পরিষ্কার না হয় (দরকার হ'লে নোংরা করে

নেওয়া যেতে পারে)। ডুরে, চৌধুপী, নীলাম্বরী (খুব রং ওঠা) বা পুরোণো শাড়ী ছেঁড়া হলেও ক্ষতি নাই। চোখে বেশী করে কাজল—চুলে খুব বেশী তেল—কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মাথায় টেনে বাঁধা "ঘুঁটে খোঁপা" অথবা "ন্যাড় খোঁপা" বা "বেড়া বিনুনি"। দুয়েক জনের ভিজা চুল খোলাও থাকতে পারে। দুএকটির চুলে জবাফুল থাকতে পারে। জামাগুলির কনুই অবধি হাতা—"ম্যাজেণ্টা" হলুদে অথবা খুব কটকটে নীল বা সবুজ রঙ্ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঠাকুরমা, দিদিমাদের আমলের "জ্যাকেট" ধরণের জামা—অনেক কুঁচি, প্লিট, রিবণ, হলদে ও কালো লেস্ ইত্যাদি বসানো। প্রায় সকলেরই নাকে নোলক। কারো কারো খালি পা, কারো পায়ে ছেঁড়া চটি। হাতে অল্প স্বল্প "সেকেলে" গয়না। মাতঙ্গিনীর মুখে হলুদ মাখা। টুসির গায়ে মোটা গরম জামা। মেয়েদের হাতে কতগুলি ছেঁড়া বই-খাতা ও শ্লেট পেন্সিল। (কলরব করতে করতে ছাত্রীদের প্রবেশ)।

১। হ্যাঁ ভাই, তোর রঙ্টা দিন দিন অমন্ ফাক্সা পারা হচ্ছে কি করে? আমি তো কত ঝামা ঘসলুম—কিছুই হ'ল না।

২। তা জানিস না, আমার মা যে আমায় রোজ হলুদ বাটা মাখিয়ে নাইয়ে দেয়।

৩, ৪। অ...মা, তাই তোর গাল দুটো অমন ডগ্ ডগ্ করছে!

৫। (চুপি চুপি, ৬এর প্রতি) আজ ভাই একটা খাসা জিনিস এনেছি তোর জন্য—তুই কিন্তু লাষ্টো বেঞ্চিতে বসিস।

১। হ্যাঁরে বোর্ডে ও সব লিখলে কে?

২। অমা তাই তো গো—মুছে ফেল্, মুছে ফেল্!

(সকলের তাড়াতাড়ি মুছবার চেষ্টা—কেউ আঁচল দিয়ে—কেউ হাত দিয়ে—
একজন ঝাঁটা দিয়ে)

৩। ওরে—চুপ চুপ—দিদিমণি আসছে যে!

(টিচারের প্রবেশ)

(সকলে—দাঁড়িয়ে উঠে)

"গুড······ম······র্ণিং দিদিমণি······!

টি। তা বেশ, বেশ—তোরা সব বোস্।

(মেয়েদের উপবেশন)

টি। (খাতা খুলে)—কুসুম কুমারি!

১। "এজ্ঞে উপস্থিত!"

টি। মাতঙ্গিনী!

২। দিদিমণি, উপস্থি......ত।

টি। পাঁচি!

৩। এজ্ঞে আমি উপস্থিত!

টি। ফুলটুসি!

৪। উপ······স্থিত!

টি। খেঁদি!

৫। এজ্ঞে আমি এইচি!

টি। পুঁটি।

৬। এঁ্যা?

টি। এঁ্যা কি রে—আজ্ঞে বলবি।

৬। এজ্ঞে···এঁ্যা?

টি। তা বেশ বেশ—পড়া শিখে এসেছিস?

সকলে। এজ্ঞে দেখুন এইচি।

টি। আ··চ্ছা, টুসি—বানান্ কর তো অচল।

৪। অচল? অচল? দিদিমণি, অচল? স্বরে অ, চয়ে আকার—

টি। হয়নি—

৩। "খুঁক খুঁক খুঁক" (আঁচলে মুখ ঢাকল)

টি। তুই হাসছিস যে পাঁচি—বানান কর তো ছাগল।

৩। এই—আজ্ঞে—মানে—ইয়ে—ওই যে......ছয়ে আকা······র গ······অ, আর ল···অ।

টি। তা বেশ,···বে···শ। বানান কর তো বাগান।

৩। বয়ে আকা......র, গ......অ, আর ল......অ।

টি। হয়নি—তুই ওটা পাঁচবার লিখে আনবি।

৩। (চোখে আঁচল দিল—মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকাচ্ছে)

টি। তোদের যে পদ্যটা শিখিয়েছিলাম। মনে আছে?

সকলে। এজ্ঞে—আ······ছে।

৩। (সোৎসাহে)—এজ্ঞে আমি বলব ?

টি। না, কুসুমি বল্।

১। (মৃদুস্বরে) এ......এ......পাখী সব......এ এ করে......এ এ......

টি। জোরে বল্ বাড়ী থেকে কি ভাত খেয়ে আসিস নি ?

১। (চীৎকার করে) এ......এ পাখী সব করে......এ এ রব......রাতি পোহাইল কাননে এ......এ... . এ......এ......কুসুম ফুল......এ এ......রাতি পোহাইল। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) রাঁখাল এঁ এঁ এঁ গরু উঁ উঁ উঁ রাঁতি পোঁহাইল সঁবাই মন দিয়ে পঁড়া শেখো ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ রাঁতি পোঁহাইল।

টি। তোর মুণ্ডু পোহাইল—বল্ সবাই মিলে।

সকলে (সুর করে)

> "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
> কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল,
> রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
> শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

টি। তা বেশ, বে......শ——এবার তোরা অঙ্ক কর। দু'য়ের কোঠায় নামতা বল্ তো।

সকলে (সুর করে)

দু এ......ক্কে ...দু... ..ই, দুই দু'গুণে...চা .. ..র, ইত্যাদি।

টি বেশ্, বে...শ—খাঁদি, চার দু'গুণে কত।

৩। এজ্ঞে, আমি বলব ?

টি। না, খাঁদি বল্।

৫। চার দুগুণে ? দেখুন চার দুগুণে পনের।

টি। হল না, হল না—মাতঙ্গিনী।

২। এজ্ঞে, মুখে মুখে পারবো না।

টি। বেশ্ বে...শ্, বোর্ডে লিখে কর্।

২। উঠে বোর্ডে লিখলো ৪×২=...) এজ্ঞে ছয়।

৩। এজ্ঞে আমি বলব ?

টি। বেশ্ বেশ্, বল্ দেখি ?

৩। এজ্ঞে ব্যাল্লিশ।

টি। তোর মাথা—বল্, চার দু'গুণে আট

(খেঁদি ও পুটি মাথা নীচু করে চিনে বাদাম ছাড়াচ্ছে)

সকলে (সুর করে) চার দু...গু...ণে আ...ট।

টি। এবার তোদের ইংরিজি পড়া নেব।

(পিছনের বেঞ্চে বসে খেঁদি ও পুটি চিনে বাদাম খাচ্ছে ও দর্শকদের দিকে খোলাগুলো ফেলচে)

টি। পাঁচি রিডিং পড়। খ্যাঁদা, পোঁটা—ও কি হচ্ছে? বটে? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

৬। (ভয় ভয় মুখে) এজ্ঞে আমি না—ও এনেছে—(আঙুল দিয়ে দেখাল)।

৫। (কাঁদ কাঁদ) এজ্ঞে, আমি তো টিফিন এনেছিলাম ওই বলল এখন খা—

৬। এজ্ঞে, না দেখুন, আমি--

৫। এজ্ঞে আমি কিছু জানিনা—আমাকে জোর করে খাইয়ে দিল।

টি। অত কথায় কাজ কি—তোরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে থাক—ওই কোণায় --

(৫, ৬—কাঁদ কাঁদ মুখে টিচারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল)

টি। পাঁচি রিডিং পড়।

৩। দি ..কল...ক্ (৫ ও ৬ চোখ বুজে জিভ দেখাল)

৩। খুঁক্ খুঁক্ খুঁক্।

টি। হাসিস না পড়।

৩। দি...কল...ক্ হ্যা ..জ্ (আবার জিভ দেখাল)

৩। খুঁক খুঁক খুঁক—(মুখ ঢাকিল)।

টি। আবার হাসছিস?—দাঁড়া ওদের পাশে গিয়ে—

(পাঁচি ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল)

টি। ফুলটুসি পড়্।

৪। দি......কল......ক হ্যা......জ আ......ই্ ট্রা......ক ওয়া......ন্।

টি। মানে বল্।

৪। এজ্ঞে কল......ক্ মানে ঘড়ি।

টি। তা বে......শ বে......শ,—বলে যা—

৪। হ্যা……জ্ মানে এ এ হ্যাজ্ মানে (আস্তে আস্তে) ঘড়ি বোধ হয়।

টি। জাষ্ট মানে ?

৪। এজ্ঞে জা……ষ্ট্ মানে ? জাষ্ট্ মানে ? এ এ……(সহসা) ঘড়ি

টি। (রেগে) ষ্ট্রাক্ মানে ?

৪। (জোরে) বল্‌ছি তো ঘড়ি।

টি। (আরো রেগে) তা হ'লে সবটার মানে কি হ'ল ?

৪। (সন্দেহের সঙ্গে) এজ্ঞে এ এ (কাঁদ কাঁদ) ঘড়িতে এ এ ঘড়িতে—

টি। (ভেংচিয়ে) থামলি কেন ? বলে যা—ঘড়িতে, ঘড়িতে, ঘড়িতে, ঘড়িতে—তোর কিছু হবে না। কুসমি বল্।

১। দি, কলক্ হ্যাজ জাষ্ট্ ষ্ট্রাক্ ওয়ান্ মানে, মানে এ এ (ভেবে চিন্তে, মাথা চুলকে) একদা এক ব্যাঘ্রের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

টি। (রেগে) হুঁ্যা হুঁ্যা থাক্ থাক্—আর বলতে হবে না—দাঁড়া ওদের পাশে গিয়ে—

(১ উঠে গিয়ে কোনে দাঁড়াল)

টি। এবার তোদের ভূগোল পড়াব। তার আগে মাতু—বল্ তো ইংরিজি কথাটার মানে ?

২। এজ্ঞে, ঘড়িতে এক্ষুণি একটা বেজেছে—এক্ষুণি টিফিনের ছুটি হবে।

টি। থাক থাক, অত বুঝিয়ে বলবার দরকার নাই। টুনি, বল্ তো তোর ওই জামাটা কিসের তৈরী।

৪। এজ্ঞে কাপড়ের।

টি। তা তো বুঝলুম—কিন্তু কি কাপড়ের ?

৪। এজ্ঞে……আমার বাবার কোর্তা কেটে সেই কাপড়ের।

টি। আরে মোলো—তোর বাবার কোর্তাটা কি দিয়ে তৈরী হয়েছিল ?

৩। (পিছন থেকে) এজ্ঞে আমি বলব ?

টি। মাতু বল্।

২। এজ্ঞে এ এ এ (সন্দেহের সঙ্গে) বোধ হয় কাপড় দিয়ে।

টি। নাঃ এদের নিয়ে আর পারা গেল না, (রেগে) টুনির জামা তো বুঝলুম তার বাবার কোর্তা কেটে তৈরী হয়েছিল—তার বাবার কোর্তাটা কি দিয়ে তৈরী হয়েছিল বলতে পারলি না ?

৪। (সোৎসাহে) এজ্ঞে, আমার ঠাকুরদাদার পায়জামা কেটে—

টি। কি বল্‌লি ?

(টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেল—সবাই লাফিয়ে উঠে পড়ল)

সকলে (সুর করে)

দি কল...ক্ হ্যা......জ্ জা......ই্ ট্রা......ক্ ওয়ান্।

যবনিকা পতন।

"শোন, শোন, মেয়ে।"

জসীম উদ্‌দীন।

শোন, শোন, মেয়ে, কার ঘর তুমি জড়ায়েছ জোছনায় ?
রাঙা অনুরাগ ছড়ায়েছ তুমি কার মেহেদির ছায় ?
কার আঙিনার ধুলি হ'ল সোণা চুমি তব পদতল ?
কারে দিলে তুমি সুশীতল ছায়া প্রসারিয়া অঞ্চল ?
তুমি আকাশের চাঁদ হয়েছিলে, কাহার ফুলের শরে
বিদ্ধ হইয়া হে নভোচারিণী নেমেছ মাটির ঘরে ?
কোন সে তমাল মেঘের মায়ায় ওগো বিদ্যুৎ-লতা
ভুলিলে আজিকে বিরামবিহীন গতির চঞ্চলতা ?

চির সুন্দরিকা! কহ, কহ, তুমি কাহার বাঁশীর সুরে
গ্রহ-তারকার অনাহত বাণী আনিয়া দিয়াছ পুরে?
সেকি জানিয়াছে মানসসরের রাঙা মরালীর বায়
সন্ধ্যাসকাল তব দেহে আসি মিলিয়াছে নিরালায়?
সেকি জানিয়াছে যুগান্তপরে মহামন্থনশেষে
নীলাম্বুধির তরঙ্গ ছাড়ি লক্ষ্মী এসেছে ভেসে?

ওগো কল্যাণি, কহ, কহ, মোরে, সেকি জানিয়াছে হায়
ও ইন্দ্রধনু তনুখানি তব জড়াতে শ্যামল গায়
তপস্যারত জলভরা মেঘ গগনে গগনে ঘোরে,
কামনাযন্ত্রে লেলিহ-বহ্নি মহাবিদ্যুতে পোড়ে?
সেকি জানিয়াছে বাণীর ভ্রমরী ও অধরফুল হতে
উড়িয়া আসিয়া হিয়ারে যে বেড়ে চিরজনমের ক্ষতে?
সেকি শিখিয়াছে বাসকশয়নে ওই তনুদীপ জ্বালি
পতঙ্গসম প্রতি পলে পলে আপনারে দিতে ঢালি?

ও অধরভরা লালপেয়ালার দ্রাক্ষারসের তরে
জায়নামাজের বেচিয়াছে পাটি সুরাবিক্রেতাঘরে?
সেকি ও নামের করিয়াছে জপ তস্‌বিমালার সনে?
সেকি ও নামের কোরাণ লিখিয়া পড়িয়াছে মনে মনে?
ওগো কল্যাণি, কহ, কহ, তুমি, কেবা সেই দরবেশ
তোমার লাগিয়া মনমোমবাতি পোড়ায়ে করিল শেষ?
কত বড় তার প্রসারিত বুক, আকাশে যে নাহি ধরে
সেই বিদ্যুৎ-বহ্নিরে আনি লুকাল বুকের ঘরে?

হাতের কাজ (কাগজ কাটা);

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী।

আমাদের অনেকের ধারণা যে সুন্দর সুন্দর জামা পরতে হ'লে সুন্দর করে ঘর সাজাতে হ'লে, বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিতে হ'লে বুঝি অনেক টাকা খরচ করা প্রয়োজন। এই ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। ঘর সাজাবার ও ঘরের কাজে লাগাবার অনেক জিনিষই অল্প খরচে নিজে তৈরী করা যায়। চাই কেবল অবসর সময়—যথেষ্ট ইচ্ছা ও চেষ্টা, আর কিছুটা সৌন্দর্যবোধ। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই আমাদের দিনের কাজের ফাঁকে যথেষ্ট সময় পাই। যাঁরা স্কুল কলেজে পড়েন না তাঁদের দুপুর বেলাটা সাধারণতঃ প্রশস্ত অবসর থাকে। স্কুল কলেজে পড়লে বা পড়ালেও ছুটির দিনে সময় পাওয়া যায়।. কতদিন আমরা এই অবসর সময় টুকু ঘুমিয়ে বা বাজে গল্প করে কাটিয়ে দিই কত সময়ে "কি করি" "কি করি" ভাবতে ভাবতেই দিন কেটে যায়। এই সময়ে আমরা ইচ্ছা করলেই নানা রকম হাতের কাজ করতে পারি।

সেলাই, বোনা, লেস্-চিকনের কাজ ইত্যাদি প্রায় সকলেই কিছু কিছু করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সেলাই ইত্যাদির সাধারণ নিয়মগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও অনেকে পরিকল্পনার অভাবে সুন্দর জিনিষ তৈরী করতে পারেন না। আবার অনেক জিনিষ আমরা কোনও কাজে লাগাতে না পেরে আবর্জনা বলে ফেলে দিই—যেমন খালি শিশি বোতল, বাক্স, টিন, রঙীন কাগজ বা কার্ডবোর্ডের টুকরো, সুতো, পশম বা রেশমের টুকরো, পুঁথি—অথচ অল্প সেলাই, একটু আঠার কাজ, একটু রঙ্ তুলির কাজ ও সামান্য একটু সূক্ষ্ম কারিকুরির সাহায্যে এই আবর্জনা থেকেই সুন্দর সুন্দর কাজের জিনিষ বানান যায়।

অবশ্য এই রকম জিনিষ নিজে হাতে তৈরী করতে হলে কিছুটা মৌলিকতা, হাতের কাজে কিছু দক্ষতা আর সৌন্দর্যবোধ থাকা দরকার। নিজের সংসারের কোন্ পুরোনো জিনিষটকে অল্প পরিশ্রমে নতুনের মতন করে নেওয়া যেতে পারে, সেটা নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। এইখানেই মানুষের সৌন্দর্যবোধ আর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া

যায়। পয়সা দিয়ে কতগুলি সুন্দর জিনিষ কিনে এনে ঘর সাজানোর মধ্যে খুব বেশী বাহাদুরি নাই—সেই ঘর সাক্ষ্য দেয় শুধু দোকানদারের নৈপুণ্যের আর ঘরের অধিবাসিনীর পয়সার। অবশ্য কেনা জিনিষ দিয়ে ঘর সুন্দর করে সাজাতে হ'লেও সাজাবার কায়দাটুকু জানা চাই। এই কায়দাটুকুর মধ্যেই যে ঘর সাজায় তার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দামী আসবাববিহীন, ছোট ঘরকেও আলো করে রাখতে পারে ঘরের অধিবাসিনীর নিজের হাতে তৈরী ছোটখাটো জিনিষগুলি আর তাঁর নিজস্ব ঘর সাজাবার কায়দাটুকু।

ঘর সাজাবার নানারকম কায়দা আর ঘরে সাজাবার মতন নানান্ জিনিস তৈরী করবার কথা আমার পরে আরো বলবার ইচ্ছা রইল। আজকে আপনাদের কাছে কাগজ কাটার কাজের কথা কিছুটা বলতে চাই।

যাঁরা অল্প-স্বল্প ছবি আঁকতে পারেন তাঁদের কাছে কাগজ কাটার কাজও কিছু কঠিন হবে না। আমাদের দেশেই আগেকার দিনে মেয়েরা নরুণ দিয়ে কাগজ কেটে কত সুন্দর সুন্দর ছবি তৈয়ারী করতেন। কাগজের ওপর হাল্কা করে পেন্‌সিল দিয়ে ফুল-লতা-পাতার ছবি তাঁরা আঁকতেন - ছবির প্রত্যেকটি রেখা ডবল করে আঁকা হ'ত। তারপর সযত্নে নরুণ দিয়ে অনাবশ্যক অংশটি কেটে ফেলে দিলেই সুন্দর ছবি হ'ত। ছবিতে শাদা অংশ খুব কম থাকত—কেবল মাত্র ডবল রেখার সাহায্যে ছবি আঁকতে হ'ত। এই সব ছবি দেখতে খুবই সুন্দর হয় কিন্তু এ কাজ করা বড় কঠিন। ছবির পরিকল্পনা করবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে ছবির প্রত্যেক রেখার সঙ্গে অন্য রেখার যোগসূত্র চাই।

এত সূক্ষ্ম কাজ যাঁরা নাও করতে পারেন তাঁরাও কাগজে ছবি এঁকে কেটে অন্য রঙের কাগজের ওপর আঠা দিয়ে জুড়ে সুন্দর সুন্দর ছবি বানাতে পারেন। এই সব ছবি শাদা কাগজে কেটে কালো কাগজের ওপর জুড়লে সব চেয়ে সুন্দর দেখায়। এই রকম ভাবে চমৎকার বাতির "শেড" দেয়াল পঞ্জিকা, টুকিটাকি জিনিষ রাখবার বাস্ক ইত্যাদি বানানো যায়। ছায়ার মতন (silhouette) ছবি নিলে কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে অথচ দেখতেও খুব সুন্দর হয়। ছুরি, নরুণ দিয়ে ছবি কাটবার সময় একখণ্ড মোটা কাঁচের ওপরে রেখে করলে ভাল। ছুরি বা নরুণটি খুব সূক্ষ্ম আর ধারালো হওয়া প্রয়োজন।

ছবির এক অংশ যদি অপর অংশের অনুরূপ (symmetrical) হয়, তা হ'লে,

প্রয়োজনানুসারে কাগজটিকে, এক, দুই বা ততোধিক বার ভাঁজ করে তার ওপর ছবি এঁকে কাঁচি দিয়ে কাটলে পরিশ্রম কম হয়—অথচ জিনিষটি বেশী সুন্দর হয়। এ কাজ করতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের আঁকবার দরকার হয় না। একটা সমচতুষ্কোণ (square) কাগজ নিয়ে তাকে সমানভাবে ভাঁজ করলে একটি লম্বা চতুষ্কোণ (rectangle) হল, তাকে আবার ভাঁজ করলে একটি ছোট সমচতুষ্কোণ হল, তৃতীয় বার ভাঁজ করলে (কোণাকুণি ভাবে) একটি সম-দ্বি-বাহু ত্রিভুজ (Isosceles triangle) হবে। ইচ্ছা করলে আরো একবার ভাঁজ করে একটি সরু লম্বা ত্রিভুজও বানানো যেতে পারে। এইবার ছবির পরিকল্পনা করে নিয়ে কাটতে হবে। কাটবার সময়ে কোনদিকটি কাগজের মাঝখানে ও কোনটি ধার সেটা ভাল করে মনে রাখা দরকার। ছবিটি (design) এমন হতে হবে যাতে প্রত্যেক ভাঁজের সঙ্গে অন্য ভাঁজের অনেকগুলি যোগসূত্র থাকে—না হ'লে একটি ছবি না হয়ে যতগুলি ভাঁজ ততগুলি ছোট ছোট খণ্ড হবে। এবার ভাঁজগুলি খুলে ছবিটা সমান করে নিলেই অন্য কাগজে আঠা দিয়ে সাঁটবার জন্য প্রস্তুত হল। ছবি যদি সূক্ষ্ম হয় তা হ'লে ভাঁজ খোলা আঠালাগানো ও সমান করে অন্য কাগজে বসানো—সবই অতি সাবধানে করতে হবে—না হ'লে হয় ছবি ছিঁড়ে যাবে, নয়তো বাঁকা হয়ে যাবে।

আপনারা অনেকেই হয়তো ষ্টেন্সিলের কাজ (stenciliing) করতে জানেন এর ছবিগুলিকে কাগজ কাটার ছবির ঠিক বিপরীত বলা যেতে পারে, কারণ, এখানে আসল ছবিটাকেই কেটে বাদ দিয়ে কেবল জমিটাকে (back ground) রাখতে হয়। তারপরে, যে জিনিষের উপর কারুকার্য করবেন তার উপর কাগজটি শক্ত করে বসিয়ে, সাবধানে অথচ দৃঢ় ভাবে তুলি দিয়ে রঙ্ বুলিয়ে দিলেই কাগজের নীচে ছবিটি ফুটে উঠবে। রঙের গোলাটা যত ঘন হয় ততই ভাল। রঙ্ করা হয়ে গেলে কাগজটা তুলতে হবে অতি সাবধানে—তা নইলে ছবি ধেবড়ে যাবে।

ষ্টেন্সিলের কাগজ খুব শক্ত হওয়া দরকার। এই কাজের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কাগজ, ছুরি ও রঙ্ কিনতে পাওয়া যায়। যাঁরা নিজেদের ছবি তৈরী করতে পারেন না তাঁদের জন্য সুন্দর সুন্দর কাটা ছবিও কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিজেদের ছবি নিজেরা তৈরী করতে পারলে ঠিক নিজের পছন্দ মতন জিনিষটি হয়। অথচ খরচও অনেক কম পড়ে।

ষ্টেন্সিলের ছবি আঁকবার সময়েও মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক রেখার সঙ্গে অন্য রেখার যোগসূত্র চাই। এই মাসের "মেয়েদের কথার" প্রথম পাতায় শ্রীসত্যজিৎ রায়ের

আঁকা যে ছবিটি বেরিয়েছে সেটা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই আমার কথার অর্থ ভাল করে বুঝতে পারবেন। চিত্রকর এমন সুন্দর কায়দা করে ছবিটি এঁকেছেন যে আপনা থেকেই প্রত্যেকটি রেখা অন্য রেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—আলাদা রেখা টেনে তাদের জুড়ে দিতে হয় নি। এই ছবিটা একটা শক্ত কাগজের (stencil paper) উপর এঁকে সাবধানে কালো অংশগুলি কেটে বাদ দিলেই সুন্দর ষ্টেন্‌সিলের ছবি হল (stencil plate). তারপর তাকে কোনও জিনিষের উপর বসিয়ে যে রঙের তুলি দিয়ে টান দেবেন সেই রঙেরই ছবি ফুটে উঠবে অবশ্য ষ্টেন্‌সিলের কাজ প্রথম আরম্ভ করবার সময়ে এই ছবিটা না নিয়ে আরো সহজ ছবি নিলেই ভাল।

একটা সাধারণ ষ্টেন্‌সিলের ছবি—দশ বারো বার এমন কি সাবধানে ব্যবহার করলে আরো বেশী ব্যবহার করা যেতে পারে। কাগজের ওপর না করে যদি টিনের পাতের উপর ছবি তৈরী করা যায় তা হলে সেটা কোনও দিন নষ্ট হবে না—অবশ্য এরকম ছবি করা খুব কঠিন। ষ্টেন্‌সিলের কাজের জন্য এমন অনেক রঙ্ কিনতে পাওয়া যায় যা ধুলেও ওঠে না। জামা-কাপড়, টেবিলের চাদর, পর্দা, বাতির শেড—এ সবের ওপর ষ্টেন্‌সিলের কাজ তো খুব ভালই হয়—এমন কি কাঠের বা টিনের বাস্ক বা ঘরের দেয়ালের উপরেও এ কাজ করা যেতে পারে। আজকাল "ব্ল্যাক্ আউটের" জন্য ঘরের সমস্ত বাতির সৌখিন "শেড"গুলি খুলে ফেলে কালো বা ছেয়ে রঙের "শেড" কিনে বা তৈরী করে লাগাতে হয়েছে। এর জন্য ঘরের সৌন্দর্য্যের হানি করবার কোনও দরকার নাই। কেনা কালো শেডের উপর শাদা বা অন্য কোনও মানান সই রঙের ছবি কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। ইচ্ছা করলে রঙীন "কার্ড বোর্ড" কিনে তার উপর পছন্দ মতন ষ্টেনসিলের কাজ করে বা ছবি কেটে জুড়ে নিলে তাই দিয়ে সুন্দর "শেড" বানানো যেতে পারে।

সর্ব্বপ্রথম যে বাঙ্গালী মেয়ে বিমানপোতে ভ্রমণ করেন তাঁহার নাম শ্রীমৃণালিনী সেন

প্রথম ভারতীয় মহিলাচিকিৎসক শ্রীকাদম্বিনী গাঙ্গুলি।

ভারতের মহিলাপরিচালিত প্রথম পত্রিকার নাম ছিল "ভারতী।"

রূপচর্চ্চার খুঁটিনাটি।

শ্রীসরস্বতী চক্রবর্ত্তী

এর আগের সংখ্যায় রঙের জৌলুষ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি—কেমন করে তেলতেলে ও খসখসে চামড়ার উন্নতি করা যায়। কিন্তু অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত সুন্দর ও ফর্শা রংও নানা রকমের দাগ থাকাতে দেখতে একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে। এই দাগ সাধারণতঃ তিনরকম কারণে হয়—ব্রণ, বসন্ত ও মেছেতা।

প্রথমতঃ ব্রণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। মূলতঃ পেটের গোলমাল ও দূষিত রক্ত থেকে এর উৎপত্তি। অনেক সময় যৌবনের আরম্ভে এই ব্রণে সমস্ত মুখ ছেয়ে যায়। একে বয়সব্রণ বলে, কিন্তু বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলো একেবারে সেরেও যায়। সাধারণতঃ দুপ্রকারের ব্রণ দেখতে পাওয়া যায়, কতকগুলো বেশ বড় বড় দেখতে হয় ও বেশ বড় মুখ নিয়ে ওঠে কতকগুলো আবার মুখ ছোট মুখ নিয়ে চাপচাপ হয়ে জন্মায়, দেখতেও সেগুলো কালো রঙের হয়।

বড় ব্রণ অতি অল্প চেষ্টাতেই সেরে যায় বলে তার সম্বন্ধে অত ভাবনার কারণ নেই, তবে ছোটগুলো সারাতে অত্যন্ত সময় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

শরীরের বা রক্তের যা বিষ তা আমাদের মুখে ব্রণের আকারে ফুটে উঠে; আমাদের মুখের চামড়া অত্যন্ত নরম তাই শরীরের যা গলদ সেই খান দিয়েই সহজে প্রকাশ পায়। যে সমস্ত ব্রণ পেটের দোষ বা দুষিত রক্ত থেকে হয় সেগুলো সারাতে হলে প্রথমেই একটা ভাল জোলাপ খাওয়া দরকার; শুধু একদিন নয় অন্ততঃ মাসখানেক কোন ফ্রুটসল্ট অথবা দেশীমতে ত্রিফলা খাওয়া আবশ্যক। তবে ব্রণের পক্ষে রোজ ভোরে সামান্য ফ্রুটসল্টই বেশ ফলপ্রদ। মাংস খাওয়াও সাময়িকভাবে একেবারে ত্যাগ করা দরকার, মাছ না খেয়ে থাকতে পারেলে আরও ভাল, তবে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করলে সামান্য খাওয়া যায়। চিংড়িমাছ কিন্তু একেবারে স্পর্শ করবেন না। ফল ও শাকসব্জি বেশী পরিমাণে খাবেন কাঁচা তরকারি বা স্যালাড (salad) খেতে পারলে আরও ভাল হয়। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম (deep-breathing exercise) নেওয়া খুবই দরকার।

এই সবের কারণ এই যে এই ভাবে শরীরের রক্ত যত শোধিত হবে ততই ব্রণর প্রাদুর্ভাব কম হবে। শরীরের রক্ত পরিষ্কার না হওয়া অবধি বাইরে যত রকম প্রলেপ বা ওষুধ লাগানো হোকনা কেন তাতে ব্রণ চিকিৎসার কোন স্থায়ী ফল হবে কিনা সন্দেহ।

অনেকের মুখের চামড়া হয়ত খুব মসৃণ, হঠাৎ নাকের উপর বা ঠোঁটের নীচে গোটার মতন বড় বড় ব্রণ দেখা দেয়। এ সব ব্রণ সারাবার খুব সহজ এবং ফলপ্রদ উপায় হচ্ছে আস্ত গোলমরিচ শিলে ঘষে সেই ব্রণর মুখে ঘন ঘন প্রলেপ লাগানো। মনে রাখতে হবে সে গোলমরিচ বাটা নয় বা গোলমরিচের গুড়ো জলে গুলে নেওয়াও নয়—চন্দন যেমন করে শিলে ঘষে নেয় সেরকম আস্ত গোলমরিচ জলে ঘষে নিয়ে মুখে লাগাতে হবে। দু'চার দিন বারকয়েক এ প্রলেপ লাগালে আপনিই এই ব্রণ সেরে যাবে। এই প্রলেপ দিয়ে সব রকম ব্রণ সারানো যায় কিন্তু অন্য রকম ব্রণতে আরো অনেক রকম পরিচর্য্যার প্রয়োজন হয়।

বড় মুখ নিয়ে যে সব ব্রণ বের হয় এবং গালের মাঝখানে বেশী করে ওঠে সেগুলোর জন্য সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে গরম জলের ভাপ মুখে লাগাতে হবে। একটা ছোট গামলায় খুব ফুটন্ত গরমজল নিয়ে মুখটা তার কাছে নামিয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ এবং গামলার চারদিক ঘিরে রাখতে হবে যাতে ধোঁয়াটা বাইরে না চলে গিয়ে সোজা মুখের ওপর পড়ে। চোখ বুজে পাঁচ মিনিট গরমজলের ধোঁয়ার ওপরে মুখ রাখলেই মুখটা ঘেমে ওঠে ও মুখের চামড়ার লোমকূপগুলো খুলে যায়। এই সময়ে যে সমস্ত ব্রণ পেকেছে তার পুঁজ বের করা আবশ্যক। পাকা ব্রণ টেপবার সময় যাতে নখের আঁচড় না লাগে তা দেখতে হবে, না হলে তার দাগ সারাতে আবার সময় লাগবে। সমস্ত পুঁজ পরিষ্কার করে একটু তুলোয় করে স্পিরিট (Mothylated Spirit) দিয়ে মুখটা মুছে ফেলতে হবে যাতে লোমকূপের মুখ আবার ছোট হয়ে যায়। স্পিরিটের অভাবে খুব ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুলেও চলে। মুখের ব্রণ যাঁরা সারাতে চান তাঁদের একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে সে রাত্রে শোবার আগে যেন গরম জল ও সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা হয়।

এর পরের সংখ্যায় ছোট বা চাপ চাপ ব্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। ওপরের চিকিৎসা অনুসারে ব্রণ যদি না সারে তবে "মেয়েদের কথা"র সম্পাদিকার নিকট প্রশ্ন করে পাঠালে আমিও কারণ ও উপায় "মেয়েদের কথা"র মারফৎ জানাব।

"বিপদের বন্ধু"

শ্রীইলা সিংহ।

আমি কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের কথা মায়েদের সুবিধার জন্য বলতে চাই। অসুখ সামান্য বা বেশী হোক, সকলের ঘরেই আছে। বেশী হলে সে তো ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্‌তে হবেই, কিন্তু অল্প সামান্য জ্বর সর্দ্দি কাশী বা পেটের অসুখ করলে কেউ ডাক্তার ডাকেনও না বা সকলের এমন অবস্থাও নয় যে ইচ্ছা করলেই ডাক্তার ডাকার সুবিধা হয়। এ ওষুধের দাম ও বেশী নয়; আশাকরি সব মায়েরাই এ ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারবেন। আপনারা যদি কেউ আমার লেখায় উপকার পান বা বেশী কিছু জানতে চান তবে সম্পাদিকার কাছে জানালেই আমি আবার আপনাদের কাছে আসব। এখন আমার কথা শুনুন:—

সামান্য সর্দ্দি জ্বর হলে, অস্থিরতা ব্যতীত অন্য আর কোন গ্লানি না থাক্‌লে "Aconite 6"। ৬ ঘণ্টা অন্তর তিন বার। যদি অস্থিরতা না থাকে "Gelsenium 6", ঐ নিয়মে দিনে ৩ বার দিতে হবে; কিন্তু জ্বর যদি খুব বেশী হয়, চোখ লাল, মাথায় খুব যন্ত্রণা তাহলে তৎক্ষণাৎ "Belladonna 30" ৬ ঘণ্টা অন্তর তিন বার।

শিশুরা যে জ্বরের ধমকে চম্‌কিয়ে চম্‌কিয়ে ওঠে তাতে ও "Bellad nna 30" খুব ভাল।

যদি জ্বর বেশী হয় এবং বুকে ব্যথা থাকে বা সর্দ্দি বসে যায় তাহলে "Bryonia 30" দিনে ৩ বার।

নিতান্ত শিশু যারা, মাঝে মাঝে অকারণে কাঁদে বা খুঁত খুঁত করে তাদের পক্ষে "Chamommila 30" খুব ভাল।

দাঁত উঠবার সময় যে শিশু পেটের ব্যথায় ও অসুখে কাঁদে তাদের পক্ষেও ইহা খুব ভাল।

অতিরিক্ত তেল, ঘি, বা মাছ, মাংস আহারে বা নেমন্তন্নে গুরুভোজনের ফলে যে পেটের অসুখ করে তাতে "Pulsatilla 30" খুব ভাল। পেটের অসুখের সঙ্গে বমি বা

বমিবমি ভাব থাকিলে "Nux-Vomica 6" সাধারণ পেটের অল্প স্বল্প গোলমালে "Nux-Vomica 30" খুব ভাল। রাত্রে শোবার সময় একবার খেয়ে শুলেই সব ভাল হয়ে যায়। দরকার মত তিন রাত উপরি উপরি খেয়েও শুতে পারেন।

শিশুরা যখন চলতে শেখে, তখন থেকে আর সেই বড় হওয়া পর্য্যন্ত কতবার যে কত কারণে পড়ে যায় তার আর শেষ থাকে না। কিন্তু হঠাৎ বেগাপ্পা ভাবে পড়ে গিয়ে মাথায় বা অন্যান্য স্থানে লেগে তাদের অনেক অনিষ্ট ও হ'তে দেখা গিয়েছে; সেজন্য মায়েদের অনুরোধ করছি যে ছেলে যদি পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে "Arnica Mont 6" খাইয়ে দেবেন।

শিশুদের জন্য ছোট কাঁচের গ্লাসে আধ আউন্স জলে বা অসুবিধা না হলে Distilled Water এর সঙ্গে এক ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে তাই সমস্ত দিনে ৩ বারে খাওয়াতে হবে। Measure Glass হলে সমান তিনভাগ করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তিন মাত্রা ঠিক সমান না হয়ে একটু যদি কম বেশী হয় তাতে কোনও ক্ষতি নাই। তিনভাগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিষ্কার পাত্রে ওষুধের গ্লাসটী ঢাকা দিতে হবে। ওষুধ খাওয়ার জলে যেন কর্পূর ফিট্‌কারি ইত্যাদি কোনও জিনিষের সংস্পর্শ না থাকে। ওষুধের শিশিও যেখানে রাখবেন সেখানেও যেন কোন উগ্রগন্ধ জিনিষ না থাকে।

ছোট ছেলেপিলেদের হোমিওপ্যাথিকের বড়ি খেতে ভাল লাগে বলে অনেক সময়ে জলের বদলে একটি করে বড়ি খাওয়ানই সুবিধাজনক হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী স্ত্রীলোক মিসেস ইসাবেল ষ্টিলম্যান্‌ রকফেলার।

মাদাম কুরী একমাত্র মহিলা যিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

ভারতে পাঁচজন নারী নিজহস্তে রাজ্যশাসনের ভার নিয়াছিলেন--রিজিয়া, চাঁদসুলতানা, নুরজাহান, দুর্গাবতী ও অহল্যাবাঈ।

সর্ব্বপ্রথম যে বাঙালী মহিলা বিলাতযাত্রা করেন তাঁহার নাম শ্রীচন্দ্রলেখা বসু।

শ্রীরামপুর মহিলাসমিতি।

শ্রীঅর্চ্চনা দেবী।

. কোনকোনও সহৃদয়া মহিলার সমবেত চেষ্টায় গত বৎসর হইতে শ্রীরামপুরে একটি মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এ যাবৎ এখানে ঐরূপ একটি সম্মেলনস্থানের অত্যন্ত অভাব ছিল। সপ্তাহান্তে একবারও ঐরূপ একটি স্থানে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মনোভাবের আদানপ্রদানের স্থযোগ পাওয়ায় মনের যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি হয় তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাঁহারা সকলেই বুঝিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে এইরূপ একটি সমিতির এখানে বড়ই অভাব ছিল, যে স্থানের মহিলাগণ নিজেদের যথার্থ শিক্ষিতা বলিয়া মনে করেন সেইরূপ স্থানের পক্ষে ইহা সত্যই লজ্জার বিষয়। যাহা হউক, যাঁহাদের চেষ্টায় সেই অভাবের পূরণ, সেই লজ্জার অবসান এবং শিক্ষিতা মহিলাগণের পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়ার ও পারস্পরিক সহানুভূতির সহযোগিতায় সংস্কৃতিপূর্ণ জীবন যাপনের সাহায্য হইয়াছে তাঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই সমিতিতে একটি পাঠাগার থাকায় আমরা আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হইবার স্থযোগ পাইয়াছি। ক্রমশঃ এই সমিতির পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি হইলে এই পাঠাগারেরও সমধিক উন্নতির আশা করা যায়। যাহাতে সভ্যগণ শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা স্থস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকিতে পারেন সেজন্য এখানে অঙ্গসঞ্চালনোপ-যোগী কয়েকটি খেলারও বন্দোবস্ত আছে। সপ্তাহে একবার করিয়া এই সমিতির অধিবেশন হয়। এখন এই সমিতির একেবারে বাল্যাবস্থা, ইহার ক্রমোন্নতির জন্য আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। সমিতির অধিবেশনে সাহিত্য সমাজ, নারীশিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে নারীকল্যাণের আলোচনা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানযুগে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন বটে কিন্তু মনের মেরুদণ্ড স্থস্থ অর্থাৎ মন দৃঢ় ও শরীর সম্পূর্ণরূপে আপন সম্ভ্রমরক্ষার্থে সক্ষম না থাকিলে স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয় এবং পাইলেও হারাইবার আশঙ্কাই প্রবল। স্থতরাং শরীর ও মনের এই আদর্শে লক্ষ্যে রাখিয়া জীবনের পথ চলা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক সভ্যা ও প্রতি বঙ্গমহিলার সহৃদয় সহানুভূতি সম্যকভাবে প্রার্থনা করিয়া আজিকার মত বিদায় লইতেছি।

অঙ্গচালনা।

মনুষ্যত্বই যে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি একথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করলেও "মনুষ্যত্ব" এই শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গেলে গোলমালে পড়তে হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বর্ণনা অনেকে অনেক ভাবেই করেছেন কিন্তু স্পষ্ট হয়নি; এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে আমিও পারবনা তবে পূর্ণমানবতার যে চিত্র আমার মানসপটে মুদ্রিত আছে সে চিত্র সত্য আনন্দ, শক্তি, সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যদ্বারা চিহ্নিত। উপরিউক্ত শব্দগুলিকে উল্টিয়ে নিলেই মনুষ্যত্বলাভের সোপান পাওয়া যাবে। সেই সোপানের সর্বপ্রথম ধাপ স্বাস্থ্য, অন্য সব গুণ গুলি স্বাস্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই স্বাস্থ্যকেই মনুষ্যত্বলাভের প্রাথমিক প্রয়োজন বলে নির্দেশ করা যায়।

স্বাস্থ্যের সঙ্গে সৌন্দর্য দৃঢ়সূত্রে বাঁধা। স্বাস্থ্যবান দেহের প্রতি-অঙ্গ সুসমঞ্জস ও সুগঠিত হয় বলে স্বাস্থ্য দেহকে সৌন্দর্য দান করে; কি বর্ণের দিক দিয়ে, কি লাবণ্যের দিক দিয়ে, স্বাস্থ্যের দীপ্তিই মানুষের প্রকৃত রূপ। স্বাস্থ্যের আভা কালো মুখকেও আলোকিত করে আর স্বাস্থ্যের অভাবে সুন্দর মুখও দীপ্তিহীন বলে প্রতীয়মান হয়। সুস্বাস্থ্য যৌবনকে স্থায়ী করে। স্বাস্থ্যের অভাবই বাঙালী মেয়েদের "কুড়িতে বুড়ি" হওয়ার প্রধান কারণ।

বাঙালী মেয়েদের আকৃতিতে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য দুষ্প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে দীর্ঘচ্ছন্দ, সুললিত দেহগঠন নাই বল্লেই হয়। "মাথায় ছোট বহরে বড়" আমাদের বর্ণনা, "নবনীত কোমলা" এই বিশেষণটি বাঙালী গৃহিণীদের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য পেশীর সবলতার চিহ্নমাত্র নাই, মেদের ভারে দেহ ভারাক্রান্ত। নয়ত এর বিপরীত মূর্তি, অতি ক্ষীণ, শুখনো কাঠির মত, তাদের শরীর দেখে অস্থিবিদ্যার আলোচনা করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর মেয়েদের শরীরেই রোগ সর্বদা লেগে থাকে।

শিক্ষিত মেয়েদের বিষয়েও স্বাস্থ্যহীনতার দুর্নাম প্রচলিত আছে। লেখাপড়া শিখলে নাকি মেয়েদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। কথাটাকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে

দেবার জো নেই। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে যারা মাথাটাকে যতটা খাটায় শরীরটাকে সেই পরিমাণেই অগ্রাহ্য করে, কিন্তু এই অবহেলা একেবারে নিষ্প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হলে যে দিন রাত বই মুখে করে বসে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য তার দরকারও হয় না। মানুষের মাথা খাটাবার জন্যই আছে, তাকে খাটালে ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় শরীরের অন্যান্য অঙ্গের প্রতি অবহেলা করে কেবল মাথার কাজ করলে। অতিরিক্ত পাঠাভ্যাসে বিদ্যাও ভাল করে আয়ত্ত হয় না, স্বাস্থ্য যে অমূল্য নিধি তাও হারাতে হয় আর সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের হানি ঘটে।

অলসতার জন্য বহুলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয়; এই অন্যায়ের পরিমাপ করা কঠিন। কর্মহীনতা শরীর মন উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক। গৃহস্থঘরের মেয়েদের ঘরের অনেক কাজ নিজের হাতে করতে হয় বলে তজ্জনিত শরীরের চালনা স্বাস্থ্যের সহায়তা করে। বিছানা পাতা ও তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনা বাটা প্রভৃতি কাজে খুব ভাল ব্যায়াম হয় বলে কর্মশীলা নারীর দেহ সাধারণত সুগঠিত হয়। চাষাভূষো ও শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের দেহের গঠন দেখে সৌন্দর্যব্যবসায়িনী অভিনেত্রীরাও ঈর্ষা করতে পারে; অথচ তারা নিজেদের শরীরের জন্য কত হাজার টাকা খরচ করে আর এরা দিনান্তেও একবার নিজেদের রূপের কথা ভাববার অবসর পায় কিনা সন্দেহ।

ভারতীয় মেয়েদের চলার ভঙ্গীর প্রশংসা অনেক বিদেশী শিল্পী ও ভ্রমণকারী করেছেন। নিত্য কলসী করে জল আনার ফলেই নাকি এদের ভঙ্গী এত সুন্দর হয়। আগেকার দিনে বিলেতের কোন কোন মেয়ে-ইস্কুলে মেয়েদের চলন ভাল করবার জন্য মাথায় ভারি জিনিস দিয়ে হাঁটান হত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নিয়মিত চালনা স্বাস্থ্যলাভের প্রধান উপায়, এবং সঙ্গে চাই পরিমিত আহার। ভাঙ্গা আর গড়া এই দুটো কাজ দেহের মধ্যে সর্বদাই চলে। চলাফেরা কথাবার্তা এমনকি শুধু বেঁচে থাকার দ্বারাই যে শক্তিক্ষয় হয় সেটা ভাঙ্গার কাজ। দেহের যে শক্তি এইভাবে ক্রমাগত ক্ষয়িত হচ্ছে খাদ্য তার পূরণ করে। খাদ্য রক্তমাংসাদিতে পরিণত হয়ে দেহকে পুষ্ট করে; কিন্তু তাকে তার প্রাথমিক অংশসমূহে ভেঙ্গে না নিলে সে মেদমাংসস্নায়ুপেশী ইত্যাদিতে পরিণত হতে পারে না। কাজেই এখানেও ভাঙ্গা ও গড়া দুইই আছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযুক্তরূপ সঞ্চালন না হলে খাদ্যদ্রব্যকে ভেঙ্গে শরীরের অংশে পরিণত করা যায়না ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

এঞ্জিনের যেমন জলকয়লা, শরীরের তেমনি খাদ্য। সে খাদ্য দেহরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গের চালন ভিন্ন তাকে কাজে লাগান যায় না। বেঁচে থাকার পক্ষে তাই খাওয়া ও ব্যায়াম করা সমপ্রয়োজনীয়। ঘরের কাজের মধ্যে যে অনেকের অঙ্গ চালনা সুন্দররূপে হয়ে থাকে সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে, ও যাদের হয়না তাদেরও নিজেদের স্বাস্থ্য ও শ্রীর খাতিরে নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যাদের দিনরাত বসে বসে কাজ করতে হয় তাদেরও ব্যায়ামদ্বারা ঐরূপ কাজের শারীরিক কুফল এড়াতে হয়। এতে বেশী সময় লাগে না. দৈনিক পোনেরো মিনিট মাত্র ব্যায়াম করাও স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়ক। ব্যায়ামের সময়ে মাথা উঁচু করে সুন্দর, সোজা ভঙ্গীতে দাঁড়াবার অভ্যাস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। খাদ্য বিষয়েও সাবধানতার প্রয়োজন। সে দিকে লোলুপতা বা সংযমের অভাব ব্যায়ামের সুফলনাশক, অপরপক্ষে অল্প বা অপুষ্টিকর আহারের উপর ব্যায়াম সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

স্কিপ করা, বা দড়ি ঘুরিয়ে লাফান খুব ভাল ব্যায়াম। এতে শরীরের সর্বাঙ্গীন চালনা হয়। ঘরে দড়ি ঘোরাবার উপযুক্ত স্থান না থাকলে ওই ভঙ্গীর অনুকরণ করে কেবল লাফানও উপকারী।

ভোরবেলা খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাস করলে বুক চওড়া হয় ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া সবলতা লাভ করায় শরীরের রোগপ্রতিষেধক্ষমতা বাড়ে।

মাথার নীচে দুই হাত চেপে সোজা হয়ে বিছানায় শুয়ে কোন কিছুতে ভর না দিয়ে বারকয়েক উঠে বসলে এবং শুলে পেটের পেশী সমূহের চালনা হয়ে "ভুঁড়ি" কমে যায়। বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে হাঁটু না বেঁকিয়ে পা ওঠালে আর নামালেও এই দিক দিয়ে খুব উপকার হয়।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাঁতারের ভঙ্গীতে হাতের চালনা করলে বুকের পেশী সবল হয়।

দাঁড়িয়ে ওঠ-বোস করলে কোমর, পেট ও উরুর পেশী সবল হয়। এই ব্যায়ামটা পায়ের আঙুলের উপর ভর করে করলে বেশী উপকার দেয়।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে হাত দিয়ে শরীরটা একবার ডানদিক ও একবার বাঁদিকে হেলালে দেহের ভারসাম্য বাড়ে এবং একবার ডান-পা ও একবার বাঁ-পা বুক পর্যন্ত তুলে নামালে পায়ের শক্তি বড়ে।

এই কয়টি প্রক্রিয়া দৈনিক বার পাঁচেক করে করলেও উপকার দেয়, তবে নিয়মিত

রূপ করা চাই এবং সঙ্গে উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন। তবে ব্যায়াম যতই উপকারী হোক না কেন সেটা নিতান্তই প্রয়োজনের ব্যাপার। যার দ্বারা শরীরের সঞ্চালন ও মনের আনন্দ দুইই হয় সেই কাজই সবচেয়ে ফলপ্রদ!

ইস্কুল কলেজে মেয়েদের "স্পোর্টস" হয় এবং বাস্কেটবল, ব্যাডমিণ্টন, টেনিকয়ট প্রভৃতি নানারকম খেলার "টুর্ণামেণ্ট" হয়, কিন্তু মহিলা সাধারণের জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই বল্লেই হয়। এটা নিতান্ত হানিকর, কেননা যে মেয়ে আঠেরো-উনিশ বা কুড়ি পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানারূপ ক্রীড়ার দ্বারা দেহকে সঞ্চালিত করতে অভ্যস্ত তার পক্ষে হঠাৎ সমস্ত ব্যায়াম বন্ধ হয়ে গেলে তার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। বড় মেয়েরা, বউরা, মায়েরা, এমন কি দিদিমারাও যে স্বাস্থ্যের জন্য খেলা করবেন না এমন কোন কথা নাই। কিছুদিন আগে একটা বিলাতী কাগজে একটি অভিনব প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়েছিল—মা ও মেয়ের সমবয়সী বলে মনে হবার প্রতিযোগিতা। বোধহয় পোনেরো জোড়া "সমবয়সী" মা ও মেয়ের ছবি সেই পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে দেখলাম। আমাদের দেশে এমন হওয়া কল্পনারও অতীত অথচ কেন যে হবেনা তার কোন কারণও নেই।

কলকাতার কয়েকটি পার্কে এবং খোলা জমিতে মেয়েদের খেলাধুলার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে খেলবার জন্য অনেক মেয়ে জড়ও হয় কিন্তু মা দিদিমার ভিড় আশানুরূপভাবে আজও জমলনা।

"স্পোর্টস্" বা "টুর্ণামেণ্ট" ছাড়াও সাঁতার এবং নৌকাবাওয়া খুব উপকারী ও আনন্দদায়ক ব্যায়াম। সমগ্র কলকাতা সহরে মাত্র একটি কি দুইটি সাঁতারের সমিতি আছে কিন্তু কোথাও বোধহয় নৌকাবাওয়া শিখবার উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা নেই।

খেলধুলার পরেই সঙ্ঘবদ্ধ ব্যায়ামের কথা মনে হয়। কুচকাওয়াজ বা ড্রিল এর প্রধান অঙ্গ। আমাদের মেয়েদের মধ্যে এই জিনিষটার প্রতি অত্যন্ত বেশী অবহেলা করা হয়। ইস্কুলের মেয়েরা ড্রিল করে বটে, কিন্তু কলেজে তেমন ব্যবস্থা নেই। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা এর সুযোগ পেত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই অনুষ্ঠানটি এখন হয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে বড় মেয়েরা এমনকি বুড়িরাও নানা সঙ্ঘ ও সমিতি গঠন করে ড্রিল করে থাকে। এইরূপ দেহসংযম কর্তব্য পালনের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ এবং আমাদের মত দ্বন্দ্বকলহের পঙ্কে নিমজ্জিত না থেকে এইরূপ সংযমের প্রভাবে তারা তাদের কর্মে সফলতা লাভ করে। আর আমাদের দেশে মেয়েদের কথা দূরে থাক ছেলেদের মধ্যেও

ড্রিল বা কুচকাওয়াজ যার অঙ্গ এমন প্রতিষ্ঠান কটি আছে তা আঙ্গুলে গোণা যায়। এমনই ভ্রান্ত আমাদের মত যে পাছে এই মহাযুদ্ধে কোন প্রকারে সাহায্য করে ফেলি সেই ভয়ে নগর বা দেশ রক্ষার অর্ধসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও যোগদান করতে সঙ্কুচিত হই। অথচ এই ব্যবহারের ফলে দেশের যে অর্থ দেশে থেকে দেশের লোকের উপকার করতে পারত সেই টাকা হয় বিদেশে চলে যাচ্ছে নয় এদেশবাসী বিদেশী সম্প্রদায়ের ব্যবহারে লাগছে।

নৃত্য সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ও স্বতস্ফূর্ত ব্যায়াম। স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য ব্যায়ামে, ক্রীড়ায়, সঙ্ঘবদ্ধ দেহচালনায় পূর্ণশক্তি লাভ করে নৃত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের জাতি আনন্দের অভাবে মরণাপন্ন তাই নৃত্যের দ্বারা আত্মপ্রকাশ আমাদের পক্ষে লজ্জাকর। নৃত্যে আমরা চরিত্রহীনতার আভাস পাই রঙ্গমঞ্চের গন্ধ পাই। কিন্তু পৃথিবীর সকল জাতের মধ্যেই পল্লীনৃত্যের প্রচার আছে যার দ্বারা জাতি সঙ্ঘবদ্ধতার বৈশিষ্ট্যের বিকাশ লাভ করে। এর অভাবে আমরা এত ক্ষুদ্র ও শতধাবিভক্ত, অথচ আমাদের দেশে সবই ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের ঝুমর নাচ এখনও তার সাক্ষ্য দেয় ব্রতচারীনৃত্যের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সে আত্মপ্রকাশ করে। আগেকার পুরুষেরা দলবেঁধে পুরুষোচিত বীরত্বব্যঞ্জক নাচ নাচত, আগেকার মেয়েরা নাচের মধ্যে দিয়ে তাদের ব্রতগুলি সার্থক করে তুলত; আমাদের দেশের স্ত্রীআচার, বরণ, আরতি প্রভৃতি যে সব মাঙ্গলিকের মধ্য দিয়ে নারীর কল্যাণময়ী মূর্তিটি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিও নৃত্যধর্মী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণে মণিপুরী, গরবা প্রভৃতি কয়েকপ্রকারের দলবদ্ধ নৃত্য বাংলাতে প্রচলিত হয়েছে কিন্তু তাও রঙ্গমঞ্চ বা বিশিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর গণ্ডী ছেড়ে জনসমাজের আসরে এখনও নামেনি।

গণনৃত্যের উদ্দেশ্য কোন উৎসবাদি উপলক্ষ্যে অনেকে একত্র হয়ে আমোদ প্রমোদের উল্লাস বর্ধন করা বা মানবদেহের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতরসপরিবেশনে নিবিড় অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করা। মানুষের স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের স্বাভাবিক অঙ্গচালনার প্রবৃত্তি তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে; শিশু যেমন অকারণ আনন্দে নেচে বেড়ায় সেই সহজ আনন্দের মুক্তি তার মধ্যে আছে। দেহ আপনার চাহিদা আপনি প্রকট করে তাই অঙ্গসঞ্চালনের ইচ্ছা ক্ষুধাতৃষ্ণার মতই স্বাভাবিক।

যে পূর্ণস্বাস্থ্যের সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক সত্তা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই কাম্য এবং স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শক্তি ও আনন্দের ধারার চরম পরিণতি।

সাগরপারের চিঠি।

শ্রীঅজয় দাস।

সামচুণ, ৪ঠা জানুয়ারী।

ব্রিটিশ সীমা থেকে সামচুণ প্রায় দেড়মাইল দূরে। সীমা পার হলেই দেখা যায়, দূরে সামচুণগ্রামের ছোটছোট একতলা ও দোতলা পাথরের বাড়ীগুলো। ঘিরে রয়েছে উঁচুনীচু পাহাড়ের পর পাহাড়। তারই ফাঁকে ফাঁকে কলুন-ক্যান্টন রেলওয়ের সিঙ্গল্ লাইন এঁকে বেঁকে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই ছোট গ্রামটা গত ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে ছিল সহজ আনন্দ! কিন্তু ২৬শে সকাল বেলা হঠাৎ একটা জাপানী উড়োজাহাজ কোথা থেকে উড়ে এসে এই গ্রামের উপর বৃত্তাকারে অনেকক্ষণ উড়লো ও কাগজে ছাপান সাবধানকারী ইস্তাহার ফেলে গেল। একটা কাগজ আমাদের হাসপাতালের উপর এসে পড়ল। সেটা পড়ে দেখলাম যে জাপানীরা চীনাভাষায় লিখেছে, "তোমরা সব ভাল যোদ্ধা, তবু আমরা আসার পর তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব পরিত্যাগ করো, আর এই কাগজখানা তোমাদের বাড়ীর দরজায় লাগিয়ে রেখো; তাহলে জাপানী সৈন্যরা তোমাদের কিছু বলবে না। আর তা না হলে তারা তোমাদের মেরে ফেলবে।" প্রায় ঘণ্টা দুই পর সেই উড়োজাহাজখানা আবার সামচুণের উপর বৃত্তাকারে কিছুক্ষণ উড়লো। তারপর চিলের মত ছোঁ মেরে একবার নীচের দিকে নামতে লাগলো ও সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া কামান দিয়ে সামনে গ্রামবাসীদের উপর গুলী চালাতে লাগলো। ঘণ্টাখানেক গুলী চালিয়ে তারা আবার উড়ে চলে গেল। এই ব্যাপার গ্রামবাসীদের উপর এনে দিল একটা আতঙ্কের কাল ছায়া—তারা অপেক্ষা না করে পালাতে লাগলো ইংরেজ সীমানার দিকে। সারাদিনে এই গ্রাম থেকে প্রায় দেড় হাজার লোক চলে গেল, রেখে গেল শুধু শূন্য মরুভূমির মত খালি গ্রামটাকে। পড়ে রইলাম আমরা ২৮ জন লোক আর ২৬টি আহত সৈন্য। সারাদিন এ রকম আতঙ্কের মধ্যে কেটে গেল। বিকেলে আরো দুজন সৈন্য এসে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হলো। তাদের যখন ওষুধ দিতে গেলাম, তারা আমাকে বল্লো, "ইসাং (ডাক্তার), আগে আমাদের কিছু খেতে দাও। আজ ৩ দিন কিছু খাবার জোটেনি।" আমাদের সকলের কাছে খোঁজ করে দেখা গেল একটিন "কোকো" ছাড়া আর কিছুই নেই। কি করি, গ্রামের দোকানপাট সব

বন্ধ, জনমানব নেই। বেরিয়ে পড়লাম তবু, গ্রামের ভিতর খাবার সংগ্রহের আশায়। বহুকষ্টে একটা দোকানের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম, মালিকের সন্ধান পেলাম না। সে আগেই পালিয়েছে। কাজেই হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই চৌর্যবৃত্তি করে আনা গেল। মালিকের অবর্ত্তমানে কাউকে না বলে আনা চুরি ছাড়া আর কি হতে পারে? ফিরবার মুখে গ্রামের থানায় ঢুকলাম, তারা আছে কিনা দেখবার জন্য। তারাও গ্রামবাসীদের পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো। বুদ্ধিমান তারা! তাই ফিরবার সময়ে সেখান থেকে একটা রাইফেল, ২০০ গুলী ও ৮টা হাতবোমা নিয়ে এলাম, অসময়ে কাজে লাগবে মনে করে। ক্যাম্পে ফিরে এসে সেই সৈনিককে কোকো ও বিস্কুট খাওয়ালাম ও তারপর ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে রাখলাম। রাত্রে আমাদের Loader ফিরলো না দেখে আমাদের দলের লোকেদের মধ্যে রাত্রে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেবার বন্দোবস্ত করলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে রাইফেল ছুঁড়তে জানে একজন, সে আগে সৈন্য ছিল, আর আমি। কাজেই পাহারার পালা আমাদের মধ্যে ভাগ করে ঠিক হয়ে গেল। রাত ১১টার সময়ও দলপতি ফিরলো না। সাড়ে এগারোটার সময়ে একদল চীনা এসে খবর দিল যে "তাড়াতাড়ি পালাও, জাপানীরা মাত্র আধ মাইল দূরে যুদ্ধ করছে। এখানে থাকলে তোমরা বাঁচবে না। তারা হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে। তাদের সঙ্গে সাজোয়া গাড়ী ও আছে।" লোকটার সঙ্গে দুজন জার্ম্মান ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁদের কাছে মাত্র দুটো রিভলবার। কি করি অগত্যা তাড়াতাড়ি পালাবার বন্দোবস্ত করতে হলো। আমাদের জিনিষপত্র এবং আহত সৈন্যদের ষ্ট্রেচার ও চেয়ারে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হলো। আহতদের মধ্যে যারা হাঁটতে পারে তাদের হাঁটিয়ে নিতে হলো। চেয়ার বইবার লোক নেই তাও আমাদের কাঁধে নিতে হলো। সেই জার্ম্মান ভদ্রলোক দুজন আমাদের সাহায্য করলেন। সবার পেছনে রইলাম আমি ও জার্ম্মান ভদ্রলোকেরা। আমাদের তিনজনের কাছেই অস্ত্র ছিলো। ঠিক হলো বেগতিক বুঝলেই আমি ঠিক পেছনে ও তারা দুজনে দুপাশে সমানে গুলী চালাবে। আমি পেছনে, কারণ আমার কাছে রাইফেল—তার পাল্লা ঢের বেশী। কোন রকমে আমরা তাদের নিয়ে প্রায় যখন সীমানার কাছে এসেছি, এমন সময় পেছন থেকে একটা গুলী এসে আমার হাঁটুতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনজনের বন্দুক থেকে ৩০টি গুলী বেরিয়ে চলে গেল, অন্ধকারে, যেদিক থেকে সে গুলী এসেছে। ব্রিটিশ সীমায় পৌঁছে দেখলাম গুলীর জখম তেমন নয়। হাঁটুর কাছের কিছুটা মাংসের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। আহত জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তখনই আবার

বেরিয়ে পড়তে হলো, এম্বুলেন্সের খোঁজে, কারণ আহতদের তখনই হাসপাতালে পাঠাতে হবে। রাত প্রায় দেড়টার সময়ে হংকংএ টেলিফোন করে এম্বুলেন্স আনিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে আবার সামনের দিকে রওনা হলাম, আরো আহতদের খোঁজে। সৌভাগ্যবশতঃ সে রাত্রে আমাদের খুব বেশী বিপদে পড়তে হয়নি। সামনে যাবার সময় ব্রিটিশরাজ্যের একজায়গায় আমরা যাচ্ছি এমন সময় সেখানে জাপানীদের ছুটো গোলা এসে পড়ে। আমাদের তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। পরের দিন হাঁটু ফুলেছিল এবং ৩।৪ দিন হাঁটা প্রায় বন্ধ ছিল।

আর একদিনের ঘটনা বলছি। দিনপনেরো আগে একদিন আমরা "ফ্রণ্টে" যাচ্ছি। আগাগোড়া পাহাড়ী রাস্তা, উঁচুনীচু ও সরু। আমাদের যেতে হবে ক্যাম্প থেকে ২৫ মাইল দূরে। আমাদের রওনা হতেই দেরী হয়ে গেছে। যখন সবে আট মাইল চলে এসেছি, পাহাড়ী রাস্তায় সন্ধ্যা তখন এসে পড়েছে। চলা ক্রমেই অসুবিধার হয়ে উঠলো, কারণ যদিও প্রত্যেকের সঙ্গে শক্তিশালী টর্চ আছে কিন্তু তা জ্বালবার হুকুম নেই, প্রথমতঃ শত্রুপক্ষের জন্য, দ্বিতীয়তঃ চীনা দস্যুদের ভয়ে, তারা ওসব জায়গায় অবাধে নিরীহ দেশবাসীদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব চালায়, পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নেয়, কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না, কারণ দলে তারা থাকে ভারী ও আগ্নেয় অস্ত্র থাকে সঙ্গে। আমরা ১২ জন চলেছি, এ দলের নেতা হচ্ছি আমি। সকলকে হুকুম দিলাম কেউ টর্চ জ্বালাতে বা জোরে কথা বলতে পারবে না। সকলে বাধ্য হয়ে ফ্রণ্টে কাজ করার সময়ে আমার কথা শুনত, কারণ প্রতিবার যাবার সময় চীনা মিলিটারী হেডকোয়ার্টার থেকে আমি একটা "মিসেল" (একরকম রিভলভার, তার কাজ একটু তফাৎ ; রিভলভার থেকে একসঙ্গে ৬ টার বেশী গুলী ছোঁড়া যায়না, কিন্তু এতে কামানের মত এক সঙ্গে ২৫ টি গুলী ছোঁড়া যায়।) নিয়ে যেতাম, ও যাবার আগে যে কথা না শুনবে তাকে গুলী করবার আদেশ পেতাম, তবে আজ পর্য্যন্ত গুলী করবার প্রয়োজন হয় নি।

আমরা চলেছি রাত্রের অন্ধকারে, আমাদের জোরে নিশ্বাস ও জুতার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সকলের কাছে একটা করে কম্বল, ওয়াটারকেরিয়ার, ফুডকেরিয়ার ও কিছু ঔষধ আছে। আমরা পাহাড়ের একটা উপত্যকা দিয়ে নামছি, হটাৎ আমাদের একজন পা হড়কে প্রায় ১২ ফুট নীচে খাদে পড়ে গেল। ছুজন তো তাকে টেনে তুললো কিন্তু আলো জ্বালতে দিলাম না, তাকে তোলা হতেই আবার মার্চ করতে হুকুম দিলাম। যে পড়ে গেছে তার হাড় ভাঙ্গলো কিনা তা দেখতে আমরা অপেক্ষা করলাম না, কারণ

সে জায়গা নিরাপদ নয়। আমরা আবার চল্লাম। সে অগত্যা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বহুকষ্টে একজনকে ভর করে আমাদের অনুসরণ করলে। আরো দুঘণ্টা হাঁটবার পর আমরা একটা ছোট গ্রামে পৌঁছলাম। এখানে এসে সঙ্গীটির ব্যবস্থা করবার সময় পেলাম, হাড় তার ভাঙ্গেনি, হাঁটু মচ্‌কে গেছে। এমন সময় কয়েকজন চীনা সৈন্য জনাদশেক আহত নিয়ে হাজির হলো। কোথায় গেল আমাদের বিশ্রাম—তখনই আবার হাত গুটিয়ে লাগতে হলো কাজে। যে সঙ্গিটী পড়ে গিয়েছিল, তার কাজ ছিল আমাকে ড্রেসিংএ সাহায্য করা। তাকেও নামতে হলো কাজে। যদিও বুঝলাম যে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তখন দয়া দেখান যায় না। সব ভুলে দেখছি কাজ ও কথা। যখন দেখি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্ত্রীলোকেরা আর নিরীহ বৃদ্ধবৃদ্ধারা যাদের যুদ্ধের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তারাও কি ভাবে দলে দলে জাপানীদের বোমা আর কামানে, মরছে তখন সাহস বেড়ে যায় মরণের ভয় থাকেনা।

"অজু"*

মেয়েদের খবর।

জ্যৈষ্ঠমাসের "মেয়েদের কথা"য় মহিলাদের জন্য বোর্ডিং প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয়েছিল, যথেষ্ট সংখ্যক মহিলার আবেদন পাওয়া না যাওয়ায় প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি; কিন্তু যতদিন ঐ বোর্ডিং স্থাপন করা সম্ভবপর না হয় ততদিন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা সমিতির দক্ষিণ শাখার তত্ত্বাবধানে একটি মেস পরিচালিত হতে থাকবে; যাঁরা এ বিষয়ে সবিশেষ জানতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় খবর নেবেন—শ্রীঅপর্ণা সেন, ৯৯।১, টালিগঞ্জ রোড, টালিগঞ্জ।

* * * * * *

---

*শ্রীমান অজয়দাস আমাদের পরিচিত পরিবারের সন্তান; এঁর পত্র যদি পাঠিকাদের ভালো লাগে তো ভবিষ্যতে আরো প্রকাশিত করবার চেষ্টা করব।

সম্পাদিকা।

জ্যৈষ্ঠমাসের "মেয়েদের কথা"য় টীচার্স ক্লাবের বিবরণ শ্রীবাসনাসেনের কাছে পাওয়া যায় বলে লেখা হয়েছিল কিন্তু তাঁর ঠিকানায় ভুল ছিল, ঠিক ঠিকানা—৫৫নং বকুলবাগান রোড।

* * * * * *

১৭২।৩ রাসবিহারী এভিনিউতে যে মহিলাদের এ-আর-পি ক্লাস খোলা হয়েছে, তার প্রথম দফা পরীক্ষা সমাপ্ত হল। আরো নূতন নূতন যাঁরা পড়তে চান তাঁদের জন্য দ্বিতীয় দফা বক্তৃতা জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হবে। যাঁরা যোগদান করতে চান তাঁরা উপরের ঠিকানায় সব খবর পাবেন।

কলিকাতার বিভিন্ন অংশের মেয়েদের সুবিধার জন্য উত্তর কলিকাতায় একটি ও পার্কসার্কাসে একটি এ-আর-পি শিক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১০৮-এ, অপার সার্কুলার রোডের ঠিকানায় শ্রীইলাসিংহের নিকট ও ১৩নং তারকদত্ত রোডের ঠিকানায় শ্রীআরতি মুখার্জির নিকট এ বিষয়ে সবিশেষ জানতে পারা যাবে।

এই কেন্দ্রগুলির বিশেষত্ব এই যে কোন স্বাক্ষর বা চুক্তি বিনা স্বাধীনভাবে, ইচ্ছানুযায়ী এখানে পড়তে ও পরীক্ষা দিতে পারা যায়, তাছাড়া সকল অঞ্চলের মহিলাদের পক্ষে ৫৫নং পার্কষ্ট্রীটের কেন্দ্রে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের জন্য ঘরের কাছে ব্যবস্থাই অধিকতর সুবিধাজনক।

উপরিউক্ত তিনটি কেন্দ্র কলিকাতার সকল অঞ্চলের অধিবাসিনীদের অভাব পূরণ করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই যদি কোন মহিলা তাঁদের পাড়ায় এ-আর-পি ক্লাস খুলবার উপযুক্ত স্থান এবং ছাত্রী আছে বলে মনে করেন তবে ১৩নং তারকদত্ত রোডের ঠিকানায় শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়কে জানালে তিনি শিক্ষকতার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবেন।

* * * * * *

গত ১৪ই জুন শনিবার ১১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে একটি বিশেষ অধিবেশনদ্বারা "সন্ধানী সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কয়েকটি ছাত্রীর উৎসাহে মহিলাদের খেলা, পাঠ, আলোচনা ও নানা প্রকার আমোদপ্রমোদের জন্য এই সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে।

* * * * * *

বরিশালের দুর্যোগপীড়িতদের দুঃখলাঘবের জন্ত যাঁরা পুরান কাপড় অথবা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চান তাঁরা "মেয়েদের কথা"র সম্পাদিকার নিকট তাঁদের দান পাঠালে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত ও যথাস্থানে প্রেরিত হবে।

শ্রীললিতা রায়ের প্রেরিত পুরান কাপড় পেয়েছি ও তাঁকে ধন্তবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের কথা।

এ বৎসরের প্রারম্ভ দারুণ দাঙ্গা ও দুর্যোগের মধ্যে এবং দুর্ভিক্ষও যে বহুদূরবর্তী নয় একথা অনেকেই অনুমান করছেন। বাহিরে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের প্রলয়, ভিতরে মানুষের পৈশাচিক প্রবৃত্তির ভীষণ ও প্রকৃতির ভীষণতর অত্যাচার,—যেন আগ্নেয়গিরির চূড়ায় আমরা বাস করছি। এর জ্বালা জুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা শ্রাবণের স্নিগ্ধ ধারাবর্ষণেরও নাই।

চতুর্দিগ্‌ব্যাপী এই ভীষণতার মধ্যে আমরা কি "শুধু প্রাণ ধারণের, শুধু দিনযাপনের গ্লানি" বহন করে নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকব? যতক্ষণ না মৃত্যু এসে আমাদেরও গ্রাস করছে ততক্ষণ অপেক্ষা করব? জানি বিপদের যে পরিমাণ তার তুলনায় আমাদের শক্তি অতি ক্ষুদ্র; জানি বিপদের সঙ্গে লড়বার সুযোগ ও সুবিধা আমাদের নাই, কিন্তু তবু যে কাঠবিড়ালী রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সহায়তা করেছিল তার কাহিনী স্মরণ করলে বুঝতে পারব আমরা নগণ্য নই।

আমরা নারী, জাতির অর্ধাংশ আমরা, আমাদের শক্তি সংঘবদ্ধ হলে কত প্রবল হতে পারে তাকি জানিনা? আজকের দুর্যোগে প্রকৃতির অত্যাচারটুকু ছেড়ে দিলে দেখা

যাবে যে স্বার্থের হানাহানিই মানুষের সৃষ্ট কদর্যতার মূল। স্বার্থত্যাগের জন্য নারীর খ্যাতি আছে, আমরা সকলে কি সংঘবদ্ধ হয়ে তার সাধনা করতে পারবনা? জাতিধর্ম নির্বিশেষে শুধু ভারতের নয়, জগতের সব নারী যদি সম্মিলিত হয়ে দৃঢ়ভাবে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারত তবে এ জগদ্দল পাষাণ এতদিনে নিশ্চয়ই টলে পড়ত।

নারীর বিত্তাধিকার নিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদে কিছুদিন থেকে আন্দোলন চলছিল এবং কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সমিতির হাতে নারীর স্বার্থসংরক্ষণের নূতন আইন গঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল। তারপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে এ সংঘ শুধু বিত্তাধিকারসম্বন্ধীয় নয় নারীর দাবীসম্বন্ধীয় অনেকগুলি আইন নিয়েই আলোচনা করবেন। এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, কেননা বিত্ত তো সম্মানের বহিরংশমাত্র নারীর আসল মর্যাদা তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতিতে-জগতের সকল জাতিই সুদিনে নারীর মর্যাদা বুঝতে না পারলেও দুর্দিনে তার মূল্য বুঝেছে এবং তাকে পূর্ণমানবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মরক্ষা করেছে। ভারতবর্ষ যদি আগে থেকেই তার নারীকে মানুষ করে নিয়ে দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে তবে সেটা তার সৌভাগ্য।

শ্রাবণে নূতন প্রচ্ছদপট দেওয়া হয়েছে ও একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে; পত্রিকার আকৃতিও বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যাঁরা কাগজ বাঁধিয়ে রাখতে চাইবেন তাঁদের অসুবিধার ভয়ে আশ্বিনমাস অবধি পরিবর্তনটি স্থগিত রইল।

এ মাসে পৃষ্ঠার পাদপূরণের জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খবরগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্তের দ্বারা সঙ্কলিত।

আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবারকার প্রচ্ছদপটের ও প্রথম ছবির ব্লক ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও আমাদের বিনামূল্যে করে দিয়েছেন।

"মেয়েদের কথা"র এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। অগ্রিম টাকা জমা দিলে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় পত্র দাখিল করিলে "মেয়েদের কথার" এজেন্সী লইতে পারা যায়। প্রতি মাসের প্রাপ্য প্রতি মাসে শোধনীয়। তিন মাসের টাকা বাকী থাকিলে এজেন্সী থাকিবে না।

২। মাসিক পাঁচখানার কম সংখ্যা লইতে হইলে প্রতি মাসে অগ্রিম মূল্য Stampএ পাঠাইতে হইবে।

৩। "মেয়েদের কথা" বিক্রীর কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা। ১০% অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় এজেন্টের ব্যয়ে।

ম্যানেজার—"মেয়েদের কথা"

১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩/০ আনা ; যাণ্মাষিক মূল্য ১॥০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন ; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

Printed at Bhowanipur Art Press, 82-A, Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar Chakravartty

মেয়েদের কথা—

ভাদ্র—১৩৪৮

বলে নে ভাই, "এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া,
এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আনন্দ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

(পূরবী)

সম্পাদিকা—

শ্রীকল্যাণী সেন, এম এ।

সূচি পত্র—ভাদ্র ১৩৪৮

"মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমর মূরতি—
সমুন্নত ভালে
- - - লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে।"

-'রবীন্দ্রনাথ'

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | ভাদ্র—১৩৪৮ | ৫ম সংখ্যা

"তুমি।"

এক্‌লিম রাজা

তুমি দিও সুর সুমধুর
আমি যদি রচি গান,
আমি গড়ি যদি মাটির পুতুল
তুমি দিও তাহে প্রাণ।

চলিতে চলিতে পথ ভুলে যাই,
হারাই পথের রেখা,
হে মোর সুন্দর, পথ দেখাইও
তুমি আসি দিয়া দেখা।

বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

শ্রীরেণু রায়।

(বেতারের সৌজন্যে)

সকল দেশের উন্নতির মূল শিক্ষা। যে দেশে শিক্ষার অভাব সেই দেশেই কুসংস্কার ও নিশ্চেষ্টতা এসে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে দেয়। দেশ হয়ে পড়ে নির্জীব, দুর্বল। তারই জন্য আমরা দেখতে পাই যে, যে দেশেই উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা হয়েছে সেখানে প্রথমেই শিক্ষা বিতরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যে দেশ অশিক্ষিতে ভরা, সে দেশের লোক ভাবতে শেখেনি, তাদের চলতি পথ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই তারা বাইরের পৃথিবীর সংস্পর্শে আসতে অক্ষম; আধুনিক যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারেনা, তাই তারা পড়ে থাকে অনেক পেছনে।

আমাদের দেশের অবস্থাও তাই। শতকরা তিরানব্বই জন ভারতবাসী সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতার শতকরা সংখ্যা আরও বেশী। এ অবস্থায় আমরা যে কুসংস্কার ও নির্জীবতার কবলে পড়ব তাতে আর আশ্চর্য কি? সেই নিশ্চেষ্টতা, সেই কুসংস্কার দূর করে ব্যাপক শিক্ষাই শুধু এনে দিতে পারে নূতন চিন্তাধারা, নূতন শক্তি, উৎসাহ ও নবজাগরণের বাণী। তাই আজকের সব চাইতে প্রয়োজনীয় কাজ এই শিক্ষা বিতরণের জন্য বিপুল প্রচেষ্টা করা। আজ প্রত্যেক গ্রামে, মহকুমায়, জেলায়, সহরে চাই এই শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ ও আয়োজন।

বয়স্কদের শিক্ষা দেবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। যেমন তেমন করে পুঁথিগত নিয়মে পড়ালে চলবে না। আজকাল এই বয়স্কশিক্ষার প্রতি শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌রা বিশেষ মনোনিয়োগ করেছেন। দেখা গেছে যে ছোটবেলা থেকে যারা লিখতে পড়তে শেখে তাদের যে প্রণালীতে পড়ান হয় সেই প্রণালী বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকে নানা জিনিষের ও বিষয়ের পরিচয় পেয়ে থাকে, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। যারা ছোটবেলাতেই শিক্ষালাভ করতে সুরু করে তারা সেই সব জিনিষের পরিচয় পায় প্রথমে বইএর মধ্য দিয়ে তারপর তাদের সেই জিনিষ ছবিতে বা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে তার মানে বোঝাতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তি "নদী" শব্দের অর্থ কি

তা জানে, শুধু জানেনা কি ভাবে লিখতে এবং পড়তে হয়। তাই কয়েকবার তাকে সেই শব্দটি নানান্‌ভাবে দেখিয়ে দিলে সে চট্ করে শব্দটির অক্ষরগুলির স্বরূপ ধরে ফেলতে পারে! তাকে আর সেই "অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে"র টানা পদ্ধতির ঘোরপ্যাচের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দান করতে হয় না। একেই বলে প্রত্যক্ষপদ্ধতি (Direct Method) এই প্রত্যক্ষ পদ্ধতিই হল বয়স্কদের শিক্ষার একমাত্র সহজ ও সফল উপায়। তাছাড়া বয়স্কদের শেখাতে গেলে তাদের ত আর বছরের পর বছর পড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; তার প্রয়োজনও নেই, কারণ বড়দের শিখতে অনেক কম সময় লাগে, যদি ঠিকমত প্রণালীতে তাদের শেখান হয়।

আজকাল বয়স্কদের শিক্ষায় যে সমস্ত কথা ভাষায় আমরা বেশী ব্যবহার করি বা যে গুলি মনের ভাব প্রকাশের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় সে গুলি আলাদা করে বেছে নিয়ে এমন ভাবে গুছিয়ে শিক্ষাদান করা যায় যে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সহজ বই, কাগজ তারা পড়তে পারে এবং চিঠিপত্র লিখতে পারে। একেই বলে মূল ভাষাগত (basic language) শিক্ষা। এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে যারা এ পর্য্যন্ত শিক্ষার সংস্পর্শে আসেনি তাদের মন যেন অত্যধিকসংখ্যক শব্দের চাপে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে তারই চেষ্টা। হয়ত এতে তাদের ভাষার প্রাচুর্য ও লালিত্যের উপর সম্পূর্ণ দখল না, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যারা এই শিক্ষার প্রথম স্বাদ পেয়ে আরও জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা তাদের নিজেদের চেষ্টাতেই উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্যরা লিখতে পড়তে শিখে শুধু নিজেদের কাজটুকু উদ্ধার করতে পারলেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এটা ঠিক, সে লোকের উৎসাহ জাগিয়ে দিতে পারলে তারা অনেক সময় নিজেদের চেষ্টায় যে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে কানপুরের একটি স্কুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেখানকার একটি কলেজের ছাত্রেরা কলেজ বাড়িতেই শ্রমিকদের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় খোলে। যারা পড়তে আসত তাদের অধিকাংশই অতিশয় গরীব। তাদের মধ্যে অনেকে তিনমাসের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ও মূল ভাষাগত পদ্ধতি অবলম্বন করে লিখতে পড়তে শিখল। তাদেরই মধ্যে দুই একটি উদ্যোগী ছাত্র যাতে অনভ্যাসবশত তাদের নবসঞ্চিত জ্ঞান হারিয়ে না ফেলে এবং যাতে আরও জ্ঞানলাভ করতে পারে তারই জন্য একটি ছোট্ট খাপরার ঘর ভাড়া নিয়ে পাঠাগার গঠনের চেষ্টায় নিযুক্ত হল। তাদেরই সামান্য আয়ের অংশ দিয়ে তারা দৈনিক কাগজ কিনতে লাগল। ক্রমে সহজ ইতিহাস, জীবনী, গল্পের বই

প্রভৃতি লোকের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে সংগ্রহ করতে লাগল। মনে পড়ে যায় তাদের সেই আনন্দভরা মুখগুলি যখন তারা তাদের সেই ছোট্ট নিকোন পরিপাটি পাঠাগারের মধ্যে আমাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করল, যখন তারা সগর্বে দেখাতে লাগল তাদের সম্পত্তি। এই রকম করে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে জনগণের সহযোগিতা, উৎসাহ ও উন্নতির চেষ্টার দৃষ্টান্ত অনেক জায়গাতেই পাব এবং এরাই আমাদের শিক্ষাবিস্তারের অভিযান এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের উৎসাহ জাগ্রত করে রাখবে।

বয়স্কদের শিক্ষায় শুধু বাঁধা নিয়মে পড়িয়ে গেলে চলবেনা। এই শিক্ষা প্রদানে সহানুভূতি ও বুদ্ধি খরচ করতে হবে, কারণ যারা পড়তে আসবে তারা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, তারা জীবনপথে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। এরই জন্য তাদের শেখাতে গেলে তাদেরই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সুপরিচিত আবহাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে পড়াতে পারলে ওতেই তাদের মন তাড়াতাড়ি আকর্ষণ করা যাবে। একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যায় যে গ্রামবাসীকে কচুরীপানা এই কথাটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে লিখতে, পড়তে শেখাতে বিশেষ কষ্ট হবে না। তারপর সেই কচুরীপানাকে অবলম্বন করে তাকে সহজ ভাবে উদ্ভিদবিদ্যার কিছুটা বোঝান যেতে পারে। আবার বাংলাদেশের কোথায় কোথায় কচুরীপানার অধিক উৎপীড়ন সেই কথার ভিতর দিয়ে গল্পের ছলে ভূগোলও পড়ান যায়। উপরন্তু সেই একই কচুরীপানা স্বাস্থ্য ও কৃষিবিজ্ঞান প্রচারের প্রসঙ্গ যোগাতে পারে, যথা—কি ভাবে ম্যালেরিয়া হয়, কি ভাবে পানাতে জল দূষিত করে, দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের কতখানি ক্ষতি করে, কি করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করলে কচুরীপানার আবর্জনা দূর করা যায়, কি ভাবে পানা পুড়িয়ে সার করা যায় ইত্যাদি। যে সব জিনিষের সঙ্গে লোকদের দৈনন্দিন পরিচয়, যেমন শ্রমিকের কলকব্জা, কারখানা প্রভৃতি সহুরে জিনিষের সঙ্গে কারবার, তেমন গ্রাম্যলোকের চাষবাস, নদীবায়ু, গাছপালা এই সবই বেশী পরিচিত, এমনি চেনা জিনিষের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাপ্রদান করলে তারা উৎসাহও পায় বেশী, তাদের শিক্ষাতেও সময় লাগে কম। তাই শুধু অর্থের জন্য যাঁরা পুঁথিগত নিয়মে, যা তা করে পড়িয়ে যান তাঁদের শিক্ষা ততটা সফল হয় না; যাঁরা জনগণের উন্নতির জন্য সত্যই উৎসুক, যাঁরা তাদের প্রকৃত শিক্ষা দান করতে ইচ্ছুক, তাঁরাই তাঁদের সহানুভূতি ও চেষ্টায় এই কাজ সাফল্য মণ্ডিত করতে পারেন।

কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করতে হলে শুধু লিখতে পড়তে শেখালেই চলবেনা। সেই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের চিন্তাশক্তি বাড়িয়ে তুলতে হবে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের

নানান্ সমস্যার আলোচনা, তর্ক (debate) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাদের ভাবতে শেখাতে হবে। আবার মনে পড়ে যায় কানপুরের সেই স্কুলের কথা,— একটি প্রৌঢ় ছাত্র উঠে কি সুন্দর, সহজ অথচ সোজাসুজি ও সপ্রতিভ ভাবে মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে বলে গেল! তারপর আর একজন উঠে শিক্ষার লাভ কি, এই বিষয়ে আলোচনা করল। তখনই বুঝলাম এরা শুধু লিখতে শেখেনি, নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে ভাবতে শিখেছে, এরাই প্রকৃত শিক্ষালাভ করেছে।

তাছাড়া কি উপায়ে এরা নিজেদের উন্নতিসাধন করতে পারে, কি ভাবে নাগরিক অধিকারগুলিকে (citizenship rights) ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদিও এদের শেখাতে হবে। এদের কাছে এদেরই বোধগম্য ভাষায় বাইরের পৃথিবীর বার্তা এনে দিতে হবে। এই ভাবেই তাদের সাধারণ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি প্রসার লাভ করতে পারবে। তাদের শেখাতে হবে কিভাবে তাদের নিজেদের এবং শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়, কি ভাবে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, ইত্যাদি। তাছাড়া শিক্ষার একটি প্রধান স্থান অধিকার করবে শিল্প আমাদের প্রতি গ্রামে বিশিষ্ট কারুশিল্পের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি যে অনেক ক্ষেত্রে অবহেলার দরুণ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা অতি আপশোষের কথা। আলপনা কাটা, তাঁতের কাপড়ে নানারকম নিখুঁৎ নক্সা করা, পটের কাজ, সূক্ষ্ম সূচীশিল্প, চিত্রকলার নৈপুণ্য এ সবেরই পরিচয় অল্পবিস্তর আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে। সেগুলিকে আবার বিস্তারিতভাবে প্রচলিত করা চাই। তাছাড়া যাত্রা পূজাপার্বণে নাচগান, সন্ধ্যাবেলার আরতি ইত্যাদি আমাদের জনগণের মধ্যে একটা নাটকপ্রীতি এবং সঙ্গীতবাদ্যের প্রতি টান রেখে গিয়েছে; এই সুরবোধ ও অভিনয় প্রীতিই শিক্ষাবিস্তারের একটি মহৎ উপায় হয়ে উঠতে পারে। এই ভাবে যেখানেই আমরা আনন্দ ও শিক্ষা, কলাশিল্প ও বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে মিল রেখে কাজ করতে সক্ষম হব সেখানেই যে সব শিক্ষায়, বিশেষতঃ বয়স্কদের শিক্ষায় সফলতা লাভ করব তা নিশ্চিত।

যে দেশে শতকরা তিরানব্বই জন নিরক্ষর সেখানে যে শিক্ষাবিস্তারের কতখানি প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ। যারা জাতির মা, যারা মানুষ করবে ভবিষ্যৎ ভারত সন্তানদের তারাই আজ হয়ে পড়েছে অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত ও নিশ্চেষ্ট। দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের চাপে তাদের শরীরমন ভেঙ্গে পড়েছে তাদের মধ্যেই আজ কাজ করা বিশেষ আবশ্যক। এই জন্য গত জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদে নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে এই বিষয়ে বিশেষ

আলোচনা হয়; সেখানে স্থির হয় যে আজ আমাদের দেশে এমন সময় এসেছে যাতে ভারতব্যাপী নিরক্ষরতাদূরীকরণের একটা প্রকাণ্ড প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই এই অধিবেশনে নির্ধারিত হয় যে নিখিলভারত মহিলাসম্মেলনের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা এ বৎসর এই কাজেই বিশেষ মনোযোগ দেবেন। ইতিমধ্যে গত বছরই গুজরাট ও বোম্বাই সহরের শাখা বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণের কাজ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাঁরা বোম্বাই সহরের বস্তিতে বস্তিতে টোলে টোলে প্রায় পঞ্চাশটি অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছিলেন। গুজরাটে এই কাজ গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য প্রদেশেও এই কাজ অল্পবিস্তর হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট সুব্যবস্থা ও উৎসাহের অভাবে তেমন সাফল্য লাভ করেনি।

গত অধিবেশনের বিবেচনার ফলে কলিকাতা শাখাও শিক্ষাবিতরণের কাজে বিশেষ মনোনিয়োগ করেছে, এবং এই বৎসর কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে অন্তত দশবারোটি স্কুল খুলতে হবে বলে সঙ্কল্পিত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অর্থের এবং তার চাইতেও প্রয়োজন উৎসাহী কর্মীর যাঁরা তাঁদের সবকিছু দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যদান করবেন, যাঁরা অজ্ঞানের কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করে এনে দেবেন নবজীবনের আলোক, দূর করবেন কুসংস্কারের অন্ধকার, এই নির্জীবতা কাটিয়ে আনবেন চেতনা ও উন্নতির ইচ্ছা। চেতনা আনবার সর্বাধিক প্রয়োজন মেয়েদের মধ্যে তাই মেয়েদের কাজ মেয়েদেরই সম্পন্ন করতে হবে। সামাজিক রীতির চক্রে পড়ে তারা আজ একঘরে হয়ে পড়েছে, বাইরের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শ অল্প। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বসে তারা তাদের পৃথিবীটাকে ও জীবনটাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে, তাদের আপন গণ্ডী ছাড়িয়ে তারা ভাবতে শেখেনি। সমাজ যে জন্য দায়ী তা আজ বেশীর ভাগ লোক স্বীকার করবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ এই নূতন হাওয়ার স্পর্শে এসে শিক্ষা পেয়েছে, বাহির জগতের বার্তা এসে তাদের কানে বেজেছে। তারা যে শিক্ষা পেয়েছে তা যদি আর দশজনের কাছে বিলিয়ে দিতে পারে তাহলেই আমাদের এই দেশের ত্রিংশকোটী অধিবাসীর দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। আজ যে সুযোগ যে সুবিধা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভোগ করছে তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তবেই এই নূতন যুগের নূতন হাওয়ার মধ্যে আমরা নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারব।

কালিদাস সাহিত্যে নারী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুকুমারী দত্ত।

রঘুবংশে প্রধানতঃ দুইটি নারীর দেখা পাওয়া যায়,—ইন্দুমতী ও সীতা। বিদর্ভরাজ্যের স্বয়ম্বর-সভায় যখন রাজন্যবর্গ মঞ্চের উপরে সমাসীন তখন পরিচারিকা সুনন্দার সহিত ইন্দুমতী সভায় প্রবেশ করিলেন। সুনন্দা একে একে রাজাদের পরিচয় দিয়া গেল এবং ইন্দুমতীও একটি একটি ঋজু প্রণাম দ্বারা রাজাদের অভিনন্দিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কবি উপমা দ্বারা বলিয়াছেন, যেন সঞ্চারিণী দীপশিখা। এই সামান্য প্রণামের দ্বারা ইন্দুমতীর চরিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—যে রাজাকে তিনি বরণ করিতে পারিলেন না তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই, শুধু একটি বিনয় নম্র প্রণাম। অবশেষে অজের সম্মুখে আসিয়া ইন্দুমতী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সুনন্দা পরিহাস করিয়া বলিলেন,—সম্মুখে চল, রাজপুত্রি, এখানে রহিয়া গেলে কেন? তাহাতে ইন্দুমতী সুনন্দার দিকে ফিরিয়া কটাক্ষপাত করিলেন কোন প্রগল্‌ভতা নাই, অথচ কি সরস-মধুর ব্যবহার।

ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ রাজধানীতে ফিরিলেন। পথে শক্ররাজগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইল, অবশেষে অজই জয়ী হইলেন। স্বামীর বিজয়ে আনন্দিত হইয়া ইন্দুমতী সখীদের মুখে অজকে অভিনন্দিত করিলেন, নববধূসুলভ লজ্জায় তিনি স্বয়ং বাক্‌কুণ্ঠিতা হইয়া রহিলেন। কিছুদিন বেশ প্রমোদে কাটিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অজের সহিত প্রমোদ কাননে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বর্গীয় একটি পুষ্পহারের স্পর্শে ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে অজের মুখের বিলাপে ইন্দুমতীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মগধের রাজলক্ষ্মী ইন্দুমতী তিনি অজের গৃহিণী সচিব রহঃসখী ললিত কলায় প্রিয়শিষ্যা। অজের মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিলে বুঝা যায় ইন্দুমতীর বিরহে তাঁহার জীবন কত শূন্য হইয়া গেল।

* * * * * *

রঘুবংশের প্রধান নারীচরিত্র সীতা, ভারতের বহুযুগের আরাধ্য দেবতা। কালিদাস তাঁহার মর্য্যাদা হানি করেন নাই বরং অপূর্ব্ব কবিত্বের সাহায্যে ভারতবাসীর চির সমস্যাকে আরও গৌরবময়ী করিয়া তুলিয়াছেন।

সীতার বিবাহ হইতে বনবাস ও উদ্ধার পর্য্যন্ত কালিদাস রামায়ণের যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। উদ্ধারের পর রাম সীতাকে লইয়া পুষ্পক আরোহণে অযোধ্যায় ফিরিলেন। পথে যত কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু—সেই পঞ্চবটী, সেই গোদাবরী, পম্পা, দণ্ডকারণ্য সকলই একে একে দেখাইতে লাগিলেন।

অযোধ্যায় ফিরিয়া সীতা জননীদের প্রণাম করিতে গেলেন। কৈকেয়ীকে প্রণাম করিবার সময় বলিলেন,—'মা গুরু পিতৃদেব যে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই, এ বিষয়ে যত ভাবি ততই দেখি এ আপনারই করুণায়। আপনি সত্যরক্ষা না করাইলে তাঁহার স্বর্গ-পথ রুদ্ধ হইত।' যে কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর আদেশে বনবাসে, লঙ্কাবাসে তাঁহার জীবন এত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে আজ দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া কোথায় সঞ্চিত ক্রোধ তাঁহারই উপর বর্ষণ করিবেন, না এমন নম্রমধুর বচনে তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য উৎসর্গ করিলেন। রামায়ণে সীতা চরিত্র এখানে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বধূদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা তিনি তাই সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির পরিচর্য্যা তিনিই করিলেন। তাহার পর কিছুদিন বেশ সুখেই কাটিল কিন্তু কোথা হইতে আবার বিপত্তি দেখা দিল। সুখের স্বর্গ ধ্বংস হইয়া গেল ; জন্মদুঃখিনী সীতাকে রাম বনে পরিত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মণ যখন ভাগীরথীর তীরে রথ রাখিয়া সীতাকে এই নির্ম্মম বার্ত্তা শুনাইলেন, তখন তিনি রামের উদ্দেশে কোন কটূক্তি বা ভৎর্সনা করিলেন না, শুধু আপনার মন্দ ভাগ্যকেই বারবার ধিক্কার দিলেন। কাতর লক্ষ্মণ যখন ক্ষমাভিক্ষা করিয়া সীতার পদপ্রান্তে পড়িলেন, তখন সীতা সযত্নে তাঁহাকে উঠাইয়া স্নেহমধুর বাক্যে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কহিলেন, লক্ষ্মণ এই নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর একে একে গুরুজনদের প্রণাম-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রামচন্দ্রের বিষয় বলিলেন, অগ্নিশুদ্ধির পরেও যে লোকাপবাদের জন্য তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার দোষ নাই। তিনি জ্ঞানবান কর্ত্তব্যরক্ষা করিয়াছেন ; এ কেবল সীতারই জন্মান্তরের কর্ম্মফল। গভীর দুঃখে আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, সেবার বনবাস সুখের হইয়াছিল, সঙ্গে রামচন্দ্র থাকিতেন, আজ এই নিঃসঙ্গ বনবাস তিনি কেমন করিয়া সহিবেন? বলিলেন, রামচন্দ্র যেন অবিচলিত হৃদয়ে রাজধর্ম্ম পালন করেন,—ক্ষত্রিয়ের উহাই পরম ধর্ম্ম। অবশেষে সতীর মহিমাকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন,—বলিও বৎস,—তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন করুন, কিন্তু আমি আমরণ তপস্যা করিয়া এই কামনাই করিব, যেন পরজন্মে তাঁহাকেই পতিরূপে পাই,—কেবল যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। এই একটিমাত্র

উক্তিতে সীতা চরিত্রের বিরাট মহিমা নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে স্বামী বনবাসে পাঠাইলেন, আমরণ তপস্যায় তাঁহাকেই তিনি পতিরূপে কামনা করিবেন—রমণীর প্রেম জয়গৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

* * * * * *

কালিদাসের প্রধান নায়িকাদের মধ্যে একমাত্র সীতার জীবনে ভোগবাসনা কখনও প্রবল হয় নাই, তাঁহার প্রেম মদনের প্রভাব-বর্জ্জিত, তাই তাঁহার জীবনে যে দুঃখ আসিয়াছে তাহা প্রায়শ্চিত্তের জন্য নহে,—দৈবের নির্দ্দেশে। কিন্তু শকুন্তলা, উর্ব্বশী ও মালবিকার জীবনে দুঃখ আসিয়াছিল মহাকালের আদেশে তাঁহাদের বিশুদ্ধির জন্য। ইঁহাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ে মদনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বাহিরের বাহুল্য-আয়োজনের মধ্য দিয়া। কোথাও তপোবনে তাপসবিরোধী ভাবের সঞ্চার, কোথাও কর্ত্তব্যচ্যুতি, কোথাও বা স্বাধিকারপ্রমত্ততা,—সর্ব্বত্রই কল্যাণকে রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের, সমাজের দাবীকে লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী মদনের বিলাস-প্রচেষ্টা। এ চেষ্টায় নায়িকারাও সাধ্যমত সহযোগিতা করিয়াছিলেন; কেহ ভূর্জ্জত্বকে কেহ বা পদ্মপত্রে লিপি লিখিলেন, কেহ গান গাহিলেন আবার কেহবা পদ্মবীজের মালা গাঁথিয়া প্রিয়জনকে উপহার দিলেন। কিন্তু এগুলি তো উপলক্ষ্য মাত্র,—ইহাদের পশ্চাতে আছে সেই মহেন্দ্রের তপোভঙ্গ-দূত,- সেই স্বর্গের চক্রান্ত, মন্মথ। তবু এ আয়োজন নিষ্ফল হইল। সম্মোহন বাণ ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল, বাহিরের ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বর, যৌবনের অসংযত সৌন্দর্য্য বারেবারেই রুদ্রের হুঙ্কারে ও দুর্ব্বাসার অভিশাপে প্রহৃত হইতে লাগিল।

তাই সকল নায়িকাকেই একবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। কেহ লতারূপে, কেহবা পঞ্চতপে, কেহ পাতালকক্ষে আবার কেহবা মারীচের আশ্রমে থাকিয়া কঠিন সাধনা করিয়া পূর্ব্বের কলুষ ক্ষালন করিলেন। মদনকে নির্ব্বাসন দিয়া এবার ধর্ম্মের জন্য কল্যাণের জন্য তপস্যা করিতে হইল। ইহার মধ্য দিয়াই স্বার্থকেন্দ্র সংকীর্ণ প্রেমের কালিমা ঘুচিয়া গেল,--মহাকাল গ্লানিমুক্ত হইলেন। এবার দৈব অনুকূল হইল,—স্বয়ং বিধাতা সদয় হইলেন, তাই নিখিলের শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদের মঙ্গলধারায় এই পূর্ণতর মিলন অভিষিক্ত হইল। সত্য, শিব ও সুন্দর এক মাল্যবন্ধনে আসিয়া মিলিল।

কালিদাস আদর্শবাদী ছিলেন। বাস্তবের খণ্ড মূর্ত্তি অপেক্ষা আদর্শের পূর্ণ রূপ তাঁহার নিকট অধিক সত্য ছিল। নারীকেও তিনি ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারেন নাই; তাই নারীর খণ্ড-পরিচয় যেখানে, যেখানে শতলক্ষ ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ সেইখানেই তিনি

নারীচরিত্রকে একান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নারী যেখানে ধরণীর তুচ্ছতাকে, প্রাত্যহিকের ধূলি-প্রক্ষেপকে অতিক্রম করিয়া দেবীর আসনে সমাসীন, তাঁহার সহৃদয় কবি-মন সেই দুর্গমলোকে গিয়া নারীর ললাটে গৌরবের জয়টিকা পরাইয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির আবর্ত্তনেও যে এই সত্য ঘোষিত হয়—রাহুগ্রস্ত খণ্ড চন্দ্র চন্দ্রের মিথ্যারূপ, পূর্ণিমা তাহার স্বরূপ। বসন্তের প্রগল্‌ভ আয়োজন পুষ্প-পল্লবে মলয়ে কোকিলে বেশ সুন্দর ভাবেই গড়িয়া উঠে, কিন্তু তাহা তো স্থায়ী হয় না। এই মত্ত আড়ম্বরের নিঃসারতা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন,—অলস ভোগের গ্লানি ঘুচাইয়া, মৃত্যুর স্নানে ইহার কালিমা মুছাইবার জন্যই যেন গ্রীষ্ম আসে। ঋতুচক্রে এই ত দুর্ব্বাসা। ইহার অভিশাপের তপ্ত মরুশ্বাসে বসন্তের যাহা কিছু সস্ত-পাতী, ক্ষণিক ও অলীক তাহা ঝরিয়া যায়। কিন্তু এ রিক্ত বুভুক্ষার দৃশ্যেই সব শেষ হয় না। কালিদাস দুঃখবাদী ছিলেন না,—তাই তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি গ্রীষ্মের কঠোর সংহারী মূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া বর্ষার সজল-সুন্দর রূপটি দেখিতে পাইয়াছিল;—তপস্যার পরে তাই সকলের জীবনেই পূর্ণতা আসিয়াছে এ পূর্ণতায় ভোগের বাসনা নাই, ত্যাগের মহিমায় ইহা উজ্জ্বল। গ্রীষ্মের রুক্ষ তাপে যে নিঃস্ব হইয়াছিল, বর্ষার অজস্র ধারায় তাহারই অভিষেক। এবার প্রকৃতি আবার সাজিল,—বসন্তের প্রগল্‌ভ পুষ্প-ভূষণে নহে, বর্ষার স্নিগ্ধ শ্যামল বসনে। ক্ষয়ের দুঃখে যাহার দীক্ষা সবদিকে যাহার বাহুল্য ঘুচিয়াছে, প্রাচুর্য্যে ত তাহারই অধিকার। প্রকৃতির লীলানাট্যের এই সহজ সত্যটি 'ঋতুসংহারে'র কবির দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

শশার খোসা জলে সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে মুখ ধোওয়া বা এক চাকতি শশা মুখে ঘষা মুখের চামড়ার পক্ষে খুব ভাল। আধপেয়ালা জলে শশার টুকরো, সোহাগা (powdered boxax) আর টিঞ্চার বেনজিন দিয়ে অল্প আঁচে সিদ্ধ করে নিলে মুখের চামড়ার খুব ভাল ওষুধ হয়।

সোহাগার জলে লেবুর রস মিশিয়ে মাখলে চামড়া খুব নরম আর তার রং ফিকে হয়।

রোদে ঘুরে ঘুরে কালো হয়ে গেলে চুণের জল আর অলিভ অয়েল সমান অংশে মিশিয়ে মুখে মাখলে উপকার হয়।

সংস্কারকের বন্ধু।

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী।

কলেজের আলোচনা-সভায় প্রতুল বক্তৃতা দিত—"হাজার হাজার বছর ধরে যে সব কুসংস্কার ও কুপ্রথা আমাদের শিকলের মতন বেঁধে রেখেছে সেগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।" আবেগের চোটে সে নিরীহ টেবিলটাকেই ঘুঁসি মেরে ভেঙ্গে ফেলবার জোগাড় করত।

মেয়েদের বেঞ্চির দিকে তাকিয়ে সে দৃপ্তকণ্ঠে বলত যে নানা বন্ধনের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে এতদিন পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। সমাজের নিয়ম নিগড়ে বাঁধা থেকে তারা পরাধীন দেশের মধ্যেও পরাধীনতর। কিন্তু আজ নারী জাগরণের দিন—। ঘন ঘন হাততালি পড়ত আর অশোকের বুক বন্ধুগর্বে স্ফীত হয়ে উঠত। প্রতুলের প্রত্যেকটি কথা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত কিন্তু প্রতুল যখন তাকে ডেকে বলত বক্তৃতা দিতে, তখন তার ভাষা যোগাত না। কোনও মতে মাথা নীচু ও কান লাল করে দুই একটি কথায় প্রতুলের প্রতিধ্বনি করে সে বসে পড়ত।

এই নিয়ে প্রতুলের ঠাট্টা বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না। সে বলত "তোদের মতন মিইয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের নিয়েই তো আজ আমাদের দেশের এই দুর্গতি। ছেলেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য চাকরি, আর মেয়েদের বিয়ে। রামোঃ তোরাই নাকি আবার সমাজসংস্কার করবি। যেদিন একটি টুকটুকে বউএর সঙ্গে একথলি টাকা ঘরে আসবে সেই দিনই তোদের দেশোদ্ধারব্রত মাথায় উঠবে। আর মেয়েদের কথা নাই বললাম—এঁদের গানবাজনা, লেখাপড়া সাজপোষাক—সবের পিছনেই ওই এক দোকানদারি মনোবৃত্তি, কি করে একদিন সেজেগুজে একটি 'সুপাত্রের মন ভোলানো যেতে পারে। এমন দেশের কোনও দিন উন্নতি হবে?'

অশোক বিনীতভাবে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নিত। প্রতুলের মুখের উপর সে কোন কথা বলতে পারত না কোনও দিনও। কিন্তু প্রতুলের বন্ধু বলে সে মনে মনে গর্ব অনুভব করত। নিজের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করত সে ছাত্রজীবন পার হয়ে তার সমাজ-সংস্কারের আদর্শ ভুলে গিয়ে গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করবে না। নিজে একটা বড় কিছু কাজ করতে না পারলেও প্রতুলের সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পারে তাই করবে।

প্রতুল যখন কোমরে হাত দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলত "নিজের মধ্যে একটা জবরদস্ত "পার্সোনালিটি" না থাকলে তোরা অন্যকে কুসংস্কার মুক্ত করবি কি করে?" তখন অশোক প্রমুখ তার বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে ভাবত "হ্যাঁ, এই একটা মানুষ বটে!"

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। প্রতুল এখন কলিকাতার এক মার্চেণ্ট আপিসে ভালগোছের একখানা কাজ নিয়ে বসেছে। তার গুণগ্রাহী বন্ধুরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল অশোক তার সঙ্গ ছাড়েনি এখনও মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী আসে। প্রতুলের লম্বা-চওড়া কথাগুলি এখনও সে খুব মন দিয়ে শোনে আর মুগ্ধ ভাবে সমর্থন করে। আজ প্রতুল বলে পণপ্রথা তুলে দেবার জন্য একটা সভা করবে, কাল বলে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন পাশ করবে। তার ওজস্বিনী ভাষায় অশোকের বুকের রক্ত দুলে ওঠে। রঙীন কল্পনার দৃষ্টিতে সে নিজেকে দেখে মস্ত এক সংস্কারকের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার প্রত্যেকটি কাজের প্রধান সহায়।

প্রতুল তাকে খোঁচা দিয়ে বলে "এই তোদের মতন আধমরা, গোবেচারাদের জন্যই তো আজ আমাদের সমাজের এই অবস্থা। আর দেখ, আমাদের দেশের মেয়েরাও কেমন যেন নিস্তেজ, ভালমানুষ গোছের। তারা যদি নিজেদের ন্যায্য অধিকারগুলো একটু ভাল করে বুঝত, একটু জোর গলায় দাবী করত তাহলে তো অর্ধেক কাজই উদ্ধার হয়ে যেত।"

অশোক মেনে নিত যে কোনও বড় কাজের নেতৃত্ব করবার মতন ব্যক্তিত্ব তার নেই, তবু সে বলত "তুই যা কাজ করবি আমি তাতে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব প্রতুল!"

প্রতুল বলত যে তার দু'মাস বড্ড কাজের চাপ, দু'মাস পরে তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ত, শরীর সারলে তার বোনের বিয়ে হ'ত—সমাজ সংস্কার করা আর হয়ে উঠত না।

সেদিন রবিবার দুপুর বেলা প্রতুলের সঙ্গে দেখা করতে এসে অশোক দেখল যে সে কোথায় বেরোচ্ছে। তার পরণে কোঁচানো ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম ও এসেন্সের ঘটা দেখে এও বুঝল সে বিশেষ কোনও উপলক্ষ্য আছে নিশ্চয়।

পাশের ঘর থেকে প্রতুলের বাবা অতুল চাটুজ্যে ডেকে বললেন, "কে? অশোক বুঝি? তা, বেশ হল—আমরা যাচ্ছি খোকার জন্য একটি মেয়ে দেখতে তা তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু—"

অশোক অবাক হয়ে তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল এ কথার তীব্র প্রতিবাদ শুনবার আশা করে, কিন্তু সে নিবিষ্টমনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টেড়ি বাগাতে বাগাতে বলল "হ্যাঁ হ্যাঁ তুইও চল, দুজনে মিলে বেশ ভাল করে দেখে নিতে পারব মেয়েটি আমার স্ত্রী হবার যোগ্য কিনা। শেষকালে কি একটা কাঁদুনে খুকী এনে সারা জীবন কষ্ট পাব?" অশোক আমতা আমতা করে বলতে আরম্ভ করেছিল "কিন্তু—তুই যে বলেছিলি—" প্রতুল বাধা দিয়ে বলল 'কি বলেছিলাম? বিয়ে করব না? ও সব একটা ছেলে মানুষি। কোনও বড় কাজ একলা করা যায় না, বুঝলি? আমার জীবনের ব্রত পালন করতে হলে চাই এমন একটি সহধর্মিনী যে সব কাজে আমার সহকর্মিনী হতে পারবে।"

অশোক আর বাক্যব্যয় না করে অতুলবাবু ও তাঁর এক বন্ধুর পিছন পিছন প্রতুলের সঙ্গে তাদের গাড়িতে চড়ে বসল।

চাটুজ্যে মশাই সারাটা পথ তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে চললেন মেয়েটি নাকি বাড়িতেই পড়া শুনো করেছে, বুঝলে হে বাঁড়ুজ্যে, আমাদের ঘরে তো আবার কলেজে পড়া বিবি মেয়ে চলবে না—"

অশোক দেখলে যে তার বন্ধু গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখতে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

চাটুজ্যে বলে চললেন "মেয়ের বাপ বোধ হয় বেশ শাঁসালো লোক। সারা জীবন মাষ্টারি করে বুড়ো বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে শুনেছি, ছোট একটি বাড়িও করেছে। একে ভাল করে টিপতে পারলে ল্যাভ হবার আশা আছে হে—"

অশোক হঠাৎ বলে ফেলল "কিন্তু প্রতুলের বিয়েতে কি পণ—"

"বল কি হে! পণ নেব না? একশো বার নেব। আমার ব্যাটা কি তেমনি মুখ্যু যে শুধু শুধু একটা পরের মেয়েকে ঘাড়ে করে এনে সারা জীবন তাকে পুষবে?"

টালিগঞ্জের একপ্রান্তে একটা ছোট বাগানওয়ালা একতলা বাড়ীর সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন তাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য।

গাড়ি থেকে নামবার সময়ে প্রতুল অশোককে ফিস ফিস করে বলল, "পণ কথাটা শুনে তুই অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সত্যিই কি আর আমি পণ নিচ্ছি? বুড়োর ওই একটিই সন্তান এমনিতেই তো সব টাকা ওই পেত।"

ছোট একটি পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর। দরজা ও জানালায় রঙীন ছিটের পর্দা, সেই ছিটেরই গদি ও ঢাকনি দেওয়া কতগুলি চেয়ার, সোফা ও টেবিল ঘরের একমাত্র আসবাব। ঘরের দেওয়ালে কতগুলি দেশবিদেশের মহাপুরুষের ছবি।

গৃহস্বামী মুখুজ্যে মশাই আদর করে অভ্যাগতদের সেই ঘরে বসিয়ে "কই মা, সুরো কই" বলতে বলতে ভিতরের ঘরে প্রস্থান করলেন।

চাটুজ্যে মশাই সমালোচকের দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কোন মুলুকে এরা বাড়ি করেছে ভায়া, বাগান শুদ্ধ বাড়ির দাম হাজার পাঁচেক হবে কিনা সন্দেহ যে!"

বাঁড়ুজ্যে একটা গদিওয়ালা সোফার ওপর দুই পা তুলে বসে মাথা নেড়ে বললেন "কিন্তু এক্ষুনি একটা দানপত্র লিখিয়ে নিও হে! বুড়োর তো শুনছি ওই একটা ছুঁড়ি ছাড়া তিনকুলে আর কেউ নাই, ওটাকে বিদেয় করবার পর আবার একটা বিয়ে টিয়ে না করে বসে!"

"হ্যাঃ বিশবছরের ধিঙ্গী মেয়ে—রঙটাও শুনেছি তেমন ফর্সা নয়। টাকাকড়ি ভাল মতন না দিলে আমার এতবড় চাকরে ছেলের জন্য অমন মেয়ে আনতে গেলাম কেন?"

অশোকের ঠোঁটের ডগায় অনেক কথা এগিয়ে আসছিল, কিন্তু প্রতুল যেখানে শান্ত, সুবোধ বালকের মতন চুপ করে বসে আছে, সেখানে সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

মুখুজ্যে মশাইএর পিছন পিছন খাবারের ট্রে হাতে করে একটি চাকর ও উনিশ কুড়ি বছরের একটি শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, তরুণী ঘরে ঢুকল।

তিনজন অভ্যাগত মেয়েটির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন। তাদের সমালোচকের দৃষ্টির সামনে তার চোখ নীচু হয়ে পড়ল।

চাটুজ্যে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, "এ যে কালোই হে বাঁড়ুজ্যে!"

অশোক শঙ্কিত চিত্তে তরুণীর মুখের দিকে তাকাল—সে শুনতে পেল না তো?

তার চোখে পড়ল বুটিদার ঢাকাই শাড়ি ও অল্প কিছু গহনা পরা একটি মেয়ে, মেয়েটির রঙ কালো কি ফর্সা, নাকমুখ সুন্দর কি খারাপ, এটা ভাল করে বুঝতে না পারলেও অশোক দেখল যে বুদ্ধির দীপ্তিতে তার সমস্ত মুখ খানি উজ্জ্বল। অশোক খুসী হয়ে ভাবল যে তার সংস্কারক বন্ধুর পাশে এমনি একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে না হলে মানাবে কেন?

তরুণী গুরুজনদের প্রণাম করে খাবারের রেকাব ও বাটিগুলি তাদের সামনে সাজিয়ে দিল।

চাটুজ্যে প্রশ্ন করলেন "তোমার নামটি কি ?"

"শ্রীসুরভি মুখোপাধ্যায়।"

"খাবার যে সবই ঘরে তৈরী বলে মনে হচ্ছে, কে এ সব রান্না করল বলতো ?"

মুখুজ্যে হেসে বললেন, "আমার এই ছোট্ট মাটিই একমাত্র সম্বল, চাটুজ্যে মশাই, বাড়িতে অতিথি এলে সব খাবারই ও নিজে হাতে করে।"

"আচ্ছা বলতো, আলুর দম কেমন করে রাঁধতে হয় ?"

এরকম প্রশ্নের জন্য সুরভি মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সে অবাক হয়ে একবার প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর রান্নার প্রণালী বলে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে যোগ করল, "আপনারা আরম্ভ করুন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ করব বৈকি, আরম্ভ কর হে বাঁড়ুজ্যে, খোকা, অশোক, তোমরা আরম্ভ কর।"

বাঁড়ুজ্যে সুরভির মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়াশুনা কতদূর হয়েছে ?"

"এই বছর ইকনমিকস্ অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছি।"

বাঁড়ুজ্যে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "ও বাবা এ যে একেবারে বিবি !"

চাটুজ্যে প্রশ্ন করলেন, "তা, কেতাবই খালি মুখস্থ করলে, না ঘরের কাজকর্মও কিছু কিছু শিখেছ ?"

সুরভির চোখে বিদ্রোহের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তবু সে সংযত কণ্ঠে উত্তর দিল, "বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে সাধারণতঃ যা যা কাজ করতে হয় সে সমস্তই আমি করতে অভ্যস্ত।"

অশোক এরকম অভদ্র প্রশ্নের প্রতিবাদ আশা করে প্রতুলের দিকে তাকাল কিন্তু প্রতুলের রসনা যেমন ব্যস্ত ছিল সুরভির রান্না নানা রকম সুখাদ্যের রসগ্রহণ করতে, অন্য দিকে তার দর্শনেন্দ্রিয় রন্ধনকারিণীর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিচ্ছিল।

বাঁড়ুজ্যে মন্তব্য করলেন, "মেয়েটাকে শক্ত পোক্ত মনে হয়, কাজ কর্ম ভালই পারবে।"

চাটুজ্যে "গড়ন পেটন মন্দ নয়, মাথায় বেশ চুলও আছে।"

"আজকাল কার মেয়েদের ওসব কিছু বোঝা যায় না হে, ওরা খোঁপার মধ্যে ইয়া বড় বড় গুছি ঢোকায়।"

সুরভির দিকে তাকিয়ে চাটুজ্যে বললেন, "খোঁপাটা একবার খোলতো।"

সুরভির চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবু সে আস্তে আস্তে মাথার কাঁটাগুলি খুলল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়ল।

এবার চাটুজ্যে অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন, "তুমি এবার ভিতরে যাও মা, সে মাথা নীচু করে চলে গেল।

মুখুজ্যে মশাই সমস্ত ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, চাটুজ্যে তাঁকে আরো অবাক করে দিয়ে বললেন, "আপনার মেয়েটি যে বড্ডই কালো মুখুজ্যে মশাই, তা আপনি দেবেন থোবেন কেমন শুনি?"

"আমার তো ওই একটি মাত্রই সন্তান, চাটুজ্যে মশাই, টাকা কড়ি কি আমি সঙ্গে নিয়ে যাব?

"না না ওরকম প্যাঁচালো কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। নগদ দশহাজার টাকা দিতে হবে আর এই বাড়িটা এখনই আমার ছেলের নামে লিখে দিতে হবে। তারপর আপনি যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন না হয় থাকবেন এ বাড়িতে।"

বৃদ্ধ উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "বলেন কি চাটুজ্যে মশাই? আমি গৃহস্থ মানুষ, আমার সর্বস্ব খরচ করলেও তো দশহাজার টাকা নগদ বার করতে পারবো না।"

"আমি বা আপনার কালো মেয়েকে মুখ দেখে বউ করতে যাব কেন?"

একটু চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দে বোঝা গেল যে কালো মেয়েটি পাশের ঘরেই আছে। কিন্তু চাটুজ্যে বিনা দ্বিধায় টাকা কড়ির কথা বলে চললেন।

অবশেষে স্থির হল যে মুখুজ্যে মশাই বাড়িটা প্রতুলের নামে লিখে দেবেন ও বিয়ের পণ, কাপড়-গহনা ও দানসামগ্রী বাবদ মোট দশহাজার টাকা খরচ করবেন। গহনা কি কি দিতে হবে তাও চাটুজ্যে বলে দেবেন। মুখুজ্যে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন "এ সবই তো আমার সুরো-মা-ই পেত, তবে আপনারা যদি এখনই লিখে দিতে বলেন, তবে না হয় তাই দেব।"

চাটুজ্যে প্রসন্ন মুখে বললেন, "এবার আপনার মেয়েকে ডাকুন মুখুজ্যে মশাই, একেবারে আশীর্বাদটা করে যাই।"

ডাকতে হল না। সুরভি নিজেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। এবার তার উন্নত মস্তক, তেজোদ্দীপ্ত চোখের দৃষ্টি।

সোজা চাটুজ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আশীর্বাদের দরকার হবে না চাটুজ্যে মশাই, কারণ আপনাদের আমার পছন্দ হয়নি।"

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন কি চাটুজ্যের মুখেও কথা জোগাচ্ছিল না "কি—কি—কি—কি বললে?"

"বললাম যে আপনাদের আজ অনেক কষ্ট হল, আর কষ্ট দেবনা। গরীব বামুনের অরক্ষণীয়া মেয়ে উদ্ধার করার দায় হতে নিষ্কৃতি দিলাম। নমস্কার।"

এবার চাটুজ্যে বোমার মতন ফেটে পড়লেন "কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? বাড়িতে ডেকে এনে অপমান! এ বর্বরের বাড়িতে আর এক মিনিটও নয়, দেখব ব্যাটা কেমন করে ওই কেলে পেঁচি মেয়েটাকে পার করে।"

অশোক স্বপ্নাবিষ্টের মতন তাঁদের পিছন পিছন গাড়িতে চড়ে বসল।

চাটুজ্যে বলে চললেন "ও বাবা, মেয়ে নয় তো যেন ফোঁস কেউটে! আর একটু হলেই ওই কাল-সাপকে বাড়িতে এনে দুধ কলা দিয়ে পুষবার জোগাড় করেছিলাম—"

বাড়ি এসে অশোক প্রতুলকে একলা পাবামাত্র বলল, "এটা তোরা কি করলি বল্ তো?" অনর্থক একটি মেয়ে আর তার বাপকে ওরকম অপমান করবার কি দরকার ছিল?"

"অপমান? অপমান কোথায় দেখলি? একটা বউ ঘরে আনবো তা সে কাণা কি খোঁড়া সেটা ভাল করে দেখে নিতে হবে না।"

"ছি ছি, তা বলে ওরকম অভদ্রের মতন জেরা করতে হবে—? আর হাঁটিয়ে চলিয়ে, চুল খুলিয়ে দেখতে হবে? যে মেয়ের এতটুকু আত্মসম্মান বোধ আছে সেই তো এতে অপমানিত বোধ করবে।"

"হ্যাঁ তুই আবার আত্মসম্মানের বক্তৃতা দিতে আসিস না, ওই রকম উদ্ধত বেহায়াপানাকে তুই আত্মসম্মান বোধ বলিস? ওই একফোঁটা মেয়ে, আমার বাবার মুখের ওপর কিই না বলল!"

"ছেলে মানুষ মেয়ে, এতখানি অভদ্র ব্যবহারের পর যদি একটু কড়া কথাই বলে থাকে তাতে দোষের কথা কি হল? তুই নিজেই তো বরাবর বলতিস যে এমনিভাবে

ক্রেতার দৃষ্টি নিয়ে মেয়ে দেখা আর বিয়েতে পণ নেওয়া—এই দুই প্রথাই মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক।"

"পণ আবার কি? বুড়ো যাতে তার মেয়েকে তার পাওনার টাকাটা দেয় সেটা দেখতে হবে তো?"

উত্তেজনায় মুখচোরা অশোক আজ প্রতুলের চেয়েও বড় বাগ্মী হয়ে পড়েছিল "তুই কি ভাবিস যে অমন সৌম্য স্নেহশীল প্রকৃতির যে বাপ তিনি তাঁর মেয়ের টাকা ঠকিয়ে নেবেন? পণের টাকা নিয়ে যে তোরা মেছুনির মতন দর কষাকষি সুরু করলি! অমন সুন্দর বুদ্ধিমতী মেয়ে, এদিকে এত মিষ্টি নরম ব্যবহার, ওদিকে কি তেজস্বিনী—সে কখনও তার বাপের সঙ্গে এরকম ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করতে পারে?"

এবার প্রতুলের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর বেজে উঠল "ওঃ, ভারি যে দেখছি দরদ উথলে উঠেছে। অতই যদি পছন্দ হয়ে থাকে তা হ'লে যা না, ওই বাঘিনীটাকে তুই নিজেই বিয়ে কর না গিয়ে—চিরকাল তোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে এখন। তবে আমার কাছে আর মুখ দেখাতে আসিসনা কখনও।"

অশোকও তেমনি জোরের সঙ্গে উত্তর দিল, "এই ঘটনার পরে যে আর তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবো না সেটা খুবই ঠিক। একদিন তোকে যতই শ্রদ্ধা করে থাকিনা কেন আজকের ব্যাপারের পর তার কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই।"

ঝড়ের মতন অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উত্তেজিত ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে দেখল যে কখন টালিগঞ্জের একটা পরিচিত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্তাকে দেখতে না পেয়ে সে খোলা দরজা দিয়ে বসবার ঘরে ঢুকেই ভিতর থেকে বাপ্ ও মেয়ের কথোপকথন শুনতে পেল।

সুরভি বলছিল, "কেন তুমি এরকম করতে গেলে বাবা, শুধু শুধু তোমায় অপমানিত হতে হল। একটা যা হোক কারো গলায় ঝুলিয়ে দিতেই যদি চাও, তবে কেন তুমি আমাকে স্বাধীনভাবে বুঝতে শিখিয়েছিলে? আর কোনওদিন যদি আমি এরকমভাবে কারো সামনে বেরিয়েছি তো কি বলেছি—তার চেয়ে বরং আমি সারাজীবন চাকরি করে খাব।"

বৃদ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে যে এমন অভদ্র হতে পারে তা জানলে কি আমিই তোকে ওদের সামনে বেরোতে বলতাম মা! আমার গায়ে কোনও অপমান লাগেনা, কিন্তু তোকে যে এরকম অভদ্র ব্যবহার পেতে হল—"

অশোকের মৃদু কাশির শব্দে মুখুজ্যে মশাই বেরিয়ে এলেন।

অশোক নিজেকে কুণ্ঠিত হয়ে পড়বার অবসর না দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমার বন্ধুর বাবা আজ আপনাদের বাড়িতে যে রকম বর্বরের মতন ব্যবহার করে গেলেন সেটা যে অমার্জনীয় তা আমি জানি। তাঁদের সঙ্গে আমি মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে এসেছি। তবু এক সময়ে তাঁর ছেলের বন্ধু থাকার জন্য আর এরকম লজ্জাকর ব্যাপারে অনিচ্ছাক্রমে জড়িত থাকার জন্য যদি আমাকে মার্জনা করেন—তা হ'লে—"

"না না, সে কি কথা বাবা, তোমার কি দোষ? এসো, এসো, একটু কথাবার্তা বলি তোমার সঙ্গে। এই গরমে ঘরের মধ্যে নয়--বেশ চাঁদের আলো আছে, ছাতে চল। ও সুরো সুরো—মা, একটা মাদুর নিয়ে ছাতে আয় তো।"

মুখুজ্যে মশাই কুণ্ঠিত অশোকের হাত ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

মুখে গোটা বেরোলে নুনের জলে মুখ ধোওয়া ভাল।

নাকের চামড়ার কূপগুলি বড় হয়ে নাক তেলতেলে দেখালে নুনের জলে ধুলে উপকার হয়

গরমজল আর দুধ আধাআধি মিশিয়ে নিলে চোখ ধোবার ভাল ওষুধ তৈরী হয়।

যে মেয়ে পাঁচফিট লম্বা তার বুকের (waist) মাপ চব্বিশ ইঞ্চি আর কোমরের (hips) মাপ তেত্রিশ ইঞ্চি হলে ভাল।

সাবিত্রী।

শ্রীবীণা বসু।

ওগো দেবি, শক্তি স্বরূপিণি!
মহাভারতের দীপ্তি! মহশক্তি! অন্তরবাসিনি!
তোমার মহিমাছপ্ত বিশ্ব কি গো আজি তোমাহারা?
অসহায়ে নতশীর্ষে, অঝোরে ফেলিছে অশ্রুধারা
ধরার দুহিতৃকুল, সীমাহারা মৌন বেদনায়?
কালের বিজয় রথ সদন্তে দলিয়া তারে যায়
হরিয়া সর্ব্বস্ব তার বিচূর্ণ করিয়া তার প্রাণ
বুকভরা ব্যাকুলতা ব্যথার করিয়া অপমান!
আজো তো মা মহাবিশ্বে মানবের প্রতি ঘরে ঘরে
তোমার পবিত্র নাম প্রতি নারী ইষ্টমন্ত্র করে!
তোমারি মতন দিয়া সারাদেহ মনের শকতি!
তাহাদের সত্যবানে অমঙ্গল হতে ঢাকে নিতি!
তোমারি মতন আজো গভীর, একাগ্র অনুরাগে,
স্বামীর কল্যাণ মাগি' সীমন্ত ভরিয়া তার জাগে
সুদীপ্ত সিন্দুর শোভা! স্বামীর চিরায়ু বর লাগি'
কঠিন, দুষ্কর ব্রতে সারানিশি রয়েছে সে জাগি'
তোমারি মতন আজো ঘুমহারা ব্যগ্র তপস্যায়!
তবু আজ কেন তার সব গর্ব ধুলিতে লুটায়?
কোন্ স্বতীলোকে, দেবি! কোন্ দূরে, স্থির, অচঞ্চল,
সহিছ নীরবে বসি তাহার অশ্রান্ত আঁখিজল?

কাঁদে না কি হিয়া তব হেরি দীনমূর্ত্তি তনয়ার ?
জ্বলিয়া উঠেনা বহ্নি সেইমত সতেজে আবার
দহিতে কালের শক্তি ? মৃত্যুরে করিয়া হৃতমান
কেড়ে কি পারেনা নিতে সেইমত তার সত্যবান ?

* * * *

যে ব্যথায় আত্মহারা ছুটেছিলে অজানার পথে
কত শত ক্লান্তিহীন দিনে প্রাতে সন্ধ্যায় প্রভাতে—
কণ্টকবিক্ষত পদে, পড়িয়া উঠিয়া কতবার,
দুর্গম দুস্তর শত গিরি নদী মরু হয়ে পার,
শ্বাপদ সঙ্কুল বন ; জীবনের সব দুঃখ ভয়,
সব লজ্জা, সব বাধা, যে ব্যথা করিয়াছিল জয়,
সেই ব্যথা অহরহ উথলিত বিশ্বনারী প্রাণে
কোটিগুণ হয়ে শুধু আজ মাগো শত বজ্র হানে !
অলোকসামান্য তব দুর্নিবার যে সাধনাবলে
সিদ্ধির অমর লোকে সগৌরবে এসেছিলে চলে,
নিখিল করেছে স্তব, বিধাতা দিয়েছে যারে নতি,
শমনে করেছে ম্লান সে প্রদীপ্ত সতীত্বের জ্যোতিঃ ,
সে সাধনা সে আলোক কোথা আজি তব তনয়ার ?
শুধু ব্যথা বেদনায় পেয়েছে সে উত্তরাধিকার ?
ঘরে ঘরে হয়ে আছ আজ শুধু পুরাণকাহিনী !
ক্লিষ্ট নারী হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত্ত বিগ্রহিণি ?
স্বপ্নভরা অতীতের নিবিড় কুহেলিজাল-তলে,
সেথা দীনা ধরনীর অশ্রুঅন্ধে দৃষ্টি নাহি চলে,
সেথা ধ্যানলোকে বসি হেরিছে তাহার কাতরতা ?
জীবন্ত স্পন্দনে পুনঃ বক্ষে তার হবেনা জাগ্রতা ?

এস মা অমৃতময়ি, ঘুচাও নির্ম্মম অন্তরাল,
চরণে পড়ুক লুটি আবার দুরন্ত মহাকাল !
তব দীপ্তি তব শক্তি ভরে যাক নারীর পরাণ,
দুষ্কর সাধনামন্ত্রে সিদ্ধি তার হোক মহীয়ান্ ,
বেদনা সার্থক হোক, তপস্যার শুভ্র শতদল
ছড়াক বিশ্বের বুকে গৌরবের স্নিগ্ধ পরিমল !
জাগো জাগো মহাদেবি ! ভারতের জ্যোতিঃ অবিনাশ !
দেখাও নারীর মাঝে মূর্ত্তিমন্ত তোমার প্রকাশ ।

বীররস।*

শ্রীকনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীরা নাকি জাতিহিসাবে বীররসের বড় ভক্ত। তাহারা যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভীমসেনকেই অধিক পছন্দ করে। জানি না সম্পূর্ণ জাতির চরিত্রবিশ্লেষণে এই কথাটাই প্রমাণিত হইবে কিনা। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক নলিনীকান্ত বাবুর জীবনে যে বীররসটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। যখন "Tales of Rajput Chivalry" বই হাতে লইয়া তিনি রাণা প্রতাপের সৈন্যদলকে হুঙ্কার সহযোগে হলদিঘাটার যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন তখন যদি একবার তাঁহাকে দেখিতে! সে কী বীরত্ব! কী চরিত্রের দৃঢ়তা!! কী নৈতিক বল!!!

কিন্তু তিনি উপযুক্ত সময় ব্যতীত বীরত্ব প্রকাশ করিতেন না। ইতিহাসের ক্লাস ছাড়া আর সব সময়েই তাঁহাকে দেখিলে কবিবরের সেই কবিতা মনে পড়িত—

"রেখেছে বাঙ্গালী করে--
মানুষ করনি—"

তিনি চোরকে ভয় করিতেন—কুকুরকে ভয় করিতেন--বজ্রপতনকেও ভয় করিতেন। এককথায় বলিতে হইলে নির্বিবাদী লোকের মর্মে বা কর্মে যে কোনও বস্তুই আঘাত লাগাইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে তাহা দেখিলেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

কিন্তু একথাও সত্য যে বাপ্পারাও, রাণা কুম্ভ অথবা প্রতাপসিংহই তাঁহার আত্মার আত্মীয় ছিলেন। ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে নলিনীবাবু আত্মহারা হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার বীররসের উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে বাধা পড়িত। কারণ ক্লাসে কেহ কথা বলিলে সেটা তাঁহার বরদাস্ত হইত না। কিন্তু ছাত্রতাড়নারূপ গ্লানিকর কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার কণ্ঠস্বর তেজোব্যঞ্জক হইয়া থাকিত।

এক এক সময় তাঁহার পড়া বুঝিতে আমাদের রীতিমত বেগ পাইতে হইত। কারণ কখনও বা তিনি নিজেকে রাজপুত রাণা মনে করিতেন আবার কখনও বা আপনাকে ইতিহাসের শিক্ষক মনে করিতেন। কিন্তু কথা বলবার ভঙ্গী উভয়েরই এক। সুতরাং রাজপুত রাণা না ইতিহাসের শিক্ষক কে যে কথা বলিতেছেন বোঝা যাইত না। তাঁহার

একদিনের বক্তৃতা আমরা খাতায় টুকিয়া লইয়াছিলাম সেইটা পড়িলেই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। বক্তৃতার বিষয়—"রাণা প্রতাপের বীরত্ব" নলিনীবাবু কহিলেন—

"সেই ভীষণ সংগ্রামে রত হইবার পূর্বে স্বদেশরক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া রাণা প্রতাপ তাঁহার সৈন্যদের দিকে শেষবারের মতন ফিরিয়া চাহিলেন ও তাহাদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"যদি তোমরা এরকম গোলমাল কর ও কথা বল তাহ'লে সমস্ত ক্লাসকে দাঁড় করিয়ে দেব—

"স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া অমরতা লাভ করিতে অদ্য আমি বদ্ধপরিকর। মহাকাল মহাভৈরব অদ্য আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। তাঁহারই পদতলে অদ্য আমি আত্মোৎসর্গ করিলাম।

"বেলা তুমি আজ মারাঠা শাসন প্রণালীর বিশেষত্বগুলি মুখস্থ করে আমাকে পড়া দেবে।

"আমাদের অমর দেশের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর ইহাই আদেশ।

"রমা! তুমি যদি বেলাকে তোমার খাতা দাও তাহলে তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দেব।

"কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্মই হইতেছে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করা। সুতরাং এই সুখের দিনে তোমরা আমার জন্য শোক করিও না।

"আরতি! বিনা কারণে বোকারাই হেসে থাকে। বুধবার off-periodএ তুমি আমার কাছে ইতিহাসের এক অধ্যায় পড়ে যাবে।

"আমার আদর্শ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া যাইবে—

"দেখ তোমরা যদি ফের হাস তো আমি হেড মিষ্ট্রেসের কাছে তোমাদের নামে report করব।

"এবং স্বর্গ হইতে আমার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইবে।

রাণাপ্রতাপ ও নলিনীকান্ত বাবুর বক্তৃতা এক সঙ্গে শেস হইল। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল কিনা জানিনা। তবে এ পাপ চক্ষে আমরা দেখিতে পাই নাই।

Anatole Franceএর "The Last Words of Decius Mus" নামক গল্পের ছায়াবলম্বনে।

মুখোস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

উমা শুনিল বাগান বাড়ী সজ্জিত হইতেছে, কলিকাতা হইতে বাইজী আসিবে। গৃহদেবতার সিংহাসনের নীচে গিয়া লুটাইয়া পড়িয়া সে চোখের জলে ভাসিতে লাগিল—"আমার জন্য কোনো প্রার্থনা করি না ঠাকুর, তাঁকে তুমি অসৎ পথ থেকে ফেরাও, তাঁকে সুমতি দাও প্রভু।" অনিদ্রায় উমা কত রাত্রি ঠাকুরঘরে কাটাইয়া দেয়, "তাঁকে ফেরাও তাঁকে সুমতি দাও" বলিয়া সে মাথা খুঁড়িতে থাকে। কিন্তু যেদিন সে শুনিল যে স্বামী অসহায় প্রজা ও কুলবধূগণের উপরে অত্যাচার করিতেছেন, সেই দিন তাহার চিরসহিষ্ণু অন্তর স্বামীর অসৎ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইল। অলকার সেই অনুরোধ তাহার শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুতে যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল সে স্বামীর বিলাসসঙ্গিনীমাত্র নয়, সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। তাহার স্বামী ও সন্তানের কল্যাণের জন্য অসৎ কার্য্য হইতে সে স্বামীকে নিবৃত্ত করিবে, নতুবা কুলবধূগণের অভিশাপে, দুঃখী প্রজার চোখের জলে তাহার স্বামীকন্যার অকল্যাণ ঘটিবে।

বৃদ্ধা দাসী শান্তাকে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া উমা বলিল 'শান্তা—!'

শান্তা এ সংসারে জীবন কাটাইয়াছে, উমার বধূ জীবনে সে তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে। আজ দুঃখের দিনে তাহার চোখে জল দেখিয়া সেও অশ্রুমোচন করিল। তারপর আস্তে আস্তে উমার চোখ্ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেঁদে আর কি করবে বৌরাণি, বরাৎ তোমার মন্দ, না হ'লে অমন সোয়ামী, মাথায় তুলে শেষে পায়ে ঠেল্‌লে।"

"না শান্তা, সে জন্য আমি কাঁদিনে, আমার দুঃখের জন্য ভাবিনে কিন্তু—তুইতো সবই জানিস্ শান্তা!" "জানি বই কি মা!"

স্বামীর দুষ্কার্য্যের কথা উচ্চারণ করিতে দুঃখে ক্ষোভে উমার রসনা বিবশ হইয়া আসিল, জোর করিয়া বলিল "আমার দুঃখী প্রজা, তাদের কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, এদের শাপে আমি যে স্বামীসন্তান হারাব শান্তা।"

কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শান্তা বলিল, "কি করবে মা তোমার কর্ম্মফল।"

উমা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তাঁর এই অন্যায় কাজ থেকে আমি তাঁকে রক্ষা কোর্‌ব শান্তা!"

শান্তা খুসী হইয়া বলিল, "তা কোর্‌বে বই কি মা, তুমি ছাড়া আর কে কোর্‌বে?"

শান্তার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া উমা বলিল, "তুই আমাকে সাহায্য কর্‌বি শান্তা!"

শান্তা কি সাহায্য করিবে বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া উমার মুখের দিকে চাহিল।

"তিনি যে সব অন্যায় কাজ করেন, সে গুলো কর্‌বার আগেই আমার জান্‌তে হবে। তুই সে খবর সংগ্রহ ক'রে আগেই আমাকে জানাতে পার্‌বি শান্তা!"

বুঝাইয়া বলিলে শান্তা কথাটা বুঝিল ও সেই অনুসারে কার্য্য করিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া উমার নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিল।

* * * * * *

ঠাকুরের আরতি শেষ হইলে তন্দ্রাকে ঘুম পাড়াইয়া উমা চুপ করিয়া বিছানার উপরে বসিয়া আছে। রাত্রির আহারের পাট সে উঠাইয়া দিয়াছে। দিনটা এক ভাবে কাটিয়া গেলেও রাত্রিটা যেন দুর্ব্বহ পাষাণের মত উমার বুকের উপর চাপিয়া বসে। সে যেন অনন্ত রাত্রি, তাহার যেন শেষ নাই। বিনিদ্র নয়নে উমা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কখনো কখনো অধীর হৃদয়ে নিদ্রিতা কন্যাকে চুম্বন করে, কখনো বক্ষের মাঝে নিপীড়িত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

এমনি এক বিনিদ্র রজনীতে শান্তা ঝি ত্রস্তে ঘরে ঢুকিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌরাণি, হরি কৈবর্ত্তের বউ মলিনাকে বাবুর লোকেরা ধ'রে বাগান বাড়ীতে নিয়ে গেছে।"

তীব্র কশাঘাতে উমা যেন লাফাইয়া উঠিল। স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে জড়িত স্বরে বলিল, "আমাকেও সেখানে নিয়ে চল্ শান্তা!"

শান্তা বিস্মিত হইয়া বলিল "তুমি সেখানে যাবে কিগো, এই নিশুতি রাত—"

"তা হোক্—আমার রাজ্যে আমার আর ভয় কিসের—"উমার পা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। শান্তাও তাহার পশ্চাতে চলিল

এত রাত্রে এ ভাবে ঘরের বাহির হইয়া উমার পা কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু থামিলে চলিবে না ; কুললক্ষ্মীর অপমান ! তাহারই স্বামী ! উমার চোখ দিয়া গরম রক্তের মত জল টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিস্তব্ধ পল্লী, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, সমস্ত আকাশ কৃষ্ণ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে স্বন্ স্বন্ করিয়া দম্‌কা বাতাস এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া যাইতেছে। তখনো বিদ্যুৎ হয় নাই হইলে অভাগিনী উমা এই আঁধারে হয়তো একটু আলোর সাহায্য পাইত।

উমা ছুটিয়া চলিল। সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী পাপের হাত হইতে সে স্বামীকে রক্ষা করিবে, জগতের কোনো বাধাই ত্যাহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না।

বাগান বাড়ীর গেট্ খোলা ছিল, দরোয়ান খৈনি মুখে দিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। উমার কানে কাহার যেন করুণ আর্ত্তনাদ আসিয়া পৌছাইল, সে দ্রুতপদে গিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। একটা দম্‌কা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘরের আলোকশিখা চঞ্চল করিয়া তুলিল। উমা দেখিল মত্তাবস্থায় স্বামী মলিনার হাত ধরিয়াছেন, আত্মরক্ষার জন্য মলিনা চীৎকার করিতেছে। উমার কণ্ঠ হইতে আপনিই বাহির হইয়া গেল "এ কি ? কুললক্ষ্মীর অপমান ?"

চূণীলাল চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, মলিনার হাতখান তাঁহার হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এ কি উমা ? না অসুরনাশিনী আজ অসুর নাশ করিতে স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন ? চূণীলাল চোখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, নতনেত্রে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ উমা স্বয়ং তাঁহার সকল অপরাধের বিচার করিয়া নিজের হাতে দণ্ড বিধান করিবে। যে মুহূর্ত্তটীর আশঙ্কায় তিনি কণ্টকিত হইয়া সময় কাটাইয়াছেন, আজ সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উমা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, অগ্রসর হইয়া মলিনাকে বুকে টানিয়া নিয়া বলিল ভয় কি বোন ? কিছু ভয় নেই।

কিসে কি হইল বুঝিতে না পারিয়া মলিনা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে সে কখনো উমাকে দেখে নাই কাজেই উমাকে সে চিনিলনা কিন্তু পরমনির্ভয়ে উমার স্কন্ধে নিজের শ্রান্ত মস্তকটী রক্ষা করিয়া সে যেন সকল বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল।

উমা তাঁহাকে কিছু বলিল না উপরন্তু মলিনাকে নিয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল দেখিয়া চূণীলাল আর সেখানে দাঁড়াইলেন না সম্মুখস্থ উন্মুক্ত দরজা দিয়া ক্ষিপ্রপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। দরোয়ান আত্মরক্ষায় ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। চূণীলাল বৃষ্টির মধ্যেই গেট্ খুলিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

উমা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "ভগিনি আমার স্বামীর অপরাধ অমার্জ্জনীয় জানি তবু তুমি তাঁকে ক্ষমা কর। তুমি সতীলক্ষ্মী তুমি ক্ষমা না কোর্‌লে তোমার শাপে আমার স্বামীকন্যা ভস্ম হ'য়ে যাবে বোন। তোমার কাছে আমি সন্তানভিক্ষা চাই।"

মলিনা এতক্ষণে উমাকে চিনিতে পারিল। তাহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি ও মধুর কথায় সম্ভ্রমে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। এমন ভগবতীর মত স্ত্রী যাহার, সে কি মোহে এত দুষ্কার্য্য করে! মলিনার চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল। সে উমার হাত ধরিয়া বলিল "দিদি, ঘরের রত্ন লোকে চেনে না, তাই তোমার স্বামী, তোমাকে অনাদর করেন। তোমার পুণ্যফলই তোমার স্বামী, কন্যাকে রক্ষা ক'রবে দিদি, শত মলিনার অভিশাপও তাদের একরতি ক্ষতি ক'রতে পার্‌বে না।

দুইজনের হাত ধরিয়া দুইজনে অনেকক্ষণ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তখন বড় বৃষ্টির দাপাদাপি আরম্ভ হইয়াছে। এক একটা প্রবল ঝটিকা যেন রুদ্ধ দরজা চূর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য দরজার উপরে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে অবসন্ন এই দুইটি নারীহৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া ঝড় বৃষ্টি থামিয়া আসিল, মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ার নিষ্ফল আক্রোশে জানালার সার্সী ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিলেও বৃষ্টি থামিয়াছে বুঝা গেল। উমা বলিল "চল বোন্, আমি নিজে তোমাকে বাড়ী রেখে আসি। তুমি যে নিষ্পাপ, সে কথা আমার সঙ্গে গেলেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

মলিনাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া রাত্রি শেষে টলিতে টলিতে আসিয়া উমা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কি অপমান! কী বেদনা! কী লাঞ্ছনা! ভগবান্ জগতে নারীকে এত অসহায় করিয়া পাঠাইয়াছিলে কেন?

আধুনিক গৃহে গৃহিণী, গৃহস্বামী, পুত্রকন্যা, বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রী এবং বান্ধবী ও তাঁর স্বামী প্রভৃতি সকলে মিলে আমোদ করবার সুযোগ হয়। এই সম্মিলন চা-পার্টি, আইস্‌-ক্রীম-পার্টি বা সরবৎ সম্মিলন, অনেক রকম হতে পারে, সান্ধ্যভোজনে মিলনও হতে পারে। এই সকল উৎসবে সাধারণতঃ খাওয়াটাই প্রধান থাকে, তারপর গল্পস্বল্প, খেলা, ইত্যাদি থাকলে আরো ভাল। পশ্চিমে ডিনার পার্টির (dinner party) পরে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমাদের ভোজনটা এত গুরু হয়ে পড়ে যে তারপরে বসেবসে গল্প করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে ওঠা যায় না। তবু ইচ্ছা করলে এই সকল সম্মিলনকে খুব উপভোগ্য করতে পারাযায়।

দু'একটি নিমন্ত্রণ, যা আমি উপভোগ করেছি, তার বিষয়ে আজ বলব। নূতন কিছু হয়ত বলতে পারবো না, কিন্তু কতকগুলি নির্দ্দোষ আমোদের সঙ্কেত দিতে চেষ্টা করব।

বাগানঘেরা একটি বাড়ীতে বাঙ্গালী পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, উড়িয়া নানা প্রদেশের স্ত্রী পুরুষ মিলেছেন চা-পার্টিতে চা খাওয়ার পর সকলের হাতে এক টুকরো করে কাগজ দেওয়া হ'ল, তাতে লেখা আছে—"রসালফলের গাছের নীচে সন্ধান আছে।" কিসের সন্ধান? সকলে ছুটলেন দেখতে। কেউ পেয়ারার গাছ, কেউ নারিকেল গাছ, কেউ বা আমগাছের নীচে খুঁজতে লাগলেন। আমগাছের নীচেই পাওয়া গেল সন্ধান,—আবার কতকগুলি কাগজের টুকরা—"রথের (Chariot) ভিতর দেখ"। এদিক ওদিক দেখে, বাড়ীর গাড়ীবারান্দার কোণে একটি পেরাম্বুলেটর পেয়ে সকলে মিলে সেটা উল্টে পাল্টে বের করলেন—আবার কাগজ। এমনি করে একতালা দোতালা খুঁজে এক জায়গায় পাওয়া গেল একটি পাউডারের বাক্স। সেটি কিন্তু আসল প্রাইজ নয়, তবু সেটি একটা প্রাইজ, যিনি পেলেন তিনি নিলেন, তার ভিতরে পোরা আসল সন্ধান—"ফুল ঘেরা পথে ছায়াঢাকা সবুজ ঝোপের নীচে দেখ"। ফুলের কেয়ারীর মাঝে ছিল কি একটা গাছের ঝোপ, তার নীচে কতকগুলি মাটীর টব, কোনটা সোজা, কোনটা উপুড় করা। সবাই টবগুলি নেড়েচেড়ে দেখছেন, একজন কেবল উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ তিনি বল্লেন--"পেয়েছি'। গাছের ডালে ঝোলান সবুজ কাগজ মোড়া প্যাকেট। সেইটাই প্রাইজ; ভিতরে ছিল ঝিনুক ও রূপার নূনদানী আর চামচ। নূনদানীটা এল আমাদের বাড়ীতে।

এই ধরণের খেলা ঘরের ভিতরে করার অনেক অসুবিধা আছে। ঘরের ভিতর যা চলতে পারে এমনি দু'একটি খেলার নমুনা দিই। একটি ছোট মত জিনিষকে প্রাইজ করতে হয়। তার চারদিকে একটার উপর একটা কাগজ মুড়ে একটা পোঁটলা করতে হয়। প্রত্যেক কাগজে কিছু লেখা থাকে, সে কথা পরে বলব। পোঁটলাটা প্রথমে একজনের হাতে দেওয়া হয়। আমার বাড়ীতে একবার এ খেলা আরম্ভ করেছিলাম এমনি করে,— ডাকপিয়ন সেজে বাড়ীর একটি ছেলে পোঁটলাটি এনে দিল একজন প্রবীণ অতিথির হাতে। তিনি হয়ত দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—"এখানে যাঁকে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করেন তাঁকে এটি দিন", তখন তিনি সেটিকে দিলেন একজন প্রফেসরের হাতে। প্রফেসর পোঁটলাটি নিয়ে উপরের কাগজটি খুলে ফেল্‌লেন; তার পরের কাগজে লেখা রয়েছে— "সবচেয়ে যাঁকে সুন্দরী মনে করেন এটি তাঁকে দিন"। তখন বেশ মজা হল; সেই প্রফেসরের স্ত্রীই ছিলেন ঘরের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী। প্রফেসর বেচারা ফাঁপরে পড়ে গিয়ে সেটিকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলেন একটি মেয়ের হাতে, যিনি সুন্দরী নন। তখন মেয়েটিও অপ্রস্তুত হলেন আর প্রফেসরের স্ত্রীও মুখ ভার করলেন। তারপর চল্‌ল— "সকলের চেয়ে রসিক যিনি"—"সবচেয়ে ভাল গায়ক বা গায়িকা যিনি ইত্যাদি। যিনি পোঁটলা হাতে পান, উপরের কাগজ খানা খুলে ফেলেন, নীচে যা লেখা আছে সেই দেখে অন্যকে দেন। শেষে ছিল—"সকলের চেয়ে অভিমানী (sentimental)"। এটি যে ভদ্রলোকের হাতে পড়ল, তিনি নূতন বিবাহিত, তিনি বল্‌লেন—"আর কারো অভিমানের কথা জানিনা, যার অভিমানের কথা জানি তাকেই দিলাম" বলে তাঁর স্ত্রীকে দিলেন। তিনিই পুরস্কারটা পেলেন, খুব হাততালি পড়ল।

যতজন অতিথি অন্ততঃ ততখানা কাগজের মোড়ক থাকা চাই। লেখাগুলি নানা ধরণের করে দেওয়া যেতে পারে। ছড়া কেটে দেওয়া যায় বা সঙ্কেতে দেওয়া যায়। আমাদের পার্টিতে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তাই সাধারণতঃ ইংরাজিতে সব কাজ করতে হয়। আর একবার লেখাগুলি এমনিভাবে দিয়েছিলাম "এটা এমন একজনকে দিন যিনি একটা রবারের বলের মত" অথবা "কথা বলা কলের (talking machine) মত" অথবা "আগ্নেয়গিরির মত"; এতে একটা মোড়কই মহিলা বা পুরুষ কে ইচ্ছা দেওয়া যায়। প্রত্যেককেই বলতে হবে কেন তিনি অন্য লোকটিকে এইরকম মনে করেন। এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর পদবী "দে", তিনি খুব ফর্সা। একটা লেখা

ছিল "কে দিনের মত ?"—"Who is like day ?" সেটা পড়ল তাঁর হাতে, কেননা দের (De) চেহারা dayর মত ; তার কিছু পরে যখন এল "কে রাত্রির মত ?" তখন সেটা পড়ল মিসেস দের হাতে কেননা "রাত্রি দিনের (day-De) পিছু পিছু চলে।"

সেই প্রফেসর এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী একবার চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাওয়ার পর সকলকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি দেয়ালে টাঙ্গান রয়েছে কতগুলি পরিচিত বিজ্ঞাপনের ছবি, কিন্তু কেবল ছবিটা কেটে টাঙ্গান আছে, লেখা কিছুই নেই। কুড়ি মিনিট সময় ; যিনি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছবি দেখে বলতে পারবেন কিসের ও কাদের বিজ্ঞাপন তাঁরই জিত। প্রত্যেকের হাতে কাগজ ও পেনসিল দেওয়া হয়েছিল। মোটরকার, লিপ ষ্টিক, দাড়ি কামাবার ব্লেড, চকোলেট প্রভৃতি জিনিষের বিজ্ঞাপন ছিল।

আরো অনেক রকমের খেলা করা যায়। যেমন, একটা ট্রেতে কাঁচি, আলু, ফিতা, দিয়াশালাই, তাসের প্যাকেট, চক্‌খড়ি প্রভৃতি দশবারোটি ভিন্ন রকমের জিনিষ সাজিয়ে রেখে সকলের সামনে একবার মিনিটখানেকের জন্য দেখিয়ে আনতে হয়। তার আগে সকলকে অবশ্য কাগজ পেনসিল দিতে হবে। যিনি সবচেয়ে বেশী জিনিষের নাম ঠিক ঠিক লিখতে পারবেন, তাঁর জিত।

কিম্বা ছোট্ট ছোট্ট কাপড়ের থলিতে নানারকমের জিনিষ ভরে বন্ধ করতে হবে। এমন জিনিষ ভরতে হবে যা উপর থেকে গন্ধ শুঁকে বা হাত দিয়ে ধরে বুঝতে পারা উচিত, যেমন তুলাতে লাগিয়ে ফিনাইল বা ল্যাভেণ্ডার, দালচিনি, চা, আদা, রসুন ইত্যাদি। একটা লম্বা টেবিলে থলিগুলি সারিসারি সাজিয়ে নম্বর দিয়ে রাখতে হবে। নিমন্ত্রিতেরা কাগজে লিখে যাবেন কোন নম্বরে কি জিনিষ, যেমন—১। রসুন, ২। ফিনাইল, এইরকম। যিনি সবচেয়ে ঠিক লিখতে পারবেন তাঁর জিত। এইসব খেলাতে পুরস্কার থাকলে ভাল হয়। ছোট খাট দু,তিনটা খেলাও রাখতে পারা যায়। তাছাড়া শ্যারেড, ছোট অভিনয়, এসব ও হ'তেই পারে।

শিশুর খেলা ও খেলনা।

শ্রীমিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর খেলা ও খেলনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। শিশুর ক্ষমতা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে তার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক কতকগুলি খেলনা এবং তার মনোমত জিনিষ তৈরী করবার উপাদানের উল্লেখ করেছিলাম।

ষষ্ঠ বৎসর

অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিশুর জন্য যে সব খেলা ও খেলনার কথা বলা হয়েছে পাঁচ বৎসরের শিশুও সেগুলি নিয়ে খেলতে ভালবাসবে; কিন্তু সে এখন বেয়ে ওঠা, দৌড়া-দৌড়ি করা, জিনিস নিয়ে লোফালুফি করা প্রভৃতি কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ানৈপুণ্য পুরোপুরি আয়ত্ত করে নিয়েছে এবং তার শরীর মনের সামঞ্জস্যময় পরিণতি অনেকটা অগ্রসর হয়েছে বলে সেগুলির ব্যবহারে অধিকতর কৌশল, জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দেবে।

তাছাড়া পাঁচ বছরের শিশু বড় হতে এবং বড়রা যে সব কাজ করে সেগুলি করতে খুব বেশী চায়;—ছেলেরা ফুটবল প্রভৃতি বড় ছেলেদের খেলা খেলতে চায় আর মেয়েরা ঠিক মায়ের মত করে পুতুলগুলির সেবা করে আনন্দ পায়। এই বয়সের শিশুরা পড়ার কঠিন শিল্প আয়ত্ত করবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে এবং লিখতে আর গুণতেও চেষ্টা করে।

ছবির বইয়ে লেখা শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য এদের মুগ্ধ করে, বিশেষও বইয়ের ছাপার অক্ষর যদি বড় আর পরিষ্কার হয়। হয়ত কোন স্নেহশীল গুরুজনের কাছে গিয়ে ছবির বইয়ের লেখা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবে "এখানে কি বলেছে?" এবং এমনি করতে করতে খুব অল্পদিনের মধ্যেই লেখাগুলি নিজে পড়তে পেরে আনন্দ লাভ করবে।

ছবির বই এই বয়সে খুব প্রিয় হয় এবং অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুদের ছবিগুলির চেয়ে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি দেওয়া ছবি এরা উপভোগ করতে পারে। অবশ্য একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে ছোটদের ছবিগুলি খুব সরল হওয়া চাই। আলোছায়া চিহ্নের সম্পর্ক-বর্জিত রেখাচিত্রই এদের সবচেয়ে উপযোগী; আবার কালোর চেয়ে রঙিন ছবিই এদের চিত্ত বেশী আকর্ষণ করে।

ছবি ও শব্দের সঙ্গে সহজ খেলা এদের খুব ভাল লাগে এবং এ সব খেলনা নিজেরা বাড়ীতে তৈরী করে নেওয়া যায়। আন্দাজ পোষ্ট কার্ডের আয়তনের কতকগুলি কার্ড নিয়ে সেগুলির মাঝখানে দিয়ে একেকটা রেখা টেনে প্রত্যেকটিকে দুই অংশে ভাগ করতে হবে, বাঁ দিকের অংশে একটা ছবি এঁকে ডান দিকে তার নাম লিখতে হবে। তারপর এর অনুরূপ আরো কতকগুলি কার্ড তৈরী করতে হবে কিন্তু তাতে ছবি থাক্‌বে না, কেবল নামগুলি লেখা থাকবে। শিশু ছবিওয়ালা কার্ডগুলির সঙ্গে লেখা কার্ডগুলি মেলাতে মেলাতে অল্পদিনের মধ্যেই পড়তে শিখে খুব আনন্দ পাবে।

এই বয়সের শিশুরা গল্প শুনতে খুব ভালবাসে বলে তাদের পড়তে শিখবার আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায়। এরা যে সব লোকে বা জিনিষ ভালবাসে তাদের বিষয়ে ছোট ছোট গল্পই এদের বিশেষ উপযোগী, ছেলেভুলোনো ছড়া ও কবিতাও এদের খুব প্রিয় হয়।

কেবল শিশুর বুদ্ধি নয়, তার পেশী সমূহের শিক্ষার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাকে বড় বড় পুঁতি এবং সেগুলি গাঁথার জন্য জুতোর ফিতে চেপ্‌টা চেপ্‌টা রঙিন কাঠি দিলে সে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

প্রত্যেক পিতামাতা ও শিক্ষকই কামনা করেন যে শিশুর হাতের লেখা সুন্দর হোক, তাই তার অঙ্গুলিচালনার ক্ষমতার পূর্ণপরিণতির জন্য তাকে বড় বড় নরম শীষের পেন্সিল ও এমন সব খেলবার জিনিষ দিতে হবে যারদ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তার লেখার শক্তিও বেড়ে যাবে। শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে খড়ি, রং, সস্তা মোটা ব্রাউন কাগজ, মোটা ও বড় ছুঁচ, সেলাইয়ের জন্য মোটা কাপড, কাদা ইত্যাদি দিলে কেবল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী সমূহের পরিচালনক্ষমতা বাড়ে তা নয় এ গুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগ্ন হয়ে থেকে সে প্রচুর আনন্দও পাবে। কিন্তু একবারে যেন খুব বেশী জিনিষ দেওয়া না হয়।

শিশুরা যত বড় হতে থাকবে ততই দল বেঁধে খেলতে ভালবাসবে। সাধারণত এখন পর্যন্ত তারা কাল্পনিক খেলাই চায়, যেমন, ঘরকন্নার খেলা, ইস্কুল ইস্কুল খেলা, চোর সেজে খেলা, ইত্যাদি। পুরোনো বাক্স, বিছানা, লাঠি, বাসনকোসন প্রভৃতি যা কিছু পাবে তারই সাহায্যে তাদের খেলা অধিকতর বাস্তব হয়ে উঠবে, এইজন্য পিতামাতা যেন এইসব জিনিস জুগিয়ে তাঁদের সুবিবেচনার পরিচয় দেন। সাধারণত শিশুদের মধ্যে যার অন্যদের

চালাবার ক্ষমতা আছে এমন একজন শিশু নেতা হয়ে এইসব খেলার পরিকল্পনা ও চালনা করে ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন ও নির্ভরশীল ছেলেপিলেরা তার অনুসরণ করে।

কল্পনা প্রধান খেলা

আগেই বলা হয়েছে পাঁচবছরের শিশুও অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেদের মত কল্পনা-মূলক খেলা খেলতে ভালবাসবে কিন্তু এদের খেলা একটু জটিল হবে এবং এরা কাঠের বা সীসার জন্তু, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, ব্রিজ প্রভৃতি বাস্তবিক খেলনা চাইবে। মেয়েরা পুতুল, পুতুলের বাড়ী এই সব পছন্দ করবে। কাপড়ের টুকরো, রিবণ, পাতলা কার্ডবোর্ড দেশলাইবাক্স প্রভৃতি জিনিষ তাদের পুতুলের কাপড়চোপড, বাড়ী, বাড়ীর টেবিল, চেয়ার, পর্দা, আসন প্রভৃতি তৈরী করবার প্রেরণা দেবে।

ছেলেপিলেরা যদি সাহায্য চায় তবে নিশ্চয় সাহায্য করতে হবে কিংবা তাদের খেলার জন্য আবশ্যক জিনিষ কি করে তৈরী করতে হয় তা দেখিয়ে দিতে হবে; কিন্তু না চাইলে শিশুকে সাহায্য করা অথবা পরামর্শ দেওয়া উচিত নয় কেননা তাতে শিশুর উদ্ভাবন ও কল্পনার শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশুদের কেবল বুঝতে দেওয়া উচিত যে যখনই সে দরকার বোধ করবে তখনই সাহায্য পাবে।

ক্রমশ

পরিচয়।

বাংলাপড়ানো—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

আমি নিজে যখন বি-টি পরীক্ষার্থিনী ছিলাম তখন বাংলা কেমন করে পড়াতে হবে এ সম্বন্ধে কোন বই বার হয়নি, এর অভাব আমরা সবাই অনুভব করেছিলাম; কাজেই প্রিয়রঞ্জন বাবুর "বাংলা পড়ানো" যখন আমার হাতে পড়ল তখন বড় আপশোষ হল কেন এই বই আমাদের সময়ে বার হয়নি। যে শিক্ষকতা শিক্ষা করছে বইটি যে কেবল তাকেই সাহায্য করবে তা নয়, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীও এর থেকে অনেক সাহায্য পাবেন।

বিশেষ করে ভাল লেগেছে "বর্ণপরিচয়ের" ও "লেখার" অধ্যায়গুলো। আধুনিক শিক্ষক মাত্রেই জানেন সম্পূর্ণ শব্দ ও বাক্যের পদ্ধতি দিয়ে শিশুদের স্বাভাবিক ভাবে, কি সহজে পাঠশিক্ষা হয়। বর্ণপরিচয়পদ্ধতির দোষ এই যে ছাত্ররা বর্ণকে শব্দ থেকে বিযুক্ত করে দেখতে শেখে, কিন্তু স্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে সে ভয়ের কথা উঠবেই না।

ব্যাকরণ ও অনুবাদের অধ্যায় পড়ে কিন্তু সন্তোষ লাভ করতে পারলাম না। প্রিয়রঞ্জন বাবু যদি একটু পরিষ্কার করে বলতেন কি করে ব্যাকরণ ও অনুবাদের বিষয় ছাত্রদের মনোগ্রাহী করা যেতে পারে তো ভাল হত। অনুবাদ করাতেই হবে, ব্যাকরণ পড়াতেই হবে, কিন্তু কি ভাবে পড়ালে শিক্ষনীয় বিষয় মনোগ্রাহী হবে সে কথা প্রায় কেউ বলতে পারেননি। আরেকটি কথা মনে হল, পাঠ্যক্রমে প্রবাদবাক্যের স্থান কোথায়?

স্বয়ংসঞ্চয়নের অধ্যায় "বাংলা পড়ানোর' মধ্যে ধরা হয়েছে দেখে খুবই ভাল লাগলো, এতদিন পর্য্যন্ত স্বয়ংসঞ্চয়নের সাহায্য কেবল ইংরাজীর শিক্ষকেরাই নিতেন। এতে যে ছাত্রদের উৎসাহ ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীলতিকা রায়।

প্রভাতী—মাসিক পত্রিকা, শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত।

পাটনা হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালীদিগের মাসিক মুখপত্র "প্রভাতী" এবার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত সাময়িক পত্রে সংখ্যা

বেশী নহে এবং এইরূপ একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক কাগজের প্রকাশ বোধ হয় এই প্রথম। "বনফুল", বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিভাগুণে বিহার বর্ত্তমানে বঙ্গ-সাহিত্য-সাধনার একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সেখান হইতে এরূপ একখানি কাগজের প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক। "প্রভাতীর" প্রতিসংখ্যাই সুচিন্তিত ও মনোগ্রাহী রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এবং প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট পরিচয় বর্ত্তমান। প্রবাসী বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে এবং আমাদের সহিত বঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের যোগসূত্র ছিন্নপ্রায়। প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যে সম্মেলন এই ছিন্নসূত্রবন্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে, "প্রভাতী" ও ইহা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়। যে উচ্চ আদর্শ লইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বঙ্গভাষাজননীর এ মহার্ঘপূজার আয়োজন করিয়াছেন তাহা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীনীলিমা দত্ত।

আমাদের কথা।

সমগ্র ভারতবর্ষে একজন মাত্র ছিলেন রাজরোষ যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, পশুশক্তি যাঁর বিশ্ব-খ্যাতির সম্মুখে ভীত হয়ে নিরস্ত হয়েছে। তাঁকে আমরা মহাকবি বলে জানি, সাধক বলে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু রাজপুত্রের পৌত্র, মহর্ষির পুত্র, সেই রাজর্ষির রাজমূর্তি সর্বদা স্মরণ রাখতে পারি না। বঙ্গভঙ্গআন্দোলনের সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের আত্মসম্মান তাঁর কণ্ঠে বাণী পেয়ে এসেছে। সেদিনকার সেই আন্দোলনে তিনি যে শুধু সঙ্গীত-রস-সিঞ্চন করেছিলেন তা নয়, জাতির স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগ্রত করে জাতিগঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগে তাঁর যুবকণ্ঠের উদাত্ত সঙ্গীত-ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপ কম্পিত হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস অত্যাচারের পর সেই পুরুষসিংহ উদগ্র তেজে রাজসম্মান প্রত্যাখান করে জাতির মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। আবার বেশীদিনের কথা নয়, হিজলির রাজবন্দীদের উপর গুলিচালানর পর তিনি যে বিরাট জনসভা অহ্বান করে জাতির মূক আক্ষেপকে ভাষা দিয়েছিলেন সে কাজ আর যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য হত। তারপর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত অশীতিবার বৃদ্ধ সভ্য জগতের দানবীয় শক্তির সম্মুখীন হয়ে উদ্যত বজ্রের মত, উজ্জ্বল দেবরোষানলের মত যে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তার প্রভাতরল জ্যোতি এ বসুধার নয়।

মানুষ কে যিনি বড় করেছিলেন, উন্নত মস্তক যিনি কোনদিন নত করেন নি, অর্দ্ধ-শতাব্দীর কিঞ্চিদূর্দ্ধ কালের মধ্যে যিনি জগতের হীনতম জাতিকে বিশ্বপরিচয় দান করেছেন তাঁর শেষ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে যদি আমরা এই ভারতবর্ষে ভবিষ্য যুগ সম্ভাবনার কঠিন সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারি তবেই অযোগ্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি সফল হবে।

তিনি দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন; শতায়ু শততরায়ু হলে দেশবাসী আনন্দিত হত, কিন্তু একথা অস্বীকার করে স্বার্থলুব্ধ হীনতার পরিচয় দেব না, যে এ দেশ এই যুগ যা পেয়েছে তা অভাবনীয়।

পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবনান্তে যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন সেই ইচ্ছামৃত্যু মহাসাধকের জন্য খেদ নাই; পরাশান্তি যেন তাঁকে আবৃত করে রাখে এই আমাদের প্রার্থনা।

* * * * *

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে আমাদের নিয়মিত পূজাসংখ্যা প্রকাশিত হবে; অগ্রহায়ণে বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছি, সেই সংখ্যা চিত্রে, প্রবন্ধে, কবিতায়, কবির অপ্রকাশিত কবিতা, হস্তলিপি ও স্বহস্তরচিত চিত্রে সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করছি। যাঁরা বৈশাখ থেকে ছয়মাসের গ্রাহিকা হয়েছেন তাঁরা যেন অন্তত এই সংখ্যাটির জন্য ও আগামী ষণ্মাসকালের গ্রাহিকা হ'তে ভুল না করেন।

* * * * *

বরিশালের দুর্য্যোগ পীড়িতদের সাহায্যকল্পে শ্রীনলিনী চক্রবর্তী, শ্রীঅমিতা চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্তা বীণা দাসের প্রেরিত কাপড় পেয়েছি ও তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি পাঠিকাদের এই সহানুভূতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

শ্রীরেণুরায়ের লেখা বৈশাখে প্রকাশিত "প্রাচ্যে নারী প্রগতি" ও জৈষ্ঠে প্রকাশিত "অসভ্যসমাজে নারীর স্থান" এই দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে বেতারের সৌজন্যে।

"মেয়েদের কথা"র এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। অগ্রিম টাকা জমা দিলে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় পত্র দাখিল করিলে "মেয়েদের কথার" এজেন্সী লইতে পারা যায়। প্রতি মাসের প্রাপ্য প্রতি মাসে শোধনীয়। তিন মাসের টাকা বাকী থাকিলে এজেন্সী থাকিবে না।

২। মাসিক পাঁচখানার কম সংখ্যা লইতে হইলে প্রতি মাসে অগ্রিম মূল্য Stampএ পাঠাইতে হইবে।

৩। "মেয়েদের কথা" বিক্রীর কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা। ১০% অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় এজেন্টের ব্যয়ে।

ম্যানেজার—"মেয়েদের কথা"

১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।৴০ আনা ; যাণ্মাষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৴০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১০ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন ; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েদের কথা

সম্পাদিকা — শ্রী কল্যাণী সেন, এম,এ

"মেয়েদের কথা"র এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। অগ্রিম টাকা জমা দিলে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় পত্র দাখিল করিলে "মেয়েদের কথার" এজেন্সী লইতে পারা যায়। প্রতি মাসের প্রাপ্য প্রতি মাসে শোধনীয়। তিন মাসের টাকা বাকী থাকিলে এজেন্সী থাকিবে না।

২। মাসিক পাঁচখানার কম সংখ্যা লইতে হইলে প্রতি মাসে অগ্রিম মূল্য Stampএ পাঠাইতে হইবে।

৩। "মেয়েদের কথা" বিক্রীর কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা। ১০% অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় এজেন্টের ব্যয়ে।

ম্যানেজার—"মেয়েদের কথা"

১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

সূচি পত্র—আশ্বিন ১৩৪৮

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | আশ্বিন—১৩৪৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হারামণি।

হুমায়ূন কবীর।

কোন অমরার ফুল এসেছিলে মোদের জগতে
শুধু হায় দু'দিনের লাগি
ফুরালো ক্ষণিক খেলা, চলি গেলে আপনার পথে
আমাদের হেলায় তেয়াগি।
তবু মনে রয়ে গেল হাসি তব, তব মুখছবি,
যত তব অর্দ্ধস্ফুট কথা,
বুকের আঁচলে ঘেরা উষ্ণ তব দেহের সুরভি,
কপোলের চারু কোমলতা।

সহসা নিশীথ রাতে নিদ্রা টুটি ভয় জাগে মনে,
বক্ষ মোর শূন্য বড় লাগে,
অন্ধকারে হাতাড়িয়া অর্দ্ধ স্বপ্ন অর্দ্ধ জাগরণে
চিত্ত মোর স্পর্শ তোর মাগে ;

স্বপ্নে মনে হয় বুঝি নিদ্রাতুর মুখ হতে তব
স্তন মোর পড়িয়াছে খসি'।
জাগিয়া নিষ্ঠুর সত্য মনে পড়ি' দীর্ণ আর্ত্তরব
ওঠে মোর অন্তরে নিঃশ্বসি।

দিনের কাজের মাঝে অকস্মাৎ পড়ে যবে মনে
দেখিবনা তোরে কভু আর,
তোমার হাসির আলো অকারণে আসি ক্ষণে ক্ষণে
ঝলিবেনা ভুবনে আমার ;
অর্থহীন মনে হয় সব কাজ, সকল জীবন,
চিত্ততলে শ্রান্তি বড় লাগে.
আরব্ধ সংসার কাজ পড়ে থাকে, সারা দেহমন
মৃত্যুমাঝে শান্তি শুধু মাগে।

তবুও সংসারপথে চলিতে হইবে আজো মোর
দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন ধরি !
লুকায়ে অন্তরতলে অন্তরে যে তিক্ত অশ্রুলোর
অবিরাম পড়িতেছে ঝরি,
বাহির ভুবনে হাসি কহিবারে হবে প্রতিদিন
সকলের সাথে কত কথা,
ধ্বনিবে আড়ালে তার মর্ম্মতলে বিরামবিহীন
তোর লাগি নিরশ্রু শূন্যতা।

এদেশের মেয়েদের কথা।

শ্রীকল্যাণী ভট্টাচার্য্য।

ভাই,

এদেশের মেয়েদের কথা জান্‌তে চেয়েছ। এই অল্পকয়েক মাসে এদের সঙ্গে মিশে এদের সম্বন্ধে যা কিছু জান্‌বার সুযোগ পেয়েছি তাই তোমাদের কাছে লিখে পাঠাচ্ছি।

প্রথমেই বলে রাখি বোম্বাই সহরে কোনও একটি বিশেষ জাতি বাস করেনা। কলকাতাতেও বিভিন্ন জাতির লোক দেখা যায়। কিন্তু সেখানকার মেয়েদের কথা লিখ্‌তে গেলে বাঙ্গালী মেয়েদের কথাই লিখ্‌তে হবে। কারণ এই যে দেশটী বাঙ্গালীর এবং এখানকার অধিবাসীদের বল্‌বে বাঙ্গালী। এ দেশটী কাদের বোঝা বড় শক্ত। কয়েক-জনকে প্রশ্ন করে জান্‌তে পেরেছি যে এটা মারাঠীদের দেশ বলা যেতে পারে। এখানে বহু সংখ্যক পার্শীদের দেখা যায়। তাদের প্রকাণ্ড বড় একটা কলোনী রয়েছে—সেখানে তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী করে রয়েছে। তাদের বাড়ীতে প্রায়ই হিন্দুদের থাক্‌তে দেয় না। হিন্দুরাও তাদের বাড়ীতে তাদের থাকতে দেয় না। এই অনুদারতার উদাহরণটা কারা আগে দেখিয়েছে তা বল্‌তে পারি না। তবে পার্শী সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেশাটাকে খুবই অগৌরবের বিষয় মনে করে। বিবাহের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত প্রায়ই মেয়েরা ফ্রক পরে বেড়ায়—কাজেই এংলোইণ্ডিয়ান মেয়েদের থেকে তফাৎ করা যায়না। ছেলেরাও ইংরাজ ছেলেদের মতন পোষাক পরে স্কেটিং করে বেড়ায়। মহিলারা খুবই সাজসজ্জা করে রাস্তায় বার হন, পার্কে বসে থাকেন। শুনেছি বেশীর ভাগ এঁরা নিজেদের ভারত বাসী বল্‌তে কিছুতেই রাজি নন। যতরকম ভাবে সম্ভব ইংরাজ মহিলার অনুকরণ করতে পারলেই খুসী হন। যে কারণে তাঁরা শাড়ী পরতে বাধ্য হয়েচেন সেই ঐতিহাসিক কারণ এখানকার স্থানীয় একজনের কাছে শুন্‌লাম।

তবে ওদের ভেতরে যে একতা আছে সেটি আমাদের বোঝা উচিত খুবই। ওদের ধনীরা ওদের সম্পদায়ের গরীবদের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী করে দিয়েছেন। ওদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা ভাল নয় তাঁরা সেই সব বাড়ীতে মাসে খুবই অল্প টাকা দিয়ে থাক্‌তে পারেন।

এঁরা এত দূরে সরে আছেন বলে এঁদের মেয়েদের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগ পাইনে। কাজেই এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত নয়। অনেক ইংরাজ মহিলার সামনে গিয়ে পড়লে মনটা কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এঁদের কাছে গেলেও সেইরকম মন হয়ে ওঠে। "এরা আমার দেশকে ভালবাসেনা এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিছুতেই সম্ভব নয়।"

আর বেশী যাঁদের দেখা যায় এখানে তাঁরা হচ্ছেন মারাঠি ও গুজরাটী মহিলা। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশের ও অনেক মেয়ে আছেন।

এখানে এসে প্রথমে অনেক বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হোল। তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলেন। কিন্তু যেদিন প্রথম এইখানকার মারাঠি মহিলাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'ভগ্নীসমাজে' গেলাম সেখানকার মেয়েরা আমায় প্রথম প্রশ্ন করলেন সুভাষবাবু কোথায় গেছেন, কেন গেছেন ইত্যাদি। তারপর নানা দিক্ দিয়ে যখন রাজনীতি আলোচনা করলেন তখন মনটায় এমন একটা দুঃখ হোল। বাংলা দেশ থেকে এসেছি—সুভাষবাবু তাঁদেরই নিতান্ত আপনার এবং বাঙ্গালী;—বাঙ্গালার বধূরাত কই আকুল ভাবে তাঁর বিষয়ে প্রশ্ন করলেন না? এই ভগ্নী সমাজ মস্ত বড় প্রাচীর ঘেরা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকাণ্ড বড় খেলার মাঠ আবার হলঘর, লাইব্রেরী। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মেয়েরা (প্রায় সবই বিবাহিতা ও সন্তানের মা) খেলতে আসেন। ছাত্রী সঙ্ঘের একজন প্রাক্তন ছাত্রীকর্ম্মী বিবাহের পর এখানে এসে এর সঙ্গে খুবই গভীর ভাবে সংযুক্ত হয়ে আছেন। তাঁর কাছে শুনলাম মেয়েরা ভোরের অন্ধকার থাকতেই এসে বসে থাকেন যাতে আলো হোলেই ব্যাড্‌মিনটন খেলতে পারেন। তারপর বাড়ী গিয়েই ইক্‌মিক্ কুকারে বসান রান্না গুলি সাঁতলে স্বামী পুত্র কন্যাদের খেতে দেন। বাড়ীর সমস্ত কাজ আপনার হাতে করেন। ধোপার বাড়ী পর্য্যন্ত অনেকে কাপড় দেন না। আবার দুপুরে কোনও স্থলে হয় বেড়াতে, নয় শিখ্‌তে যান। রাস্তায় রাস্তায়প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের ইংরাজী বা হাতের কাজ শেখানর ক্লাস্ আছে সেখানেও যান। বিকালে ঘরের কাজ সব শেষ করে আবার ক্লাবে যান। রাত্রি আটটা নটার মধ্যে খাওয়া ইত্যাদি সব শেষ করে ফেলেন। শাশুড়ী এবং পুত্রবধূ এক সঙ্গে এসে খেলা করেন এরকমও দেখা যায়।

প্রতি সপ্তাহে একদিন প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। এই সব দেখি আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়—বালিগঞ্জের মতন যায়গায় যেখানে সাধারণতঃ শিক্ষিত ও প্রগতিভাবাপন্ন লোকেরাই বাস করেন—সেখানে মহিলা সমিতি করবার জন্য বারবার কত ব্যর্থ প্রয়াসই না করতে হয়েছে। শাশুড়ী ও তাঁর পুত্রবধূ একত্রে খেলতে যাচ্ছেন বাংলা দেশে যেন তা এখনও কল্পনাই করতে পারিনা এখানকার মায়েরা ছেলেমেয়েদের বিকেল হলেই খোলা মাঠে খেলা করতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন—যেখানে লাঠিখেলা, ড্রিল প্রভৃতি শেখান হয় সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর কলকাতায় ছাত্রীদের বিকালে খেলার জন্য ক্লাবে নিয়ে যাবার জন্য গত চোদ্দ বছর ধরে ছাত্রীসঙ্ঘ কত চেষ্টাই না করেছে সপ্তাহে একটী দিন আলোচনাসভার সমস্ত ব্যবস্থা করেও ছাত্রীদের দুদিনের বেশী আনতে পারা যায়নি। তারা তাদের মায়েদের আপত্তির দোহাই দিয়ে—নিজেদের সরিয়ে রেখেছে।

এইসব বহুদিনের যত ব্যর্থতার করুণ কাহিনী দিনরাত চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভাই।

এইখানে একটী কথা বলে রাখি। এই ভগ্নীসমাজের জমি এক সহৃদয় ধনীর দান। মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই তিনি দিয়েছেন। ভাবি—বাংলা দেশে একটী বিধবা আশ্রম বা অনাথ আশ্রমের জন্য সামান্য জমি ভিক্ষা করে কত লক্ষপতি ধনীর দুয়ার থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। শুধু মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এই উদ্দেশ্যে কেউ জমি দিয়েছেন বলেত মনে হয়না।

এখানে 'পরদা' বলে কোন কিছুই নেই। মেয়েদের জন্য রয়েছে অগাধ স্বাধীনতা। এরা কিন্তু যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে বা যেটা তারা এতদিন সংগ্রাম করে লাভ করেছে তার অপব্যবহার করেনা।

পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে তারা চলেছে—তাদের চলার ভেতরে এমন স্বচ্ছন্দ ও সুদৃঢ় ভাব রয়েছে। কোন শঙ্কা নেই, লজ্জা নেই, মুক্তির আনন্দে চলে বেড়াচ্ছে। তাদের গুণ্ঠনবর্জ্জিত মুখে যেন এক কুণ্ঠাহীন নম্রতা ও গরিমা দেখতে পাই। রাস্তায় বা কোথাও এদের ভেতর কখনও এতটুকু চপলতা বা চঞ্চলতা দেখতে পাইনি।

ছাত্রীদের ভেতরেও একটা সংযত ভাব ও গাম্ভীর্য্য আমাকে অনেক সময় মুগ্ধ করেছে।

আগে ধারণা ছিল এখানে মেয়েরা বুঝি খুব বেশী বিলাসিতায় ডুবে আছে। কিন্তু এখানে এসে সে ধারণা এখন যেন বদলে গেছে। নিত্য নূতন ফ্যাসানের আমদানী এখানে ত কই দেখা যায়না। নকল করাটাকে এরা খুব অবহেলার চোখেই দেখে বলে মনে হয়। সকলকে প্রায় নিজেদের দেশের মিলের তৈরী কাপড় পরে বেড়াতে দেখা যায়। হয়তো একটা সমাজ এখানেও আছে যেখানে ছেলেমেয়েরা ইংরাজী সাজসজ্জা আচার-ব্যবহারকে হুবহু অনুকরণ করাকে গৌরব বলে মনে করেন কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং আমার সেই সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি। আমি যাদের কথা এতক্ষণ লিখলাম এর আগে, তারাই এখানে সংখ্যায় এত বেশী যে বোম্বাইয়ের মেয়েদের কথা লিখলে এদেরই বোঝা যায়।

এখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থাই চলে আসছে। বেশী ভাগ বিদ্যালয়ে ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা এক সঙ্গে পড়ছে। তাই তাদের পরস্পরের ভেতর সম্বন্ধটা এত সহজ হয়ে আছে এখনও। এখানকার বাংলা বিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রচলিত হয়ে রয়েছে দেখে বেশ আনন্দ হল। একটী ছাত্রী ছুটীর পর দেরীতে ফিরল—সে ফিরে এসে কাছেই তার সহপাঠীর কাছে গিয়ে পড়া জেনে নিয়ে এল। তার পিতা মাতা এই ঘটনাটী এত সহজ ভাবে নিলেন যে দেখে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

আর একটী জিনিষ খুব ভাল লেগেছে এখানে। ট্রামে বাসে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী বলে কিছু নেই এখানে। এক লক্ষপতির পাশে যখন একজন গরীব মজুর এসে বসে তখন মনটা বেশ সুখী হয়ে ওঠে। মেয়েদের জন্য দু একটী নির্দ্দিষ্ট আসন আছে। কিন্তু এত মেয়ে ট্রামে ওঠে যে তাদের ঐ আসন ছাড়াও অন্য জায়গায় বসতে হয়। সব সময় মেয়েদের দেখলেই কেউ উঠে দাঁড়ায় না কারণ মেয়েরা এখানে পুরুষের থেকে কোন দয়া নিয়ে ছোট হতে চায় না। একই সঙ্গে তারা পাশাপাশি বসে যায়। একটী কোনে একটী মহিলা বসে আছেন তার পাশের খালি জায়গায় একটি পুরুষ স্বচ্ছন্দে এসে বসলেন। মেয়েটীর দিক থেকে কোনই বাধা এলনা।

আর একটী জিনিষ যা বড় ভাল লেগেছে তা হচ্ছে এদের গৃহ সংসার সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার ক্ষমতা। বাড়ীর সব ঘরত পরিষ্কার থাকেই, রান্নাঘর কি সুন্দর পরিষ্কার রাখা হয় দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। একটী পরিবার একটী বাড়ীতে আছেন এরকম এখানে খুবই কম দেখা যায়। প্রকাণ্ড তিনতলা চারতলা বাড়ী সব—এক এক বাড়ীতে পোনর

কি কুড়িটী সংসার থাকেন। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে ঠিক শোয়া ও বসার ঘরের মতন বড় রান্নাঘর। যদি কোন ফ্ল্যাটে দুটী ঘর থাকে একটী শোবার ও আর একটী রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমন দেখেছি শোবার ঘরের চেয়েও রান্নঘরে বেশী আলো বাতাস। বাসন ইত্যাদি এত সুন্দর করে সাজান। বেশীরভাগ বাড়ীতে গ্যাসের ব্যবস্থা আছে। যে বাড়ীতে নেই সেখানে কাঠ কয়লা দিয়ে উনান ধরান হয়। কাজেই এই সহরে ধোঁয়া বলে কিছু নেই। অথচ এর জন্য খরচও বেশী নয়। এই সব দেখি আর ভাবি আমাদের কলকাতাতেও সবাই যদি এই ব্যবস্থা করত তবে ওখানকার মানুষের অত স্বাস্থ্য খারাপ হত না। মেয়েদেরইত সেখানে বেশী যক্ষা হয় তার কারণ এই ধোঁয়া আর বদ্ধ ঘরে বাস করা। যদি এদেশের মেয়েদের মতন অন্ততঃ বাইরে বেড়াতে পারত তাহলে এদের মতনই স্বাস্থ্যবতী হতে পারত। এখানে ২৫ বা ৩০ টাকার ফ্ল্যাট, তাতে ব্যবস্থা কি সুন্দর। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের পেছন দিকের দরজার বাইরে একটী করে বালতী রাখার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক দিন দুবেলা বাড়ীওয়ালা যে লোক নিযুক্ত রাখেন সে সেই ময়লা নিয়ে কর্পোরেশনের গাড়ীতে ফেলে দেয়। কাজেই বাড়ী এবং রাস্তায় ময়লা থাকতে পায় না। প্রত্যেক দিন দুবেলা ময়লার গাড়ী বাড়ীর সামনে এসে ঘণ্টা দেয়। কলকাতার রাস্তা ঘাটের কথা মনে হয়। বাড়ীর চাকর ময়লা হয় বাড়ীর সামনে রাস্তায়, নয় অন্যের বাড়ীর সামনে ফেলে দিয়ে আসে। তাছাড়া বাড়ীর জানলা দিয়ে রাস্তায় কত কি যে ফেলা হয় সে যাঁদের রাস্তায় দিনের অর্দ্ধেক সময় ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁরা বুঝতে পারবেন। এখানকার কর্পোরেশনের সমস্ত কাজ এত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা হয় যে রাস্তাঘাট ও বাড়ী অপরিষ্কার হবার উপায় থাকেনা। তাই মনে হয় কলকাতার কর্পোরেশনের এখান থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে একদিনের একটি ঘটনা মনে হল কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রীরূপে যখন সেই বিদ্যালয়ের ঠিক সামনে একতলা সমান স্তূপীকৃত ময়লা পরিষ্কার করিয়ে ছিলাম ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসারকে লিখে, তখন স্থানীয় কাউনসিলরের কাছে কি লাঞ্ছনাই না পেতে হয়েছিল। পরিষ্কার হবার পর ছাত্রীদের মুখে কি হাসি,—আর তিনি বলে পাঠালেন যে যেখানে যা আছে সেইরূপ থাকবে আমি যেন ভবিষ্যতে আর কিছু পরিবর্ত্তন করতে না যাই।

এখানকার বিধবাদের অবস্থা বাংলা দেশের চেয়ে অনেক ভাল। যাঁদের স্বামী বর্ত্তমান তাঁরা যে মঙ্গল সূত্র পরেন ও কপালে যে চিহ্ন রাখেন বিধবারা শুধু সেই গুলি খুলে ফেলেন। কোন জাতির ভেতরে এই নিয়ম আছে যে বিধবা হলে মাথায় কাপড়

দিতে হয়। তাছাড়া তাদের সমাজ তাদের অমন করুণ বেশে সাজিয়ে তৃপ্তি পায়না। বাংলা দেশে আট দশটা সন্তান থাকা সত্বেও স্ত্রী মৃতা হলে স্বামী আবার সিল্কের জামা পরে বিবাহ করতে যেতে লজ্জা পাননা। তিনবারের পর চতুর্থবারও নিঃসঙ্কোচে বিবাহে রাজি হন। অথচ তাঁরাই বিধবাদের যত রকম কড়া শাসনের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চান। বাংলার বিধবাকে যে রকম পোষাক পরতে বাধ্য করা হয় এমন বোধ হয় জগতের কোন জাতির বিধবাকেই বাধ্য করান হয়না। সে যেন মূর্ত্তিমতী বেদনা। তাকে বেঁচে থাকতে হবে, সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হবে, কিন্তু তার জীবনের কোন চাহিদাই থাকতে পারবেনা। তার জন্য রয়েছে শুধু ত্যাগ আর শুধু কঠোর নিয়ম। ভোগের ভেতরেও যে নিস্কাম থাকা যায়, প্রকৃতির ভেতরে যে নিবৃত্তি ও ত্যাগের সাধনা সে শুধু পুরুষের বেলায়।

অনেক লিখলাম ভাই। তোমাদের আর ধৈর্য্য থাকবেনা। পরে এখানকার শ্রমিক মেয়েদের অবস্থার কথা লেখবার ইচ্ছা রইল। একটী কথা লিখে শেষ করি। বাংলা দেশের দোষের কথা অনেক এখন চোখে ভাসে। কত জিনিষ যে শেখবার আছে অন্য প্রদেশের কাছে এখানে বসে বসে তাই ভাবি। আমাদের ক্রটীগুলি চোখের সামনে ধরে রাখলাম যাতে তুলনা করে অন্ততঃ এদের কয়েকটীও সংশোধন করতে পারা যায়। তবু ভাই এই শতক্রটীসম্বলিত আমার বাংলাকে যে কত ভালবাসি তা বুঝতে পারছি যখন এই প্রবাসী জীবন কাটাতে বাধ্য হলাম। ইংরাজ কবির ভাষায় এই কথাই আজ বলতে ইচ্ছা করছে "Bengal, with all thy faults I love thee still!"

তোমার বন্ধু

তুমি সে আকাশ ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী
দেবতার দূতি।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।
ভঙ্গুর মাটির ভান্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে-হেথা আহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু'বাহু বাড়ালে।

(রবীন্দ্রনাথ)

কালিদাস সাহিত্যে নারী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুকুমারী দত্ত।

দীপান্বিতার রাত্রে কয়েকটী মাত্র আকাশপ্রদীপ উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া থাকে,—নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মৃৎপ্রদীপ জ্বলে। কালিদাসের সাহিত্যেও তেমনই মাত্র দুই একটি নায়িকার চরিত্র বর্ণ-প্রভায় সমুজ্জ্বল, তাহাদের অন্তরালে ক্ষীণজ্যোতি কত অস্ফুট চরিত্র মৃদু-আলোকে জ্বলিতেছে। প্রত্যেকটি নায়িকার সঙ্গেই প্রায় এক বা একাধিক সখী আছে, ইহাদের অধিকাংশই অস্পষ্ট ও অর্দ্ধস্ফুট। তথাপি ইহাদের মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সখীদের মধ্যে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মত সৃষ্টি কালিদাস-সাহিত্যে কেন, অন্য কোন কবির কাব্যে নাই।

সখী দুইটির প্রকৃতি দুই প্রকার অনসূয়া সরল, প্রিয়ংবদা চতুর। প্রথম অঙ্ক হইতেই দেখি প্রিয়ংবদা বাক্যবাণে পরিহাসে শকুন্তলাকে জর্জ্জরিত করিতেছে। শকুন্তলা কেন সহকারের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার পর্য্যন্ত একটা অর্থ সে করিল। রাজা আসিবার পরেও শকুন্তলার অবস্থা বুঝিয়া সে-ই তাহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। প্রিয়ংবদা চতুর বুদ্ধিমতী এবং প্রিয়ভাষিণী। অনসূয়া কিন্তু সেরূপ নহে সে সরল এবং কোমলপ্রাণ। শকুন্তলার সুখদুঃখ তাহাকে গম্ভীরভাবে বিচলিত করে। চতুর্থ অঙ্কের পূর্ব্বভাগে অনসূয়া শকুন্তলার দুঃখে এত অভিভূত যে অনায়াসেই সে দুষ্যন্তকে 'অসত্যসন্ধ' বলিয়া মনে মনে কটূক্তি করিল। অনসূয়ার এ ব্যাকুলতা সত্যই মর্ম্মগ্রাহী, শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের আর সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া সে কখনও অনঙ্গকে শাপ দেয়, কখনও দুষ্যন্তকে অসত্যসন্ধ বলে আবার কখনও বা তাপসজীবনকে ধিক্কার দিয়া বসে।

শকুন্তলার প্রতি দুই সখীরই এই গভীর প্রীতি পূর্ব্বেই ;—যখন শকুন্তলা মদনজ্বরে পীড়িতা তখন, স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। দুইজনেই শকুন্তলা-অস্ত প্রাণ। শকুন্তলার ব্যাধি যাহাতে প্রশমিত হয়, তাহার জন্য দুইজনই কত না ব্যস্ত। কিন্তু শকুন্তলা যে তাহাদের জীবনে কতখানি, তাহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিল তাহার পতিগৃহে যাত্রার দিনে। বহু পরিশ্রমে দুর্ব্বাসাকে শান্ত করিয়া দুইজনে আসিয়া সখীকে মনের মত করিয়া সাজাইল। বিদায়ের

সময়ে দুইজনই কাঁদিয়া ব্যাকুল। শকুন্তলা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে, আশ্রমে ফিরিবার সময় সাশ্রুনয়নে বলিল, 'তাত কণ্ব, চাহিয়া দেখুন, শকুন্তলাবিরহিত তপোবন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে।' তপোবন শূন্য হউক বা না হউক তাহাদের দুজনের জীবন সেদিন বড় শূন্য হইয়া গেল।

উর্ব্বশীর সখী চিত্রলেখাও এইরূপ উর্ব্বশীর সুখদুঃখের সহভাগিনী। মধ্যে মধ্যে সে উর্ব্বশীর সহিত পরিহাস করে, তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলে বটে, কিন্তু পুরূরবার সহিত তাহার মিলন ঘটাইবার জন্য সে কত না কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে; আবার মিলন হইলেও প্রায় প্রত্যেকবারই সে উর্ব্বশীর হইয়া রাজার সহিত কথা কহিয়াছে। শেষবার যখন সখীর নিকটে বিদায় লয় তখন তাহার কাতর বচনে বুঝা গেল উর্ব্বশীর প্রতি তাহার প্রীতি কত গভীর। আবার উর্ব্বশী যখন কুমারবনে লতায় পরিণত হইলেন তখনও চিত্রলেখা কত ব্যাকুল হইল অবশেষে 'সঙ্গমনীয়' মণির সন্ধান করিয়া সে-ই পুনর্মিলনের উপায় করিয়া দিল।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে আর একটি প্রগল্‌ভ নারীর পরিচয় পাই—সে সুনন্দা, ইন্দুমতীর প্রতীহাররক্ষী। রাজাদের পরিচয় দিবার সময় সে চতুর ইঙ্গিতের দ্বারা ইন্দুমতীকে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় দিতেছিল, তাহার কথায় উক্তি অপেক্ষা ব্যঞ্জনাই অধিক। সময় বুঝিয়া সে ইন্দুমতীকে পরিহাস করিতেও ছাড়ে নাই।

রঘুবংশের এই সুনন্দা এবং শকুন্তলার যবনীরা কালিদাসের যুগে পরিচারিকা শ্রেণীর নারীর পরিচয় দেয়। ইহারা রাজার আশ্রয়ে পালিত হইত- এবং অন্তঃপুরে ও প্রকাশ্য সভায় ইহাদের অবাধ গতি ছিল।

এমনই আরও বহু পরভৃতিকার নাম পাওয়া যায়—জয়া বিজয়া পার্ব্বতীর সখী, পার্ব্বতীর সুখদুঃখের অংশভাগিনী, তাঁহার তপস্যা-সহচরী। বকুলাবলিকা মালবিকার মুখরা সখী,—রাজার দূতী। এমনই কত চতুরিকা নিপুণিকা, সমাহিতিকা, কত সানুমতী, মিশ্রকেশী, সহজন্যা রম্ভা, কত চেটী-প্রতিহারী যে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

এ শ্রেণীর স্বল্পোল্লিখিত চরিত্রের মধ্যে মেনকার চরিত্র একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিক্রমোর্ব্বশীয়ে সে উর্ব্বশীর সখী, শকুন্তলায়—শকুন্তলার জননী. তাহার এই দুইটি পরিচয়ই সত্য। দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত বলিতে গিয়া প্রিয়ংবদা বলিয়াছে, "বিশ্বামিত্র

যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন দেবরাজ অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত মেনকাকে পাঠান। একদিন পুষ্প-উদার বসন্তদিনে মেনকার উন্মাদকারী রূপ দেখিয়া—" প্রিয়ংবদা আর বলিল না, দুষ্যন্ত বলিলেন, 'বুঝিয়াছি'। এ সেই 'স্বর্গনটী' মেনকা, যাহার প্রকৃত কাহিনী বলিতে গিয়া প্রিয়ংবদাকে মধ্যপথে থামিয়া যাইতে হইল। কিন্তু এ পরিচয় তাহার ঘুচিয়াছিল; পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, শকুন্তলা গভীর বেদনায় বলিয়া উঠিলেন, 'কোলে আশ্রয় দাও মা' ইহার পূর্ব্বে মেনকাকে কেহ 'মা' বলিয়া ডাকে নাই; আজ দুঃখিনী কন্যার আর্ত্তস্বর শুনিয়া মেনকা স্থির থাকিতে পারিলনা, তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেল। সেই উচ্ছল বসন্তদিনের বিলাসিনী মেনকা আজ জননীর মহিমায় উজ্জ্বল,—সেদিনের সেই হীন পরিচয় আজ মাতৃত্বের গৌরবের তলে ঢাকা পড়িয়া গেল।

শকুন্তলা আশ্রমে যাঁহাকে জননী বলিয়া জানিতেন, তিনি কণ্বের ভগিনী গৌতমী। কুলপতির আশ্রমে এই নারীটি যেন কল্যাণের অধিদেবতা। এইরূপ তপস্যরতা চিরকুমারীর সংখ্যা কালিদাসের যুগে অধিক ছিলনা, তাই কণ্বের তপোবনে ইঁহাকে দেখিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনযুগের কথা মনে পড়ে। শকুন্তলা শুধু কণ্বের নিঃশ্বাসস্বরূপা ছিলেন না, গৌতমীরও তিনি কন্যাসমা স্নেহের পাত্রী ছিলেন। শকুন্তলার জ্বর শুনিয়া তিনি শান্তিবারি লইয়া ছুটিয়া আসিলেন, জননীর মত মমতাস্নিগ্ধ স্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—'বেলা গিয়াছে কুটীরে ফিরিয়া চল, মা।' আবার রাজসভাতেও তিনি শকুন্তলার সঙ্গে গিয়াছেন। দুষ্যন্তকে প্রত্যাখ্যানে উদ্যত দেখিয়া কত সাধ্যসাধনা করিলেন, শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না, তখন শার্ঙ্গরব শারদ্বত শকুন্তলাকে ফেলিয়া যায় দেখিয়া তাঁহার নারীহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল বলিলেন,—'বাছাকে আমার রাজাও ত্যাগ করিলেন, তোমরাও ফেলিয়া যাইবে?'

এমনই আর একটি প্রৌঢ়া নারীর দেখা পাওয়া যায় মালবিকাগ্নিমিত্রে,—ইনি পরিব্রাজিকা পণ্ডিতকৌশিকী—মালবিকার পিতৃস্বসা। পরিব্রাজিকা বিধবা তপস্বিনী। কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় ইনি নানা শাস্ত্রে বিদুষী ছিলেন। থাকিতেন অন্তঃপুরে ধারিণী দেবীর সহিত, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে আসিতে ইঁহার কোন বাধা ছিলনা। মালবিকার কিসে মঙ্গল হয়, সে চেষ্টায় ইনি অনুক্ষণ ব্যস্ত। এই বিদুষী নারীর শান্ত সংযত চরিত্র কালিদাসের নিপুণ তুলিকা উপযুক্ত গৌরবেই আঁকিয়াছে। সে-যুগে নারী যে যথেষ্ট শিক্ষিত হইত এবং

সে-শিক্ষা যে তাহাকে সমাজে কত সম্মানের আসন দিতে পারিত, পরিব্রাজিকাই তাহার নিদর্শন।

মালবিকার সকল মঙ্গলকে যিনি বারেবারে প্রতিহত করিতেছিলেন, তিনি ধারিণী দেবী,—অগ্নিমিত্রের পট্টমহিষী। ধারিণী দেবী বিগতযৌবনা,—পুত্র বসুমিত্র ও কন্যা বসুলক্ষ্মীর জননী। রাজার প্রতি অনুরাগ হয়ত তাঁহার অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাহার আবেশ স্তিমিত হইয়া আসিয়ছিল, এখন তিনি রাজার এবং রাজ্যের কল্যাণলক্ষ্মী হইয়া থাকিতে চাহিতেন। তাই রাজা মালবিকার মত সামান্য পরিচারিকার প্রতি অনুরক্ত, এই চিন্তা মহিষীর সম্মানবোধকে আহত করিত। এই কারণেই তিনি রাজার দৃষ্টি হইতে মালবিকাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই চেষ্টায় রাজা যে ব্যথিত হন ইহা তিনি জানিতেন,—কিন্তু তিনি নিরুপায়,—রাজ্যেশ্বরকে অপমান এবং কলঙ্ক হইতে রক্ষা করাই তাঁহার ব্রত। কিন্তু মালবিকার নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পাঁচ দিনের মধ্যে অশোকে পুষ্প দেখা দিলে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাই অশোকের পুষ্পোদ্গম হইতে মালবিকাকে বধূবেশে সাজাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার এই উদারতায় দৈব অনুকূল হইল, সংবাদ পাওয়া গেল মালবিকা হীনবংশীয়া নহে,—সে রাজকন্যা। ধারিণীদেবীর মনের গ্লানিটুকু কাটিয়া গেল, প্রসন্ন মনে তিনি মালবিকার সহিত রাজার বিবাহ দিলেন। এই চরিত্রটির আর একবার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে রত্নাবলীর বাসবদত্তাতে।

ধারিণী দেবীর অবস্থাতেই আরও একটি নারী অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন. ইনি পুরূরবার মহিষী উশীনরী দেবী। বিদূষকের মুখে ইনি শুনিয়াছিলেন, পুরূরবা উর্ব্বশী নাম্নী একটি অপ্সরার প্রতি আসক্ত। প্রথমে নারীর স্বাভাবিক কৌতূহল জাগিয়া উঠিল ব্যাপারটা সত্য কিনা জানিবার জন্য চেটীকে লইয়া 'প্রমদ বনে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ও বিদূষকের কথা শুনিয়া এবং উর্ব্বশীর পত্র পড়িয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন। সহসা অভিমান প্রবল হইল, উষ্মা প্রকাশ পাইল, রাজার অনুনয় উপেক্ষা করিয়া রাজহংসীর ন্যায় মন্থরগমনে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু পরে ভাবিয়া বুঝিলেন, রাজা যদি সত্যই উর্ব্বশীতে অনুরক্ত হইয়া থাকেন তবে প্রতিকূলতা করিয়া ফল নাই, বরং এই দুর্নিয়তিকে সহজ ভাবে স্বীকার করিয়া লইলে রাজার মঙ্গল হইতে পারে। রাজার প্রতি তাঁহারও অনুরাগ গভীর ছিল, তাই প্রিয়জনের

দুঃখ তিনি সহিতে পারিলেন না। তাই তৃতীয় অঙ্কে উশীনরী একেবারে দেবীর মাহাত্ম্যে দেখা দিলেন। শুভ্রবসনা মঙ্গলভূষণা দূর্ব্বাখচিতকুন্তলা দেবী পূর্ণিমার রাত্রে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, বলিলেন 'প্রিয়-প্রসাদন' ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। রাজাকে পূজা করিয়া রোহিণী-শশাঙ্ককে সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, যে মহারাজ তাঁহার ঈপ্সিতার সহিত আনন্দে কালযাপন করুণ, তিনি (দেবী) স্বচ্ছন্দে, প্রসন্ন মনে সমস্ত সহিবেন। বিপদে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া অনেক রমণী স্বামীকে অপরের হস্তে দান করিয়াছেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রিয়কে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই এইভাবে উদার স্বার্থত্যাগ ইতিহাসে বিরল। উশীনরীর এই নিঃস্বার্থ মঙ্গলকামনা এই সার্থক প্রিয়-প্রসাদনের কাহিনীটি বড় মর্ম্মস্পর্শী।

অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে আর একটি নারীর জীবনে এইরূপ প্রিয়-প্রসাদনের সুযোগ আসিয়াছিল, সে তাহা পারে নাই। সে দেবী নহে,—ভট্টিনী ইরাবতী। বিদূষকের মুখে শুনিয়াছি, ইরাবতী পূর্ব্বে সামান্য অন্তঃপুরিকা ছিলেন, পরে রাজার অনুরাগে রাজবধূর সম্মান পাইয়াছিলেন। প্রথম যখন ইরাবতী দেখা দিলেন, তখন তিনি রক্তনেত্রা মদস্খলিত চরণা,—আর্য্যপুত্রের সহিত দোলারোহণ করিতে আসিতেছেন। তিনি যে মহারাজের প্রিয়তমা এ সৌভাগ্যের গর্ব্বে তাঁহার চিত্ত উদভ্রান্ত। আসিয়া দেখিলেন, দোলা-গৃহে মহারাজ নাই। এই প্রথম ইরাবতীর জীবনে আর্য্যপুত্রের অবজ্ঞা। অগ্রসর হইয়া প্রমোদকাননে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাজা আবেগবিহ্বল-চিত্তে দাঁড়াইয়া,—সম্মুখে মালবিকা। ইরাবতীর সমস্ত অন্তরপ্রকৃতি বিদ্রোহ করিয়া উঠিল তিনি জানিতেন অন্তঃপুরে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী আজ তাঁহার একছত্র আধিপত্য সহসা নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া ক্রোধে অভিমানে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নিকটে আসিয়া রুক্ষ-কর্কশ বচনে সমস্ত ক্রোধ উদ্গীরণ করিয়া দলিতা ভুজঙ্গীর মত দৃপ্তগতিতে চলিয়া গেলেন।

ইরাবতীর এই ব্যবহারে সমস্ত দ্বিধা চলিয়া গেল। মালবিকা সম্বন্ধে তাঁহার যেটুকু দ্বিধা ছিল, সে এই ইরাবতীরই জন্য। আজ সেই ইরাবতীই যখন রোষভরে প্রকাশ্যে তাঁহাকে অপমান করিয়া, তাঁহার সমস্ত অনুনয় অবহেলা করিয়া গেলেন তখন রাজাও কুণ্ঠাহীন হইতে পারিলেন।

রুদ্ধ অভিমানে ইরাবতীর মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। পাতালকক্ষের সেই বিলাসভবনের চিত্রটি হইতে বুঝা যায়, একদিন ইরাবতীর কত আদর ছিল,—আজ সহসা সে সকল ত্যাগ করিতে তাঁহার চিত্ত সম্মত হইল না। ধারিণী দেবীকে বলিয়া তিনি মালবিকাকে

বন্দী করিলেন। কিন্তু তাহাতেও শান্তি পাইলেন না, ক্ষোভে-অভিমানে বিদ্রোহিণী হইয়া উঠিলেন, অথচ একথাটাও স্পষ্টই বুঝিলেন যে, তাঁহার সুখের দিন ফুরাইয়াছে। সমস্ত জানিয়াও তাঁহার ক্ষুব্ধ অভিমান শান্ত হইলনা।

শেষ অঙ্কে যখন ধারিণী দেবী—প্রতিহারীকে দিয়া মালবিকা অগ্নিমিত্রের মিলনের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন ইরাবতী উত্তর দিলেন, দেবী পৃথিবীর ন্যায় উদারমনা তাঁহার ক্ষমতাও অসীম, সুতরাং যাহা ভাল বুঝিয়াছেন করুন। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির মধ্যে ইরাবতীর আপনার সঞ্চিত ক্ষোভ যেন ঢালিয়া দিয়াছেন। দেবী পুত্রকন্যার জননী, আর ক্ষমতাশালিনী,—ইরাবতী সদ্যোযৌবনা, আর ক্ষমতাহীন কাজেই উভয়ের তুলনা হয় না। এই মিলনের উৎসবে সে অভিমানিনী অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে না জানি কতই অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

ইরাবতীর প্রসঙ্গে আর একটি ভাগ্যহীনার কথা মনে পড়ে,—সে দুষ্মন্তের অন্তঃপুর-চারিণী হংসপদিকা। পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই তাহার গান শুনা গেল,—"হে মধুকর, একদিন এই আম্রমঞ্জরী তোমাকে তৃপ্তি দিয়াছিল, আজ কমলের মধুতে মুগ্ধ হইয়া চুতমঞ্জরীকে একেবারেই ভুলিলে?" গানের ক্লিষ্ট করুণ সুরটি রাজার প্রাণে বাজিল, বিদুষককে বলিলেন, সখে "সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ"—উহার সহিত একবারই প্রণয় হইয়াছিল। তাহার পর হংসপদিকা সাধারণ অন্তঃপুরিকার স্থান পাইয়াছিল। অনসূয়া সত্যই বলিয়াছিল, —'রাজারা বহুবল্লভ হ'ন'; সেই একবারের পর দুষ্মন্ত সব ভুলিয়াছিলেন কিন্তু হংসপদিকা তাহার জীবনের ঐ একটি সুখস্বপ্নের স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই;—তাই এই গান। গান শুনিয়া রাজা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এ হংসপদিকার প্রতি অনুরাগ নহে,—শকুন্তলার বিস্মৃতিতে একটা অব্যক্ত উন্মাদনা। হংসপদিকার চিত্রটি স্বল্পরেখায় অঙ্কিত কিন্তু এ চিত্র পাঠকের স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া থাকে। এই মন্দভাগিনী সর্ব্বরিক্তার গানে অন্তঃপুরের বহু-ভাগ্যহীনার অব্যক্ত বেদনা ভাষা পাইয়াছে।

কালিদাসের বিরাট সাহিত্যে ইতস্তত:বিক্ষিপ্ত অসংখ্য নারীচরিত্রের মধ্যে আর একটি স্বল্প-উজ্জ্বল আলেখ্য চোখে পড়ে,—এটি মদনবধূ রতির। সমগ্র কুমারসম্ভবে কোথাও রতির পরিচয় নাই, কেবল চতুর্থ সর্গে মদনভস্মের পর একবার মাত্র সে দেখা দিয়াছে,— সদ্যোবিধবার বেশে। তখনও তাহার অঙ্গে অঙ্গরাগের চিহ্ন দেখা যায়,—চরণে অলক্ত-মণ্ডনের অসমাপ্ত রেখা, এমন সময় সহসা পতির মৃত্যুতে অসহ যাতনার প্রথমে সে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িল। ক্ষণপরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তাঁহার করুণ মর্ম্মভেদী বিলাপে আকাশবাতাস ব্যথাতুর হইয়া উঠিল। কাতর আর্ত্তস্বরে সে বলিতে লাগিল, শশী অস্তমিত হইলে কৌমুদী বিলীন হয়,—মেঘের সহিত বিদ্যুৎও লুকায় - জড়লোকেও এই বিধান-যে পতির সহিত পতিব্রতা সহমরণে যায়, তবে এই ভাগ্যহীনাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গেলে,—অনঙ্গদেব ?

আর একটি নারীর স্নিগ্ধ -চিত্র পাঠকের স্মৃতিতে জাগরূক থাকে তিনি দিলীপের মহিষী সুদক্ষিণা। অপুত্রক দিলীপ পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গেলেন, সঙ্গে চলিলেন সুদক্ষিণা। দুইজনে শুদ্ধবেশে যখন রথে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইতেছেন তখন দেখিয়া মনে হইল যেন মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে চিত্রা ও চন্দ্র।

বশিষ্ঠের আদেশে দিলীপ যখন দেবধেনু নন্দিনীর পরিচর্য্যা করিতেন তখন কল্যাণ-লক্ষ্মী সুদক্ষিণাও আশ্রমে থাকিয়া সাধ্যমত সহধর্ম্মিণীর ব্রত পালন করিতেন। শ্রান্ত সন্ধ্যায় পথশ্রমে ক্লান্তদেহে দিলীপ যখন নন্দিনীকে লইয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, তখন মহিষী তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত নিষ্পলক নেত্রে বনের দিকে চাহিয়া আছেন এই কল্যাণী রাজবধূর চিত্রটি পরিসরে ক্ষুদ্র হইলেও একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল।

সাহিত্য সমাজের ছায়া ; কালিদাসের সাহিত্যেও এত বিচিত্র নারীচরিত্রের মধ্যে সেকালের নারীর সামাজিক অবস্থা কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ তখন চলিয়া গিয়াছে তবু সমাজে সে-যুগের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান নারী শিক্ষা পাইবার অধিকারিণী ছিলেন, তাই অনসূয়া প্রিয়ংবদা কাব্য-পুরাণ পড়িয়াছে, এবং পরিব্রাজিকা বিদুষী। তবে ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষা ছিলনা, অধিকাংশ নারীই অশিক্ষিতা ছিলেন। শাস্ত্রচর্চ্চা ভিন্ন অন্যপ্রকারের শিক্ষায়, বিশেষ ভাবে নৃত্যগীত ও শিল্পকলায় নারীর অধিকার তাই মালবিকা নৃত্যকলার ছাত্রী এবং সিংহলকন্যা দুটি সঙ্গীতে পারদর্শিনী। রাজ অন্তঃপুরের বহু কার্য্য নারীই করিত ; কালিদাস সাহিত্যে প্রতিহারী, উদ্যানপালিকা, চেটী প্রভৃতি বহু কর্ম্মচারিণীর পরিচয় আছে। যবনদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, যুদ্ধে বন্দিনী যবনীরা অন্তঃপুরে স্থান পাইত কখনও বা বাহিরেও রাজার মৃগয়াসঙ্গিনী হইত। সামাজিক জীবনে ভোগবিলাসের মাত্রা কিছু কম ছিলনা, তথাপি কালিদাস স্বাধীন গুপ্ত-যুগের কবি বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার আদর্শবাদের জন্যই হউক, তাঁহার সাহিত্যে কেমন একটা উদার স্বচ্ছ পরিস্থিতির প্রভাব আছে। অন্তঃপুর যবনিকায় রুদ্ধ হইয়া আসে নাই, রাজসভায় তরুণী রাজবধূর যাওয়ায় বাধা ছিলনা, আশ্রমের সত্যবতী সভাতেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ

করিয়াছিলেন এবং অনাত্মীয়া পণ্ডিতকৌশিকী স্বচ্ছন্দভাবে রাজার সহিত আলাপ করিয়াছেন।. বহু ভোগ-বিলাসের মধ্যেও নৈতিক দিক হইতে সমাজের বেশ একটা শুচিতা ও শালীনতা ছিল। পরবর্ত্তী যুগের রত্নাবলীর সমাজ দেখিলে যেমন শিহরিয়া উঠিতে হয় অথবা মৃচ্ছকটিকের সমাজের চিত্র দেখিলে যেমন অশ্রদ্ধা জন্মার কালিদাস যে-সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে সেরূপ কিছু নাই। অবশ্য ইহার জন্য কবির কল্যাণকামী আদর্শদৃষ্টিও কতকটা দায়ী।

কালিদাস-সাহিত্যে নারীচরিত্র বহু-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোনও নারী ত্যাগের গৌরবে উশীনরী, কেহ উদারতার মহিমায় সীতা, আবার কেহ বা ভোগের স্বার্থসংকীর্ণ গ্লানিতে ইরাবতী। বাস্তবকে কবি কোথাও অস্বীকার করেন নাই; মানবী যে-নারী, তাহার জীবনে ক্ষণিক অসংযম আসিতে পারে. ভ্রম-প্রমোদের অসংখ্য অবকাশ তাহার চরিত্রে আছে, একথা তিনি ভুলেন নাই। নারীর সকল দৈন্যদুর্ব্বলতা, এমন কি হীনতা পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার দৃষ্টিতে ক্ষণিক ম্লান হইয়া চিরন্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল. তিনি দেখিয়াছিলেন মর্ত্তের মানবী সাধনার মধ্য দিয়া স্বর্গের দেবী হইয়া উঠিতে পারে। সকলের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের কঠিন তপস্যা সম্ভব হয় না তাহও তিনি জনিতেন। যাহারা সাধনায় চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিল না তাহাদেরও তিনি বিসর্জ্জন দেন নাই,—তাই তাঁহার সাহিত্যে ইরাবতী হংসপদিকার চিত্রও আছে। কিন্তু যাঁহারা এ কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন তাঁহাদেরই তিনি নায়িকার গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন,—তাঁহারাই সীতা শকুন্তলার বেশে মর্ত্তের স্বভাবদুর্ব্বল নারীকে ঊর্দ্ধলোকের পথ দেখাইয়া দেয়।

"আমি নারী, আমি মহিয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী,
আমি নইলে মিথ্যা হোত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হোত কাননে ফুল ফোটা।"

(রবীন্দ্রনাথ)

"স্বপ্ন"

শ্রীলীলা মজুমদার।

(বেতারের সৌজন্যে)

ছোটবেলায় আমি মাঝেমাঝে একটা স্বপ্ন দেখ্‌তাম। কখনও যদি কোনও কারণে মনে একটা দুঃখ কি দুশ্চিন্তা নিয়ে শুতে যেতাম, সেই একটা পরিচিত স্বপ্ন দেখ্‌তাম। তাকে ঠিক স্বপ্নও বলা চলে না। বরং একটা দৃশ্য দেখতাম। দেখ্‌তাম একটা সবুজ শ্যাওলা পড়া পুকুরের কাণা ঘেঁষে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ হয়েছে; তার গোড়াকার শিকড় গুলো মাটি থেকে উঁচু উঁচু হ'য়ে রয়েছে, আর তার মধ্যে কতকগুলো দিন রাত্রি পুকুরের জলে ভিজে রয়েছে, তাদের গায়ের খাঁজে খাঁজে ঘন সবুজ শ্যাওলা লেগে রয়েছে। দেখ্‌তাম যেন সূর্য্য উঠেছে, তার রোদে পুকুরের জল ঝিক্‌মিক্ করছে, কিন্তু তেঁতুল গাছ তলায় গভীর ছায়া। আর ঝিরঝির শব্দ ক'রে তেঁতুল পাতার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমার স্বপ্নে আমি গাছ তলায় যেতাম না; পুকুরের বাঁধ অবধি পৌছতাম না; দৃশ্যটা চোখে দেখ্‌তাম বটে কিন্তু নিজে থাক্‌তাম দৃশ্যের বাইরে।

একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবহুবার আমি এই স্বপ্নটা দেখেছি। তেঁতুল গাছের প্রত্যেকটা ঝুলে পড়া পাতার গুছি, মাটি থেকে উঁচু-হ'য়ে-ওঠা প্রত্যেকটা শিকড়ের গিট্ আমার চেনা হ'য়ে গেছিল। তাদের কখনও কোন বদল হ'ত না, তারা বাড়তো না, কম্‌তো না, দুরন্ত বাতাসে ঝরে পড়তো না, আর সেই ঝিরঝিরে বাতাস কখনও থামতো না। সমস্ত দৃশ্যটা যেন একটা ফটোগ্রাফ, সত্যি অথচ অপরিবর্ত্তনীয়। সবটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছিল; এমন ক'রে গেঁথে গেছিল যে শেষটা আর ঘুমিয়ে পড়ে তবে তাদের দেখ্‌তে হত না, আমি জেগে জেগেই চোখ বুজলে দেখ্‌তে পেতাম সেই পুকুরধারের মস্ত তেঁতুল গাছ। হঠাৎ কেমন ধাঁধা লাগ্‌তো, মনে হ'তো ঐ তেঁতুল গাছটাই বুঝি আসলে সত্যি, আর এই আমি খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি কথা বল্‌ছি, এই আমিটাই বুঝি স্বপ্ন।

পষ্ট মনে পড়ে তখন আমার বয়স আট নয়ের বেশী নয়; আমি আসামের পাহাড়ে একটা সহরে জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার সঙ্গে থাক্‌তাম। আমার মাবাবা কবে

শৈশবে মারা গেছিলেন তাঁদের কথা একটুও মনে করতে পারি না। মনে আছে জ্যাঠামশাই আমাকে খুব ভালোবাসতেন আর জ্যাঠাইমা একটুও বাসতেন না। তাই ব'লে আমাকে খেতে পরতে কষ্ট দিতেন না, কিন্তু তবু বুঝ্‌তে পারতাম জ্যাঠামশাই আমাকে ভাল বাসেন ব'লে এটা ওটা দেন আর জ্যাঠাইমা দেন, ছোট মেয়েদের দিতে হয় ব'লে। আমিও জ্যাঠামশাইকে ভালবাসতাম, আর জ্যাঠাইমাকে ভালবাসতাম না, আর তিনি আমাকে ভালোবাসেন না ব'লে একটুও দুঃখ হ'ত না। কিম্বা যদি কখনও একটু বা দুঃখ হ'ত আমি জানতাম চোখ বুজ্‌লেই দেখ্‌তে পাবো সেই পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছ আর সেই বাতাসের শব্দ শুনতে পাব, আর তক্ষুণি আমার মনটা ভালো হ'য়ে যেতো।

আমরা থাকতাম ছোট একটা বাংলো ধরণের বাড়ীতে; পাশাপাশি একসারি ঘর আর তার সামে চওড়া কাঠের বারাণ্ডা। রান্নাঘরটা আলাদা, একটু দূরে, আরও দূরে চাকরদের ঘর, একেবারে একটা ছোট পাহাড়ে নদীর উপর, তার পেছনে ঘন সরকারী জঙ্গল। মনে আছে শীতের শেষে গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর একা চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে শুনতাম সরল গাছের বনের ভিতর শীতের হাওয়া মাতামাতি করছে, আর কোথায় যেন একটা কুকুর ক্রমাগত ডাকছে। সেই শীত আর নির্জ্জনতা আর শূন্যতা আস্তে আস্তে আমার বুকে বোঝার মতন ভারী হ'য়ে আস্‌তো। আমি আমার ছোট হাত পা গুলিকে লেপের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে পাথরের মতন প্রায় আড়ষ্ট হ'য়ে যেতে গিয়ে মনে করতাম তেঁতুল গাছতলায় পুকুরের সবুজ জলে সূর্য্যের আলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে আর মিষ্টি বাতাস দিচ্ছে অমনি আমার কাণের মধ্যে থেকে সেই উদাস হাওয়ার একটানা সুর কোথায় মিলিয়ে যেতো। আর পৃথিবীর সব জিনিষের থেকে যার বেশী দাম সেই মনের শান্তি আমার ছোট প্রাণটাকে ভ'রে দিতো।

মনে আছে সেখানে বর্ষাকালে অনবরত বৃষ্টি পড়তো, সেরকম অবিরাম বৃষ্টি বোধ করি পৃথিবীর আর কোন দেশে ভাবা যায় না; রাত্রে ঘুমোতে যেতাম কাণে বৃষ্টির আওয়াজ নিয়ে, সকালে ঘুম ভেঙ্গে শুনতাম বাড়ীর টিনের ছাদের উপর সেই একই সুরে বৃষ্টি পড়ছে। আমি জানলার কাঁচের উপর থেকে পর্দ্দাটা সরিয়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে বাইরে দেখ্‌তে চেষ্টা করতাম, অবিরাম বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তাম অন্যদেশের মতন হীরের মালার মতন বৃষ্টিধারা নয় এখানে আকাশ থেকে নেমে আস্‌ছে যেন এক

একটি লম্বা স্রোতের মতন। হঠাৎ বৃষ্টির জলের শব্দ থেমে যেতো আর আমি অবাক্ চোখে তাকিয়ে থাকৃতাম আমার সেই পুরোণ তেঁতুল গাছের ভিজে শিকড়ের উপর।

এমনি ক'রে আস্তে আস্তে আমি বড় হ'তে লাগ্‌লাম। ইস্কুলে গেলাম! ছেলবেলা-কার প্রিয় খেলাগুলো একে একে ছেড়ে দিলাম, ছেলেবেলাকার আদরের জিনিষ গুলি একে একে ত্যাগ করলাম। এমন কি শেষে একদিন যে জিনিষ আমার প্রাণের চেয়ে আদরের ছিলো রিলসুতোর বাক্সে ভরা কতকগুলো শামুক ঝিনুক আর রঙ্গীন খড়ির টুক্‌রো. সেসবও অন্যমনস্কভাবে যে কোন্ অযোগ্যকে বিলিয়ে দিলাম নিজেরই মনে নেই। আমি আরও বড় হ'লাম। সেলাই শিখলাম. রান্না শিখ্‌লাম. ঘর গুছোতে শিখ্‌লাম. গান গাইতে শিখলাম, চুল বাঁধতে শিখ্‌লাম. ভালো ক'রে চলৃতে ফিরৃতে সাজ্‌তে গুজ্‌তে কথা বলৃতে শিখ্‌লাম। এতো সব শেখার মধ্যে আর স্বপ্ন দেখার সময় কোথায়? তবু যদি কোন দিন কঠিন অসহিষ্ণু কথা ব'লে জ্যাঠামশাইয়ের মনে কষ্ট দিতাম. কিম্বা যদি জ্যাঠাইমা অযথা রূঢ় কথা বলৃতেন, কি নিজে একট ভুল ক'রে, কি বুদ্ধিদোষে একটা গুরুতর কোন অন্যায় কাজ ক'রে ফেলৃতাম. যদি রাত্রে শুতে গিয়ে মনটা বিষণ্ণ হ'ত তখনই স্বপ্ন দেখতাম গভীর সবুজ জলের ধারে হাল্কা সবুজ পাতায় ভরা বিশাল তেঁতুল গাছ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে সেই আমার শৈশবে যেমন দেখেছি তেম্‌নি রয়েছে, পুকুরের জলে রোদের আলো একটুকুও ম্লান হয়নি, আর তখনই সুগভীর অনাবিল শান্তিতে আমারও মন ভ'রে যেতো।

এক এক সময় ভেবেছি হয়তো খুব ছোট বেলায় মাবাবার সঙ্গে ঐ রকম পুকুরধারে তেঁতুল গাছ দেখেছি সেই একটু মনে আছে আর সব ভুলে গেছি। আবার মনে হ'ত হয় তো বড় হ'য়ে ঐ রকম তেঁতুল গাছ তলায় কিছু একটা ঘটৃবে তাই অমন স্বপ্ন দেখি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জানৃতাম ও তেঁতুল গাছ পৃথিবীর মাটিতে গজায় নি, ওর চারাও এখনও অঙ্কুরিত হয় নি, কোনদিন হবেও না।

দিন দিন যেমন বড় হ'তে লাগ্‌লাম, জ্যাঠামশাই আমাকে কাছে টেনে নিতে লাগ্‌লেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, কবি মানুষ। নিজে পণ্ডিতি করতেন না, খালি অন্য পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি কথা বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নিতেন আর অন্য কবিদের কবিতা অস্থি দিয়ে প্রত্যেক শিরা দিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর'তেন। সেই কল্পনার রাজ্যে

আমাকেও টেনে নিয়ে গেছিলেন। ছোট বেলা থেকে "খুকুমণির ছড়া" দিয়ে আরম্ভ ক'রে শেষে এমন সময় এলো ইংরিজি বাংলা সব কাব্যের দরজা আমার সামে খুলে দিলেন।

আস্তে আস্তে জ্যাঠাইমার কাছ থেকে সরতে সরতে শেষে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালাম যেখানে তাঁর সব থেকে চোখা কথাটিও আর আমার মনে আঁচড় দিতে পারতো না। আমার মনের উপর যেন বর্ম্ম আঁটা ছিলো, তাকে ভেদ করতে হ'লে যে অস্ত্র দরকার ছিলো জ্যাঠাইমার তা জানা ছিলো না, কিন্তু জ্যাঠামশাই অনায়াসে দু'খানা পোকা খাওয়া কালোমতন মলাটের মধ্যে থেকে বের ক'রে দিতে পারতেন।

একজন ইংরেজ কবি একবার বলেছিলেন যা আমরা চাই, তাই যদি ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যেতো, তা হ'লে স্বর্গও আর স্বর্গ থাকতো না। যেটা আমাদের আদর্শ সেটাকে লক্ষ্য ক'রে আমাদের সমস্ত কাজ চলবে কিন্তু আদর্শটা পর্য্যন্ত কোন দিন পৌছাব না ; কারণ যদি পৌছালাম তা'হলে আদর্শ আর আদর্শ থাকলো না বাস্তব হ'য়ে গেল। আমিও এই কথাকে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলাম, তাই আমি হতাশও হ'তাম না, দুঃখও পেতাম না। যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা'কে আমার সেই তেঁতুলগাছের শিকড় ধোয়া জলের মতন ধরাছোঁয়ার বাইরে মনে করতাম।

হঠাৎ আমার এই মনগড়া আদর্শবাদকে উলোট্ পালোট্ ক'রে দিয়ে দুঃখবাদ আমার জীবন জুড়ে বসলো। আমার জ্যাঠামশাই হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। একদিন বর্ষা সন্ধ্যায়, কোলের উপর একখানা আধছেঁড়া সেক্সপীয়ারের বই নিয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। আমিই লাইব্রেরিতে প্রথম গিয়ে তাঁকে খুঁজে পেলাম। কারু মলিন হাতের ছোঁয়া লাগ্‌বার আগে আধছেঁড়া তাঁর সেই আদরের বইটাকে তাকে তুলে রাখলাম। জ্যাঠাইমা এলেন, কাঁদলেন, শাঁখা ভাঙলেন, চুল ছিঁড়লেন, সবকিছু করলেন, সবার সহানুভূতি পেলেন। তাঁর দুটি হ্যাংলা মতন ভাইপোকে আনালেন মনের ব্যথা হাল্কা করবার জন্য জ্যাঠামশাইয়ের উইল বার করলেন, তাতে জ্যাঠামশাই তাঁকেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ক'রে গেছেন। বহুদিনের পুরোন, হল্‌দে হ'য়ে যাওয়া একখানা উইল, তাতে আমার নাম গন্ধও নেই।

আমার সুখদুঃখ বোধ করবার, অভিমান করবার, এমন কি সবার অগোচরে স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতাও যেন চলে গেছিল। হঠাৎ একদিন চেতনা হ'ল এ বাড়ীর ক্ষুদ্রতম

কোনেও আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। সব জ্যাঠাইমার আর তাঁর হ্যাংলামতন ভাইপো দুটির এলাকা। আমি দূর দেশে একটা ইস্কুলে সামান্য চাকরী নিয়ে চলে গেলাম। যাবার সময়ে জ্যাঠাইমা খুব আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই রাত্রে, জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর প্রথম আমি আবার সেই স্বপ্ন দেখ্‌লাম, তখন মনে হ'ল এ জগতে আর কেউ কোনদিনও আমাকে বিচলিত, করতে পারবে না। কিন্তু সকালে উঠে দেখ্‌লাম জ্যাঠামশাইয়ের উপর একটু অভিমান থেকে গেছে, আমাকে ভুলে যাবার জন্য।

তারপর একে একে পনেরো বছর কেটে গেল আমি বিবাহ করলাম না; কাজের মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে গেলাম যে পড়াশুনা করবারও তেমন অবসর পেলাম না। জ্যাঠাইমার কোন খোঁজ নিলাম না, তিনিও একদিনের জন্যও আমার কথা মনে করলেন না। প্রথমটা উৎসাহ ক'রে কাজ আরম্ভ করলাম, তারপর যখন দেখ্‌লাম বছরের পর বছর ধরে সেই একই কাজ চাকার মতন ঘুরছে, দারুণ একটা ঔদাসীন্য এলো। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতন সৌন্দর্য্য আমার ছিলো না; যদি অন্য কোন গুণ থেকে থাকে তাহ'লে সে চিন্‌তে পারবার মতন এতো কাছে কেউ আমার আসেনি। আমার যৌবন আস্তে আস্তে গড়িয়ে চল্লো। মনে হ'ত জীবন বুঝি আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেলো, কিছু পেলাম না, কিছু দেখ্‌লাম না, আমার পৈতৃক সম্পত্তিটুকুও জ্যাঠাইমার হ্যাংলা ভাইপোরা নিয়ে নিচ্ছে। মনে হ'ত ওদের সংগে মাম্‌লা করি, আমার বাপের ভাগটুকু আদায় করি। আবার মনে হ'ত বাপ? আমার বাবা কই? জ্যাঠামশাই ছাড়া আমার আবার অন্য বাবা কই? জ্যাঠামশাই যিনি আমার নাম করতে ভুলে গেলেন, তিনি নয় তো কে আমার বাবা?– আর মাম্‌লার কথা মনে আনতাম না। যেদিন রাগ নিয়ে অভিমান নিয়ে শুতে যেতাম সেদিন আর কোন স্বপ্ন দেখ্‌তাম না; আর যেদিন জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভেবে ঘুমোতাম সেদিনই দেখ্‌তাম সবুজ শ্যাওলাজমা পুকুরের জলের ধার ঘেঁষে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ, তার শিকড় গুলো মাটি থেকে উঁচু উঁচু হ'য়ে রয়েছে কতকগুলি তার জলে ভিজে সবুজ হ'য়ে গেছে, আর উপর থেকে ফিকে সবুজ পাতার ছড়া নেমে এসেছে; সোনালী রোদ পুকুরের জলে ঝিক্‌মিক্‌ করছে, আর শীতল মধুর হাওয়া দিচ্ছে আমার সর্ব্বাঙ্গে, আমার সর্ব্বান্তঃকরণে।

এমনি ক'রে এক এক ক'রে পনেরো বছর কেটে গেলো, আমার জীবনের চৌত্রিশটা বছর কেটে গেলো। এম্‌নি ক'রে কেটে গেলো বলা ঠিক হ'ল না, শেষের পাঁচটা বছর

আমি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে ছোট একটা কবিতা লিখে ফেল্লাম। তারপর আরও অনেক কবিতা লিখ্‌লাম, লোকের কাছে কবি ব'লে পরিচিত হ'লাম। আর রাতের পর রাত আমার সেই মধুর স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। যে স্বপ্নে আমার কোন স্থান নেই, আমি দর্শক মাত্র। কবির যেমন মাটির পৃথিবীতে স্থান নেই, সে যেমন দর্শক মাত্র।

জ্যাঠামশায়ের সেই শীতের দেশের মস্ত লাইব্রেরির হাওয়া একটু একটু আমার ছোট ঘরেও বইতো। আমি মনের মধ্যে আশ্চর্য্য শান্তি ফিরে পেলাম। তখন আমার পনেরো বছর না দেখা জ্যাঠাইমার কথা মনে করলাম, আসামের সেই সহরের সীমানায় সেই লম্বা গড়নের বাংলোটা মনে করলাম। তার বাগানের প্রত্যেকটা ফুলের ঝোপ, লতাজড়ানো গাছ মনে করলাম। আমার সেই ছোট ঘরখানা মনে করলাম, রাত্রে শুয়ে সেই বাড়ীর পিছনে নদীর ধারের সরকারী ঘন বনের মধ্যে বাতাস বওয়ার শব্দ মনে করলাম—শোঁ—ও—শোঁ—ও ক'রে একটানা সুরে সরল গাছের লম্বা ছুঁচের মতন পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের শব্দ মনে করলাম। মনে হ'ল রাত্রে সেই জঙ্গলে হুতুম প্যাঁচা, আর শেয়াল ডাক্‌তো। সেখানে এম্‌নি কাগ্‌ ছিলো না, বড় বড় কুচ্‌কুচে কালো দাঁড়কাকরা সরল গাছের উবড়োখেবড়ো ডালে বসে আ—আ আ—আ ক'রে ডাক্‌তো। গত কালকার সারাদিনে কথা যত না স্পষ্ট ক'রে মনে করতে পারি তার থেকেও অনেক বেশী স্পষ্ট ক'রে আমার সেই কবেকার ছোট বেলাকার কথা সমস্ত খুঁটিনাটি শুদ্ধ মনে পড়লো। রান্নাঘরের সাম্‌নে নাসপাতি গাছতলায় চাটাইয়ের উপর সকাল বেলা জ্যাঠাইমা আর আমি দু'জনে মিলে বড়ি দিতাম সেই ডালবাটার সোঁদাসোঁদা গন্ধটা পর্য্যন্ত যেন নাকে এলো। শীতের সন্ধ্যায় মালী শুক্‌নো পাতা জড় ক'রে গাদা করে রাখ্‌তো আর সন্ধ্যে বেলা তাতে আগুন ধরিয়ে দিতো। আমি তার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতাম, মুখের দিক্‌টা আগুনে তেতে লাল হ'য়ে যেতো, কিন্তু পিঠের দিকটা ঠাণ্ডা বরফ হ'য়ে থাক্‌তো তারপর আগুন নিবে যেতো, তবু ছাইয়ের ভিতরে অনেকক্ষণ জ্বল্‌তো; আর আমিও ঘরে যেতাম, কাপড়চোপড়ে একটা পোড়া পাতার গন্ধ লেগে থাক্‌তো। কতদিনকার ভুলে যাওয়া সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে হাত ধোয়া, কন্‌কনে ঠাণ্ডা বিছানায় শোয়া সমস্ত মনে পড়ে গেলো। জ্যাঠামশাইয়ের গলার আওয়াজটা মনে পড়লো, জ্যাঠাইমাকে মনে পড়লো। ভাব্‌লাম কাল জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখ্‌ব।

কিন্তু আমি জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখ্‌বার আগেই জ্যাঠাইমাই আমাকে চিঠি লিখে ফেল্লেন। লিখ্‌লেন—"তোমাকে অনেক বছর দেখিনি, উনি তোমাকে নিজের সন্তানের মতন ভালোবাসতেন সে কথা জন্মে কখনও ভুল্‌বো না। আমার শরীর মন ভেঙ্গে পড়েছে, বোধ হয় আমারও সময় আসে পড়েছে। তার আগে তোমাকে একবার দেখ্‌তে চাই। আমি জানি আমার কাছ থেকে তুমি কিছু আশা কর না, যতদূর জানি তোমার কিছুর অভাবও নেই, তাই আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার ভাইপোদের দিয়ে দিচ্ছি; তা'তে তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হ'বে না এই আমার বিশ্বাস। তবু মারা যাবার আগে তোমাকে একবার দেখ্‌তে চাই। তারপর যদি কোনখানে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের সংগে দেখা হয় তোমার কথা যেন বলতে পারি।"—আমার জন্য নয়, জ্যাঠামশাইয়ের জন্য আমাকে দেখ্‌তে চান। প্রথমটা একটু রাগ হ'ল, তারপর হাসি পেলো, দিব্যি আমার বাপের সম্পত্তিটি গাপ্‌ ক'রে বল্‌ছেন যে তিনি নিশ্চয় জানেন আমি কিছু আশা করি না! তারপর নিষ্ঠাবতী জ্যাঠাইমার পতিভক্তি দেখে—যে পতির মনের বাইরের দরজা অবধিও পৌঁছবার তাঁর ক্ষমতা ছিলো না—তাঁর সেই অটল পতিভক্তি দেখে আমার বৃদ্ধা মূর্খা মূঢ়া জ্যাঠাইমার জন্য আমার সমস্ত মনটা করুণায় ভ'রে গেলো। আমি তখনই যাবার আয়োজন করতে লাগ্‌লাম।

পনেরো বছর আগেকার কথা, অসহ্য রকমের দীর্ঘ পনেরো বছর আগের কথা, আমার কাণকে ঝালাপালা করে দিতে লাগ্‌লো। ভেবেছিলাম আমি বুঝি উদাসীন্‌ হ'য়ে গেছি, নির্ব্বিকার, অনাসক্ত হ'য়ে গেছি কিন্তু পুরোণ জায়গার পুরোণ দৃশ্যগুলো চোখে পড়্‌তেই তখনকার সমস্ত দুঃখ-দুরাশাগুলো আমাকে ঝোঁকে ধরলো। আমি সেই অতি পরিচিত কাঠের সিঁড়ির চারটে ধাপ উঠে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করলাম, জ্যাঠাইমা বস্‌তে বল্লেন। দেখ্‌লাম তিনি অতি বৃদ্ধ হ'য়ে গেছেন, শুকিয়ে ছোটটি হ'য়ে গেছেন, তখুনি, তিনি কিছু বল্‌বার আগে তাঁর সমস্ত অবজ্ঞা অনাদর ক্ষমা ক'রে দিলাম। দেখ্‌লাম ছোটবেলা থেকে সব বিষয়ে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো সে একটা ছায়ামাত্র। যৌবনে কত অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করতাম, জ্যাঠাইমা ও তাঁর হ্যাংলা ভাইপোদের অপদস্থ হওয়ার কত অসম্ভব কল্পনা। আজ তাঁদের প্রতি করুণাপরবশ হ'য়ে গেলাম। যাদের করুণা করা যায় তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা চলে না, তারা আশ্রিতের মতন হয়ে যায়। সেইখানে তখুনি আমার সব অভিমানের অবসান হ'ল; আমার দুর্লভ যৌবন ব্যর্থ ক'রে দেয়ার জন্য

আমার সব অভিযোগের অবসান হ'ল। জ্যাঠাইমা বুড়ী হ'য়ে গেছেন ব'লে আমি তাঁকে ক্ষমা করলাম।

সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখ্‌লাম চিম্‌নিতে একটুখানি কাঠের আগুণ জ্বল্‌ছে, তার পাশে জ্যাঠামশাইয়ের হাতলদেয়া চেয়ারটা তেম্‌নি রয়েছে। সেক্সপীয়র কোলে জ্যাঠামশাইয়ের শেষ দেখার কথা মনে হ'ল। তাক থেকে আধছেঁড়া বইখানা ধীরে ধীরে নামালাম। অম্‌নি তার ভেতর থেকে দুখানা পুরু কাগজ পড়ে গেলো; তুলে দেখ্‌লাম মারা যাবার কয়েকদিন আগের তারিখ দেয়া দু'কপি উইল। জ্যাঠামশাইয়ের শেষ উইল, তা'তে আমাকে দিয়ে গেছেন তিনভাগ আর জ্যাঠাইমাকে একভাগ সম্পত্তি।

আমার মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো, আমার অতৃপ্ত যৌবন অতীত থেকে ফিরে এসে আমার শিরা ধ'রে, স্নায়ু ধ'রে টানা টানি করতে লাগ্‌লো। এর থেকে বড় ব্যর্থতা কী হ'তে পারত? যতদিন পাইনি ততদিন শুধু অভিমান ছিলো, এ যে পেয়েও পাইনি, তাই এমন অন্ধ আদিম হতাশয় আমার সমস্ত হৃদয় মন তোলপাড় হ'তে লাগ্‌লো যে তার কাছে খুন করা, আত্মহত্যা করাও ছেলেখেলা মনে হ'তে লাগ্‌লো।

এমন সময় লাইব্রেরির চারখানা বই-ভরা দেয়াল সরিয়ে দিয়ে, চিম্‌নির আগুনের শব্দ ছাপিয়ে দিয়ে, দেখ্‌লাম শ্যামলঘন পুকুরের জলের ধারে উঁচু শিকড়-বের-করা তেঁতুল গাছ, তার কতকগুলো শিকড় ভিজে ভিজে সবুজ রং ধরেছে, উপর থেকে সবুজ পাতার ছড়া নেমে এসেছে, সবুজ জলে সোনালী রোদ চিক্‌মিক্ করছে, আর মৃদুমধুর বাতাসের একটুখানি শব্দ শুন্‌লাম। যে জল কোথাও নেই, যে সবুজ ভগবানও কল্পনা করেন নি, যে গাছ আজও জন্মায় নি, কখনও জন্মাবে না, আজ আমি তার শীতল ছায়ায় প্রবেশ করলাম, তা'তে আকণ্ঠ অবগাহন করলাম, আমার মুখে, আমার চুলে সেই হাওয়ার ছোঁয়া লাগ্‌লো আমি ত্রস্ত হাতে উইল দুখানা আগুনে ফেলে দিলাম। বুকের মধ্যে হঠাৎ জ্যাঠামশাইয়ের কবিদের সেই অনাসক্তি খুঁজে পেলাম যার জন্য সত্য আর স্বপ্ন জায়গা বদল করে।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
(রবীন্দ্রনাথ)

নূতন ইশ্‌তাহার।

হোস্‌নেআরা বেগম।

রঙিন জগত, নূতন জগত, সৃষ্টি হয়েছে ভাই,
নূতন দিনের দীপ্ত আলোয় ভরেছে ভুবনখানি।
আঁধার পুরীর আগল ভেঙেছে
অন্ধ পেয়েছে আঁখি,
বন্দিনীরা বাঁধন ছিঁড়েছে,
মুক্ত হয়েছে নাকি?
মিথ্যা এসব, কল্পনাসব, স্বপ্ন এসব শুধু
নূতন মন্ত্রে পুরানো দিনের আজিও চলিছে পূজা।
পুরানো ভিত্তি, পুরানো ইটেই গাঁথুনি হতেছে ফিরে,
নূতন দিনের ধ্বংসযাগের অভিনব বলিদান
যত্ন করিয়া পুরাদম দিয়ে
তৈরী হতেছে দেখ।

কাগজের গড়া হাল্কা ফানুষ
কখনও কি দেখিয়াছ?
হাল্কা হাওয়া, পল্কা আগুন সহিতে পারেনা মোটে
একটু পরশে উড়ে যায় দূরে, একটু পরশে জ্বলে।
জীর্ণা ধরণী তেমনি পারেনা সহিতে আঘাত কোনো,
নূতন আলোর একটু পরশে
ধ্বসিয়া পড়িবে জেনো।

ভুবন জুড়িয়া মেঘের মাতন, আঁধারে আগুন ভরা,
মুক্তিপাগল হাঁফাইয়া মরে পায়না পথের দিশা,
আলোর নামেতে আলেয়া কেবল ভ্রান্তি ডাকিয়া আনে—
জীবনের পারে দাঁড়াইয়া দেয় মরণেরে হাতছানি।
পুরানো আচার, পুরানো রীতি নূতনের রঙে রাঙি
জীর্ণ জরায় জিয়াইয়া রাখে মত্ত উল্লাসেতে।

রঙিন জগত, নূতন জগত সৃষ্টি হয়েছে কোথা ?
কোথায় দীপ্ত আলোর মিছিল ? মুক্তি কোথায় ভাই ?
ব্যথার পাহাড়, বাধার শিকল, বেড়িয়া সকল দিকে
বিকল করিছে, পিষিয়া মারিছে.
নিত্য এ ধরণীরে।
সোনালী চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ আজিও যে আসে নাই,
আজো ওঠে নাই প্রভাতী সূর্য্য পূবের আকাশ ফুঁড়ি,
উষার গগনে সোনালী আভাস আজিও যায়নি দেখা,
মুক্তির বাণী হয়নি আজিও রক্ত আখরে লেখা।
ভোরের আকাশ জুড়ে
আজিও বিহগ তোলেনি কাকলি মধুর বেহাগ সুরে।

আলোর পিয়াসী, মুক্তিপিয়াসী মানুষেরা আজ শোনো,
শোনো ভাইবোন সবে,
নূতন কাহিনী, নূতনের গান
মোদের গাহিতে হবে।
বৃদ্ধা ধরণী ধ্বসিয়া পড়িছে শত পাপ অনাচারে,
পঙ্কিলতায় দেহখানি তার হয়েছে দুর্ব্বিষহ।
আজিকে তাহার শেষের সমাধি
আমরা রচিব ভাই—
আমরা আবার গড়িয়া তুলিব নূতন জগত খানি,

নূতন যুগের নূতন সূর্য্য আমরা গড়িব সুখে।
নূতনের আগমনী,
মোদের কণ্ঠে গীত হবে ভাই আবার নূতন সুরে।
অভিমান নয়, অভিযান দিয়ে
জয় করো অনাচারে,
নূতন ধরার সৃষ্টির সুখে মেতে ওঠে দুর্বার,
আলোর যুগের আগম বার্ত্তা লেখা হোক দিকে দিকে,
প্রাচীর শীর্ষে পড়ুক আবার
নূতন ইশ্‌তাহার।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

শ্রীলীলা মজুমদার।

আমরা প্রথমবাবুর জয়ন্তী করলাম, কারণ এক কথায় তিনি একক ও অনন্যসাধারণ। তাঁর জুড়ী মেলা দায়।' পৃথিবীকে দেখবার আর আমাদের এই সভ্যজগতের বেঁচে থাকবার এক-ঘেঁয়ে প্রণালীটাকে দেখ্‌বার ভঙ্গীই তাঁর অভিনব। আর যা দেখ্‌লেন সেটার উপযুক্ত ভাব ও ভাষা আমাদের কল্পনার বাইরে। শুনেছি যোগ সাধনা করলে আত্মাকে শরীরের বাইরে নিক্ষেপ করা যায়, এমন ভাবে যে সূক্ষ্ম চোখ দিয়ে নিজেকে পর্য্যন্ত বাইরে থেকে দর্শন করা যায়। প্রমথবাবুর যে জানা আছে এই নির্ব্যক্তিক হ'বার গোপন মন্ত্র এ আমি বহুবার সন্দেহ করেছি। তাঁর কাছে ছোট ছোট সাধারণ ঘটনা সাধারণ মনের মধ্যে কি আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া করে। জীবনের সাধারণ দিনগুলো হঠাৎ অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। মানবচিত্তের দরজা উদ্ঘাটন ক'রে নিরপেক্ষ দর্শকের মতন সরে দাঁড়ান।

এই ছোট পরিসরে প্রমথবাবুর প্রতিভার প্রমাণ দেব না, তাঁর সাহিত্যের সমালোচনা ও করব না। বল্‌ব না যে তিনি অদ্বিতীয় কারণ চলিত ভাষাকে তিনি সাহিত্যের আসন দিয়েছেন। তাঁর যখন জয়ন্তী করলাম, এ কথা প্রায় প্রত্যেক বক্তাই বলেছিলেন।

এবং আরও বহুপূর্ব্বে যখন আমরা অনেকেই আমাদের কাঁচাবুদ্ধি দিয়েই বঙ্গসাহিত্যের কয়লার' খনিতে' হঠাৎ জহরৎ আবিষ্কার করেছিলাম তখন থেকেই জানতাম। তবে আজ হঠাৎ আমরা আগ্রহে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ছি এই মনে ক'রে যে প্রমথবাবুকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার এমন সোনার সুযোগ আর কবে পাবে? এ জগতে ক'জন মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে দিতে পারে? ক'জনার এমন জাদুকরের হাত আছে যে, যা কখনও হবে না, সাধারণ জীবনে যা হবার নয় কিন্তু সাধারণ জীবনে যা হওয়া অসম্ভব নয়, যদিও সকলেই জানি তা' কোনদিনও হবে না—এমন একটা হওয়া এবং না হওয়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ পরিবেষণ করতে পারে?

মাটির পৃথিবীতে নীললোহিত জন্মায় নি, মাটির মায়ের দুধ কখনও খায় নি, কিন্তু ঐ যে আমাদের মনের পিছনে এই চিন্তা আনাগোনা করে যে, ওর জন্মানোও' অসম্ভব নয়, ওরকমত' হ'তেও পারে, যদিও আমরা জানি যে অমন সৌভাগ্য ক'রে আমরা কেউ আসিনি, তবু ঠিক ঐ কারণে নীল-লোহিত আমাদের কাছে অপরূপ। এবং প্রমথবাবু আমাদের বরেণ্য।

শিশুর খেলা ও খেলনা।

শ্রীমিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়।

সপ্তম ও অষ্টম বৎসর।

এই বয়সের শিশুর কিছুদিন বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কোন কোন বিষয়ে গৃহশিক্ষার চেয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাই শিশুর পরিণতির অধিকতর সুসহায়, তাই কোন উন্নতিশীল বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলে সেটা শিশুর পক্ষে সৌভাগ্য-জনক। প্রথমত, বিদ্যালয়ে শিশুর পরিণতির পক্ষে যথেষ্ট স্থান আর উপযোগী উপাদান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে ওই কাজের জন্য শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পরিদৃষ্ট হয় বলে বিদ্যালয়েই তার বৃত্তিসমূহ শুভতম পন্থায় পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আর একটা মস্তবড় সুবিধা এই যে বিদ্যালয়ে সমবয়সীদের সংস্পর্শে আসার দরুণ শিশুর সামাজিক বৃত্তির উন্মেষ হয়।

প্রথম প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হয়ে শিশুকে সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে হয়না আর যে পিতামাতারা সুবিবেচক তাঁরা বাড়ীতেও তাদের বেশীক্ষণ পড়াননা, কাজেই এরা সুদীর্ঘ অবসর পায় এবং অপেক্ষাকৃত কমবয়সের ছেলেপিলেদের চেয়ে কিছু অন্যভাবে অবসর-বিনোদন করে। এখনও তাদের শারীরিক নৈপুণ্যলাভের প্রচেষ্টা চলে—যদিও কমবয়সের ছেলেপিলেদের চেয়ে অল্প পরিমাণে, এবং এখনও তারা নানারকমের কল্পিত খেলা খেলে—যদিও সে কল্পনা ক্রমশ জটিলতর বিষয়কে অবলম্বন করতে থাকে।

সাতবছরের শিশুও কিছু পড়তে শিখেছে বলে আর শুধু ছবি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেনা, তার এখন লম্বা গল্পওয়ালা বইয়ের দরকার আর ছবির প্রয়োজনীয়তা সেই গল্পগুলিকে উজ্জ্বল করবার জন্য। আগের গল্পগুলির চেয়ে এদের গল্পগুলি বেশী চিত্তাকর্ষকও হওয়া চাই। যে গল্পগুলি শিশুর বাস্তব পারিপার্শ্বিক অবলম্বনে রচিত নয় সেগুলিকে কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন ; কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে যে স্বাস্থ্যবান শিশুর পক্ষে পরী ইত্যাদির গল্প অনিষ্টকর ত নয়ই বরং শিশুর কল্পনাপ্রকাশের সহায়ক।

ছেলেভুলোনো ছড়া ও সুস্পষ্ট মিল ও ছন্দ সমন্বিত কবিতা এই বয়সের শিশুদের খুব প্রিয় হয় এবং বিনা চেষ্টায়, অতি অনায়াসে তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। এগুলির দ্বারাই শিশুর সাহিত্য ও সঙ্গীতের রসবোধের সূত্রপাত হয়। বাজনার মধ্যে ঘণ্টা, ঢোল, ঢাক অথবা লোহার বাজনা প্রভৃতি যেগুলি ঠুকে বাজান যেতে পারে তাই দিয়ে এরা হয়ত তাল ঠুকতে পারবে কিন্তু অন্য কোন বাজনা বাজাবার পক্ষে এরা এখনও বড় ছোট ; তবে সহজ সুরের গানবাজনা এরা মন দিয়ে শুনবে

শিশুদের কাছে, বিশেষত যাদের কল্পনাশক্তি প্রবল তাদের কাছে অভিনয় খুব আনন্দদায়ক। তারা যে কেবল গল্পের বইয়ে পড়া চরিত্রাংশের অভিনয় করবে তা নয়, তারা মৌলিক চরিত্রের সৃষ্টি করে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার অভিনয় করবে। হয়ত মাঝে মাঝে এ চরিত্রগুলি অদ্ভুতও হবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবেনা। অভিনয়ের জন্য সাজপোষাক, রং ইত্যাদি জুগিয়ে তাদের এই স্বাভাবিক শুভপ্রেরণার সহায়তা করতে হবে। এই খেলা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান কেননা এর মধ্যে দিয়ে সে-যে কেবল তার সৃষ্টি প্রতিভা চরিতার্থ করে তা নয়, এর দ্বারা আপনাকে অনাবশ্যক সঙ্কোচ থেকে মুক্ত করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয় ; অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শেখারও এ একটি ভাল উপায়।

এখন শিশুর সত্যকার দায়িত্ব বহন করবার বয়স হয়েছে। স্নান করা, নিজের জুতো পরিষ্কার করা বা সংসারের কোন হাল্কা দৈনন্দিন কাজ নিয়মিতভাবে পালন করবার ভার তাকে দেওয়া উচিত। প্রথম প্রথম তার কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হবেনা বটে কিন্তু ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করলে অল্পদিনের মধ্যেই সে শিখে নেবে। এরদ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে শিশু ক্রমশ কঠিনতর কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে মানবতার দিকে অগ্রসর হবে।

এই বয়সের শিশু সত্যিকারের রান্না করতে খুব ভাল বাসবে। বড়দের কাছ থেকে অল্প সাহায্য পেলে এরা সহজ সহজ ভাজা, বিস্কুট, ফলের মোরব্বা (Stewed fruit) তৈরী করতে পারবে। যে শিশু আনন্দের সঙ্গে এই কাজে যোগ দিতে পারবে না বুঝতে হবে তার বুদ্ধির কোন দোষ আছে।

কিছুদিন আগে আমি ছয়সাত বৎসর বয়সের কয়েকটী শিশুকে ফলের গজা করতে শিখিয়েছিলাম। খুব কড়া চিনির রস করে (যাতে চিনিটা লালচে হয়ে যায়) তার মধ্যে খেজুর, আখরোট কিংবা অন্য কোন মেওয়া ডুবিয়ে নিলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চিনিটা তার উপরে শক্ত হয়ে জমে যাবে। এইটাই ফলের গজা। ছেলেপিলেরা এই গজা খেতে যতটা আনন্দ পেল তৈরী করতে তার চেয়ে বেশী বই কম নয় কয়েকদিন পরে এদের মধ্যে দুটি মেয়ে গল্প করল যে বাড়ীতে এই মিষ্টি করে তারা বাবামাকে খাইয়েছে এবং তাঁরা খুব খুসী হয়েছেন।

জিনিষ তৈরী করবার ও কাজ করবার জন্য শিশুদের অদম্য আগ্রহের চরিতার্থতার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে মা বাপ ও শিক্ষয়িত্রীরা কেবল যে শিশুর আমোদই মাটি করেন তা নয়, নিজেরাও প্রচুর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। শিশুর বিভিন্নপ্রকারের সক্রিয়তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অধিকাংশেরই উল্লেখ করেছি, এখন পিতামাতা শিশুর কাজ করবার ও কৃতকার্যতা লাভ করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য যেন যথাসাধ্য করেন। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, কেননা এতে শিশুর মনে সন্তোষ ও আত্মনির্ভরতা জন্মায় ও ফলত সে অন্যান্য কঠিনতর কাজে হস্তক্ষেপ করবার সাহস পায়।

মুখোস।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

উমার সান্নিধ্য হইতে পলাইয়া চুণীলাল বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে গ্রামের প্রান্তে একেবারে নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন প্রবল বেগে বৃষ্টি হইতেছে। নদীর বুকে বৃষ্টির ধারা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়াছে। বিদ্যুৎ রেখা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। নদীর বাঁধানো সোপানের উপর দিয়া প্রবল জল স্রোত বহিয়া যাইতেছিল, ধপ্ করিয়া চুণীলাল সেখানেই বসিয়া পড়িলেন। মাথার উপরে মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইতেছিল যে বিধাতা বুঝি আজ সুবিচার করিয়া তাঁহার মস্তকে বজ্রপাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই জলপ্লাবিত সোপানের উপরে বসিয়া চুণীলাল বিধাতার দণ্ড মাথা পাতিয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হোক্—আজ তাহার সমুদয় যাতনার অবসান হোক্—এই অধঃপতিত জীবন, এই কলুষিত দেহের আজ অবসান হোক। চুণীলাল আর ইহা বহন করতে পারেন না।

প্রবল বারিপাতের ফলে চুণীলালের উষ্ণ মস্তিষ্ক ক্রমে শীতল হইয়া আসিল। আজ তবে তিনি সত্যই উমাকে দেখিয়াছেন, ইহা স্বপ্ন নয়, সত্য। উমাকে তিনি দেখিয়াছেন জাগ্রত অবস্থাতেই দেখিয়াছেন! উমাকে এ জীবনে তিনি কত রূপে দেখিয়াছেন, কিন্তু আজিকার একি অপরূপ রূপ! সতী যেন কৈলাস হইতে অসহায়া নারীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। কেন চুণীলাল পলাইয়া আসিলেন কেন চক্ষু ভরিয়া দেখিলেন না।

কিন্তু এতদিন তিনি বৃথা ভয় করিয়াছেন উমার প্রেমতো এখনো অটুট আছে। তাঁহাকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যইতো জল ঝড়ের মধ্যে উমা ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উমা তাঁহাকে উপেক্ষা করিল কেন? চুণীলাল আপন মনে হাসিলেন। উমা ছুটিয়া আসিয়াছে শুধু একটি সতী নারীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাহার স্বামীর জন্য নয়। যদি সে স্বামীকে ত্যাগ না করিত, তবে তাহার দণ্ড বিধানে অগ্রসর হইত। কিন্তু স্বামীর কোন কাজেই তাহার বিধি নিষেধ নাই। মলিনার শুভাশুভের জন্যই সে ছুটিয়া আসিয়াছে, স্বামীর শুভাশুভের জন্য একটী অঙ্গুলি উঠাইতেও সে ঘৃণা বোধ করে। চুণীলাল নিঃসন্দেহে

বুঝিলেন যে উমা তাঁহাকে চিরজন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার কাছে ফিরিয়া যাইবার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে দীর্ঘ দিনের মধ্যেও উমার এতটুকুও অবসর ছিলনা। বৃহৎ সংসারের সমুদয় দায়িত্ব তাহার মাথায় ছিল। সেই সমস্ত কাজের অন্তরালে সর্ব্বদাই তাহার অন্তর উন্মুখ হইয়া থাকিত যে কোন্ সময় সে স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করিবে! সেজন্য সকল কাজেই তাহার ত্বরা ছিল। কিন্তু এখন সেই সংসার, সেই কাজ, তবু উমার দিন আর ফুরায় না। সে অবসর পাইয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু সেই অবসরের মধ্যে তাহার আনন্দ নাই।

সকালে স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া উমা ঠাকুর ঘরে যায়, পূজার সমস্ত আয়োজন নিজের হাতে করে। পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিয়া চলিয়া গেলে উমা নিজে আবার পূজা করে। রাধাকৃষ্ণের মনোরম বিগ্রহ মূর্ত্তি। উমা বদ্ধকরে ফুল চন্দন নিয়া মুদিত নেত্রে বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়াছিল। চক্ষুর জলে জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিয়া সে যেন হৃদয় ভার লঘু করিয়া লইতেছিল। সহসা কাহার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। শান্তা ঝি দরজার ফাঁকে মুখ বাহির করিয়া বলিল, "মা হানিফ্ বুড়োকে মেরে খুন ক'রে ফেল্‌লেগো"—

উমা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতের ফুল কক্ষতলেই খসিয়া পড়িল। চোখ্ মুছিয়া সে বলিল "কি হয়েছে রে শান্তা!"

শান্তা যাহা বলিল তাহাতে উমা ভুলিয়া গেল যে সে ঘরের বধূ, যেখানে যাইবে বলিয়া পা' বাড়াইয়াছে সেখানে সে জীবনে যায় নাই, যাওয়া সঙ্গতও নয়। সব ভুলিয়া গিয়া তাহার মনে শুধু এই কথাটাই জাগিয়া রহিল যে ক্ষুধার্ত্ত, নিপীড়িত বৃদ্ধ, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।

চুণীলালের দরবার গৃহ লোকে গম্ গম্ করিতেছিল। জমিদারের আদেশে পেয়াদা গিয়া বৃদ্ধ হানিফ্ মিঞাকে ধরিয়া আনিয়াছে। সে তাহাদের প্রজা। জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন "এর ক'সনের খাজনা বাকি?"

পেয়াদা বলিল "হুজুর, তিন সনের বাকি।"

হানিফ হাত জোড় করিয়া বলিল "কি ক'র্‌মু হুজুর, পরপর চাইর্‌ডা বছর অতিবিষ্টি অনাবিষ্টি হওনে একগোটা ধান গোলায় তুল্‌তে পার্‌লাম না। পোলাপান প্যাটের ক্ষুধায়—" বলিয়া পেট দেখাইয়া কাঁদিতে লাগি।

জমিদার বলিলেন "ওসব প্যান্‌প্যানানি কিছু শুন্‌তে চাইনে। কোলকাতা থেকে নতুন বাইজী আস্‌বে, বায়না গেছে, এক্ষুনি আমার হাজার পাঁচেক টাকা চাই। তুই কত দিতে পার্‌বি?"

হানিফ্ আবার হাত জোড় করিয়া বলিল "পাই পয়সাও দিতে পার্‌মু না হুজুর! পোলাপান দুগা ভাতের লেইগ্যা—" চোখের জলে তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

তখন হুজুর হুকুম দিলেন "বেত মার বেত মারিলে টাকা অবশ্যই বাহির হইবে।"

পেয়াদা সেই ভয়ার্ত্ত বৃদ্ধের পৃষ্ঠে বীরত্বের সহিত বেত্রাঘাত করিল। হানিফ্ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার উপবাসক্লিষ্ট দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। উৎসাহের সহিত আরেকঘা বেত মারিবার জন্য হাত উঠাইয়া পেয়াদা সহসা থমকিয়া অসহায় দৃষ্টিতে হুজুরের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া হুজুর একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া পড়িলেন।

উমা চঞ্চল চরণে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কোনো দিকে না চাহিয়া হানিফের কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল। গরদের আঁচলে তাহার পিঠের রক্ত মুছাইয়া দিয়া তাহার হাতে একগোছা নোট্ গুঁজিয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল "কেঁদোনা, বাড়ী যাও। এই টাকা দিয়ে তোমার স্ত্রী পুত্রকে খেতে দাও গে, তুমিও পেট ভ'রে খাওগে। আমি তোমার গত তিন সনের খাজনা মাপ কর্‌লুম, আসচে পাঁচ সনও তোমার খাজনা দিতে হবে না।"

সেই কোলাহলময় সভাগৃহ নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল। উমার সদ্যঃস্নাত দেবীপ্রতিমার মত মূর্ত্তি, আলুলায়িত কেশের মধ্যভাগে অগ্নিশিখার ন্যায় সিন্দুর রেখা, চন্দন চর্চ্চিত ললাটের সৌকুমার্য্য, অনেকেরই প্রাণ ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সপার্ষদ হুজুর নতনেত্রেই বসিয়া রহিলেন, চক্ষু উঠাইয়া চাহিবার সাহস কাহারো হইলনা।

উমা দরবার গৃহে আসিয়াছে, কক্ষান্তরে একথা নায়েব মহাশয়ের কানে গেলে তিনি বিস্মিত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়া উমার বরাভয়প্রদায়িনী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

হানিফ হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উমার পায়ের উপর পড়িতে গেলে উমা সরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে নায়েব মহাশয়কে দেখিয়া বলিল "নায়েব কাকা, বাইজীর জন্য যে বায়না গেছে যাক্,—আর যে পাঁচ হাজার টাকা হিসেব ধরা হয়েছিল, তাই দিয়ে

এই সপ্তাহে আমি কাঙ্গালী ভোজন করাব। আপনি আয়োজন করুণ” বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল। নায়েব মহাশয়ও বিজয়ী বীরের মত, সেই হীন্ চাটুকারগণের দিকে কৃপা-কটাক্ষ করিয়া বুঝিবা কাঙ্গালী ভোজনের অয়োজন করিতেই প্রস্থান করিলেন।

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া জমিদার বলিলেন “এ সব খবর ভিতরে যায় কি করে? সব আমোদ মাটি! ননসেন্স!”

পার্ষদগণের সব সব তেজ বীর্য্য ও এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। উমাকেও তবু সহ্য যায় কিন্তু ঐ বুড়ো নায়েবের সেই অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি, এ যেন একেবারে অসহ্য! তাহারা আস্ফালন করিয়া বলিল “ঐ বুড়ো নায়েবেরই যত কাণ্ড! ঐ বুড়োই ভিতরে গিয়ে সব বলে। কেন, তুমি কি ওর বাবার টাকায় ফুর্ত্তি করুছ নাকি? কতবার তোমাকে বলেছি ওল্ডফুলকে তাড়াও। তাতো তুমি শুনবে না। এখন ঠ্যালা সামলাও। বোগাস্!”

এত উদ্দীপনাতেও জমিদার নীরব রহিলেন। কাঙ্গালী ভোজনও বন্ধ হইল না। সেই সপ্তাহেই ধুমধাম করিয়া কাঙ্গালী ভোজন হইয়া গেল, আশে পাশের গ্রামে যত দরিদ্র যত কাঙ্গালী ছিল, সকলেই আসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিল। লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে উমাও স্বহস্তে আহার্য্য ও গাত্র বস্ত্র বিতরণ করিয়া স্বামীর অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করিল।

(ক্রমশ)

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

(রবীন্দ্রনাথ)

পরিচয়।

বঙ্কিম-কণিকা—কুমার বিমল চন্দ্র সিংহ, এম-এ, সম্পাদিত।

মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান প্রকাশনী।

বঙ্কিম চন্দ্রের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কিছু পূর্ব হইতেই বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা জাতির সাহিত্যিক উজ্জীবনের সূচনা। এ আন্দোলনে বিমল চন্দ্র সিংহের প্রেরণা ও সাধনার মূল্য সামান্য নহে। তাঁহার "বঙ্কিম-প্রতিভা" জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন, "বঙ্কিম-কণিকা" ও বঙ্কিম-প্রতিভার অনুগামী। এই বইখানিতে বঙ্কিম চন্দ্রের অপ্রকাশিত একটি বাঙ্গালা নাটক এবং হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী ও বাঙ্গালা হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং তাঁহার কর্ম্মজীবনের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের প্রশংসাপত্র সন্নিবেশিত আছে। নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই, সমাপ্তও করেন নাই; কাজেই তাহার সমালোচনা করা সম্ভব নহে,—এবং বোধ হয় বিধেয়ও নহে। কিন্তু প্রবন্ধটি প্রকাশ্য সভায় পঠিত হইয়াছিল; -ভাষার ওজস্বিতার এবং ভাবের তীব্রতায় ইহা অনন্য। হিন্দুকে ও হিন্দুর সংস্কৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র কি দৃষ্টিতে দেখিতেন প্রবন্ধটিতে তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। বইখানি কালোপযোগী; বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কিছু লিখিয়াছেন সকলই এখন বাঙ্গলা-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের চক্ষে বহুমূল্য। এই দিক হইতে লেখক সমগ্র বাঙ্গালার পাঠক সমাজের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ভূমিকায় লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মজীবনীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। এ চেষ্টার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং পাঠক সাধারণকে তিনি অনুগৃহীত করিয়াছেন, ভরসা করি, বঙ্কিমচন্দ্রের লুপ্ত-সাহিত্যের দুর্গম প্রদেশে তাঁহার তীর্থযাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

শ্রীসুকুমারী দত্ত।

বদ্যিনাথের বড়ি—শ্রীলীলা মজুমদার।

বড়রা যে চোখে জগতকে দেখেন সে দৃষ্টি শিশুর নয়। সংসারাভিজ্ঞ, কার্যকাণজ্ঞ, চিত্ত প্রবীণ আখ্যানভাগাগঠনের নিপুণতায়, হাস্তরসের দীপ্তিতে, চরিত্রসৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে শিশুকে যতই চমৎকৃত করুননা কেন তার মনের ছন্নছাড়া ঐশ্বর্যলোকের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকের থাকে। শিশু কোন কিছুর কারণ জ্ঞাত নয় বলে সবই তার কাছে রহস্তময়। মাষ্টার মশায়ের বড়ি খেয়ে বানর হয়ে যাওয়া, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভূতের ছানার হাতছানি দেওয়া, মামাবাড়ীর আদুরে ঘোড়ার হঠাৎ বক্তৃতা দেওয়া এ সব শুধু পরীকাহিনীর রাজ্যের চিহ্নিত ঘটনা নয়, শিশুজগতের প্রাত্যহিক ব্যাপার। শিশু প্রবীণের অপূর্ণ সংস্করণ নয়, সে পরিপূর্ণ শিশুই ; বড়দের নিয়ম কানুন হাবভাব না মানলেও তা নিজস্ব সুচিন্যস্ত ভাব সম্ভার কারো চেয়ে কম নয়। পিসিমার আকস্মিক উদারতায় লজ্জিত হয়ে যাওয়া, অন্ধকার বনের ছায়ায় দুই প্রেতিনীর সহসা পরিচিতা বৃদ্ধাদ্বয়ে পরিণত হওয়া, অশ্বমনস্তত্বের বিশ্লেষণ সেই পূর্ণতার বিভিন্ন দিক। শিশুর মতামতও বড়দের অনুরূপ নয়। পূর্ণ-বয়স্কের কৃত্রিমতা, অন্ধতা ও গতানুগতিকতার মুখোস ভেদ করে শিশুর আদিম বুদ্ধি মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে ও সংসারের মূল্যক্রম উলোটপালোট করে দেয়। সাংসারিকতার ক্রমবর্ধমান কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে স্বভাবের সেই স্বর্গরাজ্যে যে প্রবেশ করতে পারে সে শিশুর দোসর।

মা সন্তানের মন যেমন করে পড়েন তেমন কেউ না ; সেই মা যদি ধী শালিনী ও সহানুভূতিপূর্ণদৃষ্টি হন এবং নিজ শৈশবের অভিজ্ঞতা ও মনোভাবগুলি যদি বয়সের হাত এড়িয়ে অবিকৃতভাবে তাঁর অন্তরে সজ্জিত থেকে থাকে তবে তিনি যেমন করে শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট করতে পারেন "বদ্যিনাথের বড়ি" তে শ্রীলীলা মজুমদার তেমনটি পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়।

মাতৃভূমি—বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা।

কার্যালয়—৪৪নং আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

আজ তিন বৎসর হইল শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দত্তের সম্পাদনায় "মাতৃভূমি" নামক মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, অর্থনীতি,

দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত রচনাদি ইহার বিষয় বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুপ্রভা দেবী, অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সুসাহিত্যিক ও সুলেখকগণ নিয়মিত উপন্যাস, গল্প ও রচনা দিয়া 'মাতৃভূমির' সৌষ্ঠববর্দ্ধনে সহযোগিতা করিতেছেন। ইহাতে শ্রীনীরদকুমার রায় "যুসুফ ও জুলেখা" কাব্যের যে সমালোচনা করিতেছেন তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। মুসলমান কবিবিরচিত লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ, য়ুসুফ-জুলেখা, আমীর হামজা প্রভৃতি কাব্যের সম্যক আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 'মাতৃভূমি' যে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অস্পষ্ট অংশকে সাধারণের গোচরীভূত করিতেছেন ইহা আনন্দের বিষয়।

আসিয়া বেগম।

"নিজেরে হারায়ে খুঁজি"—(গীতা ঘোষ)

মূল্য—১॥৵০ আনা। প্রকাশক – শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার।

৯, মাধব চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

"মেয়েদের কথার" পাঠিকাদের অনুরোধ করি তাঁরা সকলে যেন এই উপন্যাস খানা পড়েন। লেখিকা তরুণী, বইখানা কাঁচা হাতের প্রথম প্রয়াস। কিন্তু আমাদের এই নিশ্বাস-রোধ-করা অগ্রগতির দ্রুত ছন্দের ফাঁকে ফাঁকে কারও যদি খোলা আকাশ আর ঠাণ্ডা জল, আর সবুজ গাছের মাঝে দু'ধারে ধান ক্ষেত-পাতা পিচ্-ঢালা রাস্তার জন্য মন-কেমন করে, তাঁরা এই বইয়ের পাতাগুলোর মধ্যে সেইরকম আরএকটা মনের সন্ধান পাবেন। সহজ কথায় সহজ মনের ভাব প্রকাশ করা এত কঠিন এই জন্য যে ঐ সহজ জিনিষ গুলোকে ছাপিয়ে ভীড় ক'রে আসে শত শত সভ্যতার ইঙ্গিত আর ঐতিহ্যের সতর্ক বাণী। কিন্তু শ্রীমতী গীতা ঘোষ ঐ সহজ হবার রীতিটা ধরে ফেলেছেন তাই যদিও নায়িকার শৈশবের ছবিগুলি অতিরঞ্জিত ও সব সময়ে ঠিক শিশুসুলভ নয়, এবং এই ধরণের আরও ত্রুটি খুঁজলে আবিষ্কার করা যায়, তবু বইখানা সুপাঠ্য।

শ্রীলীলা মজুমদার।

মেয়েদের খবর।

গত ৩০শে আগষ্ট ৩ টার সময়ে আশুতোষ কলেজে নিখিল-ভরত-মহিলা-সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা শাখাসঙ্ঘের ষান্মাসিক অধিবেশন হয়, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন। "সমাজ Service নামক কৌতুক নাটিকার অভিনয়ান্তে হাস্যরোলের মধ্যে সভাভঙ্গ হয়। নাটিকাটি আগামী মাসের "মেয়েদের কথায়" প্রকাশিত হবে।

* * * * * *

গত ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা শাখা সঙ্ঘের ক্লাববিভাগের উদ্যোগে মহিলা শারদ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়ত। ১৩ই সেপ্টেম্বর চৌরঙ্গী ওয়াই, এম, সি, এ হলে "নানান দেশের নারীর কথা" আলোচনা ও রবীন্দ্রনাথের "রথের রশি" নামক রূপক নাট্যের অভিনয় এবং রবিবার, ১৪ই মোহনবাগান মাঠে খেলাধুলার অনুষ্ঠান হয়।

* * * * * *

চাকুরীজীবী মহিলারা যাতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় মাসিক ১০।১১৲ মাত্র খরচে থাকতে পারেন সেইজন্য কয়েকটি মহিলা মিলিত হয়ে ১৬বি, ফার্ণ প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা এই ঠিকানায় "মহিলাভবন" স্থাপিত করেছেন।

আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে।
স্থষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ করে গড়তে—
রেখেছেন আধা আধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথার আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।

(রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের কথা।

অবিচ্ছিন্ন শোকপ্রকাশের ধারার মধ্যে দিয়ে ভাদ্র মাস কেটে গেল। ভারতে বোধ হয় এমন নগর নাই যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের বিয়োগব্যথা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। শুধু ভারত নয়, জগত এই মহাদুর্দিনে মৃত্যুবিভীষিকার মুখোমুখী দাঁড়িয়েও অন্তত একমুহূর্তের জন্যও মহাকবিকে স্মরণ করতে ভোলেনি।

গত শতাব্দীর মধ্যে ভারতের দুইজন মহাপুরুষ জগতকে চমৎকৃত করেছেন; দুইজন মহাপুরুষ পৃথিবীকে বুঝিয়েছেন যে জগত সভায় ভারতবর্ষের যে বিশিষ্ট স্থান এবং দাবী আছে তাকে অবজ্ঞা করা চলে না। একজন ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, অপরজন মহাত্মা গান্ধী। হয়ত এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ভারতের চিত্তকে চঞ্চল করেছেন, জাগ্রত করেছেন বেশী, চালনাও হয়ত তিনিই করেছেন বেশী, কিন্তু তাঁর দান ভারতেতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণের সীমানা পেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্ত সমাহিত সাধনার পথে যে পূর্ণসিদ্ধির মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন তা যুগ ও দেশকে অতিক্রম করে শাশ্বত ধ্রুবনক্ষত্রের মত শুভ্র মহিমায় জাগ্রত থাকবে—"যাবৎ স্থাস্যতি গিরি সরিতশ্চ মহীতলে"।

একজন জাতীয় শক্তিকে জাগ্রত করে উদ্যত করেছেন আর একজন তাকে সংহত করে বিশ্বমানবের দ্বারে অগ্রসর হবার বাণী দিয়ে গিয়েছেন। তাই বলি গান্ধীনেতৃত্বের বিফলতার কথা যদিবা আজ উঠতে পারে, রবীন্দ্রদর্শনের দীপ্তি কে ম্লান করবার মত বাণীর আজও উদ্ভব হয়নি। মানুষের অন্তরাত্মার যে তীব্র ক্ষুধা তাকে—"—লোকে লোকে,

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে"—নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় তার ধ্বনি কবির বীণার সহস্রতারে যেমন পূর্ণতার সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে তেমনি স্পষ্ট হয়েছে তাদের দাবী, জঠরের ক্ষুধা যাদের সমস্ত ইচ্ছা ও কর্মের উত্তেজক। যতদিন বিশ্বের নিভৃততম প্রান্তে পর্যন্ত একটিও বুভুক্ষ থাকবে, যতদিন ধনীর "স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ" না ফেটে পড়বে, যতদিন একজনও সূর্যালোকে বা জ্ঞানালোকের প্রয়াসী বঞ্চিত থাকবে, যতদিন মানবের দেহের ও আত্মার ক্ষুধা থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রয়োজন থাকবে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য প্রমুখ পৃথিবীর সকল ধর্ম-প্রচারকের বাণীই প্রসার লাভ করেছে তাঁদের

তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথের মানব-ধর্মও যে আগামী কালে জগতে গৃহীত হবে এরূপ ভরসা মূঢ়তা নয়, এবং সেই বার্তার বাহক যে ভারতে জন্মাবেন রবীন্দ্রনাথের সে আশা সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।

* * * * * *

শ্রীযুক্ত প্রমথচৌধুরীর জয়ন্তী উৎসব সমাপ্ত হল। দুইদিনব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন সংৰ্দ্ধনা ও অর্ঘদান এবং দ্বিতীয় দিন আনন্দ সম্মেলন শোভনরূপে অতিবাহিত হয়েছিল। বাংলাদেশ যে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে পশ্চাদপদ নয় এ তারই নিদর্শন। আজকের দিনের ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত বাংলাদেশের পক্ষে প্রমথচৌধুরীর ন্যায় শক্তিমান, বিদ্রূপনিপুণ লেখকের কশাতীব্র লেখনীকে সম্মান দেখাবার বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

* * * * * *

মেয়েদের নানা প্রতিষ্ঠানের বিবরণী "মেয়েদের কথায়" বেরোবে বলে জানিয়েছিলাম, সেই প্রসঙ্গে অনুরোধ করছি যে যাঁরা এরূপ সংবাদ প্রকাশ করতে চান তাঁরা যেন বিজ্ঞাপন না পাঠিয়ে সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে পাঠান তবে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়।

* * * * * *

গতমাসের "মেয়েদের কথায়" শ্রীমিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়ের "শিশুর খেলা ও খেলনা" এই প্রবন্ধে একটি ভুল থেকে গিয়েছে। ১৮৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে "ছবি" কথাটার পরিবর্তে "কার্ড" এই শব্দ বসবে।

SAFE DELIVERY

Price Rs 2/8

A remedy for all incidental ailments during advanced stage of pregnancy. It corrects mal position, prevents Eclampsia and ensures easy delivery.

It is a boon to the dyspeptic, anaemic nervous & weak mothers and those who are undergoing the labour for the first time

To be used under direction from the 8th month.

Dr. S. Nag, H.M.B.

8, Nabin Kundu Lane,
CALCUTTA.

"বালিগঞ্জ"

(মাসিক পত্রিকা)

মার্জ্জিত রুচি এবং শিক্ষিত চিন্তাধারার একমাত্র সাহিত্যিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।

মূল্য প্রতিসংখ্যা—।০ বার্ষিক— ৩।০

কার্য্যালয়—১৫নং, হিন্দুস্থান পার্ক

ফোন—পি, কে ২২২৮।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।/০ আনা; যাণ্মাষিক মূল্য ১॥০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸/০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েদের কথা
কার্ত্তিক
১৩৪৮
প্রতি সংখ্যা
হেড অফিস—২১।৩, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

গৃহ-রক্ষা

'গৃহ-রক্ষা'র জন্যই জীবন-বীমা। গৃহ জাতীয় জীবনের প্রকৃষ্টতম প্রয়োজন, পৃথিবীর আশা-ভরসার স্থল। গৃহকে বাঁচাইয়া রাখিবার কাজে যাহার সার্থকতা আছে তাহার প্রভাবও অপরিসীম। যে পরিবার প্রতিপালন করে, সেই-ত সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাহারি চারিদিকে গৃহ-নীড় রচিত হয়। তাহার অভাবে গৃহ সংসার বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু সেই প্রতিপালকের স্থানে জীবন-বীমা সংসার প্রতিপালনের দুরূহ ভার গ্রহণ করে। গৃহ-সংসার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়—জাতীর জীবনের শক্তি অব্যাহত থাকে।

নূতন বীমা প্রায় ৩ কোটি টাকা

মোট চল্‌তি বীমা ১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল	৩ ,,	৫৭ ,,	,,	,,
মোট সম্পত্তি	৪ ,,	৫ ,,	,,	,,
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)	২ ,,	২৫ ,,	,,	,,

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমাপত্র দিতে পারে—

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ্ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্।

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।
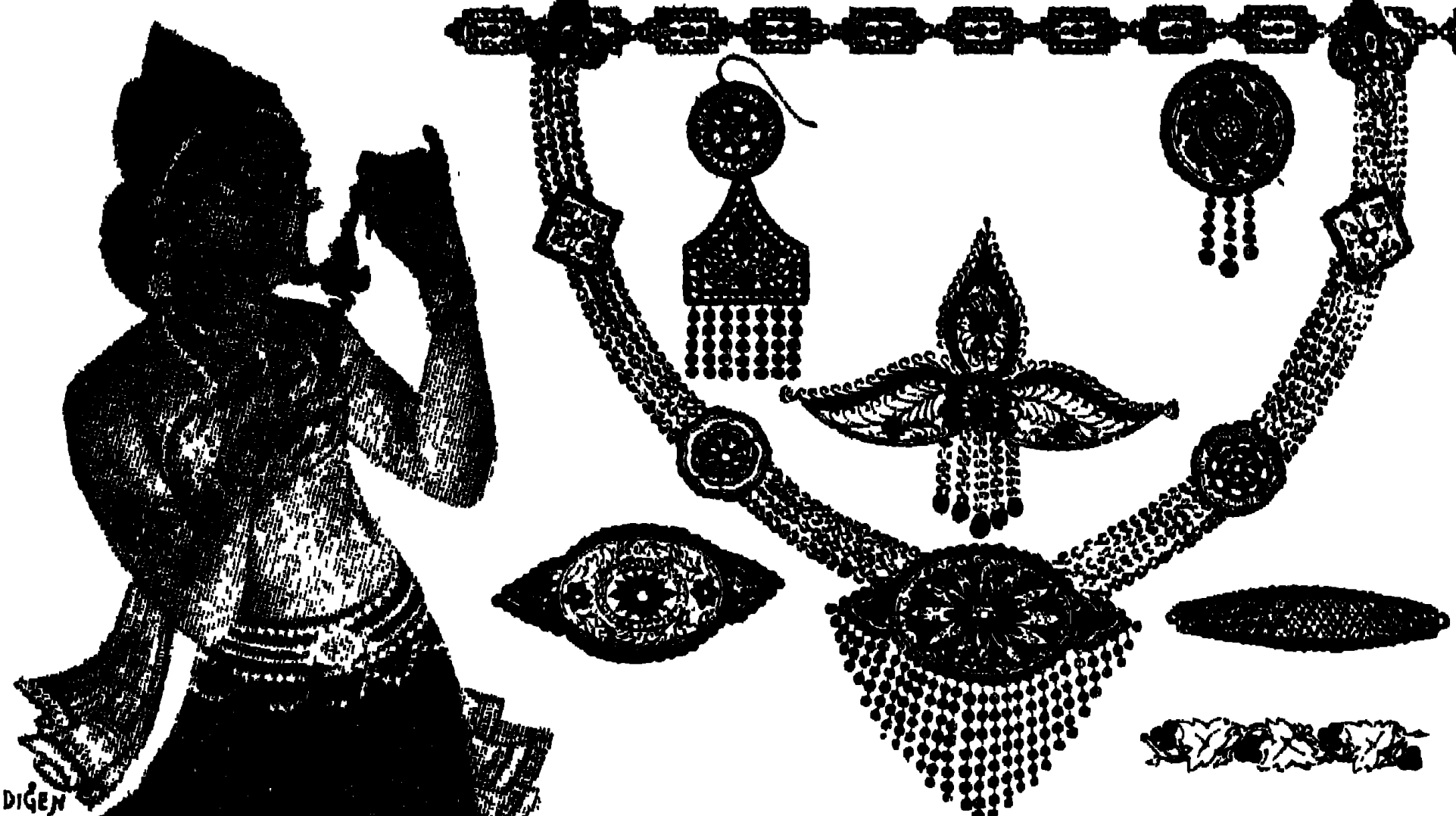
সঙ্গীতযন্ত্র কিনিতে হইলে ডোয়ার্কিনেই কিনিবেন

উহাই আপনাকে যথার্থ সন্তোষ দিতে পারিবে

৫৩ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭৮) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রস্তত একটী হারমনিয়ম পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছিলেন:—আপনাদের "ডোয়ার্কিন ফ্লুট" পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার হাপর অতি সহজেই চালান যায়। ইহার স্বর প্রবল এবং সুমিষ্ট। ইহাতে অল্পের মধ্যে সকল প্রকার সুবিধাই আছে। দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষে আপনাদের এই যন্ত্র যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই যন্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি আমাকে ইহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইবেন।

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি-গীতিমালা, ২য় খণ্ড, ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর বয়সের গান, তাঁহারই প্রদত্ত স্বর, মূল্য ২৲ টাকা। বেহালা, ছড়ি, বাক্স ও প্রাথমিক শিক্ষা পুস্তক সহ ৩০৲

DWARKIN & SON LTD, 11, Esplanade, Calcutta.

বিজ্ঞাপন দাতাদের নিকট আবেদন করিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক 'মেয়েদের কথার' নাম উল্লেখ করিবেন।

সূচি পত্র—কার্ত্তিক ১৩৪৮

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৪৮ | ৭ম সংখ্যা

অতৃপ্ত

শ্রীনিরুপমা দেবী।

তুমি তো দিয়াছ কত কিছু
        তবু তো ভরে না মোর মন
অজানা ব্যথার পিছু পিছু
        কাঁদিয়া ফিরিছে অনুখন !

এত হাসি এত সুধা গান
বুকে ভরা উছলিত প্রাণ
অযাচিত এত প্রেম দান
        ভরিয়া দিয়াছ এ জীবন,
        তবু তো ভরে না মোর মন !

ধন মান যশের বিভব
        আমারে ঘিরিয়া যাহা আছে
কাছে যাহা এল তাহা সব
        তোমারে আড়াল করিয়াছে !

না চাহিতে আমি যাহা পাই
তাহাতে হৃদয় ভরে নাই
না পাওয়ারে তাই শুধু চাই
        তাই মোর বুঝি এ বেদন
        তাই তো ভরে না মোর মন !

আধুনিক মেয়ে ও পিতামাতার শাসন।

(বেতারের সৌজন্যে)

শ্রীলীলা মজুমদার।

সেকালের মুনিঋষিরা বাপকে স্বর্গ ও ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আর বলেছিলেন যে পিতার প্রিয়কাজ করলে সকল দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। এই বিশ্বাসটা এমন কতকগুলি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার গাঁথুনির উপর তৈরী যে সেকালের যে কোন ছেলে কি মেয়ে এর সত্য মিথ্যা বিচার করতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করবার সাহস পেতো না। এমন কি কুড়ি বছর আগেও, আমরা ও আমাদের সমবয়সীরা যখন ছোট ছিলাম, তখনও আমাদের বাবামারা আমাদের বারবার এই শিক্ষা দিয়েছেন যে পৃথিবীর সকল সন্তানদের কর্ত্তব্য চোখকাণ ও সম্ভবতঃ বুদ্ধিও বুজে নীরবে ও নির্ব্বিচারে বাপমায়ের আজ্ঞা পালন করা। তাঁদের আদেশের ও বিচারের ন্যায় অন্যায় ভেদ করতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা ও অত্যন্ত হাস্যকর এবং অমার্জ্জনীয় বেয়াদবি। কারণ তাঁরা আমদের চেয়ে ঢের বড়, অনেক বেশীদিন বেঁচেছেন, কাজেই দেখেশুনে ঠেকেঠুকে অনেক বেশী জানেন। আর সব থেকে বড় কথা, তাঁরা আমাদের মঙ্গল বই আর কিছু চান না, অতএব তাঁদের কথা শুন্‌লে আমাদের ভালো বই আর কিছু হ'বে না। এইখানে তাঁদের যুক্তির একটু খেই হারিয়ে যেতো, কারণ আমার মনে আছে তাঁরা অনেক সময়ে বিখ্যাত ইংরেজ কবি টেনিসনের একটি কবিতার উল্লেখ ক'রে বল্‌তেন যে ঐ কবিতায় একটা সত্য ঘটনার বিবরণ আছে। কেমন ক'রে ছয় শ' সেপাই কাপ্তানের ভুল আদেশ মেনে একেবারে শত্রুর কামানের মাঝখানে পড়ে বিনাশ হ'ল। যদিও তারা জান্‌ত যে সাম্‌নে নিশ্চিত ও নিষ্ফল মৃত্যু, তবুও সেপাইয়ের কর্ত্তব্য প্রশ্ন না ক'রে, উত্তর না দিয়ে নীরবে আজ্ঞা পালন করা। কেন যে তাঁরা এই আদর্শ আমাদের সাম্‌নে ধরতেন, ও জেনেশুনে এমন নির্ব্বোধ ও নিষ্ফল মৃত্যুর যে মাহাত্ম্য কোথায় একথা আজও বুঝ্‌তে পারি নি।

আশ্চর্য্য কথা এই যে ছেলেমেয়েদের বাধ্যতা শেখাবার সময়ে তাঁরা মুনিঋষিদের ও বিদেশী কবিদের সহায় নিতেন, কিন্তু ঐ মুনিঋষিরাই যে আবার সন্তান পালন সম্বন্ধে বলে গেছেন, যে পাঁচবছর অবধি আদর দিতে হয়, দশ বছর অবধি শাসন করতে হয়, পণেরো অবধি শিক্ষা দিতে হয়, এবং তারপর বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে হয়, একথা সেসময়ের বাবামারা একেবারে ভুলে যেতেন। তাঁদের মতে ছেলেমেয়ের নাবালকত্ব এ জীবনে শেষ হয় না; যতদিন বাপমা বেঁচে আছেন ততদিন তাদের নিজেদের ভালোমন্দ বুঝবারও বয়স হয় না; তারা যতই না লেখাপড়া শিখুক, নিজেরা ছেলেমেয়ের বাপমা হোক্, আর যাই হোক্। তাঁদের কথার উপর কথা বলার যো' ছিল না. সে ছিলো জ্যাঠামি ও আস্পর্দ্ধা; তাঁদের কাছে যুক্তি চলতো না. কারণ বাপমা হ'য়ে তাঁরা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তর্কে নাম্‌তে রাজী ছিলেন

না ; ব্যবহারে ও ইঙ্গিতে তাঁরা এক একটি ছোট ছোট ভগবান ছিলেন, যাঁদের প্রশ্ন করা যায় না, আর যাঁদের ইচ্ছা অবশ্য পালনীয়।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ এ নাগপাশ খস্‌তে আরম্ভ করলো ; এখন বরং উলটা ব্যবস্থাতে দাঁড়াবার আশঙ্কা অনেকের মনে হচ্ছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের যে কিছু বল্‌বার যো নেই এ আক্ষেপ আমি বহু বাপমা'কে করতে শুনেছি। অর্থাৎ কিনা আজকালকার ছেলেমেয়েদের এমন কোন আদেশ বা যুক্তি দেওয়া যায় না, যেটাকে তারা এক মুহূর্ত্তে নিজেদের যুক্তিতর্ক দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেলতে না পারে। কিন্তু গোড়ার কথা হচ্ছে বিচক্ষণ বাপমা, যাঁরা সন্তানের মঙ্গলই শুধু চান, তাঁরা এমন কথা বল্‌বেন কেন যেটা যুক্তিতর্কের সাম্নে দাঁড়াতে পারে না। ছোট ভগবানদের কেবল তখনই ভগবানত্ব ঘুচে যায়, যখন প্রমান হয়ে যায় যে তারা অমোঘ ও নির্ভুল নয়।

মানুষের ব্যবহারের ও কাজের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে মাঝেমাঝে মানুষ জানোয়ারের মতন প্রকৃতির বশ হয়, মাঝেমাঝে তার শিক্ষা অনুসারে কাজ করে, মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছা, বুদ্ধি ও বিবেক মেনে চলে। আর মাঝেমাঝে এর একাধিকটা একসঙ্গে জড়িত থাকে, কখন কি জন্য কিরকম আচরণ করছে মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ছাড়া আর কারও বলা কঠিন, এবং তাঁদের মধ্যেও এত মতভেদ যে অকাট্য বলে কাউকে মানা যায় না। তবে এই যে বাপমায়ের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সন্তানকে আজীবন আয়ত্ত রাখবার, এর প্রধান কারণটা বোধ করি আদিম যুগের, যখন মানুষ বাধ্য হয়ে সন্তান ও আশ্রিতদের পশুর মতন অন্যান্য পশুদের হাত থেকে রক্ষা করতো, যখন দল বেঁধে না থাক্‌লে বাঁচা মুস্কিল হ'ত, আর দলপতিকে মেনে না চল্‌লে দলেও বাস করা অসম্ভব হ'ত : বনমানুষদের এখনও যেমন নিয়ম। এই আদিম প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত আছে মানুষের অহমিকা, আমি যা'কে জন্ম দিয়েছি সে চিরকাল আমার। আর আছে অন্ধ স্নেহের অবিশ্বাস। আমি ওকে যতটা ভালোবাসি ও নিজে বোঝে না, ওর জন্য আমি যা করতে পারি, আর কেউ পারে না, ও নিজেও না। ঐ শেষের কথাটা বাপমা ও ছেলেমেয়ের সম্বন্ধটাকে পশুর স্তর থেকে একেবারে কাব্যের স্তরে তুলে দেয় ব'লে বাপমায়ের সঙ্গে সংঘর্ষে উভয় পক্ষই এত দুর্ব্বল হ'য়ে যায়, মনে মনে যে কোন রকমে সকল দ্বন্দ্বই আপোষে মেটাতে চায়। কিন্তু আজকালকার এই পরিবর্ত্তনের যুগে, যখন সামাজিক জীবনের ভিত্তিগুলো অবধি নড়ে গেছে, এখনতো সব সমস্যা আপোষে মেটানো যায়না। আপোষে মেটানো মানেই ভবিষ্যতের জন্য আবার সমস্যাটাকে স্থগিত রাখা, অথচ তার সমাধান এখনই দরকার।

আসল কথা বাপ-মা হওয়া কোনদিনই সোজা কথা ছিলো না, এখন আরও কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কচি অবোধ শিশুকে যেমন যা খেতে দেওয়া যায়, তাই খেতে ভালো লাগলে নির্ব্বিচারে খেয়ে নেয়, আর ভালো না লাগলেই আপত্তি করে ; তেমনি শিশুর শিক্ষার বেলায়ও যা' তার ভালো লাগে সেটা সে খুসি হ'য়ে গ্রহণ করে, যা ভালো লাগে না সেটার বেলায় সাধারণতঃ বিদ্রোহ করে আর যেটা সম্বন্ধে তার কোন মতামত নেই বাপমায়ের মতামতকেই

শ্রেয়ঃ ব'লে ধরে নেয়। তার একমাত্র মাপকাটি হ'চ্ছে ভালো লাগা বা না লাগা। আজকালকার অনেকের মতে ঐ মাপকাটিই যথেষ্ট; শিশুকে সব খাদ্য ও শিক্ষা এমন ক'রে দিতে হ'বে যে তার ভালো লাগবেই, না লেগে উপায় নেই। ওষুধ যেমন তেতো হ'লেই তাকে চিনি মুড়ে গিলিয়ে দেওয়া যায়, শিক্ষাও তেমনি অপ্রিয় হ'লেও তাকে মুখরোচক করা যায়। এর জন্য গল্প, গান, ছবি ছুরী কাঁচি খেলনা সব কিছুর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেটা অপ্রিয়, সেটার অপ্রিয়ত্বটুকু ঘুচিয়ে যদি সমস্ত উপকারটুকুই পাওয়া যায় তবে ক্ষতি কি? এই মতের সঙ্গে সাধারণ স্নেহশীল বাপমায়েরই মত মিলবে, কারণ আদরের ছেলেমেয়েকে দিয়ে অপ্রিয় কিছু করানো যে কি পীড়াদায়ক কর্ত্তব্য সব বাপমাই তা জানেন। কিন্তু শিক্ষার আরেকটা মস্তবড় দিক আছে, যেটাকে প্রিয় ক'রে তোলা ঢের বেশী কঠিন, সেটা হচ্ছে সংযম শিক্ষা। ভোগ করতে শেখা বড় সহজ, বঞ্চিত হ'তে শেখা কঠিন ব্যাপার। সেকালে যেমন তেতো ওষুধ খেয়ে খেয়ে ছেলেমেয়ের ধারণা হয়ে গেছিল যে ওষুধ মাত্রেই তেতো, তেতো ছাড়া ওষুধ হয়না; তেমনি পড়াশুনো সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রায়ই খাটতো; শিক্ষা মাত্রই বিরক্তিকর, কাজেই বিরক্তিটুকুকেও মেনে নিতে হ'বে। কিন্তু আজকাল সেই মনের সংযমটুকু পাওয়া মুস্কিল, যাতে মানুষ কষ্টকে কর্ত্তব্য ব'লে মেনে নিতে পারে। আজকালকার বাপমায়ের এই সমস্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, ছেলেমেয়ে প্রিয় জিনিষ পেয়ে পেয়ে ও প্রিয় কাজ ক'রে ক'রে, অপ্রিয় কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ সংসারে যা ভালো লাগে না তাই যদি বাদ দিয়ে যাওয়া যেতো তবে তো এখানেই স্বর্গ রচনা হ'ত। শৈশবে যদি অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করতে ও কষ্ট সহ্য করতে না শেখা যায়, আর কবে হ'বে? ছেলেমেয়ের চরিত্র স্বাধীনতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ফুটুক, কিন্তু পিতামাতার শাসন সেইখানে এসে পড়বে যেখানে শিশু শ্রেয়কে ছেড়ে প্রিয়কেই শুধু খুঁজবে। ভোগের আর স্বার্থপরতার বীজ একবার অঙ্কুরিত হ'লে তা'কে রোধ করা কঠিন।

আজকাল অনেকে শ্লেষ ক'রে বলেন যে এখন পিতামাতার কোন অধিকার নেই, তাঁরা দর্শক-মাত্র, ছেলেমেয়ে যা' খুসি করছে। এরকম যদি সত্যি কোথাও হ'য়ে থাকে তা' হ'লে সে বাপমা বাপমা হ'বার অযোগ্য। কারণ সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যায় যে যতদিন ছেলেমেয়েরা তাদের নিত্যিকার দরকারের জিনিষের জন্য, তাদের খাওয়াপরা ও রোগে সেবার জন্য বাপমায়ের উপর নির্ভর করছে, তখন তারা কোনদিনও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হ'তে পারে না। তা'দের চলাফেরা সমস্তই বাপমায়ের পর্য্যবেক্ষণের ভেতরেই থাকে। তবে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চায় ও সেই চিন্তা মতন কাজ করতে চাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। এই অবস্থায় যদি দু'জনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন বাপমায়ের কি কর্ত্তব্য? সেকাল হ'লে তাঁরা চোখ পাকিয়ে ধমকে দিতেন, তা'তে না হ'লে প্রহার করতেন, তা'তেও না হ'লে হয় তো খেদিয়ে দেবেন ব'লে ভয় দেখাতেন, সত্যি দিতেন কিনা সন্দেহ। আজকাল এ সব চলে না। চোখ পাকালে তারা উল্টে চোখ পাকায়, ধমকালে ধমকায়, প্রহার করলে,

যেখানে সহানুভূতি পাবে সেখানে পালিয়ে যায় হয়তো, আর যতদিন নাবালক আছে ততদিন আইনমতে বাপমা তা'কে প্রতিপালন করতে বাধ্য। তাছাড়া, বই এ পত্রিকায় ও বক্তৃতায় মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা ও শিশুশিক্ষকরা তুমুল আন্দোলন করছেন যে বেশী বাধা দিলে ও মারলে বড় হ'য়ে ছেলেমেয়ে অস্বাভাবিক পুরুষস্ত্রী হ'য়ে দাঁড়াবে, দেশের ক্ষতি হ'বে। তবে অবাধ্য ও বিদ্রোহী ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপ মা করবে কি ?

এখানে ঐ মুনিঋষিদের পরামর্শ "বন্ধুবৎ আচরয়েত" কথাটার শরণ নিতে হ'ল। শিশুকাল থেকে যদি বাপমা ছেলেমেয়েকে বুদ্ধিমান বন্ধুর মতন যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মানুষ করেন, তা হ'লে সে সব সময়ে সব কথার যুক্তি খুঁজবে এবং পেলে পর সেকথাকে শ্রদ্ধা করবেই।

একথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে সবরকম স্বাধীনতার ঐ দুটো দিক আছে। নিজে স্বাধীন চিন্তা করা, এবং তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ, পরের স্বাধীন চিন্তাকে শ্রদ্ধা করতে শেখা। আমরা যখন আমাদের শিশুদের ছোট বেলা থেকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাব, সেই সঙ্গে তাদের যদি এ শিক্ষাও দিই যে তাদের যেমন স্বাধীন চিন্তার অধিকার আছে, অন্য আর সকলেরও প্রত্যেকেরই তাই আছে, তা' হ'লে তো তা'রা পরের মতামত সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হবে না ; তাদের সহানুভূতি না থাকলেও অসহিষ্ণু হবে না। বাপমায়ের বেলাতেও না। তারা জানবে যে বাবামা আরেক যুগের শিক্ষায় মানুষ, কাজেই কতকগুলো বিষয়ে অমিল হ'বেই। তারা এও জানবে যে তারা বাপমায়ের অধীন, এবং তা'দের কাজের জন্য যতদিন তা'রা নাবালক আছে তাদের বাপমা'কে দায়ী করা হ'বে। যে শিশু ছোটবেলা থেকে পরের মঙ্গলটাও চিন্তা করতে শিখেছে, সে তখন একটু বড় হয়েছে, সে বাপমায়ের দায়িত্বটুকুনও বুঝবে, এবং যতদিন নাবালক আছে বিদ্রোহটাকে মনে মনেই রাখবে, কাজে পরিণত করাটাকে স্থগিত করবে। আর যে শিশুকে ছোটবেলা থেকে স্বাধীনতার এই দ্বিতীয় অঙ্গটা শেখানো হয় নি, সে স্বাধীনতার সংযম শেখেনি, সে যখন বিদ্রোহ করবে কেবল নিজের সুখটুকুই চিন্তা করবে। তাকে নিয়ে অশেষ বিপদ, তা'কে স্বাধীনতা দেওয়া হ'য়েছে ব'লে নয়, তা'কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না শিখিয়ে মোটে আধখানা শেখান হ'য়েছে বলে।

ভয়ের শাসন নির্ব্বুদ্ধিতার শাসন। শাসনকারীর বুদ্ধির পরাজয় স্বীকার, আর যাকে শাসন করা হয়েছে তার বুদ্ধির অপমান। তা'তে বাধ্যতাও শেখানো যায় না, কারণ চোখের আড়াল হ'লেই শিশু অবাধ্য হ'বে! তাছাড়া এর আরেকটা কুফল হ'বে। ঐ সঞ্চিত অপমান বোধ জমে জমে মনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবে। আর যে বাপমা ছেলেমেয়ের মঙ্গলের জন্য তা'র কঠিন শাসন বিধান করছেন, ছেলেমেয়ে তাঁদেরই শত্রু বোধ করবে, তার সুখের পথের বাধা মনে করবে। অধিকাংশ পারিবারিক বিরোধের এই একমাত্র কারণ, দুই বংশের মধ্যে এতো মতভেদ আর মনভেদ যে সদ্ভাব হওয়া অসম্ভব। অথচ দু'জনের মধ্যে নিবিড় স্নেহের সম্বন্ধ। তার ফলে দু'জনই মনে মনে অশেষ বেদনা পায়, অথচ মিলের কোন উপায় থাকে না।

তারপর কৈশোর শেষ হ'য়ে যৌবন আরম্ভ হ'লে বাপমায়ের কর্ত্তব্য আরও কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁরা মনে করেছিলেন সন্তানের একটু বুদ্ধি হ'লে, একটু শিক্ষা হ'লেই তাদের সুমতি হবে। অর্থাৎ কিনা বাপমায়ের মতে চল্‌বে; কিন্তু হয় তার উলটো। সাহসের অভাবে অনেক কাজ কৈশোরে সম্ভব ছিলো না, একটু বয়স হ'লে সেই ভীতিটা চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম অভিজ্ঞতালাভ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, অথচ ভেদবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধি অপরিণত থাকে। বাপ মায়ের সংসারের নানান্ বিপদের কথা জানা আছে, সন্তানের বিপদ আশঙ্কা করে, তাঁরা উদ্বেগে অধীর হ'ন। পদে পদে তাদের খাওয়াপরা চলাফেরা পরিদর্শন করেন। তাদের প্রায় সব বন্ধু বান্ধবকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন, তাদের সমস্ত যাতায়াতের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার গন্ধ পান। সন্তানকে ও তার সদ্‌বুদ্ধিকে যে অপমান করতে চান তা' নয়, তা'র ভালোর জন্য এত বেশী কাতর তাঁরা যে কারু উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। তাঁদের কাছে ছেলেমেয়ে সেই অবোধ শিশুটিই থেকে যায়, তাদের আর বুদ্ধিসুদ্ধি হয় না।

এতক্ষণ আমি ছেলেমেয়ে উভয়ের কথাই উল্লেখ ক'রে এসেছি যদিও আমার বক্তব্য আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধেই। তার কারণ, এতক্ষণ যে সমস্যা গুলোর কথা ব'লে এসেছি সে গুলি ছেলেমেয়ের দুজনের বিষয়েই খাটে। কিন্তু এছাড়াও কতকগুলো বিষয়ে আজকালকার বাপমা'দের ভাব্‌তে হয় যার জন্য তাঁদের কন্যারা দায়ী। প্রথম মনে রাখ্‌তে হ'বে যে বহুশত বৎসর ধরে আমাদের বাংলা দেশে মেয়েদের জন্য অবরোধ প্রথা ব্যবস্থা ছিলো। তার ফলে ভদ্রঘরের মেয়েরা পথে ঘাটে চল্‌বে, কি বায়োস্কোপ থিয়েটারে পুরুষদের সঙ্গে সমানে যাবে, কি সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়বে, কি একাকী ট্রাম, বাস, ট্রেনে চড়বে, কি চাক্‌রী করে টাকা রোজগার করবে; এসব ভয়ঙ্কর কথা আমাদের ঠাকুরদারা শুনলে কাণে আঙ্গুল দিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইএর সময় থেকে আরম্ভ ক'রে এই ক'বৎসরের মধ্যেই এই সবই সম্ভব হয়েছে; কাজেই আর ঠাকুরদাদের মাপকাটি দিয়ে মেয়েদের বিচার করলে চল্‌বে না। এখন আর ঐ সব অধিকার নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না, আধুনিক প্রশ্ন হচ্ছে সকল বিষয়ে ছেলেদের যে নিয়ম খাটে মেয়েদের বেলাতেও তা খাটে কি না। আর বাপমা ছেলেকে যতখানি স্বাধীনতা দেন মেয়েকেও ততখানি দেওয়া উচিত কি না। এ কথার উত্তর দিতে গেলে মনে রাখ্‌তে হ'বে যে মানুষের আচরণের নিয়ম গড়তে গেলে শুধু যে ন্যায় অন্যায় বিচার করলেই হ'ল তা নয়, শোভনতা ও সুরুচির কথাও ভাবতে হ'বে। কারণ আমরা শুধু বাঁচ্‌তে চাই না, সুন্দর ভাবে বাঁচ্‌তে চাই। দ্বিতীয় কথা, পুরুষমানুষ আত্মরক্ষা করতে যতটা সক্ষম, স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েরা ততটা নয়। অতএব আমাদের দেশে যেখানে সামাজিক সংযম এতটা শিথিল সেখানে বিপদকে পরিহার ক'রে চলাই বুদ্ধির কাজ; আমার স্বাধীন যাতায়াতের অধিকার নেই ব'লে নয়; অধিকার আছে বই কি; তবে তার ফলে আমার ক্ষতি হ'তে পারে সেইজন্য; যেকারণে আমি আমার স্বাধীন গতিবিধির অধিকার থাকা সত্ত্বেও

জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিই না সেই কারণেই সাবধান হ'ব। আজকালকার মেয়েদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনেছি তারা নিজেদের অতি খেলো ক'রে দেয়, তাদের কথাবার্ত্তা চলাফেরা বেশভূষার মধ্যে গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব, হাল্কা কথা হাল্কা কাজ, অগভীর চরিত্র। মেয়েদের এ বিষয়ে নিজেদের কি বল্‌বার আছে না জান্‌লেও কতকটা অনুমান করতে পারি। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে জিনিষটার অন্য কোন দোষ নেই কেবলমাত্র দৃষ্টিকটু সেটাও অসুন্দর ব'লে বর্জ্জনীয়। মেয়েদের বাপমাদেরও এটা বোঝা দরকার। তাঁদের মেয়েরা সাবালিকা হ'য়ে, স্বাধীন হ'য়ে যখন লোকনিন্দার পাত্রী হয়, তাঁরাই তার জন্য অনেক পরিমানে দায়ী এ কথা ভুলে গেলে চলবে কেন। সুরুচি বিশাল বটগাছের মতন, কিন্তু তার বীজ অঙ্কুরিত হয় শৈশবে বাপমায়ের হাতে। ছোট বেলায় অসুন্দর কথা ও অসুন্দর কাজ যদি মাপ করে যাওয়া যায়, সে মেয়ের পক্ষে সুন্দর অসুন্দর বিচার করাই কঠিন হয়। তার মায়ের বেলায় বিচার করার কথাই উঠ্‌তো না কারণ তিনি নির্ব্বিচারে আদেশ ও পরামর্শ মেনে চল্‌তেন, আত্মনির্ভর শেখেন নি। এ যুগের মেয়েরা আত্মনির্ভরের গর্ব্ব ক'রে, কিন্তু তার প্রথম পর্ব্ব আত্মটাকে নির্ভরযোগ্য করা। সে একদিনের কাজ নয়, বাপমার দীর্ঘকাল ধরে সাধনা। সব মেয়ে সমান নয়, জন্মগত দোষগুণ সবার আছে, তবে সবাইকেই প্রায় চলন সই ক'রে নেওয়া যায়, ছোটবেলা থেকে প্রত্যেক আলাপের যুক্তি প্রদর্শন ক'রে ক'রে, এটা আমার খুব বিশ্বাস।

বাকী রইলো বাপমাদের প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁরা নিজেদের জীবনটা যেমন ক'রে হোক্ কাটিয়েছেন ছেলেমেয়েদের জীবনটাও যেন তাঁ'রা তা'দের হ'য়ে না কাটাতে চেষ্টা করেন। তা'দের তৈরী করে দিয়ে, তা'দের উপর বিশ্বাস রেখে, ভবিষ্যতের জন্য সাহস রেখে যেন সরে দাঁড়াতে শেখেন। নিজেদের বিশ্বাস, নিজেদের মতামত, নিজেদের অনুভূতি তা'দের জীবনে যেন আরোপ না করেন। তাদের ধর্ম্ম, তাদের চাক্‌রি-বাক্‌রি, তাদের বিবাহাদি এসবই তাদের ব্যাপার। বাপমা পরামর্শ দিতে পারেন বটে, কিন্তু বাধা দেবার কি ক্লেশ দেবার তাঁদের কোন অধিকার নেই, সেটা মঙ্গল কামনা তো নয়ই, নিদারুণ স্বার্থপরতায় দাঁড়ায়। সকল আত্মত্যাগের বড় এই মঙ্গল কামনা ত্যাগ, আর সব থেকে কঠিন। কারণ যেটা বর্জ্জনীয় বলে বুঝলাম সেটা ত্যাগ করাতো সহজ। কিন্তু যেটা আমার ভালো মনে হচ্ছে সেইটা ত্যাগ করা সব ধর্ম্মের চেয়ে কঠিন ধর্ম্ম। আজকালকার বাপমার সাম্নে এই ধর্ম্ম দাঁড়িয়েছে বলে তাঁদের কাজ এত কঠিন ও অপ্রিয়। কিন্তু যে স্নেহের জন্য মানুষ ও জানোয়ার অকাতরে প্রাণ দেয় সেই স্নেহের অসাধ্য কিছুই নেই।

অভিভাষণ *

(অনুবাদ)

শ্রীরুবি সরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে এবছর তোমাদের সম্ভাষণ করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করাতে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিজেকে এই কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করে যে তোমাদের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ ক'রেছি তা' নয়। তোমরা বিদ্যামন্দিরের কিশোরী উপাধিপ্রাপ্তার দল এবং তোমরাই দেশের আশা ভরসা ;—তোমাদের মধ্যে আমি ভবিষ্যত নেতৃত্বের আভাস পেয়েছি তাই এই সম্মেলনে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগে আমি এত বেশী আগ্রহান্বিতা হয়েছি।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত তোমরা এতজন তরুণী বিদ্যামন্দিরোত্তীর্ণা প্রতি বছরের বৃহৎ সংখ্যার একটি ভগ্নাংশ মাত্র—তোমাদের উপাধিপত্র গ্রহণের জন্য একত্র সমবেত দেখে আমি গৌরব বোধ ক'রছি। আজকের অধিবেশনে আমি বর্তমান যুগের অবস্থার সঙ্গে অতীতের আমার শৈশব কালের তুলনা না ক'রে পারছি না। আমরা যখন বালিকা ছিলাম সেই সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার নিয়ে বহু মতান্তর চ'লছিল এবং তখনকার উপাধিপ্রাপ্তা মহিলা জনসাধারণের কাছে বিস্ময়ের বস্তুরূপে দৃষ্ট হয়ে থাকতেন। মেয়েদের বিদ্যামন্দিরে পাঠানকে দুঃসাহসিক কাজ ব'লে পরিগণিত করা হ'ত ; শিক্ষিতা নারীর তো কথাই নাই,—গৃহস্থ যেমন শান্তিভঙ্গের ভয়ে রাজদ্রোহীকে আতিথ্য দান ক'রতে অসম্মত হয় সেই প্রকার সমাজও এই শিক্ষিতা নারীদের গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ ক'রতে রাজী হ'ত না। তা'দের ধারণা ছিল উক্তপ্রকার নারী গৃহস্থের সংসারে খাপ খাবে না। যাঁরা স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী তাঁরাও উত্তেজনা বশে স্ত্রী-শিক্ষা অর্থে গৃহ-সংসারের ভাঙ্গন ভিন্ন আর কিছু কল্পনা ক'রতে পারতেন না। সভা-সমিতি, সংবাদপত্র ও প্রতি গৃহে এই নিয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক হ'ত। স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থিত হ'বে কিনা তাই নিয়ে মহা সমস্যার উদয় হ'য়েছিল। বিগত বিশ বছরের মধ্যে বহু পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে—বর্তমান যুগে সর্বশ্রেণীতে বিশেষতঃ উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থন নিয়ে কোন মতদ্বৈধ হয়নি। আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা সম্বন্ধে এত বেশী রকম উৎসাহী যে শিক্ষা প্রণালীর বহু অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পা'চ্ছে।

সকলেই স্বীকার করেন যে আমাদের দেশে মেয়েদের যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে তা' সর্বোত্তম নয়। পুরুষদের পক্ষে যে প্রকার শিক্ষাধারা আদর্শস্থানীয়, কোন চিন্তা পরামর্শ না

---

* [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে শ্রীমতী শ্যামকুমারী নেহেরুর প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে

ক'রে মেয়েদেরও সেই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রক্ষিপ্ত করা হ'য়েছে, এবং আমরা ভাল ক'রেই জানি যে উপরিউক্ত প্রণালী মেয়েদের তো দূরের কথা এমন কি পুরুষদের অভাব পর্যন্ত দূর ক'রতে কিছুমাত্র কৃতকার্য হয়নি। স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালীতে যে সমস্ত গলদ আছে তা'র হিসাব দিয়ে আমি তোমাদের ক্লান্তি এনে দিতে চাইনা। এই অভাবগুলি এত সর্বজনবিদিত যে নূতন ক'রে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আমি এখানে কার্যিক ইঙ্গিত ক'রে কতকগুলি গঠনক্ষম সমালোচনা ক'রব। খুবই সুখের বিষয় যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী ও অভিভাবকবৃন্দ অসন্তুষ্ট তাই তাঁরা শিক্ষা সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হ'য়েছেন এবং সেই কারণে শিক্ষার কিছু উন্নতি পরিদৃষ্ট হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী অভাব মিটাবার জন্য এই শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হ'য়েছে।

আমার মতে শিক্ষার প্রয়োজন দ্বিবিধ:—প্রথমতঃ প্রত্যেককে উপযুক্ত মানুষ করবার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ তা'কে উপযুক্ত সমাজসেবী ক'রবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে আমি প্রথমোক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ক'রব।

প্রবাদ আছে যে বেঁচে থাক্‌তে হলে নৈপুণ্যের প্রয়োজন। আমাদের জীবন পদ্মপাতায় শিশির বিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এই স্বল্পপরিসর দিনগুলির সদ্ব্যবহার ক'রতে হ'লে তা'রজন্য শিক্ষার আবশ্যক। প্রত্যেকের ক্রমবিবর্তন সম্পূর্ণাঙ্গ হবার জন্য অন্তর্নিগূঢ় অব্যক্ত গুণাবলীর প্রকাশ এবং পরিবৃদ্ধির একান্ত দরকার। শিশু যা'তে তা'র ইন্দ্রিয়ের সঠিক প্রয়োগ ক'রে পড়াশুনা, ভাবনাচিন্তা কাজকর্ম ক'রতে পারে তা'র জন্য তা'র অন্তর্জাত প্রকৃতির উন্মোচন আবশ্যক। শুধু মাত্র বই প'ড়ে পরীক্ষায় পাস দিয়ে এবং স্মরণশক্তির প্রখরতার সাহায্যে তা' হয় না। একমাত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রমাগত পরিশ্রম অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তা' সমাধা ক'রতে পারা যায়। শিক্ষার কার্যিক এবং বাস্তব ব্যবহার করার যদি ইচ্ছা থাকে তাহ'লে শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ক'রতে হ'বে। শিক্ষার সার্থকতার জন্য সর্বপ্রথমে, প্রত্যেককে উপযুক্ত মানুষ হবার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষাধারায় উপরিউক্ত শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও উপযুক্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারেন না। শিক্ষিত উপাধিধারী বেকার যুবকদের মধ্যে নিরানন্দ ও অসন্তোষ এনে দেবার জন্য উক্ত প্রকারের শিক্ষাধারা বহুলাংশে দায়ী। এই কু-ব্যবস্থা ও দুর্ভোগের হাত থেকে ত্রাণ পেতে হ'লে প্রতি ব্যক্তি ভবিষ্যতে যে কর্মপথে প্রবিষ্ট হবে শৈশবাবস্থা হ'তেই তা'র শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু তদুপযোগী হওয়া উচিত। আমার মনে হয় শিশুকে তা'র ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আভাস মুখে মুখে শিশুকাল হ'তেই দেওয়া কর্তব্য এবং ক্রমশঃ কৈশোর হ'তে যখন সে যৌবনে প্রবিষ্ট হ'য়ে উচ্চশিক্ষা প্রয়াসী হ'তে থাকবে তখনও তা'কে এ বিষয়ে সচেতন ক'রে দেওয়া মঙ্গল। পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাবার আশায় অনেকে কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে আন্দাজে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে কিন্তু তা'তে অনেক সময়ে কর্মজীবনে তা'দের

প্রতিহত হ'তে হয়। পাঠজীবনের শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু এরূপে নির্বাচন করা উচিত যা'তে সেগুলি ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সাহায্যকারী হয়।

পুরুষের অনুরূপ নারীরও কর্মময় জীবনের প্রয়োজন আছে, তা' নইলে তা'রা মিতব্যয়ী হ'তে পারে না। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যুবকদের কেরাণীগিরি এবং অধ্যক্ষতাজাতীয় সরকারী কার্যের উপযোগী করে কিন্তু এই শিক্ষাধারার সাহায্যে মেয়েরা শুধু শিক্ষকতা ভিন্ন আর কিছু ক'রতে পারে না। এই পথে কর্মপ্রার্থিনীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'চ্ছে। উপরন্তু অনেকে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত না হ'য়েই এ পথে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ চাকরী করা পছন্দ করে না। তা'দের মধ্যে কয়েকজন লেখাপড়া শেষ ক'রে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপনা করে। নিজেদের পক্ষে এবং যে প্রতিষ্ঠানের অধীনে তা'রা কাজ করে—উভয়ের পক্ষেই এই প্রবৃত্তি সুখ ও মঙ্গলজনক নয়। আমার মতে যে সব মেয়েরা কর্মী হ'তে চায় নির্বাচিত কর্মজীবনকে তাদের আন্তরিক ও বাস্তবিক ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং এজন্য তাদের যথার্থভাবে বিদ্যার্জন করতে হবে। যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করে এই অধ্যাপিকাবৃন্দ শিক্ষাদান করবে সেই বিষয়ে নৈপুণ্য প্রকাশ করতে হ'লে তাদের বিশেষরূপে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আমি জানি যে বিবাহ ও কর্মজীবনের মধ্যে সমন্বয় করা মেয়েদের পক্ষে কঠিন। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপোষে এই সমস্যার মিমাংসা হ'তে দেখা গিয়েছে। আমার মতে সব মেয়েরা যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে নিজেদের জীবিকার্জন করতে পারে তারজন্য তাদের কোন না কোন কাজের উপযুক্ত হ'য়ে থাকা উচিত। আমার কথার অর্থ এই নয় যে সকল পরিণীতা নারীই চাকরী করবে। গৃহস্থালী কাজকর্ম করার মধ্যে কিছুমাত্র অসম্মান নাই। অন্তঃপুরিকারা, যারা অন্তঃপুরের কাজে তাদের সবখানি সময় নিয়োগ ক'রেছে তাদের কাজ বহির্জগতের অন্যান্য কাজের ন্যায়ই প্রয়োজনীয়। বিশ্বদেবের আশীর্বাদী নির্মাল্য বিবাহ,—মেয়েদের স্ব স্ব কর্মপদ্ধতির সঙ্গে বিবাহিতজীবনের কর্তব্যও তাদের সমাধা করতে হবে। তার জন্য একটি জীবনব্যাপী দীর্ঘ নূতন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে। খুবই আনন্দের কথা যে অধুনাতন যুগের নারীশিক্ষার মধ্যে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, খেলাধূলা, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, গান বাজনা, চিত্রাঙ্কণ এবং শিশু পালন (mother craft) বহুলাংশে নারী-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্ভূত হয়েছে। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত বিষয়বস্তুগুলিকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে তার সংখ্যা খুবই অল্প। এদিকে এ পর্য্যন্ত যতদূর মনোযোগ দেওয়া হ'য়েছে তা'র থেকেও বেশী মনোযোগের প্রয়োজন। এই বিষয়বস্তুগুলি সাড়ম্বরে আরম্ভ না হ'লেও সূচনা যে হ'য়েছে তা'ই যথেষ্ট। সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থালী ক'রতে হ'লে উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংসারের পক্ষে শুধুমাত্র সুনিপুণ গৃহস্থালীই যথেষ্ট নয়। প্রবাদ আছে যে বর্বরকে ভোজনে শান্ত রাখা যায় কিন্তু একথাও বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে সাধারণ মানুষ শুধু আহারেই সন্তুষ্ট নয়। সুস্বাদু আহার্য, সুন্দর

আসবাবপত্র, রঙবেরঙের পর্দা প্রভৃতি আবাসগৃহের বাস্তব পরিবেষ্টনীগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু তা র মধ্যে যদি পরস্পরের মিলিত সাহায্য এবং ধীশক্তি না থাকে তা'হলে গৃহ যতই সুন্দর হোক্ না কেন তা'কে প্রাণহীন পটে আঁকা ছবি ব'লে ভ্রম হবে। পরিবারস্থ সকলের সাহায্যে যে সংসার গ'ড়ে উঠে নারীই তা'র প্রকৃত প্রাণদাত্রী। এই প্রাণের স্পন্দন সংসারকে আনন্দময় ক'রে তোলে। এই আবহাওয়ার সৃষ্টি করার জন্য প্রেম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু প্রেমই সর্ব্বস্ব নয়। সংসারে প্রাণের সাড়া পেতে হ'লে মানুষের চরিত্র, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, লৌকিকতার আদান প্রদান প্রভৃতি ভাল ক'রে জেনে রাখতে হবে। এইগুলি অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান দিয়ে অর্জন ক'রতে হয়। বিয়ের আগে মেয়েদের মনস্তত্ব, শিশু-চরিত্র, যৌনবিজ্ঞান ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষের খুব অল্পস্থানেই উপরিউক্ত রীতিতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং স্ত্রীস্বাধীনতার ক্রমবৃদ্ধি এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতিকে আরও প্রয়োজনীয় ক'রে তুলেছে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ ক'রতে না পেরে অনেক স্থানে গৃহবিচ্ছেদ ও অশান্তির সৃষ্টি করে। আমি প্রত্যেক শিক্ষিতা নারীকে মনস্তাত্ত্বিক বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষক গ্রন্থ পাঠ ক'রতে অনুরোধ করি।

প্রাচীনকালে যৌথ পরিবারের বহু অসুবিধা সত্বেও একটা সুবিধা ছিল যে সংসারের সুখ-সুবিধার জন্য অন্তঃপুরিকারা নিঃস্বার্থ ত্যাগ ক'রতে শিখত। কৈশোর হ'তে নিঃস্বার্থ কর্মী হ'তে শিখলে ভবিষ্যৎ জীবনে তা সহায়তা করে। একান্নবর্তী পরিবারে দুঃসময়ে বয়স্কদের কাছ থেকে সদুপদেশ এবং পরিচালনা লাভ করা যায়। বর্তমানে পরিবার ক্ষুদ্রায়তন হ'য়েছে তাই মেয়েরাও তা'দের স্ব-স্ব উদ্ভাবনশক্তির উপর নির্ভর ক'রতে বাধ্য হয়। সেই কারণে পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে স্বতন্ত্র শিক্ষার অধিক প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য প্রত্যেকের কি ধরণের বিদ্যার্জন করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু ব'লতে চাই। পৃথিবীতে কেউ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ক'রতে পারে না। আমরা সভ্যতার এমন একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে জাতীয় একাকিত্ব অসম্ভব। শরীরের সঙ্গে জৈবনিক অংশের যেরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন—জাতির সঙ্গে প্রতি মানুষের সম্বন্ধও তদনুরূপ। সমগ্র দেহের পরিণতির জন্য ক্ষুদ্রতম কোষটিরও স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন। জীবনের মধ্যে জীবনীশক্তি আছে কিন্তু সমগ্র ও আংশিকের প্রাণশক্তি এত নিকট সূত্রে আবদ্ধ যে বাস্তব ব্যাপারে দু'টিকে এক ব'লে ভ্রম হয়। এই কোষগুলির পৃথক পৃথক জীবন থাকলেও সমগ্র দেহের পুষ্টির জন্য এগুলির একটি সম্মিলিত প্রাণ আছে। শরীরের নিরাপত্তা রক্ষা এবং মঙ্গলের জন্য প্রতিটি দেহকোষ নিজেকে উৎসর্গ ক'রে অধীনতা স্বীকার ক'রেছে। মনুষ্যগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরূপ আদর্শে গঠিত। সামাজিক জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনও আছে। সুশৃঙ্খল সমাজে প্রতিবেশীর সুখ-সুবিধার জন্য বেঁচে থাকাকেই মানুষ জীবনের সর্বোত্তম

সার্থকতা ব'লে জ্ঞান করে। অনেক জায়গায় এই নিয়মিতকরণের অভাবে সমাজে অরাজকতা প্রবেশ করে; এই বিশৃঙ্খলাই সমাজের ধ্বংসের কারণ স্বরূপ। এইদিক দিয়ে আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত জীবনাপেক্ষা সমষ্টিগত সামাজিক জীবন অধিক প্রয়োজনীয় তাই সামাজিক জীবন সংগঠনের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা কর্তব্য। মানুষকে সামাজিক জীবন যাপনের উপযুক্ত ক'রে তুলবার জন্য শিশুশিক্ষা পদ্ধতিরও প্রয়োজনানুযায়ী সুব্যবস্থা ক'রতে হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বর্তমান শিক্ষাধারা শিশুশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হ'য়েছে। যদি আমাদের শিক্ষা নিকেতনগুলি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না ক'রত তাহ'লে আমাদের জাতীয় জীবনধারা আরও সুন্দর হ'ত। যে শিক্ষা উপযুক্ত নাগরিক গঠন ক'রতে সক্ষম নয় সে শিক্ষা নিরর্থক। আমাদের জাতীয় জীবনযাত্রা সমৃদ্ধ, আত্মশাসন ক্রমোন্নত এবং দায়িত্ববোধ ক্রমবর্দ্ধমান। অতীত অপেক্ষা বর্তমানে ভারতবর্ষে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সুবিবেচক নাগরিকের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে এই প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের সহায়তা না ক'রে তা'হলে এগুলি অবলুপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমার মতে শিষ্ট অধিবাসীদের সঙ্গে মাতৃভাষার একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। মাতৃভাষায় পূর্ণজ্ঞান না থাকলে কেউ উন্নত ও মার্জিত হ'তে পারে না এবং জনসঙ্ঘের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তাদের তৃপ্ত করাও কঠিন হ'য়ে পড়ে। মাতৃভাষার এই অজ্ঞতা শিক্ষিত ও নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে তা' দুরতিক্রম্য। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের ভাষাজননীর দাবী এ পর্যন্ত অস্বীকার ক'রে এসেছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণবৃন্দ যে অক্ষমতার জন্য স্বীয় মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলতে বা পত্রালাপ ক'রতে পারে না তা' অত্যন্ত মর্মান্তিক। হিন্দিভাষাকে সর্বদেশের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার ব্যবস্থা হ'য়েছে জেনে আমি অত্যন্ত প্রীত হ'য়েছি।

আমি বহুবার যে প্রস্তাব ক'রেছি সেই প্রস্তাবের পুনরুক্তি ক'রে বলছি যে সমস্ত বিদ্যানিকেতনে সামাজিক কাজ শেখানার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কয়েকটি ছাত্র-বিদ্যামন্দিরে কাজ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা' না হওয়াতে দৃষ্টিকটু হ'য়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধীয় বহু কাজ যথা—দরিদ্র বালকদের বস্ত্র নির্ম্মাণ, হরিজনবস্তী পরিদর্শন, নিরক্ষরদের নিকট জগতের সংবাদ পাঠ ক'রে শোনান এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজগুলি অধ্যাপিকাদের সাহায্যে অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। আমি প্রস্তাব করছি যে উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা অন্ততঃ ছ'মাস কোন না কোন বিভাগে অবৈতনিক কর্মীরূপে দেশের কাজ না করলে উপাধিপত্র পাবে না। উক্ত প্রকার কোন পন্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত দেশের নারীকর্মীর অভাব মোচন হবে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সব ত্রুটি আছে তার সংশোধনের জন্য স্বদেশ সেবা অত্যাবশ্যক। দেশ সেবা মানবচরিত্র সংগঠনের সহায়তা করে এবং মনুষ্য হৃদয়ে সহানুভূতি ও বোধশক্তির সমৃদ্ধি করে এবং সর্বোপরি দেশ সেবা ব্রত স্বার্থলেশহীন শ্রদ্ধার উৎপাদন করতে পারে।

বর্তমান শিক্ষা ধারার যে মারাত্মক ত্রুটিগুলি আমার চোখে পড়েছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষ রূপে উল্লেখ করব। শিক্ষিতা মেয়েদের রুচি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। আমাদের দরিদ্র মাতৃভূমির পক্ষে তাদের জীবনধারণের আদর্শ অনুপযোগী। আরাম, আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং সাংসারিক কাজে অসন্তোষের লক্ষণ প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে সুপরিস্ফুট। তার ফলে, যদিও আমরা বিদ্যা, কর্মদক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের রাজ্যে খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছি কিন্তু স্বার্থত্যাগ-শক্তির অভাব আমাদের মধ্যে খুব বেশীরকম দেখা যায়। প্রাচীনাদের তুলনায় আমাদের আধুনিকারা অনেক বেশী আত্মসচেতন ও স্বার্থপর হওয়াতে দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হ'য়েছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ভাগ্যকে রোধ করবার জন্য যে কোন সমাধানযোগ্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রের আবহাওয়া সহজ ও সরল জীবন যাত্রার সমর্থক হওয়া চাই। অল্প আয়ে সংসার চালাবার উপযুক্ত রূপে আমাদের গঠিত হতে হবে কারণ তা'হলে অদূর ভবিষ্যতে যখন ভারতবর্ষের বর্তমান ধনী সম্প্রদায়ের আয় হ্রাস হবে তখন আমরা এই পরিবর্তনের জন্য বেশী কষ্টবোধ করব না। সুতরাং বাঁধাধরা আয়ের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে শিখ্‌তে হবে এবং ছাত্রীজীবন হ'তেই এই শিক্ষালাভ করা বাঞ্ছনীয়।

আমার তরুণী বান্ধবীবৃন্দ! তোমাদের আমি এটুকুন বল্‌তে চাই যে আমার শৈশব যুগের নারীদের অপেক্ষা তোমরা অনেক বেশী সৌভাগ্যবতী। তোমরা শিক্ষালাভের অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়েছ। সীমাবন্ধনের তুলনায় তোমাদের স্বাধীনতার প্রসার সমধিক। যে সুযোগ তোমরা পেয়েছ তার যথাযথ সদ্ব্যবহারের প্রতি তোমরা যত্নবতী হ'য়ো। বৃহৎ অধিকারকে উপযুক্ত কর্তব্য-বোধের সঙ্গে সমাধা ক'রো। তাহ'লে অনাগত ভবিষ্যতে তোমাদের স্বাধীনতা ক্রমবর্দ্ধিত হবে। স্মরণ রেখো স্বাধীনতালাভ অত্যন্ত কঠিন ও দুরুহ। তুমি যদি স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত হ'তে পার তাহ'লেই তা' তোমার সহজলব্ধ হবে এবং স্বাধীনতা পাবার জন্য যদি কঠিন পরিশ্রম কর তবেই তুমি তা' রক্ষা করতে সমর্থ হবে। নিজেকে আবদ্ধ ক'রতে না শিখ্‌লে মুক্ত হ'তে পারবে না। তোমার স্বীয় শক্তির সীমা-রেখা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ো—তাহলেই তুমি অসীমের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে। আদেশ প্রদান করবার পূর্বে তোমাকে আজ্ঞা পালন ক'রতে হবে। সংযত জীবন যাপন ক'রো। ভাবপ্রবণতা ও সংস্কারকে (Catch phrases) জীবনে প্রশ্রয় দিয়োনা। চিন্তা না করে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করো না। কাজ করবার পূর্বে দেখে নিয়ো যে তোমার আরব্ধ কাজের তুমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত কি না।

উপসংহারে আর একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। সাধারণের মধ্যে শাসন একতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিত্রতা ও বিশ্রব্ধতা আনবার জন্য অনুরোধ করা দেশের প্রায় সমস্ত নরনারীর জন্মাগত অভ্যাস। আমার মনে হয় এই অহেতুক উৎসাহ দান গৌরবের নয়। এই ধরণের প্রস্তাব শুনতে পেলে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি।

যখন ভাইবোনদের পরস্পরকে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করবার জন্য উপদেশ বানী প্রচার করেন তা'শুনে আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে আমার একপরিবার অন্তর্ভূত এক মাতৃভূমির সন্তান ব'লে মনে হয়। বংশগত, সভ্যতাগত এবং স্বার্থগত দিক দিয়েও তারা অভিন্ন। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। মূল উৎপাটন না ক'রে শুধুমাত্র পরামর্শের সাহায্যে এই মতবিরোধ দূর হ'তে পারে না। মনপ্রাণ দিয়ে এই মতান্তরের কারণ অনুসন্ধান করতে আমি তোমাদের অনুরোধ করি। শুধু মুখে না ব'লে কাজে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপন কর।

তোমরা হিন্দু মুসলমান পার্শী ও খ্রীষ্টান মেয়েরা সকলে একত্র বসবাস ও পড়াশুনা ক'রেছ। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সখ্য হয়েছে। আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে সহোদর বোনের মতই তোমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছ। তোমাদের প্রীতির বাঁধন যেন অটুট থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখো। তোমরা যেমন পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত সেইরূপ পরস্পরের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বস্ত হ'য়ো। সর্বপ্রথমে, মতান্তরের কারণ অনুসন্ধান ক'রে তা' দূর করবার জন্য আত্মনিয়োগ ক'রো। তোমাদের কর্তব্যপথে যদি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তাতে ভয় পেয়ো না। ভারতবর্ষকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করার ভার তোমাদের উপর রয়েছে। ভারতবাসীকে শক্তিশালী, একতাবদ্ধ, বদান্য, ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত কর। ভারতবর্ষের সমদুঃখভাগিতার আদর্শ যাতে জগতের অনুকরণ যোগ্য হয় তার জন্য তোমরা আত্মনিয়োগ কর।

"পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে,
তব শঙ্খ ধ্বনি বাজে
সঙ্কট দুঃখ-ত্রাতা।
জন-গণ পথ-পরিচায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

রবীন্দ্রনাথ

বিভা...
অবলম্বন
যে সব ত্রুটি
সহায়তা করে...
স্বার্থ লেশ

পিতরৌ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

মোর এই দেহে প্রতি পরমাণু মাঝে
অর্দ্ধনারীশ্বর মূরতিতে কোটি যুগ্মে বিরাজে.
এই জনমের পিতা ও মাতার আত্মজ অনুকণা।
অন্বয়াগত যে জীবনধারা যুগে যুগে অগণনা
শাখা প্রশাখায় প্রাণের গোমুখী হ'তে
এসেছে নামিয়া চির বহমান স্রোতে,
তারি এক ঢেউ মোর পরমায়ু; পতনে ও উত্থানে
চলেছে অসীম প্রাণসিন্ধুর ক্ষিপ্রগ অভিযানে,
ক্রমাভিসারিণী তাহার অগ্রগতি,
ইহ পরকালে লভিবারে চায় নব নব পরিণতি।

দুটি সলিতায় একটি শিখায়
জ্বালি দিয়া মোর ক্ষীণদীপিকায়
যাঁহারা গেলেন চলি,
মুছি এ ধরায় চরণ চিহ্নাবলি,
তাঁদেরে আমার এই দেহমনে ধ্যানে অনুভব করি,
নির্বানপ্রায় প্রদীপে আমার স্নেহ-সঞ্চয় ভরি।
হেরি ঘরে ঘরে শিব শিবানীরে
আর তপোরতা নব গৌরীরে
কুমারী ব্রতের নবীন উদ্বোধনে।
ভ্রাতৃহস্তে যেন বাঁধে রাখি, শৈব-উদ্বাহনে
রক্ত জবার মালা
বীরের কণ্ঠে দেয় যেন বীরবালা।

২৬।৬।৪১

ছদ্মবেশ।

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী।

কাঁচের জানলার মধ্য দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। ভোরের প্রথম আলোয় বরফের পাহাড়গুলি প্রবালের মতন লাল হয়ে ওঠে। নীলার ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে, চিরকালই তার ভোরে ওঠা অভ্যাস, কিন্তু তবু তার নরম লেপটাকে আরো একটু ভাল করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে। কারণ, এখন যে তার ছুটি। গত পাঁচবছর সে রোজ নিয়ম মত ভোর পাঁচটার সময়ে উঠেছে। তারপর একটার পরে একটা কাজ এসে তাকে গ্রাস করেছে, কোথা দিয়ে যে সকাল, দুপুর, বিকেলগুলো কেটে রাত হয়ে গেছে তা সে টেরও পায় নি। কতদিন, যখন সে নাইট স্কুলের পড়ানো শেষ করে একা হেঁটে বাড়ি ফিরে এসেছে, তখন, পথে একটিও লোক চলছেনা, রাস্তার বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে দেখেছে যে বারোটা বেজে গেছে। কোনও মতে জুতো-জামা গুলো খুলে বিছানায় শুতে না শুতে চোখ বুজে এসেছে, কিন্তু মনে হয়েছে যেন ঠিক পরমুহূর্ত্তেই ঘড়িতে তার পাঁচটার এলার্ম বেজে উঠেছে।

কালকেও শুতে রাত বারোটা হয়ে গিয়েছিল। নীলার হাসি পেল—কাল ওরা রাত বারোটা অবধি জেগে তাস খেলেছিল। নীলা অবশ্য দশটার সময়ে একবার উঠবার চেষ্টা করেছিল, বলেছিল যে তার ঘুম পেয়েছে, কিন্তু মিঃ সেন তাকে কিছুতেই যেতে দেয় নি, "আহা, ঘুম তো আপনার পালিয়ে যাবে না, মিস্ গুপ্ত, মনে করুন, আপনাদের কলকাতায় যদি ফিরপোতে নাচ দেখতে যেতেন, তা'হলে কি আপনার এত তাড়াতাড়ি ঘুম পেত? আপনি না থাকলে আমাদের খেলাই জমবে না।"

দশটায় ঘুমোতে যাওয়া তার হয় নি। কলকাতায় "ফিরপোর" সঙ্গে নীলার ঠিক কতটুকু সম্পর্ক তা তো সমীর সেন জানে না! পশ্চিমের এক মস্ত কলেজের অধ্যাপক সে, নামের পেছনে বিলেত থেকে আনা ডজন খানেক হরফ, তার উপর আবার সে মস্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে। জীবনযাত্রা বলতে সে যা বোঝে নীলার জীবনের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নেই। সে চেনে শীলার মতন মেয়েদের, তাদের গায়ে জর্জ্জেটের শাড়ি, পায়ে খুরতোলা জুতো, আর মুখে অফুরন্ত হাসি গল্প। সিনেমা-পার্টিতে গিয়ে রোজ রাত বারোটা অবধি জাগতে তাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই, কারণ ঘুমোবার জন্য তো পরদিন বেলা নয়টা অবধি সময় রয়েছে! নীলাকে এখন দেখলে যদিও তাদেরই একজন বলে মনে হয়, কিন্তু, এ তার ছদ্মবেশ। তবু সে মিঃ সেনের ভুলটা ভেঙ্গে দেয় নি।

যেদিন নীলা দুপুরবেলা ক্লাসের মধ্যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, হেড্ মিস্ট্রেস্ ব্যস্ত হয়ে শীলাদের বাড়ি খবর দিয়েছিলেন, আর শীলা এক নামকরা ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ডাক্তারের গম্ভীর মুখ ও তাঁর কথাগুলি নীলার মনে পড়ল—"দেখুন, আর একসপ্তাহও কলকাতায় থাকা আপনার চলবে না, পাহাড়ে চলে যান। সেখানে খুব খাবেন ঘুমোবেন, হাসবেন, ফুর্ত্তি করবেন, বেড়াবেন। আর দেখুন আপনার এই সব কাজের কথা ভুলেও কিন্তু মনে করবেন না, এ সব কথা কারো কাছে উচ্চারণ করবেন না।"

শীলা তাকে জোর করে দার্জ্জিলিঙে নিয়ে এল, কিন্তু তার বই-খাতা-পত্রের সঙ্গে তার মোটা মিলের শাড়ী গুলিকে কলকাতায় রেখে এল। শীলার ওস্তাদ দর্জ্জি একদিনের মধ্যে তার জন্য সুন্দর সুন্দর জামা সেলাই করে দিল, আর শীলা নিজে পছন্দ করে তার জন্য হালফ্যাশনের ছাতা-জুতো-কোট-ব্যাগ ও নানারঙের বরোদা জরির পাড় বসানো ও জয়পুরী ছাপা সিল্ক ও মহিশূর জর্জেটের শাড়ি কিনে নিয়ে এল। তার উৎসাহের স্রোতে নীলার ক্ষীণকণ্ঠের আপত্তি কিছুতেই টিকলো না। শীলা কৃত্রিম রোষে ভ্রূকুটি করে বলল "চুপ, একটি ওজর শুনবো না। ডাক্তার বাবু কি বলেছেন মনে নেই? শুধু দুমাস তুই আমার চিকিৎসায় থাক—আমি যা করতে বলব তাই করবি, যা পরতে বলব তাই পরবি—তারপর তুই আর নিজেই নিজেকে চিনতে পারবি না"

শীলা তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। মাত্র দুই সপ্তাহ হল তারা দার্জিলিঙে এসেছে, এরই মধ্যে নীলার গালে রক্তের আভা আর চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। রঙীন প্রজাপতির মতন সুসজ্জিতা, সদানন্দময়ী মেয়ে গুলির মধ্যে কলকাতার সেই শাদা শাড়ি পরা, গম্ভীর, কর্ম্মব্যস্ত নীলা গুপ্তকে আর খুঁজে পাবার উপায় নাই।

নীলার এ সব প্রথমে ভাল লাগেনি, নিতান্তই শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ সে শীলার কোনও কাজে বাধা দিতে পারে নি। কিন্তু এখন তার দেহে বল আসার সঙ্গে সঙ্গে মনেও স্ফূর্তি এসেছে। এখন সে বেশ আন্তরিক ভাবেই এই ছুটির দিনগুলি উপভোগ করতে পারছে।

তাদের দুই মাসতুতো বোনের হাবভাব, চালচলন ও জীবনযাত্রার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকলেও ছোটবেলা থেকেই শীলা ও নীলার মধ্যে খুব ভাব। ছোটবেলা থেকেই নীলা পিতৃ-মাতৃহীন। বোর্ডিঙে থেকে সে পড়াশুনা করত আর ছুটিতে শীলাদের বাড়িতে এসে থাকত। তারা দুইবোনে বরাবর একই ক্লাসে পড়ত যদিও নীলা ছিল ক্লাসের সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী আর শীলা কোনও মতে পাশ করে যেত মাত্র। বি-এ, ক্লাসে পড়বার সময়ে নীলা যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গেল, আর জেল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিয়ে, একা কলকাতায় বাসা নিয়ে রইল, তখন অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা তার মুখদেখা বন্ধ করলেও শীলার বাবা-মা-দাদারাই তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। বরং নীলাই তার বড়মানুষি আর বিলাসিতার প্রতি বিতৃষ্ণা বশতঃ এর আগে কখনও তাঁদের বাড়ি এসে থাকতে সম্মত হয় নি। কিন্তু এই ক'দিনের আলাপেই সে বেশ আপনার লোকের মতই শীলার বন্ধুদের দলে মিশে গিয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত তারা হাসি গল্প করে, বেড়িয়ে ও খেলা করে কাটিয়ে দেয়। তারা কোনও কাজ করে না, কোনও গভীর বিষয়ে পড়াশুনা বা আলোচনা করে না। যে নীলা পাঁচবছর ধরে ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম কাজ করে নিজেকে প্রায় মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল, তার এই কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, নিছক আনন্দময় জীবনযাত্রা খুবই ভাল লাগে। যে নীলা দু'সপ্তাহ আগেও কোনও বড়লোক দেখলে দশহাত তফাৎ রেখে চলে যেত, তার আজ শীলার এই অলস, আমোদপ্রিয় বন্ধু-বান্ধবীদেরও খুবই ভাল লাগে। এক পৃথিবীর মানুষ হয়ে সে অন্য এক জগতের স্নেহে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে কেন? তার কি কোনও গূঢ় কারণ আছে? নীলা কিন্তু এত কথা খতিয়ে ভেবে দেখে না। অলস, আনন্দের স্রোতে নিজেকে ঢেলে দিয়ে সে কেবল প্রত্যেকটি রঙীন মুহূর্ত্তকে প্রাণ ভরে

উপভোগ করে। এখন যে তার ছুটি। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োয় সোনালি রঙ্ দেখা দেয়, পরে রোদের আলোয় বরফের পাহাড়গুলি রূপোর মতন ঝকঝক করে ওঠে।

দরজায় একটা মৃদু টোকা দিয়ে শীলা ঘরে ঢুকল। তার পরণে একখানা চীনে ড্র্যাগন আঁকা "ড্রেসিং গাউন", চোখে তখনও ঘুম জড়িয়ে রয়েছে। নীলার খাটে বসে, তার লেপের মধ্যে ঠাণ্ডা হাতদুটো ঘষে ঘষে গরম করতে করতে সে বলল "এই নীলু, ওঠ্. চল্ আজ সেঞ্চল লেকে বেড়িয়ে আসি।"

নীলার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একটা গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে সে খাটে উঠে বসে বলল "সে বেশ মজা হবে!"

শীলা বলল "নির্মল বোস আর বিজয় মুখার্জ্জির গাড়িতে ওরা কাউকে কাউকে নিতে পারবে. অনিল রায় একটা ট্যাক্সি করেছে, তাতে ওরা ভাইবোন, আর দাদা-মেজদা যাবে। সমীর সেন ওর গাড়িতে তোকে, আমাকে আর ছোড়দাকে নিয়ে যাবে। কেমন, পছন্দ হল ব্যবস্থাটা?"

নীলা হেসে বলল "পছন্দ না হবার কোন কারণ তো দেখছি না।"

"তোর সেই সবুজ রঙের ছাপা জর্জেটের শাড়িটা পরিস, তাহ'লে তোর নতুন ছাতা ও জুতোর সঙ্গে খুব সুন্দর মানাবে। আর দেখ্ তোর চুল কিন্তু আজকেও আমি বেঁধে দেব, তুই যে কি একটা টেনেমেনে বড়ি পাকাস, ভাল লাগে না।"

কতকটা তার নিজস্ব সৌন্দর্যের জন্য, আর কতকটা শীলার নিপুণ হাতে সাজানোর গুণে, নীলাকে সেদিন খুবই সুন্দর লাগছিল। সকলেই সেটা লক্ষ্য করে দেখেছিল, কিন্তু একজন হয় তো একটু বেশী। গাড়িতে উঠবার সময়ে সমীর সেনের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে, নীলার গালের রক্তিমাভা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল।

শীলা ছোড়দার হাত ধরে টেনে পিছনের সীটে বসাল।

সমীর বলল "আপনি 'ড্রাইভিং' শিখতে চেয়েছিলেন, মিস্ গুপ্ত। সেকথা আপনি ভুলে গিয়ে থাকলেও আমি ভুলিনি। সামনের সীটে বসুন। যাবার সময়ে আমি সব দেখিয়ে দেব, ফিরবার সময়ে কিন্তু আপনাকে গাড়ি চালাতে হবে।"

নীলা মৃদু হেসে জবাব দিল "বেশ তো, আপনারা তাহ'লে ইষ্টনাম জপ করে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিন।"

শীলা পিছনের সীট থেকে কলরব করে উঠল "না না, সে হবে না মিঃ সেন, নীলু কবি মানুষ, শেষে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাবে আর বেঘোরে প্রাণটা হারাব আমরা।"

সেঞ্চল লেকে গিয়ে তারা দেখল যে অন্যান্য গাড়িগুলো তখনও এসে পৌঁছায় নি। শীলা ছোড়দাকে নিয়ে কোথায় জানি "বুনো ষ্ট্রবেরির সন্ধানে" সরে পড়ল। সমীর আর নীলা বনের মধ্যে একটা রমনীয় নির্জন পথে বেড়িয়ে, বুনো ফুল ও ফার্ণে দুই হাত বোঝাই করে যখন ফিরে এল, ততক্ষণে অন্য সকলে

এসে গেছে। জলাশয়ের ধারে একটা উঁচু ঢিপির ওপর বেঞ্চিতে বসে তারা খাবার আয়োজন করতে আরম্ভ করেছে।

দিনটা খুব চমৎকার কাটল। অনেকক্ষণ সকলে মিলে বেড়িয়ে, হাসি গল্প করে, আবার তারা দুতিন জনের ছোট দল বেঁধে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আবার নীলা দেখল যে সে আর সমীর বাকি রয়ে গেছে।

সমীর স্মিত হাস্যে তার দিকে তাকিয়ে বলল "আমার ভাগ্য দেবতা আজ সুপ্রসন্ন, মিস্ গুপ্ত, আসুন, আমরা খুঁজে দেখি এই লেকের জলের উৎসমুখ কোথায়।"

ঝরণার জলের ধারে ধারে সরু পার্বত্য পথ দিয়ে তারা অনেক দূর গিয়েছিল। অজস্র ফার্ণ্ ও ফুলে ভরা সেই শৈবালাচ্ছন্ন পথ নীলার বড্ড ভাল লেগেছিল। কিন্তু তার চেয়েও ভাল লেগেছিল তার সমীর সেনের সঙ্গ। সমীর পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘুরে অনেক রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে। তার ওপর তার গল্প করবার ভঙ্গিটি ভারি চিত্তাকর্ষক। নীলার কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগে তার গম্ভীর অথচ মিষ্টি গলার স্বর শুনতে আর তার বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল চোখে আলো ছায়ার খেলা লক্ষ্য করে দেখতে।

পরদিন সকালে নীলা বলল "চল আজ দল বেঁধে হেঁটে 'ঘুম' যাওয়া যাক।"

সকলেই উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল। সকাল বেলা তারা হৈ হৈ করতে করতে বেড়িয়ে পড়ল, মধ্যাহ্ন-ভোজনটা সেখানেই একটা হোটেলে সেরে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই দার্জিলিঙে ফিরে এল।

একদিন তারা রাত থাকতে থাকতে বেড়িয়ে পড়ল টাইগার-হিলের শিখর থেকে অদ্ভুত সুন্দর সূর্যোদয় দেখবার জন্য।

কোনও দিন তারা লেবঙ্ যেত ঘোড়-দৌড় দেখতে। কোনও দিন ছেলেমানুষের মতন তাদের সখ হ'ত বার্চহিলের পার্কে বেড়িয়ে ও দোলনায় দুলে সারাটা বেলা কাটিয়ে দিতে।

এই সব আনন্দ অভিযানের মধ্যে সমীর প্রায়ই কোনও না কোনও একটা ছল করে নীলাকে নিয়ে দল ছেড়ে হয় এগিয়ে চলে যেত, তা নয় তো, পিছিয়ে পড়ত। তার এই ছোট ছোট ছল-ছুতোয় নীলা সানন্দে যোগ দিত। না দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর জন্য সে নিজের কাছে কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করত না, চিন্তা-জালে জড়িত হয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাত না। নীলাকে দেখবামাত্র যে আনন্দ সমীরের গলার স্বরে মুখের হাসিতে, চোখের জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ত, নীলার প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরার মধ্যে সেই আনন্দ-স্রোত প্লাবিত হয়ে যেত। সে কোনও কিছু ভাবত না, অনুভব করত।

এমনি করে একটা মাস কোথায় দিয়ে যে কেটে গেল, নীলা বুঝতেই পারল না।

একদিন একটা নির্জন রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে নীলা চমকে উঠল।

"নীলাদি, আরে, নীলাদি ই তো!" হাসতে হাসতে ছোট দুটি মেয়ে ছুটে এসে তার হাত ধরতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল "নীলাদি, ভাল আছেন?"

"আরে জ্যোতি আর শান্তি যে, তোমরা কবে এলে?" নীলা জিজ্ঞাসা করল। "এই দু'তিন দিন হল।"

"জানেন নীলাদি, আমরা অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রথমে আপনাকে চিনতেই পারিনি।"

"আপনি কিন্তু ছুটির আগে আমাদের বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন—"

"সত্যি, নীলাদি আপনাকে তো আর কখনও অসুস্থ হ'তে দেখিনি—এবার কিন্তু আপনি শিগ্গির ফিরে আসুন, আসবেন তো ?"

"জানেন, আপনি চলে যাবার পর থেকে আমাদের সেই ভোর বেলাকার ব্যায়াম গুলো আর নিয়ম মত হচ্ছে না।"

"সেই ছুটির দিনে বস্তিতে গিয়ে মেয়েদের সেলাই আর লেখাপড়া শেখানও বন্ধ আছে। আমরা যেতে চেয়েছিলাম নীলাদি, কিন্তু কোনও টিচার আমাদের নিয়ে গেলেন না।"

"আপনি কবে ফিরবেন নীলাদি ?"

নীলা যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল। এই ক'দিনের মাত্র অদর্শনের পর তার ছাত্রীরা তাকে চিনতে পারল না ? পারবেই বা কি করে—তার সাজ-সজ্জা, চালচলন, কথাবার্ত্তা, এমন কি তার মনের চিন্তাগুলি পর্যন্ত যে একেবারে বদলে গেছে। এটা সে করছে কি ? তার সমস্ত কাজ অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে যে ! কাজের মধ্যে থেকে মাত্র দু'মাসের ছুটি নিয়ে সে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে এসেছিল, যাতে ফিরে গিয়ে কাজগুলি আরো ভাল করে করতে পারে, কিন্তু, এরই মধ্যে নিজেকে সে একেবারে অন্য মানুষ বানিয়ে ফেলেল কি করে ? আর সমীর সেন ? যে বড়মানুষদের সে চিরকাল স্বার্থপর, আত্মসুখ-সর্বস্ব বলে অবজ্ঞা করে এসেছে, তাদেরই একজনের মায়ায় সে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ল কি করে ?

কোনও মতে মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা শেষ করে বিদায় নিয়ে নীলা দেখল যে দলের আর সকলে এগিয়ে অনেকদূর চলে গেছে, কিন্তু সমীর তখনও তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

"ওরা তো এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে মিস্ গুপ্ত, চলুন আমরা ওই রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে যাই।"

নীলা স্বপ্নাবিষ্টের মতন তার পাশে পাশে চলল। নির্মেঘ পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলোয় তুষার-শৃঙ্গগুলি স্বপ্নলোকের মতন সুন্দর হয়ে উঠেছে, দূরে, কালো পাহাড়ের বুকে দু'একটি গ্রামের আলো মিট মিট করে জ্বলছে। কোথায় জানি অজস্র গোলাপ ফুটেছে, সারাটা বাতাস তারই গন্ধে ভরে উঠেছে। কিন্তু নীলার সেদিকে আজ বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য ছিল না। আজ সে নতুন দৃষ্টিতে সমীরের দিকে তাকিয়ে দেখল। সমীরকে তার এত ভাল লাগে কেন ? নীলা ভেবে দেখল যে ভাল লাগবার কোনও কারণ নাই। চিরকালই সে এই অকেজো, বিলাস-লোলুপ বড়লোকগুলিকে আর তাদের সাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে অপছন্দ করেছে। আর, ভাল লেগেও কোন লাভ নাই, কারণ যতই ভাল লাগুক, তার জন্য সে তার জীবনের ব্রত বিসর্জন দিতে পারবে না। সেজেগুজে, হাসিগল্প করে ছুটির কয়েক সপ্তাহ তার ভাল কেটে থাকতে পারে, কিন্তু চিরটা কাল কিছুতেই কাটবে না, কাজের অভাবে সে হাঁফিয়ে মরেই যাবে।

শুধু তাই নয়, তার প্রকৃত পরিচয় পেলে সমীর সেনই কি আর তার দিকে ফিরে তাকাবে! শীলা তো তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে "দেখ্ তোর ওসব ব্যায়াম-শিক্ষা, নিরক্ষরতা-দূরীকরণ আর নাইট্-স্কুল —ওসব নামও এদের সামনে উচ্চারণ করিস না। এরা ওসব বুঝবেও না, পছন্দও করবে না, মাঝখান থেকে তোকেই একটা অদ্ভুত জীব ঠাউরে নিয়ে তোর সঙ্গে আর ভাল করে মিশতে পারবে না।"

একবার সে ভাবল যে সমীরকে সব খুলে বলবে—তার কাজের কথা, তার সব আশাআকাঙ্ক্ষার কথা। একবার সে ছদ্মবেশ খুলে নিজের প্রকৃত রূপ সমীরের কাছে প্রকাশ করবে, তারপর সমীর যা ভাল বোঝে তাই করবে। এত তার জ্ঞান, এত রকম অভিজ্ঞতা, সে কি নীলার জীবনের আদর্শকে বুঝতে পারবে না? বিদ্যার প্রতি নীলার চিরকালই খুব শ্রদ্ধা। নিজে সে এককালে খুবই ভাল ছাত্রী ছিল, যদিও নানান কাজের ভীড়ে কোনও দিন তার ভাল করে পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি। সমীরের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে এত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকটা কি করে এমনিভাবে শুধু হেসে-খেলে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে! আবার ভাবে যে তার মধ্যে আশ্চর্য কিছুই নাই, কারণ, সে যে সমাজের লোক, বিদ্যা-বুদ্ধি তাদের কাছে অর্থোপার্জনের উপকরণ মাত্র।

নীলা যদি নিজের চিন্তায় এত বেশী মগ্ন হয়ে না থাকত, তা'হলে সে বুঝতে পারত যে সমীরকে সেদিন অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর আর চিন্তিত বোধ হচ্ছে।

দু'তিনবার কি জানি কথা বলতে গিয়ে সমীর থেমে গেল। "মিস্ গুপ্ত—দেখুন—আমি—"

"কি বলছেন?" নীলা ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় তার জর্জেটের শাড়ির জরি-পাড় ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। সমীর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল—"এই যে আপনাদের বাড়ি এসে গেল। নমস্কার।" আর কোনও কথা না বলে সে চলে গেল। নীলাও তাকে ফিরে ডাকল না।

ঘরে ঢুকে নীলা দেখে যে তার দাদারা বাড়ি নাই। বন্ধু-বান্ধবেরাও চলে গেছে। কেবল শীলা কোথা থেকে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল—"ঈশ! কি দেরীই করলি তোরা! আমি এদিকে খবরটা সর্বাগ্রে শুনবার জন্য মাথাধরার ছুতো করে একা বাড়িতে বসে আছি!"

নীলা আকাশ থেকে পড়ল—"খবর? কিসের খবর?"

শীলা তার চিবুক ধরে একটা নাড়া দিয়ে বলল—"এতক্ষণ দু'জনে সন্ধ্যেবেলা চাঁদের আলোয় বেড়িয়ে এলি, তবু এখনও সুখবরটা দেবার সময় হ'ল না, এ আমি বললেই বিশ্বাস করব নাকি? বল্ সত্যি কথা —দই সন্দেশের বায়না দেবার সময় হয়েছে?"

"আঃ! কি ফাজলামি করিস! আমার জন্য দই সন্দেশের বায়না কোনও দিনই দিতে হবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। আজ না হোক, কাল যে দিতে হবে সে আমি খুব ভাল করেই বুঝতে পারছি। কিন্তু, তোর এ কিরকম আক্কেল বল্‌তো? ছেলেটাকে দরজা থেকেই বিদেয় করলি কি বলে?"

"ও চলে গেল তো আমি কি করব? সে যাই হোক কিন্তু শোন্, আমি কাল কলকাতায় যাব। আমার শরীর এখন খুব ভাল হয়ে গেছে। আর একদিনও আমি এরকম কুঁড়ের মতন বসে থাকতে পাচ্ছি না।"

শীলা এবার চটে গেল, "ছাখ নীল, তোর মৎলবটা কি সরলভাবে বল্‌তো?"

"তুই তো জানিস, শীলু ,কতরকম কাজ আমি আরম্ভ করেছি—"

"ও সব বাজে কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবি না। তুই কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস যে সমীর তোকে বিয়ে করতে চায় সে কথা আমরা সবাই বুঝতে পারি, আর তুই বুঝিস না ?"

"সমীর যে আমাকে পছন্দ করে সেটা আমি বুঝি বৈ কি, কিন্তু সে তো আর ঠিক আমাকে চেনে না। আমার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পেলে তোদের সোসাইটির মধ্যে এমন পাগল কেউ নেই যে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে।"

"বেশী বাড়াবাড়ি করিস না, নীলু। এতদিন ছেলেমানুষ ছিলি, পাঁচটা হুজুগ নিয়ে নেচে বেড়িয়েছিস, বেশ করেছিস। কিন্তু, এখন নিজের ভবিষ্যতের কথাটাও তো একটু ভাবতে হবে।"

"তুই যেটাকে বাজে হুজুগ বলে মনে করিস আমি সেটাকে তা মনে না করতে পারি তো। তুই যে রকম ভাবে নিজের ভবিষ্যতের কাজ গুছিয়ে নিতে বলছিস সে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। একমাস যদিও তোদের সঙ্গে খুবই ফূর্তিতে কাটালাম। তবু তোদের সোসাইটি'তে বিয়ে করে চিরজীবন ওরকম ভাবে কাটান আমার পোষাবে না। তেলে-জলে কখনও মিশ খায় না শীলু "

শীলা এবার অন্য পন্থা অবলম্বন করল—"লক্ষীটি. তুই একটু ভেবে দেখ্ নীলু। আমি কতদিন থেকে কত আশা করে বসে আছি।"

"তোর কথা রাখা যে সম্ভব নয় ভাই !" নীলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

সেটাকে শুভলক্ষণ বলে ধরে নিয়ে শীলা আরো মিনতি করে বলল "কেন সম্ভব নয় ? সমীরকে তোর পছন্দ হয় না বলতে চাস ? ওর মত ভাল ছেলে আর কোথায় পাবি ? যেমন বিদ্বান, তেমনি বড়লোক, দেখতে যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও চমৎকার। ওর দিকটাও একটু ভেবে দেখ্—ও তোকে এত পছন্দ করে।"

নীলা শক্ত হয়ে বলল "অমন সুপাত্রের জন্য বাঙ্‌লা দেশে পাত্রীর অভাব হবে না। যে কোনও দিন ইচ্ছা ও 'রাজকন্যা' ও তার সঙ্গে 'অর্ধেক রাজত্ব' পেতে পারবে।"

"তোর কথার ছিরি শুনলে রাগ ধরে নীলু ,পরে তোকে এর জন্য দুঃখ করতে হবে বলে দিচ্ছি।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী দুঃখ করতে হ'ত যদি বড়মানুষের বউ হবার লোভে আমার কাজকর্ম সব বিসর্জন দিতাম।"

এর পরে শীলা এত চটে গেল যে সে নীলার সঙ্গে আর কথাই বলল না। পরদিনও সে নিঃশব্দে নীলার যাবার ব্যবস্থা করে দিল। বিদায় নেবার সময়ে নীলা তাকে আদর করে বলল "তোদের বাড়ি থেকে আমি নতুন লোক হ'য়ে গেলাম শীলু , লক্ষীটি তুই আমার ওপর রাগ করে থাকিস না " শীলা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল "একশো বার রাগ করব। তোর সঙ্গে আমার জন্মের মত আড়ি।"

নীলা একটু হাসল, শীলার রাগ যে রূত ক্ষণস্থায়ী তা সে খুব ভাল করেই জানে।

গাড়ি ছাড়বার পর সে একটা পরিচিত হস্তাক্ষরে তার নাম লেখা খাম ব্যাগ থেকে বার ক'রে কম্পিত হস্তে খুলে ফেলল। চিঠিতে মাত্র কয়েকছত্র লেখা ছিল—"সুচরিতাসু, হঠাৎ দার্জিলিঙ্ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনাদের সাহচর্যে এই আনন্দের দিন গুলি আমার চিরকাল মনে থাকবে। যদি কোনও অন্যায় করে থাকি তা'হলে মার্জনা করবেন। ইতি সমীর সেন।"

নীলা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু তবু তার মনের মধ্যে কোথায় একটা দুঃখ কাঁটার মতন বিঁধে রইল।

আগের মতন নীলা এখনও রোজ ভোর পাঁচটার সময়ে ঘুম থেকে ওঠে। সূর্য ওঠবার আগে সে তার ছাত্রীদের নিয়ে স্কুলবাড়ির তিন তলার ছাদে ব্যায়াম করে। আজকাল তার ছাত্রীরা ছাড়াও পাড়ার অনেক গুলি মেয়ে, এমন কি দু'চারটি ছেলেমানুষ বউ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।' তবু নীলার মাঝে মাঝে বড্ড কুঁড়েমি লাগে, কিছুতেই তার ভোর বেলা এলার্ম শুনে ঘুম থেকে উঠতে ভাল লাগে না। দশটা থেকে চারটা অবধি স্কুলে পড়ানোর কাজ আর তার ভাল লাগে না—সেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা—সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই জিনিষ পড়িয়ে যাওয়া—তার মনে হয় এর চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু হ'তে পারে না। যে নীলা কয়েকমাস আগে পর্যন্ত অসীম ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গে হাসিমুখে মেয়েদের একবার ছেড়ে দশবার পড়া বুঝিয়ে দিত আজকাল তার মেয়েদের বোকামিতে রাগ হয়ে যায়. তারা পড়া বুঝতে না পারলে সে ধমক দিয়ে বসে। কিন্তু তবু বড় ক্লান্তি আসে, ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসতে চায়। এই ক্লান্তি জিনিষটা তার কাছে নতুন অথচ শরীর এখন তার যথেষ্ট ভাল আছে।

সিল্ক-জর্জেটের সাড়িগুলো সে আর পরে না—কিন্তু তবু বাক্সের মধ্যে সেগুলিকে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। একঘেঁয়ে বিশ্রামহীন কাজের মধ্যে তার স্বপ্নের মতন মনে পড়ে দার্জিলিঙের সেই নিরবচ্ছিন্ন ছুটির দিনগুলি, সেই তুষারশৃঙ্গ শৈলমালা, বার্চ ও পাইন বনের মধ্যে মনোহর পাহাড়ে রাস্তা, সেই হাস্য-মুখর বন্ধুর দল, সমীর সেন। জোর করে সে নিজেকে বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়ে আনে, কিন্তু মনে হয় যেন তার এত সাধের কাজগুলি সব বিস্বাদ, নিরর্থক হয়ে গেছে। নিজের ওপর রাগ করে সে আরো নির্মমভাবে নিজেকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করায়।

জন-শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিভিন্ন সঙ্ঘের মিলিত উদ্যোগে মস্ত এক সভা আহূত হয়েছে। অনেক দেশ থেকে বড় বড় বক্তা ও কর্মী এসেছেন, সেই সভায় যোগ দিতে। তার ক্ষুদ্র সমিতির পক্ষ থেকে নীলাও এসেছে।

হঠাৎ এক বহুপরিচিত কণ্ঠ-স্বরে সে ফিরে তাকাল "একি, মিস্‌গুপ্ত, আপনি এখানে? আমি যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছু মনে করবেন না একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আজকাল কি জর্জেট পরার ফ্যাশন উঠে গিয়েছে? কিম্বা আপনি কি ছদ্মবেশে বেরিয়েছেন নতুনত্বের সন্ধানে? একটা খটকা আমার মনে রয়ে গেল যে—আপনি ঠিক আপনিই তো?"

নীলাও তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার পাশে দাঁড়িয়ে সমীর সেনই বটে—তবে দার্জিলিঙের সেই সাহেব মিঃ সেন নয়—তার পরণে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, মুখের হাসিতে কি একটু বিদ্রূপের চিহ্ন?

নীলা বলল "আমিও তো আপনাকে ঠিক সেই প্রশ্নই করতে পারি। আমিও যে বুঝতে পারছি না আপনি সত্যিই আপনি কি না!"

কিন্তু সভার কাজ আরম্ভ হ'লে পর তারা দুজনেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল।

প্রথম দিকেই ডাক পড়ল সমীরের—তার নিজের মুখেই নীলা শুনল যে সে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ গুলিতে ঘুরে বিশেষভাবে তাদের গণশিক্ষার প্রণালী ভাল করে জেনে এসেছে। তার নবলব্ধ জ্ঞানের

সাহায্যে সে ভারতবর্ষে গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে. শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে চায়। কিন্তু, এ কাজ অতি কর্মসাধ্য,—কর্মীর একান্ত অভাব—।

নীলার মনে হল যেন শেষের কথাগুলি সমীর বিশেষ করে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে।

ঘনঘন হাততালির মধ্যে সমীর যখন আবার তার পাশে এসে বসল তখন উৎসাহে নীলার চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে, "আশ্চর্য লোক আপনি সমীর বাবু, কই এসব কথা তো ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন আমাদের বলেন নি!"

"যস্মিন দেশে যদাচার নীলা দেবী। ওদের সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন আমোদ করে আসা যায়, কিন্তু ওদের সঙ্গে কি কোনও কাজের কথা চলে? আমার আসল পরিচয় পেলেন তো? উঠুন এবার আপনার পালা—।"

নীলা কম্পিত বক্ষে ধীরে ধীরে বক্তার মঞ্চে উঠে দাঁড়াল। সমীরের মতন বাগ্মীতা তার ছিল না। কিন্তু সংক্ষেপে অথচ সুন্দর ভাবে তার কাজের কথা সে বলে গেল। সে বলল যে তার বহু কষ্টে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান গুলি এখন নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু কতটুকুই বা সেই কাজগুলি, সে চায় নিজের কাজের প্রসার বাড়াতে।

সভা ভঙ্গ হলে পর সমীর বলল "বিশেষ করে আজকের সভাতে দেখা হওয়াতে আমাদের পরস্পরের কাছে অনেক কৈফিয়ৎ দেবার পরিশ্রম বেঁচে গেল নীলা দেবী। কিন্তু তবু আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা আছে। আপনি একটু আমার সঙ্গে বেড়াতে আসতে পারবেন কি?

নীলার মনে পড়ে গেল যে তার নাইটস্কুলের কাজ আছে। কিন্তু নাইট স্কুলের কাজ তো রোজই আছে, তাই সে হেসে সম্মত হল।

কিন্তু "দরকারি কথা" সেদিন তাদের বলা হয়ে উঠল না। ময়দানের নির্জন প্রান্তে বেড়াতে বেড়াতে অনেক তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা তারা বলল। কিন্তু যে কথাটা তাদের দুজনেরই সমস্ত মনের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল, সেটা কেউই মুখে প্রকাশ করল না, কারণ ভাষায় সেটাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা দু'জনের কাছেই বাহুল্য বলে মনে হ'ল।

সমীর বলল "আপনার ওপর দার্জিলিঙে আমার খুব রাগ হয়েছিল নীলা দেবী। কেবল ভাবতাম আপনার মতন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মেয়েরা কি করে কেবল সেজেগুজে, আর হেসে খেলে সারাজীবন কাটাতে পারেন।"

"আর আমার বুঝি আপনার উপর রাগ হয়নি! আমি ভাবতাম যে আপনাদের লেখাপড়া শেখাই বৃথা, আপনাদের সমাজে মান-সম্মান সবই তো নির্ভর করে কেবল টাকার থলির ওজনের ওপর।"

সমীর হাসতে হাসতে বলল "বেশ তো, দু'জনেই দু'জনকে ঠিক এক ভাবে ভুল বুঝেছিলাম, শোধ বোধ হয়ে গেল।"

পরমুহূর্তেই সে গম্ভীর হয়ে নীলার দিকে ফিরে বলল, "কিন্তু কেন আমি ওরকম অভদ্রের মতন আপনাদের সঙ্গে দেখা না করেই দার্জিলিঙ্ থেকে চলে এলাম জানেন?"

নীলার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। তবু সে সমীরের চোখের দিকে চোখ তুলে বলল "জানি, কারণ আমিও ঠিক সেই দিনই দার্জিলিঙ্ ছেড়ে চলে আসি, এবং সেই একই কারণে।"

মুখোস।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

এইভাবে উমা দুইহাতে স্বামীর অপরাধের কালিমা মুছাইয়া দিতে লাগিল; তাহার লক্ষ্যহীন জীবনে লক্ষ্য ফিরিয়া আসিল। যেদিন হইতে সে স্বামীর ভালবাসা হারাইয়াছিল, সেদিন হইতে মৃত্যুই তাহার একমাত্র কাম্য হইয়াছিল। ভাবিত, জীবনের সাধ তো ফুরাইয়াছে, এখন যদি মরণ আসে, মার কাছে চলিয়া যাইব। সংসারে আমার প্রয়োজন যখন ফুরাইয়াছে, তখন অনাবশ্যক জঞ্জালের মত সংসার আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকি কেন? দারুণ অবসাদে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কাকীমা, পিসীমা প্রভৃতি যেসব আত্মীয়া তাহাদের সংসারে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহারা এতদিন উমার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এখন তাহারা "বৌমা, ডাক্তার দেখাও, দেহ তো তোমার গেল" এম্‌নি দু'একটা ধর্ম্মের ডাক দিয়াই নিজেদের পূজা-আহ্নিক প্রভৃতি পারমাথিক কাজে মনোনিবেশ করিল। আজ তাহার শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া নাই। আজ সে স্বামীর উপেক্ষিতা, আজ তাহাকে যত্ন করিবার দিন ফুরাইয়াছে। তাহাদের কথার উত্তরে উমাও "হ্যাঁ দেখাইব" এই ছোট্ট একটু উত্তর দিয়া সরিয়া যাইত।

শ্বশুরের মত স্নেহশীল নায়েব মশায় শুধু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এ সংসারের অনেক সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি পরিচিত। চুণীলালকে অসৎ পথ হইতে ফিরাইবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এই দুঃখে তিনি মৰ্ম্মাহত। কি দুঃখে যে বধূ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বুঝিয়াও কোনো প্রতীকার করিতে পারেন না, শুধু মনঃপীড়া ভোগ করেন। কিন্তু উমা যে তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে তিনি ব্যাকুল হইলেন। অনুযোগ করিয়া বলেন—"ডাক্তার কব্‌রেজ এনে ওষুধ দিলেও শান্তা বল্‌লে তুমি নাকি ওষুধ খাওনা মা, এ তোমার অন্যায়। মেয়েটা রয়েছে, তার মুখের দিকেও তো চাইতে হয়। তা' ছাড়া এ বুড়ো ছেলেটাকে কার কাছে ফেলে যাবে মা?"

স্নেহের আভাসমাত্র উমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া ওঠে। কিন্তু হাসিয়া বলে "বাপ মা ছেলেকে এম্‌নি রোগাই দেখেন কাকা, বেশ্‌তো আছি, কেন মিথ্যে ওষুধ গিল্‌ব?"

এইভাবে দিনে দিনে সে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছিল। কিন্তু এখন জীবনের কর্ত্তব্য পথ দেখিতে পাইয়া তাহার বাঁচিতে স্পৃহা হইল। সে ভাবিল আমি মরিয়া গেলে আমার স্বামীর অপরাধের বোঝা আরো ভারী হইবে। কে তাঁহার অসৎ কার্য্যের প্রতিরোধ করিবে? আমার দুঃখী প্রজার দুঃখ দূর করিবে কে? সেতো প্রজাদের জননী, প্রজাদের রক্ষার ভার ভগবান্ তাহার

হাতেই দিয়াছেন। এইসব ভাবিয়া উমার মরণে আর আনন্দ রহিলনা ; বরং তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। ডাক্তার ডাকিয়া ওষুধ খাইল ও সাবধানে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু কালকীট তাহার দেহে বাসা বাঁধিয়াছিল, দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে শয্যা গ্রহণ করিল্।

তাহার শয়ন কক্ষের সঙ্গেই প্রকাণ্ড বাগান, বাগানের মধ্যে প্রশস্ত সরোবর। অপরাহ্নে উমা সরোবরের পাড়ে ইজিচেয়ারে আসিয়া বসে, শান্তা র‍্যাপার দিয়া সাবধানে তাহার অঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া যায়। কাক চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল জল, দুইটি শুভ্র হংস-হংসী একসঙ্গে সাঁতার কাটিয়া যায়, পশ্চাতে জলের উপরে যেন আল্পনা আঁকা হইতে থাকে। সরোবরের ওপারে সারি সারি পাম্‌গাছ, তাহার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় প্রকাণ্ড মাঠ, তাহাতে গ্রাম্য ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছে। সম্মুখে বকুল গাছে একটা কাঠঠোক্‌রার কাঠ কাটিয়া নীড় বাঁধিবার কি আগ্রহ ! উমা দীর্ঘশ্বাস্ ফেলে। সে এখন পরলোকের যাত্রী, কিন্তু স্বামী ! তাহাকে বাধা দিবে কে ?

সহসা উচ্চহাস্য করিয়া তন্দ্রা ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কোলের উপর পড়িল ; পশ্চাতে মান্দ্রাজী আয়া অগ্রসর হইয়া সেলাম জানাইল।

তন্দ্রা খুসিতে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া বলিল "কী মজা হয়েছে জান মা ? টম্‌টম্ ক'রে বাবা আমাকে কতদূর বেড়াতে নিয়ে গেছিলেন। মুটুহাবুদের বাড়ী ছাড়িয়ে, নন্দীপাড়ার হাট ছাড়িয়ে আরো দূরে গেছিলাম মা ! সত্যি ! আয়াও গেছিল. তুমি আয়াকে জিজ্ঞেস কর", উমার দৃষ্টি আয়ার দিকে আকৃষ্ট করিয়া তন্দ্রা আয়ার হাত হইতে একটি সুদৃশ্য ফুলের সাজি নিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া তুলিয়া মাকে দেখাইতে লাগিল "হাট থেকে বাবা আমাকে এই দেখ কাঠের ঘোড়া, পুঁতির মালা আর চীনের পুতুল কিনে দিয়েছেন। এই দেখ, একশিশি লজেন্সও আছে। তুমি দুটি খাবে ?" ক্ষিপ্রহস্তে শিশি খুলিয়া দুটি লজেন্স তন্দ্রা মায়ের মুখে দিতে গেল ! "খাবে না ? তবে থাক, এই ফুলের সাজিটাও বাবা কিনে দিলেন, নয়তো এগুলো আনব কি ক'রে ? তুমি বরং তোমার ঠাকুরের ফুলের জন্য সাজিটাই নিও।"

উমা অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিল "তনু. তুই পারবি মা ?"

অতগুলি দ্রব্যপ্রাপ্তির সংবাদে মায়ের কোনো উৎসাহ না দেখিয়া তন্দ্রা একটু দমিয়া গেল— "কি পারব মা ?"

উমা দুই হাতে মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তুই পারবি তনু ? বল্ পারবি ?"

তনু এবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ খুব পারব। নতুন বছরে বাবা যে মুক্তোর কণ্ঠি দিয়েছেন সেইটে আবার দেখবে ? হ্যাঁ খুব পারব, আমি এখন বড় হয়েছি, সিন্দুকের চাবি ঘোরাতে পারি। দাও— চাবি দাও।

মেয়েকে চুম্বন করিয়া উমা বলিল "আমি চলে গেলে তুই সব সময় ওঁর কাছে থাকতে পারবি তনু? একটুও একা ছাড়বিনে? পারবি মা?"

উৎসাহিত হইয়া তন্দ্রা বলিল "হ্যাঁ, খুব পারব. বাবার কাছে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে মা? আমি তোমাকে যেতে দেব না" তন্দ্রা মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

* * * * *

একপা' একপা' করিয়া উমার শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রি, উমার কাছে ছোট একখানা খাটে তন্দ্রা ঘুমাইয়া আছে। শিয়রে দাসীগণ কেহ পাখা হাতে, কেহ আইস্-ব্যাগ হাতে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা উমা ঘুম ভাঙ্গিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর কি ভাবিয়া হাত বাড়াইয়া তন্দ্রাকে জাগাইয়া বলিল "তনু মা!"

তন্দ্রা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, সহজে তাহার ঘুম ভাঙ্গেনা, কিন্তু আজ মায়ের এই ক্ষীণ আহ্বানেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া চোখ্ রগ্ড়াইয়া মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "কি চাই মা? ডাক্‌ব ওদের? ফলের রস খাবে?"

উমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "তনু, যা বলেছি তোর মনে থাক্‌বে তো? পার্‌বি সব সময় ওঁর সঙ্গে থাক্‌তে? কখনো একা ছেড়ে দিবিনে?" "না—মা তুমি অত ক'রে ব'ল্‌ছ কেন? বাবার কাছে আমি সবসময় থাক্‌ব। তুমি কথা বল্‌তে হাঁপাচ্ছ, এখন চুপ ক'রে ঘুমোও।"

কথা শুনিয়া দাসীগণ জাগিয়া উঠিল, কেহ পাখা চালাইতে লাগিল কেহ মাথায় আইস্‌ব্যাগ্ চাপিয়া ধরিল, কেহ ওষুধের শিশি গ্লাস লইয়া ওষুধ ঢালিতে লাগিল।

অলসকণ্ঠে উমা ডকিল, "তনু মা।"

তন্দ্রা যেন বালিকা নয়, প্রবীণার মত বলিল "কি মা বল।" জড়াইয়া জড়াইয়া উমা বলিল "একবার ডেকে আনতে পার্‌বি তাঁকে? শেষ সময় একবার—তুই ছাড়া আর তো কেউ পারবে না মা!" "কাকে ডেকে আন্‌ব? বাবাকে? বাবা যে বলেন তাঁর অনেক কাজ, তাই ভিতরে আসতে পারেন না। আচ্ছা—যত কাজই থাক্, আজ ডেকে আন্‌বই।"

তন্দ্রা একজন ঝিকে সঙ্গে নিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার অশ্রান্ত করুণ ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী, তন্দ্রাকে একটু আলো দেখাইবার জন্যই যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া উড়িতে লাগিল। পথচারী একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তন্দ্রার সম্মুখে লেজ নাড়িতে লাগিল। নিশাচর একটা পক্ষী কর্কশস্বরে ডাকিয়া তন্দ্রার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। তন্দ্রা একবার ভয় পাইয়া নন্দঝির গা' ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

বাগানবাড়ীর গেটের সম্মুখে আসিয়া তন্দ্রা গেটের ভিতরে ঢুকিতে গেল, কিন্তু দরোয়ান বাধা দিল। তন্দ্রা রুষিয়া বলিল "আমার বাবার কাছে আমি যাব, তোর কিরে হনুমান?" হনুমান আস্ফালন ছাড়িল না, গেট্ বন্ধ করিয়া দিল।

ভিতরে তখন নৃত্যগীত চলিতেছিল; কলিকাতা হইতে বিখ্যাত নর্ত্তকী সীতারা বাই আসিয়াছে, চূণীলাল ও তাহার বন্ধুগণ রাত্রিভোর সেই নৃত্যরস উপভোগ করিতেছেন।

পানোন্মত্ত চূণীলালের কানে তন্দ্রার করুণ স্বর আসিয়া পৌছিল "বাবা, দরোয়ান তোমার কাছে যেতে দিচ্ছে না।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার নেশা ছুটিয়া গেল, পূর্ণ পানপাত্র হাত হইতে পড়িয়া গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। তিনি দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন "গেটের সম্মুখে ম্লানমুখে তন্দ্রা দাঁড়াইয়া আছে। পিতাকে দেখিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। গেট খুলিয়া ফেলিয়া চূণীলাল বাহিরে আসিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "কি হয়েছে মা, এত রাতে এসেছ কেন?"

তন্দ্রা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল. 'মার খুব অসুখ, মা তোমাকে ডেকেছেন। তোমার যত কাজই থাক্, আজ তোমাকে যেতেই হবে।"

'উমা ডাকিয়াছে!' চূণীলাল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন। আজ কি উমা বিচার করিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে? সকল দুষ্কার্য্যের কৈফিয়ৎ লইয়া আজ কি তাহাকে সে কঠোর দণ্ড দিবে?"

তন্দ্রা পিতাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল, পিতা কলের পুতুলের মত চলিতে লাগিলেন। চন্দ্র মাথার উপরে কিরণ বিকীর্ণ করিতেছিল, ঘুম ভাঙ্গিয়া পাখীর দল পাখা ঝাপটাইয়া একবার ডাকিয়া উঠিল। সম্মুখেই পথ—সে পথ চূণীলালের কত পুরাতন, কিন্তু আজ সে পথ যেন তাহার কাছে নূতনরূপে দেখা দিল।

ক্রমে পথ ফুরাইল, তাহারা বাড়ীর দরজায় ঢুকিল, উঠান, সিঁড়ি বারান্দা সব পার হইয়া দীর্ঘদিন পরে চূণীলাল নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে, কবিরাজ নাড়ি ধরিয়া আছেন, কাছে দাঁড়াইয়া নায়েব মশায় রুমালে চোখ মুছিতেছেন, ছিন্ন স্বর্ণলতার ন্যায় উমা বিছানায় পড়িয়া আছে।

চূণীলাল শিয়রে দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে সেই মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে চাহিল। তন্দ্রা মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "মা, মা, বাবা এসেছেন।"

উমা নিষ্প্রভ চক্ষু মেলিয়া চাহিল; কিন্তু স্বামীর কাছে কোনো কাজের কৈফিয়ৎ চাহিল না, কোনো দণ্ডবিধান করিল না শুধু "তনুকে দেখো, কখনো ওকে কাছছাড়া কোরো না" এই ছোট্ট দুটি অনুরোধ জানাইয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

সমাজ-Service.

শ্রীমণিকুন্তলা সেন, শ্রীকল্যাণী সেন ও শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী।

প্রথমেই পাত্রীদের একটু পরিচয় আবশ্যক।

Lady Gosh অভিজাত-বংশীয়া, বয়স্কা, আধুনিকা। কলকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের তিনি নেত্রী-স্থানীয়া। বিশেষ করে "গশ-সাহেব" 'নাইট' উপাধী পাবার পর থেকে সকলেই তাঁকে খুব মান্য করে চলেন।

Mrs. Dutt, হলেন কাজের লোক। সমাজ সেবায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত lecture দিয়ে, Meeting attend করে ও Conference join করে তিনি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত পান না। Calcutta Ladies' Social Service Club এর তিনিই হলেন সম্পাদিকা।

Mrs. Mittah তরুণী, আই-সি-এস্ পত্নী। Social Service এ তাঁর অভিজ্ঞতা না থাকলেও উৎসাহ খুবই। বিশেষ করে Lady Gosh ও Mrs. Dutt এর কাজে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা।

মন্দাকিনী দেবী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সাধনা করেন, সেইজন্য তাঁর বেশভূষা, আচার-ব্যবহার এমন কি কথা-বার্তার ধরণটি পর্যন্ত কবিত্বময় হয়ে উঠেছে।

ইরা ও শিপ্রা অত্যাধুনিকা কুমারী। সিনেমা পার্টিতে ঘুরে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে বেড়িয়ে, গল্প করে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোতে এদের দিনগুলি কেটে যায়। Social Service করবার মতন এদের সময়ও নাই এবং ইচ্ছাও নাই। কেবল Lady Gosh এর খাতিরে এই Calcutta Ladies' Social Service Clubএ এদের যোগ দিতে হয়েছে।

Lady Gosh এর বাড়িতে এক dinner partyতে তিনি একদিন গ্রামের উন্নতি সাধন করবার প্রস্তাব করেন ও Calcutta Ladies' Social Service Club এর সভ্যারা সেইদিন দেশোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেন। তারই জের টেনে আজ Mrs. Dutt এর drawing roomএ পল্লীউন্নয়নের আলোচনা করবার জন্য মিটিং বসেছে। এর ফলটি যে ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা আমি আগে থেকে বলে দিতে চাই না।

দ্বিতীয় দৃশ্যের পাত্রীদের—ক্ষেমী, ক্ষেমীর মা, মেছুনি, গোয়ালানী ও ঘুঁটেয়ালির—বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই। প্রহসনটি অভিনয় করবার সময়ে আধুনিকাদের সাজ-পোষাক অত্যুগ্রভাবে আধুনিক ও গ্রামবাসিনীদের বেশ অত্যন্ত গ্রাম্য হলে ভাল হয়।

আরো আছেন দুটি মেয়ে, তাঁরা শহরে লেখাপড়া শিখেছেন কিন্তু গ্রামেই থাকেন। তাঁদের বর্ণনা দেবার বিশেষ কোনও দরকার নাই কারণ সব বিষয়েই তাঁরা অতি স্বাভাবিক এবং সাধারণ। গ্রামবাসিনীরা তাঁদের "দিদিমণি" বলে ডাকে, আমরা "প্রথমা" ও "দ্বিতীয়া" বলে উল্লেখ করব।

প্রথম দৃশ্য
(Drawing Room.)

Mrs. Dutt.—"Sisters, আজ আমরা সকলে এখানে meet করেছি আমাদের Social work সম্বন্ধে একটু discuss করবার জন্য। Lady Gosh সেদিন বলছিলেন যে এই great war এর সময়ে England এর মেয়েরা কি অসম্ভব Social Service দিচ্ছে। Factoryতে কাজ করছে, Air forceএ join করছে, Soldiersদের জন্য sweets তৈরী করছে, sweaters knit করছে, —Campএ গিয়ে তাদের নানা রকমে inspiration জোগাচ্ছে। Bandage roll করছে—প্রা—ণ দিয়ে তারা war-work করছে। How noble! What sublime self-sacrifice!! আর আমরা? আমরা Indiaর মেয়েরা আজও ঘরের four walls এর মধ্যে বন্ধ থেকে ঘুমোচ্ছি!"

শিপ্রা (জনান্তিকে) ঘরের মধ্যে! Mrs. Dutt!!

ইরা—কবে থেকে রে?

Mrs. Mittah.—"Wake up India! ভেঙে ফেল four walls! জাগাও দেশকে! Queen Elizabeth যদি দেশের কাজে হাত soil করতে পারেন, তবে আমরা কেন করব না? কমিশনার মিঃ ডশ্ যদি নিজে হাতে Water Hyacinth তুলতে পারেন, Lady Day যদি Slums এ Milk Kitchens খুলতে পারেন, তবে আমরা কেন কোমর বেঁধে field এ নামবো না?"

(Mrs. Mittah—কোমরে কাপড় বাঁধবার ভঙ্গী করলেন কিন্তু আধুনিকভাবে পরা জর্জেট শাড়ির আঁচল কাঁধের চেয়ে নীচে পৌঁছাল না)

ইরা—"কাপড় কইরে?"

শিপ্রা—"খুঁক খুঁক—খুঁক!"

Mrs. Dutt—"হাসছ? Shame, Shame! এরকম একটা solemn occasion এ তোমাদের hopeless misbehaviour দেখে লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে।"

শিপ্রা—(জনান্তিকে) "মুখ-খানা তো সর্বদাই অমন টুকটুক করে।"

ইরা—"লজ্জায়, না রুজে?"

মন্দাকিনী—"এইরকম ভব্যতা নিয়ে তোমরা সামাজিকতা রাখবে কি করে বাছা? তোমাদের কি একটুও সংস্কৃতি হয় নি?"

Gosh—"তোমাদের planটা একটু তাড়াতাড়ি chalk out কর। আমার আবার একটা important dinner engagement আছে, Late হ'লে চলবে না।"

(ঘড়ি দেখলেন)।

Dutt—"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এক্ষুনি।"

(খোঁজাখুঁজি করে একতাড়া কাগজ পত্র বার করলেন)

"আমি Village uplift এর একটা scheme করেছিলাম, আপনাদের কাছে তার bare outlines দিচ্ছি approval এর জন্য। প্রথমেই গ্রামে গ্রামে আমাদের Adult Literacly campaign start করা দরকার—"

Mittah—"গ্রামে যাবেন কি করে? সেখানকার রাস্তাগুলো তো শুনেছি একেবারে unmotorable!"

Dutt—"না-না, সে রকম গ্রাম নয়, Jessore Road এর ওপরেই আমাদেরই জানাশোনা এক Officer এর jurisdictionএ একটা গ্রাম আছে, প্রথমে সেখান থেকে আমরা start করব।"
(সকলের সম্মতি জ্ঞাপন)

Dutt—"তা হলে next Wednesdayই সেখানে গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারি।"

Mittah, } "বাঃ আমিতো previously engaged—"
মন্দা } "আমি বাপু সেদিন জাপানী চিত্রকর চিংঙ্কুকে খেতে বলেছি—"

Gosh—"অত short noticeএ কি হয়? অন্ততঃ two weeks আগে date করে না রাখলে সবাইকে free পাবে কি করে?"

শিপ্রা—"কোনও দিনই বা free রাখা যায় কি করে? মনে করুন, গ্রামে যাওয়া ঠিক করেছি, এমন সময়ে একটা unexpected invitation এলো, তখন?"

ইরা—"আমার বাবা গ্রামে যাওয়া টাওয়া হবে না।"

শিপ্রা—"কেন? তোর boy friend কি তোকে একদিনও spare করতে পারবে না?"

Dutt—"ইরা, শিপ্রা, keep quiet! তবে আপনারাই বলুন কবে যাবেন। তবে, next two weeks এর মধ্যে আমার ওই এক Wednesday ছাড়া আর একটা দিনও free নাই।"

Gosh—"তা হলে next month এই চল। Next month এর একটা দুটো দিন নিশ্চয় এখনও free আছে তোমাদের।"

মন্দা—"আচ্ছা বাপু! দেশগাঁয়ে তো শুনি বড় ম্যালেরিয়া—ধরবে টরবে নাতো? আর সেখানে নিশ্চয় Circuit House নেই?"

Dutt—"Good Heavens! সেখানে থাকবে কে? Early lunch খেয়ে রওনা হয়ে, সেখানে school open করে, by dinner time আমরা অনায়াসে ফিরে আসব।"

শিপ্রা—"একদিনেই কাজ হয়ে যাবে?"

Dutt—"কেন হবে না? ওখানকার Sub-Inspector কে বলে সব arrangements করিয়ে রাখব, আমরা খালি স্কুলটা open করেই চলে আসব।"

ইরা—"তবে সেতো আধ ঘণ্টার কাজ। তা হলে by tea timeই ফিরে আসা যাবে।"

শিপ্রা—"তবে তো তোর problem solved হয়ে গেল।"

Dutt—"Oh, no, no! আমার schemeএ আরো আছে। যে কাজটা হাতে নেব সেটা complete করে তবে তো ছাড়তে হবে। শুধু স্কুল খুললেই কি একটা গ্রামের সব problems solved হয়ে যাবে?"

Gosh—"যেমন ধর, villagersদের health improve করবার চেষ্টা করতে পার, Water Hyacinth তুলতে পার—"

শিপ্রা—"Hyacinth ! Oh ai ai ! বাড়িতে এনে vaseএ সাজাব।"

ইরা—"উঃ, সঞ্জয় আমাকে যে একটা hyacinth রঙের জর্জেট দিয়েছে, সেটা দেখলে তুই মরে যাবি। কি সু্য—ই—ট, জানিস না ভাই।"

মন্দা—"একটু চুপ করনা বাছা তোমরা !"

Mittah—"কেবল সাজ আর শাড়ী ! কোনও serious জিনিষের ওপর তোমরা concentrate করতে পার না।"

Dutt—"Opening of the schoolএর পর একটা Hygieneএর lecture, ও charitable dispensary খুলবার একটা suggestion দিয়ে Water Hyacinth তুলেই আমরা বাড়ী চলে আসব।"

মন্দা—"বক্তৃতা কে দেবে বলতো? সাহিত্য ও শিল্পকলা ছাড়া কোনও বিষয়ে আমি তো বলিনে, আর তোমরা কি বাংলা বলতে পারবে?"

Mittah—"কেন? Mrs. Dutt তো আজকাল খুব ভাল বাংলা বলতে শিখেছেন।"

Dutt—"Oh yes ! আমি ওদের সঙ্গে খুব মিশতে পারি। এমন কি আমি ভাবছিলাম যে English Peersদের মতন Lady Gosh যদি তাঁর Parkএ villagersদের একটা social gathering—"

Gosh—(শশব্যস্তে) "Oh, no, no, no ! ওরা কি রকম dirty তাতো তোমরা জান না। আমার বাগান একেবারে নষ্ট করে দেবে—আর drawing roomএ যদি ঢুকে পড়ে তা'হলে তো সর্ব্বনা—শ !"

Dutt—"তাহ'লে একদিন গ্রামে গিয়ে কাজ সেরে আসলেই হবে।"

Gosh—(উঠে দাঁড়িয়ে) "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক থাক।" (ঘড়ি দেখে) "I am already late." (ব্যস্তভাবে প্রস্থান। পিছন পিছন Dutt, Mittah ও মন্দাকিনী দেবীর প্রস্থান)

ইরা—"আমি বাপু ওর মধ্যে নেই। ফিরতে সন্ধ্যে হলে সঞ্জয় আমাকে ব—ড্ডো miss করবে।"

শিপ্রা—"আমার দ্বারা ও সব হবে টবে না। Frankly speaking বেশ তো আছি ভাই, দরকার কি ওসব হাঙ্গামার ভিতর ঢুকে?"

(প্রস্থান। যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গ্রামের রাস্তা—Lady Gosh, পিছন পিছন Mrs. Dutt, Mittah, মন্দাকিনী, ইরা ও শিপ্রার প্রবেশ)

মিটাঃ—"কই, কোথাও তো কিছু নেই?"

ডাট্—"এই তো 15th Mile Post—এইখানেই তো আমাদের meet করতে লিখে দিয়েছিলাম।"

গশ্—"Reception Committeeর তো কোনও sign নেই।"

মিটাঃ—"School building টাই বা কোথায়?"

মন্দা—"চলনা একটু এগিয়ে দেখি, ওই তো কতগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে।"

ইরা—"যাবেন কি করে? কাদা ভেঙে? রাস্তা তো দেখছি না।"

শিপ্রা—"তাহ'লে আপনারই যান, আমি আমার নো–তুন জুতো spoil করতে পারবো না। আমি বরং ততক্ষণ গাড়িতে গিয়ে বসছি।"

মিটা:—"ওই কে যেন আসছে, ask her."

(ঝুড়ি মাথায় ঘুঁটে ওয়ালীর প্রবেশ)

ডাট্—"ওহে শোন, আমরা Calcutta Ladies' Social Service Club থেকে আসছি, আজ এখানে school open করবার কথা আছে। তুমি সে বিষয়ে কিছু জান?"

ঘুঁটে—(সভয়ে) "ও বাবা, এ হিচিং পিচিং কি সব কয় গো!"

(ঝুড়ি ফেলে প্রস্থান)

মন্দা–"তোমাদের ওই এক স্বভাব, ইংরেজি ছাড়া কোনও কথা কইতে পার না, গাঁয়ের মেয়েরা কি অত বোঝে? ওই আরো দু'জন আসছে। সর, ওদের সঙ্গে আমিই কথা বলি।"

(মেছুনী ও গোয়ালানীর প্রবেশ)

মন্দা—"ওগো ভালমানুষের ঝি, কোনও মেমসাহেবের এখানে আসবার কথা শুনেছ?"

গোয়া—(মেছুনীর প্রতি) "শুনিচি? শুধু শুনিচি, একেবারে চক্ষোচক্ষে দেক্‌চি।"

মেছু—(গোয়ালিনীর প্রতি) "মেম্‌সাহেব কিলা, ড্যানাকাটা পরী বল্।"

(দু'জনে হাসাহাসি)

গশ্—"What impertinence! জান, আমরা কে?"

মন্দা–"না না, থাম, থাম, ওরা কি অতশত বোঝে? ওদের সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইলে, তবে ওরা বুঝতে পারবে।" (মেছুনীর প্রতি) "হ্যাঁগা বাছা, তুমি বুঝি মেছুনী? তোমার ঝুড়িতে কি মাছ আছে?"

মেছু—(গোয়ালিনীর প্রতি—সন্দেহের সঙ্গে) "এই ভর-দুপুর বেলা আচে আচে করতে নেগেচে কেন? ঘাড়ে চাপবে নাকি?"

গোয়া—"কিচ্চু বিশ্বেস নেই—"

মেছু—(সভয়ে) "আবার মুকে, নোকে, আঙুলে, সব রক্ত নেগে রইচে—আর একেনে দাঁড়াস নে—চ—।"

গোয়া "রাম, রাম, রাম!"

(ঝাঁটা হাতে ক্ষেমীর মার প্রবেশ)

গোয়া—"মাসী, ওমাসী, ওনারা কে? ত্যানারা নয় তো?"

মেছু—"রাম, রাম, রাম!"

ক্ষেমীর মা—"ওরে না-না, ভয় পাসনি, ওরা হ'ল সব কলকেতার বিবি। আমার পুরোন মুনিবের বাড়ি কতো দেখেচি অমোন, আমি আর চিনতে নারব?"

(ক্ষেমী ও ঘুঁটেওয়ালীর প্রবেশ)

ক্ষেমী ও ঘুঁটে—

"ভুত আমার পুত, শাঁকিনী আমার ঝি,
রামলক্ষ্মণ বুকে আচেন, ভয়টা আমার কি?"

ক্ষেমীর মা—"কিলা ভূত ঝাড়ছিস কাকে ?"

গোয়া—"কেন, মানুষ চিনিসনে নাকি ?"

ডাট্—"Now sense dawns !"

মন্দা—"ওই দেখ, আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারবে।" (গ্রামবাসিনীদের প্রতি) "বুঝছো তো বাছা, আমরা তোমাদেরই উপকার করবার জন্য এসেছি —"

ক্ষেমীর মা—"উব্‌গার-টুব্‌গার বুজিনে বাপু। তোমরা আবার কারু উব্‌গার করবে, তা'হলেই গেচি ! যতদিন গতর খাটাতে পেরেচি ততদিন কেবল ক্ষেমীর মা, আর ক্ষেমীর মা। আর বুড়ো হইচি, কি নাতিঝাঁটা। ঢের দেকিচি অমন—হাঃ।"

ক্ষেমী "অমা, একেনেও সব বিবিরা এসে জুটেচে ? তোর এখনও সখ যায় মা ! আবার কোলকেতা যাবি নাকি খ্যাংরার বাড়ি খেতে ?"

গশ্—"তোমাদের কথার কোনও sense নেই, তা তোমরা জান ?"

মন্দা—"হ্যাঁ, তোমরা বলছ কি বলতো ? কত কষ্ট করে, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাঠঘাট ভেঙে এঁরা এসেছেন—সেতো তোমাদেরই জন্য—নইলে কি দায় পড়েছিল এঁদের ?"

ডাট্—"Ungrateful wretches—"

শিপ্রা—"আমাদের এখানে টেনে না আনলেই কি হত না ?"

ইরা—"আমি তো আগেই refuse করেছিলাম আসতে You insisted on my comming."

মিটাঃ—"এখানে এলে এসব হবে সেতো জানা কথাই, এতো আর English village নয় যে villagersরা manners জানবে।"

ঘুঁটে -(এগিয়ে এসে) "আবার ইঞ্জিরি গাল পাড়চো কি ? ঢের ঢের অমন গোড়ামুক দেকিচি !"

শিপ্রা—"মাগোঃ, এখানে কি থাকা যায় ? চল গাড়িতে গিয়ে বসি—"

ইরা—"ঠিক বলেছ, Let's leave this Godforsaken place !"

(ইরা ও শিপ্রার প্রস্থান)

ক্ষেমীর মা—"দেখ, একেনে ওসব তম্বী চলবে না, একেনে খ্যাংরা গাছ আমার হাতে—" (ঝাঁটা আস্ফালন)

মিটাঃ—(ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে) "ও বাবা riot হবে নাকি ?" (চীৎকার) "Police, Police !"

গশ্—"Oh stop it—I can deal with them ! দেখ গ্রামবাসীরা, তোমরা যে fools and idiots তা জেনেও আমরা তোমাদের উন্নতি করতে এসেছিলাম, but I didn't know that you are knaves and rogues also !"

(গ্রামের মেয়েদের পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওই, ও মৃদু ক্রোধের গুঞ্জন)

ডাট—"Leave them to their fate, চল আমরা যাই —এদের আবার emancipation !"

মন্দা—"যা বলেছ, ওই করে খাবার জন্যই ওদের জন্ম—"

গোয়া—"কোথে আবার নেত্য করচে দেকো—"

মিটা :—"Damn this unruly mob—"

ক্ষেমী "আবার ডেম্ ডেম্ করচো কেন—"

মন্দা—"যতসব ছোটলোক—"

ক্ষেমীর মা—"ছোটলোকের ঘরে এইচিলে কেন মর্তে—"

ডাট্—"দেখ, মুখ সামলে কথা বল—"

ঘুঁটে—"ও বাবা, আবার মুখ ভেঙায়—"

গশ্—"We shall take serious steps—"

গোয়া—"মুড়ো জ্বেলে দিতে হয় অমন মুকে—"

গশ্—"Silly rascals—"

মেছু—(কোমরে কাপড় বেঁধে) "আমরা কেন রাস্কে হতে যাব? তুমি রাস্কে, তোমার বাপ পিতামো রাস্কে, তোমার চৌদ্দপুরুষ রাস্কে—"

গ্রামের সকলে "—হ্যাঁ—যা বলেচ—"
"—বিদেয় কর, বিদেয় কর—"
"—ঝাঁ্যাটা মার—"
"—যত ভূতের মরণ একেনে—" ইত্যাদি।

(প্রথমা ও দ্বিতীয়ার প্রবেশ)

প্রথমা ও দ্বিতীয়া—"আরে, আরে, কি, হয়েছে কি ?"

গ্রামের সকলে—(মুহূর্তে শান্ত হয়ে) "আরে দিদিমণিরা যে, ওরে চুপ চুপ ! পেরণাম হই দিদিমণিরা—"

ডাট্—"Thank God, the reception committee at last !"

১মা—"এসব কি ব্যাপার ?"

২য়া—"আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?"

গশ্—(এগিয়ে এসে) "আমরা এখানকার school open করবার জন্য কলকাতা থেকে এসেছি। আপনারা বুঝি আমাদের receive করবেন ?"

১মা—"স্কুল ? কোন স্কুল ?"

২য়া—"আমাদের একটা পাঠশালা আছে বটে, কিন্তু সেখানে তো আজ কোনও কিছু হবার কথা নাই—"

১মা—"আমরা তো সেখান থেকেই আসছি। কই ? কিছু শুনিনি তো ?"

ডাট্—"কেন ? Police Sub-Insp.ctorকে তো Mr. Gossain লিখেছিলেন বলে শুনেছি। সে সব ঠিক করে রাখেনি ?"

২য়া—"কিসের কথা বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

গশ্—"Calcutta Ladies' Social Service Club থেকে আমরা এসেছি village uplift এর programme নিয়ে। আজকে এই গ্রামে একটা school open করে, Water hyacinth campaign start করে, আর একটা charitable dispensary খুলবার suggestion দিয়ে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু, এদের hostile attitude দেখে এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।"

মিটা:—"হ্যাঁ, আমরা ওদের জন্য এত trouble নিলাম, আর ওরা আমাদের মারতে এসেছিল।"

১মা—"সত্যি, আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে, কিন্তু এসবের কিছু দরকার ছিল না কারণ আপনারা যেসব কাজের কথা বলছেন সেসব কাজই তো এখানে একটু একটু আরম্ভ হয়ে গেছে—"

ডাট্—"কই, কারা করছে জানিনা তো? আমরা ছাড়া আর কোনও Ladies' Social Service Club আছে বলেও তো জানিনা!"

মিটা—"Statesmanএও তো সে বিষয়ে কিছু বেরোয় নি!"

গশ্—"আমাদের তো consult করেনি!"

২য়া—"আমরা এখানেই থাকি কিনা, তাই এদের দিয়েই আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করিয়েছিলাম।"

মিটা:—"আপনারা কিছু শেখাতে পেরেছেন বলে তো মনে হয় না, এদের যা manners!"

১মা—"নানা, এরা অভদ্র নয়, তবে আপনাদের মতন লোক দেখবার সৌভাগ্য তো এদের হয় না, তাই এরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছে।"

মন্দা—"তোমার কথাগুলি একটু কেমন কেমন শোনাচ্ছে বাপু।

ডাট—"Trying to be sarcastic, are you?"

(গ্রামের সকলে সন্দেহের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ আরম্ভ কর্‌ল)

২য়া—"আপনাদের বিদ্রূপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আমরা আপনাদের এইটুকু জানাতে চাই, যে এদেরই একজন না হলে বাইরে থেকে এসে এদের উপকার করা যায় না।"

১মা—"আর একদিনে সারবার কাজও এ নয়, তা করতে গেলে আপনাদের নিজেদের একটু আত্মপ্রসাদ ছাড়া কারো কোনই লাভ হবে না।"

মিটা:—"দেখেছো, এরাই হ'ল আসল culprits. এদের support না পেলে, ছোটলোকের এত আস্পর্দ্ধা হয় কি করে?"

ক্ষেমীর মা—(এগিয়ে এসে) "দেখ বাপু, আমাদের যা বলেচ, বলেচ, দিদিমণিদের যদি কিছু বলতে আস, তাহ'লে খ্যাংরাগাছ সত্যিই পিঠে পড়বে—"

গশ্—"তোমাদের আমি পুলিশে দিতে পারি, জান?"

ক্ষেমী—"পুলিশের ভয় দিদিমণিদের কি দেখাচ্ছ—ওরা কবার জেলে গেছে জান?"

গ্রামের সকলে "হ্যাঁ—এঁরা এসেছেন সব ফুটানি করতে—দেখে নেব—ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব"—ইত্যাদি।

১মা—"আরে চুপ চুপ"।

২য়া—"থাম, থাম।"

(গ্রামের সকলে চুপ করল)

মন্দা—"ও বাবা, এরা সব স্বদেশী ডাকাত।"

মিটাঃ—(সভয়ে) "চল, পালাই তাড়াতাড়ি, ওঁর আবার শিগ্‌গিরই district পাবার কথা আছে, শেষে promotion আটকে দেবে—"

ডাট্—"হ্যাঁ, এই ছোটলোকদের সঙ্গে থেকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা কেন?"

১মা—"ঠিক বলেছেন, ছোটলোকদের সঙ্গে কাজ করে আপনাদের সুন্দর হাতগুলি নোংরা করবেন কেন?"

২য়া—"তার চেয়ে ড্রইং রুমে ফিরে যান, সেখানেই আপনাদের মানাবে ভাল। এই সামান্য কাজটুকু না হয় আমাদের মতন সাধারণ লোকের হাতেই রইল।"

ডাট্—"No fear তাই যাচ্ছি।" (প্রস্থানোদ্যত)

গপ্—"Dogs will always be dogs" (সকলের প্রস্থান)

(গ্রামের মেয়েরা বক দেখাতে দেখাতে একটু এগিয়ে গেল)

১মা ও ২য়া—"আরে, আরে, ওকি?" (হেসে ফেলল)

গোয়া—"বেশ বলেচ দিদি, বেশ বলেচ।"

ক্ষেমীর মা—"আরো ভাল করে ছুকতা শুনিয়ে দিলেনা কেন? থোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে যেত।"

১মা—"মিছামিছি ঝগড়া করে মনটা খারাপ করে দিয়ে গেল—"

২য়া—(গ্রামের মেয়েদের প্রতি) "এস ভাই, একসঙ্গে মিলে একটু গান করা যাক—"

(সম্মিলিত সঙ্গীত)

"যদি তার নাইবা সরে মুখের ভাষা,
ছোটলোক নয়রে চাষা,
চাষীর জোরে শক্তি জাতির,
চাষের মূলে দেশের আশা।
চাষীরে মূর্খ রেখে
দেখে তারে ঘৃণায় চোখে,
পাশ করা লোক ভদ্র বনে দিয়েছে ছেড়ে লাঙল চষা।
তাই আজ দেশের এ দুর্দশা,
মরছে মানুষ, বাড়ছে মশা।
সোণার এই বাংলা দেশ আজ
বন্‌লো রে ভাই রোগের বাসা।" ইত্যাদি। *

(যবনিকা পতন)

* গানটি ৺শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের "ব্রতচারী সখা" পুস্তকে পাওয়া যাবে।

মানুষের জন্ম।

(ওরে) আজ এসেছে প্রলয়, লেগেছে আগুন, জেগেছে সর্বনাশা ;
যন্ত্রদানব হুকুম পেয়েছে ভাঙিতে লোকের বাসা।
(বুঝি) পাগল হয়েছে মানবের জাত, ধর্ম গিয়েছে মরে,
প্রলয়ঙ্করী হিংসা পিশাচী মহাতাণ্ডবে ঘোরে।

রাজার প্রাসাদ লুটিয়াছে ভূমে ভেঙেছে দীনের ঘর,
লক্ষপতিও অনাহারে মরে ধরে ভিখারীর কর ;
ধনীনির্ধন, ক্ষুদ্রবৃহৎ কারো কোন দাম নেই,
মরণাপঘাত ঠেলিছে সকলে এক মহাশ্মশানেই।
নরমেধযাগে অগ্নিকুণ্ড উপচে উঠেছে জ্বলে,
বলিপুরোহিত পুড়ে মরে এক লেলিহান শিখাতলে ;
লক্‌লকে লাল আগুনের জিভ আকাশ চিরিয়া ওড়ে,
বিশ্বকটাহে সব ভেদাভেদ নিঃশেষ হয়ে পোড়ে।

বণিক মরেছে, শ্রমিক মরেছে, ধনী ও সর্বহারা
মরেছে,—কিন্তু মৃত্যুর দ্বারে শঙ্খ বাজায় কারা ?
নবজনমের সাড়া জাগে যেন মহাশ্মশানের ছায়ে,
নবজীবনের বাণী লেখা হল আকাশের গায়ে গায়ে।
প্রভু ক্রীতদাস মরে মরে গিয়ে মানুষ জন্ম লভে
মৃত্যুর মুখে মানুষের জয় গায় আজি তাই সবে।
একক মানব, ভেদহীন নর, মৃত্যুর মুখোমুখি
পরম গর্বে জীবন লভিছে বিরাট দুঃখে সুখী।
বাজাও শঙ্খ, জয়ধ্বনি কর, হুলাহুলি দাও সবে,
সর্বনাশের জঠর হইতে মানব জন্ম লভে।

আমাদের কথা

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি স্থায়িত্বলাভ করবার জন্য বাহিরের কোন মূর্তি বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখেনা। কালের গতিতে লোহা-পাথর ক্ষয়ে যায় কিন্তু যা অবিস্মরণীয় সেই চিন্ময় ধনকে মানবমন যুগ থেকে যুগান্তরে সাগ্রহে রক্ষা করে। আজকের ভক্তদের প্রশস্তি দিঙ্‌নাগদের স্থূলহস্তাবলেপ শুধু আজকেরই ব্যাপার, কিন্তু শুধু শতবর্ষ নয়, সহস্রাব্দের ওপার থেকে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিপুল শুভ্রজ্যোতি এই দীনা ধরিত্রীর কোণ আলোকিত করে রাখবে।

তবু আমরা স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চাই আমাদের চরিতার্থতার জন্য; যে ধরণীতে যশঃশরীরে, কাব্যশরীরে তিনি বিরাজমান—সেখানেই তাঁর মূর্তিকে, তাঁর নামকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাই আজকে স্মৃতিরক্ষার পথ খুঁজছে সবাই। বহু লোকে বহু প্রস্তাবের উত্থাপন করেছেন, আমাদের পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তার দু'একটি নিয়ে আলোচনা করব।

কেউ কেউ বলেছেন মহাজাতিসদনের অংশবিশেষ রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে তাঁর স্মৃতিরক্ষা করা হোক; এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে তা'হলে রবীন্দ্রনাথের নামের জোরে মহাজাতি সদন উদ্ধারলাভ করে। এই উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত কিনা সে বিচার এখানে করব না, কেবল তার উপযোগিতার বিষয়ে দু'একটি কথা বলব। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শ তিনি বহুদিন ত্যাগ করেছিলেন, শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর যে দৃপ্তকণ্ঠ ভারতের আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে রেখেছে, সে কণ্ঠস্বরে মানুষের মহিমা ধ্বনিত হয়েছে, বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ নয়। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে বঙ্গদেশের হৃদয়ের ধন হলেও তাঁর দেবতা বিশ্বমানবের দেবতা। বিশ্বভারতী যাঁর জীবনের সাধনা, মহাজাতিসদন তাঁকে ভরতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, যে সকল হিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর সমর্থন পেয়েছে, যার উদ্বোধন তিনি করেছেন অথবা যাকে তিনি আশীর্বাদ দান করেছেন সব কটি যদি তাঁর নামের বিশেষ গৌরব দাবী করে তবে রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষার প্রচেষ্টার সমগ্র বঙ্গদেশময় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা, কেননা বঙ্গদেশে লোকসেবার প্রতিষ্ঠান এমন অত্যন্ত অল্প আছে যা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও সহায়তা প্রার্থনা করে পায়নি। বঙ্গদেশের প্রতি গৃহে, প্রতি প্রতিষ্ঠানে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি স্থাপিত হচ্ছে, মহাজাতি সদনেরও তাতে সম্পূর্ণ অধিকার, তার বেশীতে নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষস্থল চন্দননগরে স্মৃতিমন্দির স্থাপনের প্রস্তাব অনেকে করেছেন। এর বিশেষ একটি উপযোগিতা রয়েছে। ষ্ট্র্যাটফর্ডের সেক্ষপীয়রতীর্থের মতই পবিত্র হবে চন্দননগরের রবীন্দ্রতীর্থ, এবং এরূপ হয়ত বহু পীঠস্থানই ভারতময় স্থাপিত হতে পারবে।

কিন্তু রবীন্দ্রপীঠস্থানে রবীন্দ্রনাথের সাধনা যদি মূর্ত হয়ে না ওঠে তবে সে তীর্থ প্রাণহীন হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যসাধনার পাশাপাশি একটি কর্মসাধনার ধারা বয়ে চলেছে, সে সাধনা শুধু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাধনা নয়, সেই সাধনায় ভারতের বিশিষ্ট সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সাধনায় জগত ভারতবর্ষকে সম্মান দিতে শিখেছে। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যালয় এই সাধনার ধৃতমূর্তি। এইখানে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনে ভদ্রলোক ও চাষা পাশাপাশি হাত ধরে দাঁড়িয়েছে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার, সাহিত্য ও দর্শনের সাধনা একত্র হয়েছে, ভারতের তপোবনের পবিত্রাত্মার দীক্ষার সঙ্গে আধুনিক জগতের ঐহিকতার শিক্ষা মিলিত হয়েছে। এ সেই তীর্থক্ষেত্র যেখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত অত্যাচারিত দীন ভারতে জগতের পরিত্রাতার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। এইখানে তাঁর কামনা, তাঁর সাধনা নিহিত ছিল, এইখানেই অর্ঘ্য দিলে তাঁর আত্মার পরিপূর্ণ তর্পণ হবে।

তাই বলি শান্তিনিকেতন যেন রবীন্দ্রভক্তের প্রথম দান পায়। শুধু শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচর্যা নয়, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাতত্ত্বের গবেষণায় যে নূতন আলোকপাত করেছেন, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন তার বিশেষ আলোচনা ও সম্ভব হলে দেশের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার প্রয়োগের প্রয়োজন। রবীন্দ্র সংখ্যায় আমাদের রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

আগামী মাসে আমাদের রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা ছিল কিন্তু এখনও তার সম্পূর্ণ উপাদান তৈরী করে নিতে পারিনি বলে তা সম্ভব হলনা, পৌষ মাসের "মেয়েদের কথা" বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা হবে।

বিশেষ কারণে এই সংখ্যার প্রথমে কোন ছবি প্রকাশ করা গেল না, তারজন্য আশা করি পাঠিকারা কিছু মনে করবেন না। পত্রিকার বর্ধিত কলেবরের দিকে তাকিয়ে আশা করি তাঁরা আমাদের ক্ষমা করবেন।

যাঁরা বৎসরের প্রথমার্ধের জন্য গ্রাহিকা হয়েছিলেন গত মাসে যে তাঁদের চাঁদার মেয়াদ ফুরিয়েছিল সে কথা আমরা গতবারের পত্রিকায় জানিয়েছিলাম। এরমধ্যে কেউ কেউ অপরার্ধের চাঁদা পাঠিয়েছেন কিন্তু অনেকেই পাঠাননি। আমরা জানি নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে মনে করে টাকা পাঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় তাই এ মাসের মধ্যে যাঁদের চাঁদা আমরা না পাব তাঁদের পত্রিকা আগামী মাসে ভি-পি করে পাঠান হবে। আশা করি ভি-পি গ্রহণ করে তাঁরা আমাদের বাধিত করিবেন।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩৴৹ আনা; যাণ্মাসিক মূল্য ১॥৹ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৴৹ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৹ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৹ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

Printed at Bhowanipur Art Press, 82-A Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar Chakravartti
and Published by same from 172-8, Rashbehari Avenue, Ballygunj, Calcutta.

যদি

হাসতে চান

সচিত্র ভারত

পড়ুন।

প্রতি সংখ্যা দুই আনা

নমুনার জন্য পত্র লিখুন

২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পূজার উপহার দিবার বই—

ছন্দে পুরাতনী

বালক বালিকার জন্য সুললিত ছন্দে
পুরাতন কাহিনী।

অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্রের
ভূমিকা সম্বলিত।

সুরুচিবালা সেন গুপ্ত প্রণীত।
২ডি, পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জে
পাওয়া যায়।

"বালিগঞ্জ"

(মাসিক পত্রিকা)

মার্জ্জিত রুচি এবং শিক্ষিত চিন্তাধারার একমাত্র
সাহিত্যিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।

মূল্য প্রতিসংখ্যা—।০ বার্ষিক— ৩।০

কার্য্যালয়—১৮নং, হিন্দুস্থান পার্ক
ফোন—পি, কে ২২২৮।

সূচি পত্র—অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৪৮ | ৮ম সংখ্যা

ডাক।

শ্রীসতী ঘোষ।

তারারে যেমন ডাকে গো চাঁদ
তেমনি কি মোরে ডেকেছিলে ?
সুপ্তিমগন এ ধরা তখন,
নীরব হয়েছে বিহগ-কূজন,
গোপনে গোপনে, মোর কানে কানে,
কি মধুর বাণী কয়েছিলে ?
প্রিয়তম মম, চির সখা ওগো,
আছিনু বিভোর অলস ঘুমে ;
শিথিল অঙ্গ শিহরণহীন,
মধুনামে ডাকা মিলালোগো ক্ষীণ ;
স্তব্ধ যামিনী হ'লনা মুখর,
বাঁশী বাজিলনা নিঝুমে।
তবু মোর লাগি নিরালায় নাথ
আনমনে ছিলে জাগিয়া ;
তন্দ্রাবিবশা অপরাধী প্রিয়া,
তবু তারে হৃদে লয়েছ বরিয়া,
করেছ গো ক্ষমা ব্যাকুল সরম
করুণাচক্ষে চাহিয়া।

সুখ ও দুঃখ

শ্রীসরস্বতী চক্রবর্ত্তী।

নাম শুনে মনে হয় হয়ত বা কোন দার্শনিকবাদের আলোচনা, কিন্তু আমি যা বল্‌তে চাই বাস্তবিকই তা একেবারে সহজবাদ। সুখ ও দুঃখ এই দুটী অনুভূতির সঙ্গে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে জড়িত। এরা আমাদের অতি পরিচিত অথচ এদের সঙ্গে সত্যি পরিচয়ও আমাদের অতি অল্প। এদের বৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যখ্যা যে কোন সাইকলজির বইয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রয়োজন অতি অল্প। সংসারযাত্রার ঘাত প্রতিঘাতে যেখানে এই দুটী অনুভূতি প্রতি পদক্ষেপে আমাদের জীবনের গ্রন্থিকে তোলপাড় করেদিচ্ছে সেখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্থান কতটুকু? এদের স্পর্শ আমাদের কাছে এত সহজ বলে এদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে এত নিষ্প্রয়োজন, ঠিক. যেমন নিঃশ্বাস বা সহজপ্রাপ্য আলো হাওয়ার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আমাদের মনে সহজে ওঠে না।

বিশ্লেষণ কর্ল্লে দেখি যে বাস্তবিক সুখ আমরা তখনই পাই যখনই কোন কামনার জিনিষ আমরা লাভ করি—আর কামনার জিনিষ যখন চেয়ে পাইনা বা কামনার ধন আমাদের সান্নিধ্য থেকে অন্তর্হিত হয় তখনই আমরা দুঃখ পাই। অর্থাৎ সুখ দুঃখের গোড়াকার কথা আমাদের আকাঙ্ক্ষা বা চাওয়া। সংসারযাত্রায় দেখ্‌তে পাই কেউ বা নাতিনাত্‌নীপরিবৃত হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছেন—কেউ বা পুত্র হারিয়ে দুঃখে জীবন যাপন কর্চ্ছেন। প্রথম ক্ষেত্রে আমার সুখের কারণ—নাতি নাত্‌নীর সঙ্গ—আর্থাৎ এই ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা ও এটাই পরিতৃপ্ত হয়েছে বলে আমার সুখ। অবিশ্যি এই কামনার আবার সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা আছে যথা নাতিনাত্‌নী সুস্থ থাকা চাই ও তারা আমার প্রিয় হওয়া চাই। অনেকে সুস্থ সবল ও প্রিয় নাতিপুতি বর্ত্তমান থাক্‌লেও সুখী হয়না তার কারণ তাদের কামনা বিষয়ান্তরে ধাবিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তেমনি পিতা বা মাতার দুঃখের কারণ—এইযে. যে পুত্র কামনার ধন সে তাদের পাওয়ার অধিকারের বাইরে।

কামনার রূপ আবার মানুষের স্তর ভেদে বিভিন্নতা লাভ করে। হয়ত বা এই আকাঙ্ক্ষার মাপকাঠি দিয়ে পূর্ব্বতন ঋষিরা মানুষকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক এই তিন স্তরে বিভক্ত করেছিলেন। যার কামনার বিষয় যত পারমার্থিক সে তত সাত্বিক আর যার কামনার বিষয় যত স্থূল সে তত তামসিক। কেউ কেউ বল্‌বেন এমনও সময় আসে যখন আমাদের মনে সুখও নেই দুঃখও নেই একটা নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত অবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে এ অবস্থা অতি উচ্চস্তরের—জীব যখন জীবত্ব পরিহার করে শিবত্ব প্রাপ্ত হয় তখনই শুধু থাকে নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প "আনন্দম্"। সাধারণ লোক যখন এ কথা বলে তখন বুঝতে হবে তারা কি চায় তাই তারা জানেনা অর্থাৎ খাচ্ছি দাচ্ছি,

সামনে যা পাচ্ছি তাই নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি, তাতে সুখও পাইনা, দুঃখও বুঝ্‌তে পারিনা। এ অত্যন্ত জড় ভাবের লক্ষণ—মনটা যখন অত্যন্ত বহির্মুখী ও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তখন মন তার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাকে আর খুঁজে পায় না। এক্ষেত্রে মন তার চাওয়ার শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, জীবনে কোন উদ্দেশ্য, কোন রস আর সে খুঁজে পায়না। এ ভাব তামসিক স্তরের অবস্থা।

রাজসিক স্তরে মন নিজ ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকে। সে কি চায় তার একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা তার মনে থাকে এবং তারই জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তারপর কামনার ধন লাভ কর্ল্লে সে পায় সুখ, না পেলে সে পায় দুঃখ। এই সুখ দুঃখের তীব্রতা নির্ভর করে তার কামনার তীব্রতার ওপরে। এ স্তরের মানুষের অস্তিত্ব আপনিই প্রমাণ হয়; তারা সব সময়ে জানিয়ে দেয় তারা আছে; অন্য পক্ষে তামসিক স্তরের ব্যক্তির সুখ দুঃখ আছে কি নেই বোঝা কঠিন, তাদের তরকারিতে নুন না থাকলেও আপত্তি নেই, মাংসের কোর্মা অত্যন্ত সুস্বাদু হলেও ক্ষতি নেই। অনেকে মনে কর্ব্বেন যে মনের এরকম নির্বিকার ভাবত একটা আশীর্ব্বাদ—দুঃখের গভীর ক্লেশ এদের সহ্য কর্ত্তে হয়না, সুখ দুঃখের অনুভূতিতে বিধ্বস্ত হতে হয়না। কিন্তু বাস্তবিক এ ভাব মানবমনের ক্লীবত্ব। এর চেয়ে রাজসিক স্তরের অবস্থা অর্থাৎ কামনার বস্তুর জন্য সংগ্রাম অনেক শ্রেয়।

সুখ ও দুঃখ অতিক্রম করতে তখনই পারি যখন আমরা এর ওপরে উঠতে পারি। যখন কামনার আর আমাদের কিছু থাকেনা, জানিনা বলে নয়, পাবনা বলে নয় সেই অন্তর্নিহিত সত্যকে লাভ করেছি বলে। অর্থাৎ সমস্ত কামনার মূলে সেই পরম "আমি" র সঙ্গে যুক্ত হতে পার্ল্লে মানুষ সুখ ও দুঃখের দোলাকে আয়ত্ত কর্ত্তে পারে। যদিও যতক্ষণ না সেই পরম সত্য তার আপনার হয়, না পাওয়ার দুঃখ আরও তীব্রতা প্রাপ্ত হয়, কামনাও তার যায় না, শুধু এই প্রভেদ যে সমস্ত কামনা তার একীভূত হয়ে একটী মাত্র পরম আকাঙ্ক্ষায় পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ সেই পরম সত্যকে পাওয়া।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথ।

কেওঞ্ঝরগড়।

শ্রীরুবি সরকার।

অন্যবারের তুলনায় সে বছর গ্রীষ্মের অবকাশে কলকাতাবাসীদের বিদেশভ্রমণের মাত্রাধিক্য ঘ'টেছিল। সেবার তো শুধু গ্রীষ্মের উত্তাপই কলকাতা ত্যাগের একমাত্র কারণ নয়—সেই সঙ্গে বোমাপড়ার আতঙ্কও লোকের মনে খানিকটা কার্যকরী হ'য়েছে—তাই শেয়ালদা ও হাওড়া ষ্টেশনে নিত্য বিদেশগামী যাত্রীর দারুণ ভীড়।

বোমা পড়ার ভয়ে না হোক গরমের জ্বালায় ক'লকাতার বাইরে যাওয়া স্থির ক'রলাম। কোথায় যাওয়া যায় ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছিলামনা,—এমন সময়ে উৎকলপ্রদেশের স্বাধীন রাজ্য কেওঞ্ঝর ষ্টেট থেকে আমার এক আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে গ্রীষ্মের অবকাশে কেওঞ্ঝরে যাওয়া স্থির ক'রলাম। ক'লকাতা থেকে বাইরে যাবার নামে প্রাণ অধীর হ'য়ে ওঠে। রাজধানীর বহু বৈচিত্র্যময় আকর্ষণী শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার কলমুখরতা এক একসময়ে দেহমনে ক্লান্তি এনে দেয়—বাইরের একটু খোলা আকাশ বাতাসের সংস্পর্শে আসার জন্য মন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে—তাই বাইরে যাবার ডাকে সাগ্রহে সাড়া দিলাম। তাছাড়া উড়িষ্যার কোন স্বাধীন করদ রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ এপর্যন্ত হয়নি। লোকমুখে এই স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রসঙ্গে বহুবিধ আলোচনা শুনেছি। একবার তার স্বরূপ স্বচক্ষে দেখার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তাই কেওঞ্ঝরে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে অত্যন্ত খুসী হ'য়ে উঠ্‌লাম।

কেওঞ্ঝর পথে যাত্রী আমরা তিনজন—মা ও আমরা দুই ভাইবোন। খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের যাত্রার আয়োজন সুরু হল। রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটের পুরী প্যাসেঞ্জারে আমাদের যাবার স্থির হ'য়েছে। নির্দ্ধারিত দিনে যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হ'লাম। ট্রেণে উঠ্‌তে যাচ্ছি—বাধা পড়ল—এক বিশালকায় খোট্টা ভদ্রলোক সশব্দে হেঁচে উঠ্‌লেন—"হ্যাঁচ্চো........"। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল,—এরা নির্বিবাদে যেতে দেবেনা দেখ্‌ছি। খনার বচন স্মরণ করলাম—।

"বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি
যত্নপূর্ব্বক সেই হাঁচি কদাচ না বাছি।"

ভদ্রলোককে নেহাৎ বৃদ্ধ বোধ হ'ল না। তাঁর হাঁচিটা সর্দির না নিছক অকারণ জনিত জানবার একটু কৌতূহল হয়েছিল—কিন্তু তখন আর জেনে আসার সময় ছিল না।

একটু ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের সচেতন ক'রে ট্রেণ চল্‌তে সুরু করল। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের কামরায় বিশেষ ভীড় পাইনি,—অবশ্য পূর্ব হতেই আমাদের 'বার্থ-রিজার্ভ' করা ছিল,—রাত্রে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি।

নির্ধারিত সময়ের একঘণ্টা দেরীতে ট্রেন যখন চক্রধরপুর ষ্টেশনে এসে থাম্‌ল--তখন ৭টা বেজে গিয়েছে। ক'লকাতা থেকে কেওঞ্ঝর ষ্টেট পর্যন্ত যাতায়াতের রেলপথ নাই। চাঁইবাসা বা চক্রধরপুর পর্যন্ত ট্রেণে এসে মোটরের শরণাপন্ন হ'তে হয়। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য ষ্টেশনে মোটর প্রস্তুত ছিল। চক্রধরপুর ষ্টেশন থেকে আমাদের গন্তব্যস্থান কেওঞ্ঝরগড়ের দূরত্ব প্রায় ৮৩ মাইল।

৮টার সময়ে আমরা কেওঞ্ঝরগড় অভিমুখে রওনা হ'লাম। প্রথম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, কিন্তু তারপরই হঠাৎ মোটরের দ্রুত গতি বৃদ্ধি হওয়াতে তাকিয়ে দেখি গাড়ীটা রাস্তা থেকে দশ-বার ফুট নীচে নেমে যাচ্ছে। সৌভাগ্যবশতঃ অক্ষত দেহেই আমরা রক্ষা পেলাম। একটি ছোট ছেলে আচম্‌কা গাড়ীর সাম্‌নে এসে পড়েছিল তাকে বাঁচাতে গিয়েই আমাদের পথচ্যুতি ঘ'টেছিল! ভাবলাম হাওড়া ষ্টেশনের সেই খোট্টা ভদ্রলোকের বেয়াড়া হাঁচিই এর জন্য দায়ী!

এবার পথের কিছু বিবরণ দেওয়া যাক্‌। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গণ্ডী পর্যন্ত দ্রষ্টব্য তেমন কিছু দেখ্‌তে পাইনি। বিহার অঞ্চলে সাধারণতঃ যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় এদিকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রায় ৪৭ মাইল আসার পর বৈতরণী ব্রিজ দেখা গেল— রূপালী রেখার মত বৈতরণী নদী বয়ে চলেছে। আমরা সশরীরে বৈতরণী পার হলাম!—বৈতরণীর সেতুটি কেওঞ্ঝর ষ্টেট ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমারেখা নির্ধারিত ক'রে দিয়েছে। সেতুটির অর্ধেকটা ইংরাজ রাজ্যের এবং অর্ধেকটা কেওঞ্ঝর ষ্টেটের। শুন্‌লাম এই পোলটির সংস্কারের সময়েও আধাআধি ভাগ ক'রে খরচ নির্বাহ করা হ'য়ে থাকে।

এইবার আমরা কেওঞ্ঝর রাজ্যের মধ্যে এসে পড়লাম। প্রথমেই যা' দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা' পথপার্শ্ববর্তী জঙ্গল এবং কেওঞ্ঝরের রাস্তা,—সোজা পথ চ'লে গিয়েছে দৃষ্টি তার মাঝে গিয়ে হারিয়ে যায়। চোখ বন্ধ ক'রে যদি কাউকে কেওঞ্ঝরগড়ের দিকে মুখ ক'রে পথে ছেড়ে দেওয়া যায় সে বোধহয় অক্লেশে তার গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। বাস্তবিক কেওঞ্ঝরের এই সুন্দর রাস্তা আমার ভারী ভাল লেগেছিল।

পথের ধারে স্থানে স্থানে তিনফুট আন্দাজ লম্বা ও হাতখনেক চওড়া পাথরের টুক্‌রো—অনেকটা পথপার্শ্ববর্তী মাইলপোষ্টের ধরণের উঁচু হ'য়ে থাক্‌তে দেখেছিলাম। পরে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম কোন পাহাড়ী বীরের মৃত্যু হ'লে তার স্মারক স্বরূপ অধিবাসীরা ঐ ধরণের পাথর পুঁতে রাখে।

কেওঞ্ঝরগড়ের ত্রিশ মাইল দূরে চম্পুয়া। এখানের অফিস থেকে আমাদের পৌঁছখবর টেলিফোন ক'রে গড়ে জানিয়ে দিল। ষ্টেটের প্রায় সর্বত্রই টেলিফোন সংযোগ রয়েছে। এখানের ফোন করার রীতি দেখে খুব আমোদ লেগেছিল। এদিকে ফোন নম্বরের কোন বালাই নাই। একটি ঘর নিয়ে এক্সচেঞ্জ অফিস স্থাপিত হ'য়েছে। শুন্‌লাম চাকর লোকজনেরাই এদিকে ফোন ধরে এবং রিসিভার তুলে সর্বাগ্রে তারা নিজের পরিচয় দিয়ে অপরপক্ষের নাম জেনে নেয়। দুর্বোধ্য উৎকল

ভাষায় পরিচয় আদান প্রদানে অন্ততঃ মিনিট দশেক সময় অতিক্রম হওয়ার পর নির্ধারিত স্থানে টেলিফোন সংযোগ পাওয়া যায়। টেলিফোন করা এদিকে একটি রীতিমত পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। ফোনপর্ব সমাধা হওয়ার পর চম্পুয়া থেকে রওনা হ'লাম। পথে আর ভাগ্যক্রমে কোন বাধাবিঘ্ন পায়নি।

কেওঞ্ঝরগড়ে ১১টা নাগাদ এসে পৌঁছুলাম। ক'লকাতার অসহ্য গরম থেকে এসে এখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়া বেশ ভাল লাগলো। কেওঞ্ঝরগড়ের বর্ণনা দেবার আগে এই রাজ্যের সম্বন্ধে যতটুকুন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তা' লিখ্‌ছি।

কেওঞ্ঝর রাজ্য বহু প্রাচীন—একাদশ শতাব্দীতে এই রাজ্যের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হ'য়েছে। অনুমানিক ১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরাধিপতি মানসিংহের পুত্র জয়সিংহ জগন্নাথদর্শনে পুরীতে আগমন করেন। তাঁর শৌর্যবীর্যে আকৃষ্ট হ'য়ে পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রদেব স্বীয় কন্যা রাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়সিংহের বিবাহ দেন। প্রতাপরুদ্রদেবের নিকট হ'তে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ জয়সিংহ হরিহরপুর অঞ্চল উপহার লাভ করেন। পদ্মাবতীকে নিয়ে জয়সিংহ পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের দু'টি পুত্র ভূমিষ্ট হয়—জ্যেষ্ঠ আদি-সিংহ এবং কনিষ্ঠ যতি-সিংহ। কৈশোর হ'তে যুবরাজ আদিসিংহ বীর যোদ্ধারূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আদিসিংহের বীরত্বে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁর মাতামহ প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে ভঞ্জ উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তারপর থেকে তিনি 'আদিভঞ্জ' নামে সর্বত্র অভিহিত হ'য়েছেন।

মৃত্যুর পূর্বে জয়সিংহ হরিহরপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—এক অংশ তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য রাখেন এবং অপরাংশ কনিষ্ঠ যতিসিংহকে প্রদান করেন। যতিসিংহ পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁর রাজত্ব স্থাপনা করলেন এবং সেই নবনির্ম্মিত রাজধানীর নামকরণ হ'ল 'কেন্দুঝোর'। 'কেন্দু' অর্থে জঙ্গল এবং ঝোরা অর্থে ঝরণা। নূতন রাজধানী যেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার পার্শ্বস্থ একটি জঙ্গল থেকে ঝরণা নির্গত হয় এবং তদনুসারে রাজধানীর নাম 'কেন্দুঝোর' রাখা হয়,—অবশ্য এখন আর সে ঝরণার অস্তিত্ব নাই। পার্বত্য জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে যতিসিংহ বৈতরণীর তীর হতে তাঁর রাজধানী বর্তমান 'কেওঞ্ঝরগড়' স্থানান্তরিত করেন। ক্রমশঃ 'কেন্দুঝোরের পরিবর্তে রাজ্যের নাম হ'ল 'কেওঞ্ঝর'।

জয়সিংহের মৃত্যুর পর আদিসিংহ হরিহরপুরের দ্বিতীয়অংশটি অধিকার করেন এং স্বীয় উপাধি অনুসারে তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের 'ময়ূরভঞ্জ' নামকরণ করেন।

কেওঞ্ঝর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আর একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এর থেকে জানা যায় যে ভূঁইয়ার শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দুটি বালক রাজকুমারকে রাজপরিবারের অগোচরে নিয়ে পালিয়ে আসে এবং সেই শিশুকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে তারা কেওঞ্ঝর রাজ্যের সংস্থাপন

করে। সেই কারণে নাকি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের রাজমোহরে দুটি পাশাপাশি উপবিষ্ট ময়ূরের প্রতিকৃতি চিহ্নিত আছে—এবং কেওঞ্ঝরের রাজমোহরে একটিমাত্র পেখম তোলা ময়ূরের প্রতিকৃতি আছে,—অর্থাৎ ময়ূরভঞ্জের দুটি শান্ত ময়ূরের মধ্যে একটি ময়ূর সঙ্গত্যাগ ক'রে উড়ে চলে এসেছে। এই জনশ্রুতির সত্যাসত্য যাই হোক না কেন—কেওঞ্ঝরের ভঞ্জ রাজবংশে কিন্তু রাজঅভিষেকের সময়ে রাজার ললাটে ভুঁইয়ার শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাই সর্বপ্রথম রাজটীকা অঙ্কিত ক'রে দেবার সম্মান পায় এবং রাজপরিবারের কোন শুভকাজে তাদের জন্য বিশিষ্ট আসন ধার্য থাকে।

এই তো গেল কেওঞ্ঝর রাজা এবং রাজপরিবারের কথা এবার সহরটার বিষয় কিছু লেখা যাক্। সহরটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা এবং খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখ্‌লে মুগ্ধ হ'তে হয়। দূরে বিন্ধ্যাচল পাহাড় দেখ্‌লাম—। এখানকার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরা পাহাড়টিকে রীতিমত শ্রদ্ধা করে মনে হ'ল—যতই হোক, পুরাণ বিখ্যাত পাহাড়।

এদিকে প্রতি রবিবার বেশ বড় হাট বসে দেখ্‌লাম। এই হাটবার ছাড়া অন্যান্য দিনে সাধারণতঃ কোন তরিতরকারী পাওয়া যায় না—তাই সকলে এই দিনটীতেই সারা সপ্তাহের উপযোগী ফলমূল কিনে রাখে। গ্রামান্তর থেকে গ্রামবাসীরা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে ক্রয়বিক্রয় করতে আসে।

এ দেশের শ্রমিক মেয়েরা বড় অদ্ভুত ধরণের শাড়ী পরে। বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদূর পরে না,—কপালের প্রান্তে এবং সিঁথির প্রারম্ভে একটি সিঁদূর টিপ পরে। কোন উৎসবে অন্যান্য সাজপোষাক যাই হোক্ না কেন মস্ত এক খোঁপা ক'রে তাতে সামান্য কিছু ফুল দেওয়া চাই। শুন্‌লাম এখানে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী কর্ম্মিষ্ঠা। পুরুষরা অলস বলে খ্যাত। তাদের সম্বন্ধে দুর্ণাম শোনা যায় তারা নাকি ধানকাটার সময়ে ধান কেটে নিয়ে নীচু হ'য়ে খড়গুলি তোলার কষ্ট পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজী নয়।

সহর পরিদর্শনে গিয়ে কেওঞ্ঝরের হাঁসপাতাল, বিদ্যায়তন, কাউনসিল চেম্বার, জগন্নাথদেবের মন্দির অতিথিশালা প্রভৃতি দেখে এলাম। সম্প্রতি রাজ্যের নিজস্ব 'হাইকোর্ট' হয়েছে,—হাইকোর্টের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য দেখ্‌লাম।

কেওঞ্ঝর রাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শনের পর—কেওঞ্ঝর রাজ্য থেকে বিদায় নেবার পূর্বে একদিন ভাল্লুক শীকার দেখ্‌তে যাবার জন্য আমন্ত্রিত ছিলাম। এদিকের জঙ্গলে বন্য জন্তু প্রচুর পাওয়া যায়,—তার মধ্যে ভাল্লুক, বাঘ এক বুনোহাতীই সমধিক। যাইহোক মাচানে বসে শীকার দেখার নামে মনটা খুসীতে ভরে উঠ্‌লো। বিকেলে ৬টা নাগাদ রওনা হ'য়ে মাইল সাতেক যাবার পর নির্দিষ্ট স্থানে আমরা উপস্থিত হ'লাম। পাহাড়ের কোলে আমাদের জন্য মাচান পূর্ব হ'তে প্রস্তুত ছিল—তার উপরে তো সবাই উঠে বসলাম। আমার সেজদা ও সঙ্গী অপর দুটি ভদ্রলোক বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দিনের আলো ম্লান হ'য়ে এলো,—দেখ্‌লাম পাহাড়ের

উপর থেকে ছু'টি প্রকাণ্ড ভাল্লুক নীচে নেবে আস্‌ছে এবং তাদের পিঠের উপর ছোট ছোট ছু'টি বাচ্চা বসে আছে। তাদের বসার ধরণটি আমার ভারী ভাল লেগেছিল। হাতীর পিঠে যেমন ক'রে মাহুত বসে বাচ্চাগুলি ঠিক সেই ধরণের—তাদের মায়ের চুল ধ'রে ব'সে ছিল। ভাল্লুকগুলিকে না দেখা পর্যন্ত আমার শীকার দেখার একটা তীব্র উত্তেজনা ছিল কিন্তু তাদের দেখার পর থেকেই আমার মন শীকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো। শীকারীরা তখন শীকার পাবার আনন্দে উন্মত্ত,—আমার নিষেধ তাদের কাণে ঢুক্‌লো না। ...... এক সঙ্গে তিনটি বন্দুক গর্জন ক'রে ওঠার পরমুহূর্ত্তে ভাল্লুক ছু'টির রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়া পড়ল। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মুমূর্ষু ভাল্লুক ছু'টি তাদের শাবকগুলিকে শীকারীর লুব্ধ দৃষ্টির বাইরে নিয়ে যাবার সাধ্যমত চেষ্ট ক'রেছিলো।—একেই বলে মাতৃস্নেহ!—আর কখনও এমন নির্মম জীবহত্যার দর্শক হবোনা প্রতিজ্ঞা ক'রে রাত্রি বেলা বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম। ভোরের দিকে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আমাদের নাবিয়ে দিল।

সমস্যা। (ধর্ম্ম)।

শ্রীইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দৃশ্য

(জগদীশ রায়ের বাড়ী। হিন্দুমুসলমান পাঁচটি ভদ্রলোক বসে গল্পসল্প করছিলেন। কথা চলছে হিন্দুমুসলমান সমস্যা নিয়ে; সবাই খুব উদারপন্থী। কথাবার্ত্তার মাঝে এককোণে জগদীশের ছেলে চন্দ্র আর মীর্জা আলি খাঁর ছেলে হানিফ সবায়ের চোখ এড়িয়ে হাসিঠাট্টা করছিল: ছুজনেই কলেজের ছেলে, ভারি ভাব ছুজনে)

জগদীশ—হাঁা, আমার মতও তাই মিঃ খাঁ, ঐ হিন্দুমহাসভা আর মুসলিম লীগ, ও ছুটোই উঠিয়ে দেওয়া উচিত। মানুষ, মানুষ। এই তার পরিচয়। কি বলেন মিঃ আলি?

আলি—(একটু দ্বিধায়) নিশ্চয় নিশ্চয়, you're quite right মিঃ রয়, কিন্তু মুসলিম লীগ তো মানুষের অপকার কিছু করতে চাইছে না। Minorityকে protect করতে—

মনোতোষ বাবু—হিন্দুমহাসভাই বা কি মানুষের অপকার করছে? Minority group এর প্রতি এঁদের তো কোন—

মির্জা আলি খাঁ—না, না, না। আমি মিঃ রয়ের কথাই সম্পূর্ণ সমর্থন করি। Minority, majorityর প্রশ্ন ওঠে কেন? আমরা যে মানুষ, হিন্দু অথবা মুসলমান নই এটা ভুলে যাই বলেই তো—

জগদীশ—Exactly so. লোকে কেন যে ধর্ম ধর্ম করে মরে এটা আমি ভেবে পাইনা। এই মূর্খগুলো ভাবেনা যে আমরা মানুষ—মানুষ—মানুষ।

(জগদীশ বাবুর গলাটা প্রচণ্ডভাবে চড়ে ওঠাতে চন্দ্র ও হানিফের আলোচনায় বাধা পড়ল)

চন্দ্র—(নিচু গলায়) আঃ মানুষ তো মানুষ। কে বলছে যে আপনারা গরু।

হানিফ—বাপ্, সত্যি কি চেঁচাচ্ছে দেখ্। বাপু, মানুষ যে মানুষ তা খুব ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে। গরু হলে আমার মত জাত মুসলমানের সামনে আর বসে থাকতে হত না, এতক্ষণে কাবাব বনে যেতে।

চন্দ্র—(হেসে) খবদার! আমার মত সাত্বিক হিঁদুর সামনে গোহত্যে? শূওর কোথাকার! (কর্তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) চল পালাই, কর্তারা বড় তাকাচ্ছে এদিকে। (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জগদীশের বাড়ীর ভেতর)

চন্দ্র—ওরে ভোলা, দে, দে,, জল দে শিগ্‌গির, আমার পাঁচটায় বেরুতে হবে। এই গ্লাস রয়েছে, কোথায় যাচ্ছিস আবার?

ভোলা—দাদাবাবু, ওটায় হানিফবাবু জল খেলেন যে,—এঁটো গেলাস।

চন্দ্র—একটু ধুয়ে দেনা গাধা। (ভেংচিয়ে) এঁটো গেলাস!

মা—ওকিরে, ধুয়ে দিলেই হল? ওটা মোছলমানের খাওয়া যে। ওরে ভোলা, খোকাকে মাজা গেলাসে জল দে।

চন্দ্র—(রেগে) মোছলমান তো কি হবে শুনি, সেতো আর তোমাদের জন্য জাতধর্ম বদলাতে পারে না। ভোলা; তুই ওই গেলাসেই জল দে। কতদিন এক খাবার দুদিকে কামড় দিয়ে মেরে দিলুম, এখন আবার বলে মোছলমান!

মা—(রেগে) লক্ষ্মীছাড়া, তুই মনে করেছিস কি?

(জগদীশ এসে পড়লেন)

জগদীশ—এত চেঁচামেচি কেন ? হয়েছে কি ?

মা—এই তোমার ছেলের কীর্ত্তি ! মোছলমানের এঁটো গেলাসে জল খেয়ে তোমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবেন। যেমন তুমি মানুষ করেছ—

জগদীশ—(বিরক্তভাবে) অমনি আমার দোষ ! (চন্দ্রের প্রতি) কেন আমি কি ছত্রিশজাতের এঁটো গেলাসে খেতে বলেছি তোমায় ? এঁটো গেলাসে খাওয়া যে Sanitary নয়—

চন্দ্র—আমার স্বাস্থ্যের জন্য বল্লে আমি নিশ্চয় খেতুমনা। কিন্তু মা বলছেন মুসলমান—

জগদীশ ঠিকই তো। ওরা অনেক সময়েই নিষিদ্ধ জিনিষ খায়, অতএব ওদের—

চন্দ্র—হানিফ কোন নিষিদ্ধ জিনিষ খায়না, ডাক্তার ওকে মাছমাংস খেতে বারণ করেছেন। ওদিকে মামাবাবুর তো খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্যে কিছু বাদ যায়না অথচ তাঁর গ্লাসে আমাকে জল খেতে দিতে মার আপত্তি নেই !

মা মামার সঙ্গে হানিফের তুলনা,—এত সাহস তোর !

জগদীশ তোমায় যা বলা হচ্ছে তাই করোনা কেন ? অত কথায় কাজ কি ?

(চন্দ্র গুম হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

(মির্জা আলি খাঁর বাড়ী)

হানিফ—যা অন্যায় নয় তা আমি ছাড়ব কেন ?

আলি—ছাড়বে, ছাড়তেই হবে। আমি পছন্দ করি না বলে ছাড়বে।

হানিফ—আপনার পছন্দ যদি অন্যায় হয় তবে ?

আলি—আমায় ন্যায়-অন্যায় শেখাবে কলেজের ছোকরা ? আমার সব জানা আছে,—আজ তুমি জগদীশ রায়ের ছেলের সঙ্গে গলাগলি করছ, কাল তুমি জগদীশ রায়ের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে. আমার সব জানা আছে। তোমায় শেষ কথা বলে দিলাম, চন্দ্রের সঙ্গে অত মেশামিশি করবে না।

হানিফ—কেন চন্দ্রের দোষ কি ?

আলি—(চিৎকার করে) কি দোষ, কি গুণ, সে কথা আমি তোমায় বলতে পারব না। চন্দ্ররায়ের সঙ্গে তোমায় দেখলে আমি তোমায় দিল্লী পাঠিয়ে দেব।

(হানিফ বড় ছেলেমানুষ, চোখে জল এসে পড়াতে সে পালিয়ে গেল। গোপালদার প্রবেশ, ইনি সর্ব্বঘটে থাকেন)

গোপালদা—এই যে, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনাকে বুধবারের মিটিংয়ের কথা মনে করিয়ে দিতে এলুম। হানিফসাহেব অমন করে পালালেন কেন?

আলি—(হেসে) ও কিছু নয়। বসুনদা, চা দিতে বলি?

গোপালদা—না না, চাটা নয়। আমি পরশু, বুধবারের মিটিংয়ে যাবার কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি। আচ্ছা চলি।

চতুর্থ দৃশ্য

(পার্কের বেঞ্চ)

চন্দ্র—এই নীচতা নিজের বাপমায়ের ভিতরে কেমন লাগে?

হানিফ—(বেগে ঢুকল) কি করছিস রে চন্দ্র? (পাশে বসে পড়ল)।

চন্দ্র—কিরে, কি হয়েছে রে তোর? মুখটা অমন কেন?

(হানিফের চোখে জল আসছিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল)।

চন্দ্র—কি হয়েছে রে? একি তুই—? আরে ব্যাপার কি? (চন্দ্রের নিজের চোখেও যেন জল আসতে চায়, পকেট থেকে রুমাল বার করে গোপনে তাড়াতাড়ি চোখের জলটা মুছে নিয়ে) বুড়ো বয়সে কাঁদছিস? শোন, শোন,—কি হল বল্ই না?

(গোপালদার সহসা প্রবেশ)

গোপালদা—তোমার চোখই বা শুক্‌নো কোথায় চন্দ্র? তোমাদের ব্যথা যে একই জায়গায়। তোমাদের চোখের জলে কি ভারতবর্ষের এ কলঙ্ক ধুইয়ে দিতে পারনা ভাই?

"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদণ্ড তার;
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ় তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

রবীন্দ্রনাথ

মুখোস।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

উমার মৃত্যুর পরে দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। চূণীলাল এ একমাস আর গৃহের বাহির হন্ নাই, সর্ব্বক্ষণ মাতৃহীনা শিশুকন্যাকে খেলা ধূলায় ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন। শেষ জীবনে তাঁহার ব্যবহারে উমা যে ব্যথা পাইয়া গিয়াছে, ইহাও তাঁহার বুকে শেলের মত বিঁধিয়া রহিল। উমার এই অকালমৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী করিয়া সমস্ত অন্তর তাঁহার শোকের আগুনে পুড়িতে লাগিল। বহুদিন উমার সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিলেও "আমার উমা আছে" এই মধুময়ী চিন্তা যেন অজ্ঞাতে মনের মধ্যে মধু সিঞ্চিত করিত, কিন্তু সে মধু তখন ভোগ করিতে পারেন নাই, আজ সেই মধুভাণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ায় জগৎ তাঁহার মধুহীন হইয়া পড়িল।

সমারোহে করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। যতই দিন যাইতে লাগিল চূণীলালের প্রাণে উমার বিয়োগ ব্যথা ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই দুঃসহ যাতনা হইতে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নানা দুষ্কার্য্যে মগ্ন হইয়া হইয়া রহিলেন।

অসহায় হইয়া পড়িল গ্রামের লোক। তাহাদের সকল প্রকার দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যে একটি মহৎ প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিত, আজ তাহা কালের গ্রাসে অস্তমিত হইয়াছে। সেদিন চণ্ডী ঘোষের চণ্ডী মণ্ডপে বসিয়া তাহারা তাহাদের দুঃখের কথাই আলোচনা করিতেছিল।

হারাণ শিক্‌দার বলিল "গ্রামের লক্ষ্মী তো বিদেয় হ'লেন, এখন এ দানবের রাজ্যে বাস কোর্‌ব কেমন করে?"

অধর আচার্য্য বলিল "দেশে যে বাস কোরতাম, সেতো কেবল মা লক্ষ্মীর জন্যেই, নয়তো এ মহিষাসুরের রাজ্যে কি কেউ বাস করতে পারে?"

নিধু হালদার বলিল "এখন উপায় কি? এখন মান প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব বল্।"

অভয় মুখুজ্যে নিম্ন স্বরে বলিল "সে খবর কি জানিস্ তোরা?"

কি এমন গোপন খবর যে আমরা জানিনা, ভাবিয়া সবগুলি মাথা একত্র হইয়া অভয় মুখুজ্জের সম্মুখে জড় হইল।

অভয় মুখুজ্জে তখন যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, "শুনিস্ নি যখন, তখন যাক্—কি কাজ পরের কথায় থেকে? কে আবার কোথা থেকে শুনে ফেল্‌বে। যাক্—।"

তখন চারিদিক হইতে অনুরোধের শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেই এই কথা প্রমাণিত করিতে লাগিল যে, তাহার মুখ হইতে কোনো গোপন কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার পেটের কথা মানুষ ছাড়া দেবতাও জানিতে পারে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন অভয় মুখুজ্জে নির্ভয় হইয়া "কেউ যেন না জানে" "বড় গোপন কথা" ইত্যাদি সতর্কতা সূচক বাক্য দ্বারা ভূমিকা করিয়া বলিল যে "হরি খুড়োর বিধবা বোন সেদিন ডুলি ক'রে আস্‌ছিল, পথে বেয়ারা গুলো অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে, বোনের কোন খোঁজ নেই।" সকলেই কণ্টকিত হইয়া বলিল কী সর্ব্বনাশ! দেশের বাস উঠাতেই হবে দেখ্‌ছি।

এদিকে মায়ের শেষ কথা স্মরণ করিয়া তন্দ্রা সব সময় পিতার সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করে। চূণীলালও কিছুদিন পর্য্যন্ত সব সময় কন্যার কাছে থাকিতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব ফিরিয়া আসিল। কোনো সময় কন্যাকে এড়াইতে পারেন, কখনো পারেন না। সমস্ত মন প্রাণ বাগান বাড়ীতে পড়িয়া থাকিলেও কন্যার আব্‌দার তাঁহাকে রাখিতেই হয়। বাগান বাড়ীতে তাঁহার অবর্তমানে সকল আয়োজন অসম্পূর্ণ থাকে, অধীর বন্ধুগণ তাঁহার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন হয়তো চূণীলালকে তন্দ্রার আহারের কাছে বসিয়া থাকিতে হয়। বেয়ারা আসিয়া খবর দেয়, সকলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তিনি উঠিবার উদ্যোগ করিতেই তন্দ্রা হাতের গ্রাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে "বাবা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমার মাছের কাঁটা বেছে দাও, নয়তো আমি খাবনা।"

পিতা অনন্যোপায় হইয়া বলেন, আমার কাজ আছে, আমি যাই মা, ওই তো বামুন পিসীমা আছেন, উনি কাঁটা বেছে দেবেন।"

মাথা ঝাঁকাইয়া প্রবল আপত্তি জানাইয়া তন্দ্রা বলে "ওদের আমি চাইনে। মা আমার মাছের কাঁটা বেছে দিতেন, এখন তুমি দাও, নয়তো আমি খাব না।"

মায়ের প্রসঙ্গেই মেয়ের চোখে জল আসিয়া পড়ে, পিতারও বুকের ভিতর টন্‌ টন্‌ করিয়া ওঠে, তিনি তাড়াতাড়ি মাছের কাঁটা বাছিতে বসেন।

কোনোদিন রাত্রে মেয়েকে ঘুম পাড়াইবার জন্য পিতাকে ঘুমপাড়ানী গান গাহিতে হয়। বন্ধুগণের প্রেরিত বার্তাবহ বারবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। কন্যাকে নিদ্রিত মনে করিয়া উঠিতে গেলেই সে লাফাইয়া উঠিয়া বসে, "বাবা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? মা তো আমাকে ঘুম না পাড়িয়ে কোথাও যেতেন না। তুমি গেলে আমি ঘুমুব না, মার জন্য কাঁদ্‌ব।"

চূণীলাল যে কথা ভুলিয়া থাকিতে চান, বারবার তন্দ্রা তাহাই মনে করাইয়া দেয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলেন "এই তো আমিও তোমাকে ঘুম পাড়াচ্ছি কোথাও যাবনা মা, তোমার কাছেই থাক্‌ব।"

অধীর সঙ্গীগণ বলাবলি করিতে লাগিল যে চূণীলালের উদ্ধারের আর কোন্ আশা নাই। ওর বৌটা ছিল এমন সয়তানী যে, আমাদের আমোদ মাটি করাই ছিল তার কাজ, সে যদিবা মহামায়ার দয়ায় সরিয়া পড়িল তো তাহার স্থানে রাখিয়া গেল এমন একজনকে যে তার চেয়েও ক্ষমতাশালী।

মাকে হারাইয়া তন্দ্রা এম্নি করিয়া পিতার মধ্যেই মাকে ফিরিয়া পাইল। সকল রকম অসহিষ্ণু পিতাও পরম সহিষ্ণুতার সহিত কন্যার খেলার সঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

সঙ্গীগণ স্থির করিল গ্রামে থাকিতে জমিদারকে তাহারা একেবারে মুঠার মধ্যে পাইতেছেনা, তাহাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে চলিলে হয়তো জমিদার সাধুও বনিয়া যাইতে পারেন, তখন তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি শেষে পথে বসিবে? তাহারা জমিদারকে লইয়া কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় যাওয়া স্থির করিল। পীড়াপীড়িতে চূণীলালও সম্মত হইলেন। কিন্তু বন্ধুগণ সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিল না, বলিল "তোমাকে ভর্সা নেই বাবা, মেয়েটা হয়তো এক্ষুনি টেনে নিয়ে আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলতে বসবে। ইহকাল পরকাল তোমার তোমার ঝর্‌ঝরে হ'য়ে গেছে আর কি? এতকাল রইলে নোলক পরা বউএর ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে, এখন আবার হ'য়েছে খুদে মেয়ে। ভ্যালা বেকুব তুমি! টাকা পয়সার মালিক করেছেন ভগবান, প্রেম্‌সে ফুর্ত্তি লোটো। ভয় কর্‌বে কাকে?

ইহারা তো জানেনা উমা তাঁহার কি ছিল, তন্দ্রা তাঁহার জীবনের কতখানি জুড়িয়া আছে। চোখের জল চাপয়া কলঙ্ক মোচনের জন্য চূণীলাল বলে 'কী যে তোরা বলিস্। ভয় আমার কিসের? মেয়েটা কান্নাকাটি করে, তাই... . ..।"

কিন্তু বিপদ ঘটিলই। শত সাবধানতা সত্ত্বেও, পিতা যখন কলিকাতায় যাত্রা করিবার জন্য সুক্ষ্ম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন, কন্যা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধূলামাখা হাতে তাঁহার সৌখিন কোঁচা চাপিয়া ধরিল। পিতা একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। সে সব ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কন্যা বলিল "বাবা, তুমি কোথায় যাও, আমিও সঙ্গে যাব।" শঙ্কিত হইয়া পিতা বলিলেন, আমি একটা খুব বড় কাজে যাচ্ছি, খুব শীগ্‌গীর ফিরে আস্‌ব। তোমার জন্য কি আন্‌ব? লাল সাড়ী? মস্ত বড় পুতুল?

এত সব লোভনীয় বস্তুতেও সম্পূর্ণ নিরাসক্তি দেখইয়া তন্দ্রা বলিল "ও সব আমার চাইনে, তুমি যেতে পাবে না।'

পিতা প্রমাদ গণিয়া বলিলেন "না গেলে কত কাজ নষ্ট হবে, ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি!"

"ছাই কাজ, হোক্‌গে নষ্ট। আজ আমার পুতুলের বিয়ে, তোমাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে এসেছি, খাবে চল" বলিয়া তন্দ্রা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। খেলার ঘরে নিয়া তাঁহাকে একখানা

ইটের উপরে বসাইল। জমিদারকে দেখিয়া অন্যান্য খেলুড়েগণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে উদার হাস্যে তাহাদিগকে অভয় দিয়া তন্দ্রা বলিল "ভয় কর্‌ছিস্ কেন ? ও বাবা, তোদের কিছু বল্‌বেন না।"

ঘাসের শাক, শুর্‌কীর ভাত, কাদার দই প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া পিতাকে খাওয়াইল। পিতাও নকল আহার কার্য্যে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিলেন। "রান্না কেমন হইয়াছে ?" এ কথার উত্তরেও তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিতে হইল।

সহিস্ গাড়ী যুতিয়া আসিয়া খবর দিলে তন্দ্রা বিজ্ঞের মত বলিল "আজ যাওয়া হবে না, ঘোড়া খুলে দিগে যা।"

জমিদারও বলেন "ওদের বল্‌গে যা আজ যাওয়া হবে না, আমার শরীর ভাল নেই। কোল্‌কাতায় যেন একখানা তার ক রে দেয়।"

এম্‌নি করিয়া দিন কাটিয়া সাত আট বৎসর চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রোতা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

তোমার গান যে মধুর লেগেছে শুধু এইটুকু ব'লে
আমি যবে গেনু চলে
কে জানিত আমি তোমার মাঝারে
নিজেরে রাখিয়া গেনু বীজাকারে
শুধু এই কথা বলি।
তোমার চিত্তে আমার লাগিয়া কি বাসনা কুতূহলী
সহসা উঠিল জাগি,
দরদি শ্রোতার পরে হ'লে অনুরাগী।
শুধু ওইটুকু আনন্দ নিবেদিয়া
নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুরে আমি বাঁধিয়া তোমার হিয়া
রহিলাম তব চিতে,
পারিলেনা তুমি আমারে বিস্মরিতে।

কতকাল পরে হঠাৎ সেদিন দেখা হল দুজনায়,
ভোলোনি তুমি আমায়।
পরিচিত সম যবে মধু হেসে
নীরবে দাঁড়ালে মোর কাছে এসে,
নিমেষে বুঝিনু আমি,
স্মৃতিতে তোমার লভিয়াছি ঠাঁই, শিকড়ে গিয়াছি নামি
অন্তস্তলে তব,
গায়িকার প্রাণে শ্রোতার জনম নব
লভিয়াছে তরু বৎসল বাসভূমি,
ভোলোনি আমায় তাই সাগ্রহে নিকটে দাঁড়ালে তুমি।
সাহস জাগিল প্রাণে
কহিলাম আমি—ভুলিনি তোমার গানে।

কতটুকু দিয়া কতখানি আমি লভিয়াছি বিনিময়ে
ভাবি তাই বিস্ময়ে।
ছিল কি অভাব দরদি শ্রোতার
অন্তরে তার, কণ্ঠ যাহার
এমন অমৃতময়?
আপনার গুণে যাহার হৃদয় করেছিলে তুমি জয়,
তাহারে স্মরণে রাখি
সহানুভূতির কণাটি করিলে শাখী
প্রাণের নিভৃতে গোপনে ঢালিয়া বারি
সে চারার মূলে উজাড়ি তোমার স্মৃতি সঞ্চিত ঝারি
একটি কথার পরে
বীজ হয় তরু অজানা প্রাণান্তরে।

১০।৭।৪১

ঘোড়সওয়ার।

নিভা সুন্দরী, আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করার দরুণ একটু রোম্যাণ্টিক। তার চৌদ্দ বছরের জন্মদিনে সে ডায়েরিতে লিখল—"আজ মনে হচ্ছে পৃথিবীটা বড় সুন্দর, আজ আমার কেন জানিনা সুধু সুধু আনন্দ হচ্ছে—বোধ হয় এবার প্রেমে পড়ব।"

তারপর থেকে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সে তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে, চা খেয়ে, দিদির কোন একটা কবিতার বই হাতে নিয়ে রাস্তার ধারের একটা জানলায় বসে থাকত, যদি কোন শুভমুহূর্তে তার বাঞ্ছিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়, সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসা রাজপুত্রের অপেক্ষায় নিভারও বসে থাকা আর ফুরায়না।

শেষে একদিন হঠাৎ বিধি বুঝি সদয় হলেন। শরৎ কালের এক গোধুলিবেলায় 'প্রিন্স্-চার্মিং' এর সঙ্গে নিভার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সে যাচ্ছিল একটা ঘোড়ায় চড়ে, ঠিক তাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে। ডায়েরিতে লেখা হয়ে গেল—"কি তেজস্বী তার কালো ঘোড়াটা, কি উদার তার প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাসা! গায়ের সিল্কের সার্টটা আর মাথার কালো কোঁকড়া চুলগুলো কি সুন্দর করে উড়ছিল!! মনে হয় যেন কোন্ যুগযুগান্তর থেকে ও এমনি করে আমার মনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে গেছে।"

এই স্বর্গীয় রহস্যটা নিয়ে নিভার দম আটকে আসতে লাগল, কিন্তু বাড়ীতে এমন কেউ নাই যার সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে মনের মধ্যে একটু আরাম পাওয়া যায়। বাবা দিনরাত ফাইল ঘাঁটেন, দিদি তার নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়েই ব্যস্ত, নিভাকে একটা মানুষের মধ্যে গণ্য করে না, আর খোকাটা তো নিতান্তই ছেলেমানুষ; বাকি শুধু মা,—তাও মার কাছে এ কথাটা ঘূণাক্ষরে প্রকাশ হলে প্রশ্রয়ের চেয়ে ধমক খাবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই সে একদিন দুপুরে—বিকালটা তো নষ্ট করা যায় না—উস্কোখুস্কো চুলে লতিকার বাড়ী চলে গেল।

লতিকা তার ঘরে বসে মনোযোগের সঙ্গে একটা বিলাতি ছবি নকল করছিল, নিভা ঘরে ঢুকে, সামনের চেয়ারে বসে পড়ে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল। লতিকা চমকে উঠে বল্ল—ওকি, নিভা, তুই কোত্থেকে? কি ভাগ্যি যে আজ আমার! তা, বিকেল অবধি থেকে যাবি তো? কাল আমি একটা কেক করেছিলাম, কি সুন্দর যে হয়েছে তোকে কি বলব! তার অর্ধেকটা এখনও বাকি আছে, তুই খেয়ে দেখিস। আর সেদিন যে মিস্‌দাস বল্লেন আমি ছবি আঁকতে পারিনা, তাতে কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হয়েছে—আচ্ছা তুইই বল্, আমি যে ছবিটা আঁকছি সেটা কি বেশী খারাপ হয়েছে? আর জানিস—"

নিভা মুখের উপর হতাশার কালিমাপাত করে একটা দীর্ঘতর শ্বাস ফেল্ল। লতিকা তাই শুনে নিজের কথা শেষ না করেই জিজ্ঞাসা করল—"তোর কি হয়েছে রে, অমন বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিস কেন? ওমা চুলেও তেল দিসনি, আর তোর শাড়ীটা কি নোংরা! জানিস ভাই, মা আমাকে সেদিন কি সুন্দর একটা শাড়ী কিনে দিয়েছেন। আর আমার পুরাণ রোজ-পিঙ্ক জর্জেটটা রাষ্ট্রেড্ রং করিয়ে নিয়েছি; আর—"

নিভা কাতরস্বরে বল্ল—"ভাই আমি মরে গেলে আমার সব শাড়ীগুলো তুই নিস্; আমার ভীষণ মন খারাপ।"

লতিকা বলে উঠল—"সত্যি ভাই, আমারও, আমার রিষ্ট ওয়াচটা যে কি করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর চলছে না, কত ঝাঁকালাম, দম দিলাম, কিছুতেই কিছু হ'লনা। আর আমার সেই—"

নিভা এবার জোর করে বল্ল—"আমার মন খারাপ অন্য কারণে। আমি-আমি-আমি—প্রেমে পড়েছি।" কথাটা বলে ফেলেই সে নিজের মুখটা ঘোরতর রক্তবর্ণ করে বসে রইল।

এইবার লতিকার হুঁস হল—"এ্যাঁ!!!" বলে এক চিৎকার করে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে, নিভাকে জড়িয়ে ধরে তার চেয়ারের এককোণে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—"কার সঙ্গে? ফোর্থ ইয়ারের বীণাদের সঙ্গে তো?"

অশেষ অবজ্ঞার সঙ্গে নিভা উত্তর করল—"ওরকম নয়, সত্যিসত্যি।"

"সত্যিসত্যি? কার সঙ্গে?"

"জানিনা।"

লতিকা একটু নিরাশ হলেও হাল ছেড়ে দিলনা, আস্তে আস্তে, প্রশ্ন করতে করতে, সমস্ত বৃত্তান্ত বার করল। নিভা বল্ল—"ভাই, আমার তাকে যে কি ভালই লাগে তা বলতেই পারিনা, মনে হয়, মনে হয়, মনে হয় যেন সে ভীষণ সুন্দর!"

লতিকা বিপদগ্রস্ত হয়ে বল্ল—"তাইতো, কিন্তু তুমিতো তাকে চেননা।"

নিভা সুদূরের দিকে চেয়ে বল্ল—"সেই তো আমার দুঃখ, তাকে আমি চিনিনা।"

লতিকা বল্ল—"কোনরকমে আলাপ করা যায় না?"

নিভা 'সেই চেষ্টা করতে হবে বলেই তো তোর কাছে এসেছি, আমার বাড়ীর লোকদের তো জানিস্ই।"

লতিকার একটু একটু ধৈর্যচ্যুতি হয়ে এসেছিল, সে বল্ল—"সত্যি ভাই, বড়রা সবাই যেন কেমন কেমন হয়। এইতো সেদিন বাবা গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন, আমার এত শীলাদের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছিল, আমি মাকে বল্লাম যে আট নম্বরের বাসে চড়ে চলে যাই, তা তিনি কিছুতেই দিলেন না—"

নিভা বাধাটাকে অগ্রাহ্য করে বল্ল—"কিন্তু তোকে একবার তাকে দেখতেই হবে।"

লতিকা একটু চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করল – "কাকেরে ?"

নিভা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, চোখ বুজে, গাঢ়স্বরে বল্ল—"তাকে।"

লতিকা জিজ্ঞাসা করল—"কবে দেখাবি ?"

নিভা—সে রোজ আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যায়, কাল আসিস্, তোকে দেখিয়ে দেব, তারপর তোর সঙ্গে সব পরামর্শ হবে।"

পরদিন লতিকা নিভার বাড়ীতে হাজির হল। চা খাওয়া শেষ করে দুজনে রাস্তার ধারের জানলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল ; নিভার হাতে কবিতার বই।

লতিকা বল্ল "শোন, আমার কাছে একটা সরু লম্বা সিল্কের টুকরো আছে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না সেটা দিয়ে কি করব, অথচ রংটা ভারি সুন্দর ; আচ্ছা আধগজ সাদা গরদ কিনলে কি তার সঙ্গে জুড়ে একটা ব্লাউজ করা যায় না ?"

নিভার মন তখন উদাস, সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর করল—"হবে।"

লতিকা বল্ল—"সত্যি ? তবে কালই আমি বেঙ্গল ষ্টোর্সে যাব ; তুই যাবি আমার সঙ্গে ?"

রাস্তার দিকে চেয়ে নিভা বল্ল—"না ভাই, আমার আর আজকাল ওসব ভাল লাগেনা।"

লতিকা একটু অপ্রতিভ হয়ে একমিনিট চুপ করে রইল, তারপর আবার উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল – "জানিস্, সেদিন সুলতা এসেছিল, ও বল্ল মিস্ সেনের নাকি বিয়ে, ও স্বচক্ষে আংটি দেখে এসেছিল ; আচ্ছা ওঁর বয়স কত বলতো ? আর জানিস্, ফোর্থ ক্লাসের সুস্মিতা কি মিথ্যেবাদী, বল্ল কিনা যে ওর বয়স বারো বছর, আমি বাজি রাখতে পারি ওর বয়স পোনেরোর চেয়ে একদিন কম নয়। আর সুলেখা কি বলেছে জানিস– "

নিভা উচ্ছ্বসিত, চাপা গলায় বলে উঠল– "ওই যে সে !"

"কই, কই, কই।" বলে লতিকা জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ; কিন্তু পরক্ষণেই সে দুইহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নিভা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল "কি হয়েছে ?"

লতিকা বল্ল—"ও,-ও,-ও,-ও, "

নিভা উত্তেজিত হ'য়ে বল্ল—"তুইও বুঝি একেই— ?"

লতিকা ততক্ষণে নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছে, বল্ল—"রাগ করিসনা ভাই— কিন্তু ও, ও, ও—" উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগ সংবরণ করে সে অনেক কষ্টে কথাটা শেষ করল—"আমাদের গদাধর লস্কর— হি, হি, হি, হি—আমাদের পাশের বক্সীবাবুদের মুহুরী, তিনটে এ পক্ষের আর দুটো আগের পক্ষের ছেলে আছে। বক্সীদের বড় ছেলে কলকাতায় নাই তাই ও রোজ তার ঘোড়াকে এক্সারসাইজ করায়। আচ্ছা ও কেলে কুচ্ছিৎটাকে তুই কি বলে—ছি, ছি, ছি, ছি—"

সেদিন রাত্রে নিভা তার ডায়েরিতে লিখে রাখল—"আমি চিরকুমারী থাকব।"

রক্তগোলাপ

শ্রীপূর্ণেন্দু সেন।

ও কি ফুল—
লাল পল্লবের সম্মিলন !
ও কি বুকের রক্ত নয়,
নয় ব্যর্থতার কারুণ্যে রাঙা
ও কি না-পাওয়ার অশ্রুতে সিক্ত
নয় !
ও কি কেবলই রক্তগোলাপ ?
তরুণ প্রাণের স্বপ্ন
অপরিপূর্ণ
অবহেলিত, অতৃপ্ত প্রাণ
ওর মাঝে কি দেয় না উঁকি।
জাগায় না
অসমাপ্ত মন্থর বাসরের
দীর্ঘশ্বাস,
আর কান্না।

ও কি মাত্র একটি ফুল,
দুটি নিকট হিয়ার
সুদূর প্রিয়-প্রিয়ার
নীরব সাক্ষী নয়,
ব্যর্থতার এই চরম আশ্রয়
পরাজয়ের মৌনতা
ওর মাঝে কি নেই ঘুমিয়ে
লুকিয়ে !

ও কি কোটের কোটরে
একমাত্র শোভা,
চিনেমাটীর অঙ্গরাগ ?
ও কি নিঃসঙ্গ প্রহরের
ব্যথার মিতা নয়—
মাঝরাতের স্তব্ধতায়
ওর কথা কি শুনেছ,
বুঝেছ !
ও কি শুধুই ফুল,
তোমার হাতের
এ রক্তগোলাপ
কোমল !

নাড়্তে হবে। পরিমিত সর্ষের সঙ্গে তিন চার্টে কাঁচা লঙ্কা বেশ্ নির্ম্মল ক'রে বেটে একখানা কাঁসিতে সেই সর্ষে গুলে উপর থেকে আস্তে আস্তে কড়ায় ঢেলে দিতে হবে যেন সর্ষের খোসা না পড়ে। জলটা ২।৪ বার ফুট্‌লে বেগুন গুলো তাতে ঢেলে দিয়ে ২।৩টা কাঁচা লঙ্কা চিরে আর আন্দাজ মত নুন দিতে হবে।

ভাজা বেগুন সেদ্ধ হ'তে বেশী সময় লাগেনা, সুতরাং জল যেন বেশী না হয়, বেগুন বেশী সেদ্ধ হ'লে স্বাদ নষ্ট হ'য়ে যায়।

ঝোল কমে যখন বেশ্ গদ্‌গদে হবে, তখন নামিয়ে ছড়ানো পাত্রে ঢেলে রাখ্‌তে হবে। ঝাল সকলে সমান খান না, সুতরাং বুঝে ঝাল দিতে হবে।

খাদ্যের কথা।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, এবং এও শুনি যে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই এর প্রধান কারণ। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব কেন হয় এবং কি উপায়ে সে অভাব দূর করা যায় সেটা মেয়েদের ভাববার কথা কেননা খাবারের ব্যবস্থাটা পরিবারের মেয়েদের হাতেই থাকে।

অনেকে বলবেন "আজকাল সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ভাল খাবার পয়সা কোথায়?" কথাটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য হ'লেও, অর্থের অভাবই যে একমাত্র কারণ তা তো বলা যায়না—অনেক সময় দেখা যায়, যে পয়সায় ভাল খাবার হতে পারতো সেই পয়সা বাজে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খেয়ে নষ্ট করা হয়। তাছাড়া "ভাল খাবার" মানে শুধু ব্যয়-সাধ্য সৌখীন খাবার নয়—যতরকম সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য অল্পব্যয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরে তৈয়ারী হতে পারে, সে সমস্তই ভাল খাবারের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে একটু মনোযোগ ও চেষ্টা থাকলে আমাদের খাদ্যের মধ্যে পুষ্টির অভাব অনেক পরিমাণে দূর করা যায়।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার সকলে মনে করেন না-- যাঁরা একটু সেকেলে ধরণের তাঁরা বলেন "সাতপুরুষ এই খেয়েই মানুষ হ'ল তাঁদের কি স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা?" কিন্তু সাতপুরুষের সেই সস্তা-গণ্ডার দিন তো আজ নাই, জীবনযাত্রার ধারাও এখন বদলিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রুচির ও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বুদ্ধিমতী গৃহিণীকে এখন নূতন ও পুরানোর মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিয়ে আধুনিক রুচি অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

রক্তগোলাপ

শ্রীপূর্ণেন্দু সেন।

ও কি ফুল—
লাল পল্লবের সম্মিলন !
ও কি বুকের রক্ত নয়,
নয় ব্যর্থতার কারুণ্যে রাঙা
ও কি না-পাওয়ার অশ্রুতে সিক্ত
নয় !
ও কি কেবলই রক্তগোলাপ ?
তরুণ প্রাণের স্বপ্ন
অপরিপূর্ণ
অবহেলিত, অতৃপ্ত প্রাণ
ওর মাঝে কি দেয় না উঁকি।
জাগায় না
অসমাপ্ত মন্থর বাসরের
দীর্ঘশ্বাস,
আর কান্না।

ও কি মাত্র একটি ফুল,
ছুটি নিকট হিয়ার
সুদূর প্রিয়-প্রিয়ার
নীরব সাক্ষী নয়,
ব্যর্থতার এই চরম আশ্রয়
পরাজয়ের মৌনতা
ওর মাঝে কি নেই ঘুমিয়ে
লুকিয়ে !

ও কি কোটের কোটরে
একমাত্র শোভা,
চিনেমাটীর অঙ্গরাগ ?
ও কি নিঃসঙ্গ প্রহরের
ব্যথার মিতা নয়—
মাঝরাতের স্তব্ধতায়
ওর কথা কি শুনেছ,
বুঝেছ !
ও কি শুধুই ফুল,
তোমার হাতের
এ রক্তগোলাপ
কোমল !

নাড়্তে হবে। পরিমিত সর্ষের সঙ্গে তিন চারটে কাঁচা লঙ্কা বেশ্ নির্ম্মল ক'রে বেটে একখানা কাঁসিতে সেই সর্ষে গুলে উপর থেকে আস্তে আস্তে কড়ায় ঢেলে দিতে হবে যেন সর্ষের খোসা না পড়ে। জলটা ২।৪ বার ফুট্‌লে বেগুন গুলো তাতে ঢেলে দিয়ে ২।৪টা কাঁচা লঙ্কা চিরে আর আন্দাজ মত নুন দিতে হবে।

ভাজা বেগুন সেদ্ধ হ'তে বেশী সময় লাগেনা, সুতরাং জল যেন বেশী না হয়, বেগুন বেশী সেদ্ধ হ'লে স্বাদ নষ্ট হ'য়ে যায়।

ঝোল কমে যখন বেশ্ গদ্‌গদে হবে, তখন নামিয়ে ছড়ানো পাত্রে ঢেলে রাখ্‌তে হবে। ঝাল সকলে সমান খান না, সুতরাং বুঝে ঝাল দিতে হবে।

খাদ্যের কথা।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, এবং এও শুনি যে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই এর প্রধান কারণ। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব কেন হয় এবং কি উপায়ে সে অভাব দূর করা যায় সেটা মেয়েদের ভাববার কথা কেননা খাবারের ব্যবস্থাটা পরিবারের মেয়েদের হাতেই থাকে।

অনেকে বলবেন "আজকাল সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ভাল খাবার পয়সা কোথায়?" কথাটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য হ'লেও, অর্থের অভাবই যে একমাত্র কারণ তা তো বলা যায়না—অনেক সময় দেখা যায়, যে পয়সায় ভাল খাবার হতে পারতো সেই পয়সা বাজে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খেয়ে নষ্ট করা হয়। তাছাড়া "ভাল খাবার" মানে শুধু ব্যয়-সাধ্য সৌখীন খাবার নয়—যতরকম সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য অল্পব্যয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরে তৈয়ারী হতে পারে, সে সমস্তই ভাল খাবারের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে একটু মনোযোগ ও চেষ্টা থাকলে আমাদের খাদ্যের মধ্যে পুষ্টির অভাব অনেক পরিমাণে দূর করা যায়।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার সকলে মনে করেন না—যাঁরা একটু সেকেলে ধরণের তাঁরা বলেন "সাতপুরুষ এই খেয়েই মানুষ হ'ল তাঁদের কি স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা?" কিন্তু সাতপুরুষের সেই সস্তা-গণ্ডার দিন তো আজ নাই, জীবনযাত্রার ধারাও এখন বদলিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রুচির ও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বুদ্ধিমতী গৃহিণীকে এখন নূতন ও পুরানোর মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিয়ে আধুনিক রুচি অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

আরো গুরুতর একটি বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষার ভার তাঁর হাতে, সেটি হচ্ছে দেহের প্রয়োজনের সঙ্গে আহারের আয়োজনের সামঞ্জস্য—অর্থাৎ আমাদের শরীরের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য কি কি জিনিষ দরকার এবং কোন কোন খাদ্য হাতে সেগুলি কি পরিমাণে পাওয়া যায় সেই বুঝে খাদ্য নির্ব্বাচন করা।

খাদ্যের মধ্যে থেকে আমরা (১) কার্বোহাইড্রেট (২) প্রোটিন (৩) ফ্যাট্ (৪) কয়েকটী খনিজ দ্রব্য এবং (৫) কয়েক রকম ভিটামিন পাই—এই উপাদানগুলি আমাদের দেহের পুষ্টি ও শক্তি জোগায় এবং নানারকম রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। কার্বোহাইড্রেট বা ছানাজাতীয় উপাদান আমরা প্রধানতঃ চাল, গম প্রভৃতি শস্য এবং চিনি, গুড় প্রভৃতি মিষ্টি হ'তে পাই ; প্রোটিন বা ছানাজাতীয় উপাদান প্রধানতঃ মাছ, মাংস, দুধ, ছানা ছোলা, মটর, শিম প্রভৃতি হতে পাই ; ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় উপাদান প্রধানতঃ ঘী, মাখন, চর্ব্বি ও নানারকম উদ্ভিদজাত তেল হতে পাই ; খনিজ দ্রব্য ও খাদ্যপ্রাণ প্রধানতঃ টাটকা ফলমূল শাক সবজী মাখন, ডিম, দুধ কয়েকরকম শস্যের খোসা ও অঙ্কুর প্রভৃতির মধ্যে পাই। এই উপাদান গুলি যথেষ্ট পরিমাণে না পেলে দেহের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বজায় থাকে না সুতরাং আমাদের খাদ্যের মধ্যে যাতে এই সমস্ত উপাদানেরই যথাযোগ্য সমাবেশ হয় সেটা দেখা দরকার।

আগেকার দিনে দুধ, ঘী, মাছ যখন অপর্য্যাপ্ত ছিল, তখন সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে সকল রকম পুষ্টিকর উপাদান যথেষ্ট থাকত। আজকাল অনেক জায়গাতেই এসব জিনিষ দুর্মূল্য হয়েছে এবং টাট্কা ও খাঁটি জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হয়েছে কাজেই খাদ্যের মধ্যে পুষ্টির অভাব ঘট্ছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে আজকাল ভাতটা বেশী পরিমাণে খাওয়া হয় এবং তার তুলনায় মাছ মাংস দুধ ঘী ফল তরকারী অনেক কম পরিমাণে খাওয়া হয় তাতে কার্বোহাইড্রেটের অংশ বেশী এবং প্রোটিন ও ফ্যাটের অংশ কম হয়ে পড়ে, খনিজদ্রব্য ও খাদ্যপ্রাণ তো খুব কম পাওয়া যায়।

একবেলা ভাত একবেলা যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটি, যথেষ্ট পরিমাণে ডাল তরকারী, মাছ মাংস ডিম বা ছানা, রোজ কিছু দুধ দই, ঘী মাখন, টাটকা ফলমূল খেলে তবে খাদ্যের মধ্যে সবরকম পুষ্টিকর উপাদানের সমাবেশ হতে পারে।

নানারকম পাকা ফলের অভাব আমাদের দেশে নাই—আম, জাম, আনারস, পেঁপে, বেল, লেবু, কলা, পেয়ারা প্রভৃতি সুলভ ও উপকারী ফল যেটি যে সময়ে যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং শস্তা হয় সেই বুঝে খেলে রোজ কিছু ফল খাওয়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য হয়না। কাঁচা সবজীর স্যালাড, কচিশসা, কাঁচা কড়াই শুঁটি, ছোলাভিজা, মুগভিজা প্রভৃতি হ'তেও সুলভে মূল্যবান খাদ্যপ্রাণ ও খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়। রান্নাকরা খাদ্যে ভিটামিন অনেক কমে যায়—কোন কোন ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং কিছু টাট্কা কাঁচা জিনিষ রোজ খাওয়া উচিত। ডালের মধ্যে অনেকখানি প্রোটিন পাওয়া যায় তবে তার উপর মাছ মাংস ডিম বা ছানা দরকার। দুধ ঘী মাছ মাংস আজকাল অনেক জায়গাতেই দুর্মূল্য

হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে অন্যদিকে যথাসম্ভব ব্যয়সংক্ষেপ করে ও এগুলির ব্যবস্থা করা দরকার।

খাদ্যের অনেকখানি সারাংশ আমরা বুদ্ধির দোষে হারাই—সুস্বাদু এবং সারবান আটা, গুড় ও ঢেঁকিছাঁটা চালের বদলে মিহি ময়দা, ধবধবে চিনি ও কলেছাঁটা "পরিষ্কার" চাল খেয়ে আমরা সৌখীন রুচির পরিচয় দিই ; কিন্তু লালগুড় কে সাদা চিনিতে পরিণত করতে গিয়ে তার পুষ্টিকর অংশ অনেকটা বাদ পড়ে যায় ; শস্যের দানার পাতলা খোসাটির মধ্যে তার অনেকখানি পুষ্টিকর অংশ থাকে—কলে ছাঁটা চাল ও ময়দার মধ্যে ঐ খোসাটি বাদ পড়ে বলে দেখতে সাদা হয় বটে কিন্তু সার অংশ অনেকটা নষ্ট হয়।

রান্নার দোষে খাদ্যের গুণ যাতে নষ্ট না হয় সে দিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকা দরকার—ভাতের ফেন্ ফেলে দিলে তার সারাংশ অনেক নষ্ট হয় ; ঢেঁকিছাঁটা চাল ফেন না গেলে রাঁধলে তবে ভাতের সমস্ত সারটুকু পাওয়া যায়। "কুকারে" এরকম ভাত রান্না সহজ, কিন্তু চেষ্টা করলে হাঁড়িতেও জল এবং আঁচের এরকম আন্দাজ অভ্যাস করা যায় যাতে ভাত সুসিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে জলও শুকিয়ে যায়। মাছতরকারী কড়া আঁচে টগবগিয়ে ফুটালে তার গুণ অনেক নষ্ট হয় কিংম্বা সিদ্ধ করে জল ফেলে দিলে, সেই জলের সঙ্গে অনেকটা সার অংশ বেরিয়ে যায়। একটু সচেতন ও সচেষ্ট হলেই এসব অপচয় নিবারণ করা যায়। পরিমাণ মত মসলা খাদ্যকে মুখরোচক করে এবং হজমের সাহায্য করে, কিন্তু আমরা অনেক সময় এ জিনিষটার বাড়াবাড়ি করে ফেলি—খাদ্যকে মুখরোচক করতে গিয়ে তেলে ঝালে ঘীয়ে মসলায় রীতিমত দুষ্পাচ্য করে তুলি। বিশেষতঃ মাংস মেটুলী ডিম প্রভৃতি অনেক সময় আমাদের বেশী ঘী মসলা দিয়ে রান্নার দোষেই গুরুপাক বা "গরম" হয় ; সর্ব্বদা খাওয়ার পক্ষে ষ্টু, রোষ্ট, কাটলেট, প্রভৃতিই বেশী উপযুক্ত মনে হয় এগুলি অল্প মসলায় নরম আঁচে রান্না হয় এবং সঙ্গে যথেষ্ট সিদ্ধ তরকারী ও স্যালাড প্রভৃতি খাওয়ার প্রথা থাকাতে কোষ্ঠবদ্ধতা হয় না। ভাপে সিদ্ধ কিম্বা তন্দুরে বেক করা রান্নায় অল্প ঘী মসলাতেই খাদ্য সুস্বাদ ও সুপাচ্য হয়—এই জাতীয় রান্না আমাদের মধ্যে আরো বেশী চল্ হলে ভাল হয়।

শুধু খাদ্য নির্বাচন এবং প্রস্তুত প্রণালী ঠিকমত হ'লে হয় না, ঠিকমত পরিপাক হলেই তবে খাদ্যের কাজ হয়। সকাল ন'টা দশটার মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে বাড়ির কর্ত্তাদের অফিসকাছারীতে ও ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ছুটতে হয়। ছেলেবেলায় এ বিষয়ে একটা ছড়া শুনতাম "ডালভাত সরকারী খানা—চোখটি বৃহৎ, গলাটানা"—অর্থাৎ চোখদুটি বড় করে, গলাটা টেনে, গো-গ্রাসে ডাল ভাত গিলে খাওয়া ! ভালকরে চিবিয়ে মুখের লালার সঙ্গে না মিশালে পরে খাদ্যের ষ্টার্চ্ বা শ্বেতসার হজম হয়না ; উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে তাড়াতাড়ি খেলে পাকস্থলী, পিত্তাশয় ও অন্ত্রের জারকরসগুলি ঠিকমত নিঃসৃত হয়ে খাদ্যকে ভালকরে জীর্ণ করতে পারে না। এই খাওয়ার পরে অনেকক্ষণ কাজ

করতে হয় কাজেই খাওয়াটা বেশী ভারী না হয় এবং একটু ধীরেসুস্থে যথা সময়ে খাওয়া হয় সেটা দেখা বিশেষ দরকার।

স্কুল অফিসে টিফিনের ব্যবস্থা করা অনেক সময় গৃহিণীর পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা দিয়ে তাদের ইচ্ছামত খাবার কিনে খেতে বলা বড়ই বিপদজনক। ফেরীওয়ালাদের কাছে কি যে কিনে খাবে, তার ঠিকনাই! এ খারাপ অভ্যাসটি যেন মায়েরা কখনো না করেন। আজকাল অনেক স্কুল অফিস ইত্যাদিতে টিফিনের ব্যবস্থার ভার কর্তৃপক্ষরাই হাতে নিচ্ছেন, এটা শুভ লক্ষণ। যদিও সবজায়গায় সে ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয়নি, তবু এদিকে দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন ক্রমেই ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

আজকাল হোটেল, রেস্তোরাঁ ও "চা চপ্ মাম্‌লেটের" দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং খরিদ্দারের ভীড় দেখলেই বোঝাযায় এগুলি কি রকম জনপ্রিয় হয়েছে। বাজারের জলখাবার ও অনেক বাড়িতে নিত্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। ভাল দোকানের উৎকৃষ্ট জিনিষ নিতে পারলে বরং ভাল, কিন্তু সেগুলি ব্যয়সাধ্য বলে বাজে দোকানথেকে সস্তায় ভেজাল জিনিষ কিনে খেলে তাতে পয়সা ও স্বাস্থ্য দুই নষ্ট হয়।

টিনে রক্ষিত বিস্কুট, ফল তরকারী, মাছ মাংস প্রভৃতি আজকাল খুব ব্যবহার হয় এবং অনেকে খুব পছন্দ করেন। এগুলি যতই উৎকৃষ্ট উপাদানে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হ'ক না কেন, টাট্‌কা খাবারের সমান গুণ এতে থাকে না—এগুলি সৌখীন খাদ্য হিসাবে মাঝে মাঝে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু টাট্‌কা খাদ্যের স্থান এরা পূর্ণ করতে পারেনা বিশেষতঃ আমাদের গরম দেশে টিনের মাছ মাংস কম ব্যবহার হওয়াই ভাল।

অল্প খরচে টাট্‌কা স্বাস্থ্যকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা সহজেই যেতে পারে, কারণ আজকালকার গৃহিণীর সামনে জলখাবারের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে—নানারকম পিঠে, মিষ্টি ও নোন্তা খাবার তো আছেই, কেক্, বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ্ প্রভৃতি বিদেশী খাবার ও এখন চল্ হয়েছে; চিঁড়ে মুড়ি খই মোয়া লাড়ু ছোলা ছাতু ভুট্টা প্রভৃতি ও সুলভ এবং উৎকৃষ্ট জলখাবার। পরিপাটি ভাবে তৈয়ারী করা এবং সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দেওয়ার গুণে নিতান্ত সাধারণ খাদ্য ও সৌখীন রুচিকে তৃপ্তি দিতে পারে। খাবার সাজানো এবং পরিবেশনের পরিপাট্যের দিকে গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা চাই।

অনেকে হয়তো বলবেন "মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে এসব সখ মিটাবার সময় কোথায়?" এর মধ্যে ও বলবার এবং ভাববার কথা যথেষ্ট আছে। বিলাতে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা রান্নাবান্না ও ঘরকন্নার অধিকাংশ কাজ নিজের হাতে করেন, কিন্তু তাঁরা "হাঁড়িহেঁশেল" নিয়েই দিন কাটান না—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের পাট সেরে একটু বেড়াবার ও আমোদ আহ্লাদ করবার সময় তাঁরা করে নেন—তাতে স্বাস্থ্য ও ভাল থাকে, মনও প্রফুল্ল হয়। সময় এবং পরিশ্রম বাঁচাবার ছোটখাট নানারকম কায়দা তাদের

কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। ওদের কাজের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য, সময়ানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি অনেক গুণ ও অনুকরণযোগ্য।

আজকাল ও সব দেশে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রান্না ও খাওয়া নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে—আবশ্যকমত বদলিয়ে আমাদের দেশের অবস্থা ও রুচির উপযুক্ত করে নিয়ে তার অনেকখানি আমরা কাজে লাগাতে পারি। খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু খাদ্যের গুণগুলি বজায় রেখে রান্নাকরা, দৈনিক খাদ্যতালিকার মধ্যে স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষ-গুলির যথাযোগ্য ভাবে সমাবেশ করা, পরিশ্রম লাঘবের আর সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করা এবং আধুনিক রুচি ও জীবনযাত্রার উপযোগী করে খাদ্যব্যবস্থার সংস্কার করার জন্যও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

নিজের হাতে সুখাদ্য তৈয়ারী করে সকলকে খাইয়ে আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছা মেয়েদের মনে গহনা কাপড়ের সখের চেয়েও প্রবল, সুতরাং দেশবিদেশের নানারকম সুখাদ্য এবং খাদ্যবিজ্ঞানের নূতন তথ্য সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এসব বিষয়ে "মেয়েদের কথার" পাতায় মাঝে মাঝে আলোচনা হ'লে খুব ভাল হয়।

মেয়েলী কথা।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে তার মধ্যে নারীর বিষয়ে নানা কথা পাওয়া যায়। নারীর কথা মানে তার রূপবর্ণন বা মহিমা কীর্ত্তন নয়, তার কাজ কর্মের, জীবনযাত্রার ও চিন্তা-ধারার পরিচয়। প্রাচীন ব্রতকথাগুলিতে বিশেষ-ভাবে এই পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছে; ব্রতের বর্ণনা, বিধান ও গানের মধ্যে নারীজীবনের সুখদুঃখ ও নারীহৃদয়ের প্রেমহিংসা, সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডাকের বচনে ও অন্যান্য সাধারণ কাব্যেও মেয়েদের চালচলন আচারনীতির বিষয়ে অনেক খবর পাওয়া যায়। দু'একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে, যেমন, ডাক সুগৃহিণীর লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন—

"মিঠা রান্ধে সরুয়া কাটে।
সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে॥
সে কিছু মধুর বলে।
স্বামীর বচন শিরে ধরে॥
* * *
রৌদ্রে কাঠাকুঠায় রান্ধে।
খড় কাঠ বর্ষাতে রান্ধে॥

রান্ধে বাড়ে গায়ে না লাগে কালী ॥"

এর মোট অর্থ এই যে সুগৃহিণী সরু সরু কাঠ দিয়ে, অর্থাৎ কম কাঠে ভাল রাঁধবেন, মিষ্টি কথা বলবেন, স্বামীর কথা মান্য করবেন ; কাঠের সাশ্রয় করবার জন্য রোদের সময়ে বাইরে থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে রাঁধবেন যাতে ঘরের খড়কাঠ বর্ষার জন্য সঞ্চিত থাকে ; তাছাড়া সব কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর গায়ে কালী লাগবে না।

সন্তানজন্মের সময়কার ব্যবস্থার বিষয়ে ডাক বলেছেন—

"জন্মমাত্র বলে ডাক।
পো এড়িয়া পোয়াতি রাখ ॥
ধুইয়া পৌছয়া দিহ কোলে।
যবে ফুল নাম্বিবেক ভালে ॥
নাড়ি ছেদিয়া দিহ জয়।
ডাক বলে এহি হয় ॥"

এর মোট অর্থ এই যে—সন্তান হলে ছেলেকে ফেলে আগে মায়ের পরিচর্য্যা করবে। ফুল (placenta) ভাল করে নামলে পর ছেলেকে ধুয়ে পুঁছে কোলে দিতে হবে, আর নাড়ি কাটা হলে পর জয়ধ্বনি করবে।

রান্না ও বেশভূষা, নারীজগতের এই দুটি বড় শাখার কথাও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ডাকের রান্নার একটা তালিকা দিই—

"নিমপাতা কাসন্দির ঝোল।
তেলের ওপর দিয়া তোল ॥
পলতাশাক রুহি মাছ।
বলে ডাক বাঞ্জন সাছ ॥
মদগুর মৎস্য দায়ে কুটিয়া।
হিঙ্গ্ আদা লবণ দিয়া ॥
তেল হলদি তাহাতে দিব ;
বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব ॥"

এ ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর প্রথাগত বাহান্ন ব্যঞ্জনের তালিকা ও নায়িকার রন্ধনের বিবরণ অনেক পাওয়া যায়। এগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে আজকালকার ত রাঁধুনীদের সুবিধা হতে পারে।

রান্নার পাশে পাশে রয়েছে পোষাকের কথা ! হয়ত রাণী সাজছেন, একটা শাড়ী ভাল লাগছেনা, তাই আরেকটা পরলেন ; একরকমের খোঁপা পছন্দ হয়না, তাই অন্যরকমে চুল বাঁধলেন ; গহনাও

ক্রমান্বয়ে গায়ে উঠল হয়ত হাজারটা। এরকম বিবরণ বহু পাওয়া যায়, একটি তুলে দিলাম ; লঙ্কাযুদ্ধের শেষে গন্ধর্বনারীরা সীতাকে রাম সন্দর্শনের জন্য সাজাচ্ছেন। প্রথমে সীতার স্নান—

নারায়ণ তৈল কেহ দেয় আমলকী॥
সীতার অঙ্গেতে দিল তিল পিঠালী।
শুভ্রবস্ত্রে সীতার গায়ের তোলেন মলি॥
গন্ধ আমলকী দিয়া সীতার মাথা ঘসি।
সুবাসিত জল কেহো ঢালে কলসী কলসী॥
নেতের বসন দিয়া অঙ্গের মোছে পানী।"

স্নান সমাপ্ত হলে সীতা চুল বাঁধলেন—

"সুবর্ণ চিরুণী করি আঁচুড়িলা কেশ।
নানা ছাঁচে কবরী বান্ধি বনাইল বেশ॥"

এইবার গহনার বর্ণনা, দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে না দিয়ে খালি বিচিত্র গহনাসম্ভারের নামোল্লেখ করি। গজমুক্তাসমন্বিত "সুবর্ণের সিঁথি", কনকের চাঁপা প্রভৃতি মাথার গহনা, হাতে "কনকচুড়ি" কঙ্কণ, তাড়, কাণে কর্ণপূর, নাকে বেশর, গলায় মণিহার, "কটিতে কিঙ্কিণী", "সোনার নুপূর পায়" পরে সীতা "বিচিত্র কাঁচলি" পরলেন, তারপর শাড়ী—

"শুভ্রবস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে।
সোনার অঙ্গে শুক্লবস্ত্র শোভা নাহি করে॥
রক্তবস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে।
সোনার অঙ্গে হেন বসন শোভা নাহি করে॥
নীল বসন আনি দিল পরিবার তরে।
সোনার অঙ্গে নীল বসন ভাল শোভা করে॥
নীল বসন পরিধানে তাহে রাঙ্গা পাড়ি।
কত কর্ত লেখা আছে পক্ষ পাকড়ি॥"

যে নীলবসন সীতা পরলেন তার পাড়টি লাল আর সেই শাড়ী পাখ্-পাখালীর ছবিতে পূর্ণ। আরো অনেক রকমের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যাতে এই মেয়েলী ব্যাপারের চিত্রগুলি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, কিন্তু সে লোভ এবারের মত সংবরণ করে উপস্থিত বিষয়ের অনুসরণ করি।

একথা সত্যি যে এইসব বিবরণের মধ্যে নারীর সম্পূর্ণ দাসত্ব ও আত্মবিক্রয়ের ভাব প্রকট কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীর সকল কাজকর্মকে যে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে তা আজকাল দুর্লভ। অথবা স্পষ্টই কল্পনা করতে পারি কথকতা, বা পাঠের সময়ে এইসব কথাগুলি শুনতে শুনতে শ্রোত্রীবর্গের মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

আজ কাল মেয়েরা স্বাধীনতা পেয়েছে, নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার অবাধ সুযোগ পেয়েছে কিন্তু শুধু কোন মেয়েলী কথা সাহিত্যের পৃষ্ঠা তেমন করে অলঙ্কৃত করছেনা। এই অভিযোগের উত্তরে আমরা বলি যে নারীও মানুষ, আনন্দবেদনা সমস্ত কিছুর অনুভূতিই তার পুরুষের সঙ্গে সমান তাই এই প্রগতির যুগে বিশেষ করে স্ত্রীসাহিত্যের স্থান নেই। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে নারী ও পুরুষ হয়ত একই রকমের মানুষ হলেও শরীর ও মনের বহিঃপ্রকৃতি ভেদে তারা বিভিন্ন এবং বিভিন্নতা অনুযায়ী তাদের কর্মক্ষেত্র ও পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারাও কিছু ভিন্নপথগামী হয়ে থাকে।

য়ুরোপকে আমরা নারীপ্রগতির কেন্দ্রস্থল বলে মনে করি কেননা য়ুরোপের নারী সমাজ ও নীতির কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে, স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রার ধারা নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার পেয়েছে, পুরুষের বহু কাজ সমান উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদন করছে। এমনকি পুরুষের পোষাক পর্যন্ত পরছে।

কিন্তু তবু য়ুরোপের নারী যে পুরুষধর্মী হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই দেশের মেয়েলী সাহিত্য থেকে। ও দেশের মেয়েরা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ শাখা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে নারীসমাজে প্রচার করেন সাহিত্যের মারফতে। মেয়ে ডাক্তার লেখেন মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব, যৌনবিজ্ঞান, মাতৃত্ব, শিশুপালন সম্বন্ধীয় বই; যিনি আইনে বিশেষজ্ঞ তিনি নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন; মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা যিনি করেছেন তিনি লেখেন শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে। এমনি ভাবে কাপড় কাচা, রান্না, সেলাই, ঘর সাজান প্রভৃতি গৃহস্থালীর সব কাজই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হয়ে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের দেশে এই ধরণের কাজ মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞের দ্বারা আরো বিশিষ্টভাবে এবং ব্যাপকভাবে হওয়া চাই যাতে বাংলা দেশের প্রত্যেকটি মেয়ে তার জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করবার পথ পায়।

এতে মেয়েদের অধীনতা তো সূচিত করেইনা, বরংচ তাদের বিশেষে স্বপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকারের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশের সঙ্গে য়ুরোপের মেয়েদের কর্মতালিকার একটু তুলনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ও দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশের পক্ষেই বাজার করা, রান্না করা বাসন মাজা, কাপড় কাচা ও পায়খানা পরিষ্কার করা, নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। তাছাড়া ছেলে পিলের কাপড় চোপড় সেলাই করা ও ঘরদোর পরিষ্কার করাও গৃহিণীর কর্তব্যের অন্তর্গত। ঘরদোর অসজ্জিত করে রাখা ও দেশে নিন্দনীয়, তাই সামনের সিঁড়ি থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘরের কলতলা পর্যন্ত গৃহিণীকে ঝকঝকে করে রাখতে হয়। অধিকাংশ পরিবারের গৃহিণীকেই এই সমস্ত কাজ একটি ঠিকা ঝি মাত্র সম্বল করে করতে হয়। অথচ সেই মেয়েরাই সাজপোষাক পরে বাইরে গিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে আমোদ প্রমোদ করবার অবসর পান।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে বটে যে—"যে রাঁধে সেকি চুল বাঁধে না? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক সংসারের গৃহিনীর পক্ষেই চুল বাঁধবার সময় করে ওঠা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এটা তাঁদের স্বেচ্ছায়, নিজের হাতে লিখে দেওয়া দাসখৎ। অথচ এত করেও আমাদের জীবনে আনন্দ ও শৃঙ্খলা আসছে না। কাজ যে সম্পন্ন হচ্ছে না তা ক্রমবর্ধমান পারিবারিক অশান্তির থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। এই অশান্তিকে আমরা যুগপরিবর্ত্তনের চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে শুধু যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি তা নয়, কতকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। ক্ষেত্র বিশেষে এ কথা সত্য হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা নারীর স্বভাব ও কর্মের অনুযায়ী শিক্ষার অভাব সূচিত করছে। এর প্রতিকার করবার জন্য মেয়েদের নিজেদের উদ্যত হতে হবে। ভারতের মেয়েরা যতদিন না নারী জীবনের সকল শাখা প্রশাখার বিশেষ আলোচনা ও প্রচার না করছেন ততদিন নারী আন্দোলন যতই আলোড়ন সৃষ্টি করুকনা কেন তেমন করে সফল হবেন না।

দেহ ও মনের স্বাস্থ্য।

শ্রীনলিনী চক্রবর্তী।

আমাদের দেহ আর মনের মধ্যে সঠিক সম্বন্ধটি যে কি সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তর্কের সমাধান হল না। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সেই সম্বন্ধটি অতি গভীর, এত বেশী গভীর, যে দেহ বা মনের মধ্যে একটিকে অবহেলা করে অন্যটির পূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের দেশেরই একজন সুপণ্ডিত ডাক্তার বলে থাকেন যে চরিত্রকে যেমন মনের স্বাস্থ্য বলা যেতে পারে, স্বাস্থ্যকেও তেমনি দেহের চরিত্র বলা উচিত। চরিত্র হীনতা অসুস্থ মনের লক্ষণ। তাকে আমরা ঘৃণা করে এড়িয়ে চলি। কিন্তু চরিত্র রক্ষার জন্য আমরা যতখানি যত্নবান থাকি। ততখানিই থাকা উচিত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য—কারণ ভগ্ন স্বাস্থ্য হল একপ্রকারের চরিত্র হীনতা। এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত আমাদের দেশের মেয়েদের, কারণ তাদের স্বাস্থ্যের ওপরেই প্রধানত নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ জাতির স্বাস্থ্য।

বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্য যে আজকাল আগেকার চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে এ কথা অনেককেই বলতে শুনেছি! শুধু কানে শোনা কেন, নিজের চোখেই দেখেই যে আজকালকার মেয়েদের তাদের ঠাকুরমা দিদিমাদের মতন শ্রমক্ষমতা নেই। অল্প পরিশ্রমেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; অল্প বয়সেই

তাদের স্বাস্থ্য-হানি হয়। চেহারা খারাপ হয়ে যায়; অতি সহজেই নানা রকম রোগ এসে তাদের ধরে। এক বাঙ্‌লা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশেই বোধ হয় শোনা যায় না যে মেয়েরা "কুড়িতেই" "বুড়ী" হয়ে পড়ে।

অনেকে মনে করেন যে লেখাপড়া শেখাই বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্য হানির একমাত্র কারণ না হোক অন্তত প্রধান কারণ। তাঁরা বলেন যে দশটার থেকে চারটে পর্যন্ত ইস্কুল করা মেয়েদের শরীরে সহ্য হয় না। সময় স্বাস্থ্য ও অর্থের অপব্যয় করে' ইস্কুল কলেজে পড়ে' এরা কেবল মাত্র কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করে যা তাদের কোনও দিন জীবনের কোনও কাজে লাগে না। নিজেদের কথার প্রমাণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে আমাদের অল্প শিক্ষিতা ঠাকুরমা দিদিমাদের স্বাস্থ্য আমাদের চেয়ে এত ভাল থাকত কি করে—সে নিশ্চয় তাঁদের ইস্কুল কলেজে পড়তে হয়নি বলে।

কিন্তু এ কথা বলবার সময়ে এটা তাঁরা ভুলে যান যে আমাদের ঠাকুরমা দিদিমাদের আমলের পর, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছাড়াও আমাদের জীবন ধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বাস করেছেন পল্লী গ্রামে, সেখানে মুক্তবায়ু ও পুষ্টিকর খাদ্য তাঁরা যে পরিমানে লাভ করেছেন, তা আজকালকার দিনে শহরে বসে অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষেই পাওয়া সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি তাঁদের কলসী করে জল নিয়ে আসা, বা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানা, ইত্যাদি এমন অনেক কাজ নিয়মিত ভাবে করতে হয়েছে, যাতে তাঁদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুন্দর চালনা হয়েছে।

নাগরিক ও পল্লী জীবনের আপেক্ষিক দোষগুণ বিচার করতে বসা আমার উদ্দেশ্য নয়। ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত, কচুরী পানায় আচ্ছন্ন বাঙ্‌লাদেশের পল্লী গ্রামেও আজ পূর্বের লক্ষ্মী-শ্রী আর নাই। তাছাড়া পল্লীর সঙ্গে সব যোগ ছিন্ন করে আমরা যারা নগরে এসে বাসা বেঁধেছি আমাদের অনেকের পক্ষেই নানান কারণে পল্লীতে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই নাগরিক জীবন যাপন করেই কেমন ভাবে দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন করা যায় সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

পড়ার জন্যই যে আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য হানি হচ্ছে এ ধারণা ভুল। তাই যদি সত্যি হত তাহলে যে সমস্ত বাঙালী মেয়েরা বাড়ীতে বসে থাকে তাদের স্বাস্থ্য স্কুল কলেজের মেয়েদের চেয়ে ভাল হত, কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না। তাছাড়া ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে দেখতে পাই যে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক মেয়ে লেখাপড়া করে, তাদের তো তার জন্য স্বাস্থ্য হানি হয় না। পড়াশুনা করলে যে কেন শরীর খারাপ হবে তার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণও দেখা যায় না।

অবশ্য কোনও জিনিষেরই আধিক্য ভাল নয়। আমরা যদি রাতদিন বসে কেবল পড়াই করি, আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গচালনা না করি, তাহ'লে স্বাস্থ্য হানি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

কিন্তু তার তো কোনও প্রয়োজন নাই। মনের উন্নতি সাধনের জন্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করার জন্য কখনও এতখানি পড়বার দরকার করে না যাতে স্বাস্থ্য হানি হ'তে পারে।

আমার মনে হয় যে আজকালকার মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হবার প্রধান কারণ দুইটি ; প্রথমতঃ যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য না খাওয়া, আর দ্বিতীয়তঃ ব্যায়াম চর্চা না করা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টির বিষয়ে আমি আজকে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এবং তার জন্য যে আমাদের কিছু করা উচিত, এ বিষয়ে গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কিছুটা সচেতন হয়েছি, কিন্তু কি যে ঠিক করলে ভাল হবে, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে বহু মতভেদ এখনও রয়ে গেছে। আমার মনে হয় যে—কি স্কুল কলেজে, কি গৃহস্থ বাড়িতে—বাঙালী মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার প্রচলন করলে এই প্রশ্নের আংশিক সমাধান হ'তে পারে।

ইয়োরোপে, আমেরিকাতে ও এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশে প্রত্যেক বড় সহরেই বালিকা, যুবতী, এমন কি বৃদ্ধদেরও খেলা ধূলা ও নানা রকমের ব্যায়াম চর্চা করবার সুন্দর সুন্দর "ক্লাব" আছে। স্কুল কলেজে যে সব মেয়েরা পড়ে তাদের সকলকেই, নিয়মিতভাবে প্রত্যেকদিন খানিকটা ব্যায়াম করতে হয়। আর যারা স্কুল কলেজে না পড়ে, তাদের কোনও বাধা বাধকতা না থাকলেও এই ব্যায়াম চর্চার মধ্যে এতখানি আনন্দ ও উপকার এরা পেয়েছে যে সারাদিনের কাজ কর্মের শেষে সন্ধ্যা বেলা এই সব ক্লাব গুলিতে জড় হয়ে তারা গানবাজনার তালে তালে অঙ্গ চালনা করে। এতে তাদের শরীর ভাল হয়, মনে ফূর্তি হয়, আবার রূপযৌবনও অধিকদিন স্থায়ি হয়।

অথচ আমাদের দেশে, এত বড় কলকাতা শহরেই গুটিকতক মাত্র বালিকাদের ব্যায়ামের সমিতি আছে। বয়স্কা মহিলাদের ব্যায়াম চর্চার ক্লাবের সংখ্যা তো আরোই কম ; যে কটি সেরকম ক্লাব আছেও বা, খুব কমসংখ্যক মহিলাই সেখানে যান।

অধিকাংশ স্কুলে এবং কোনও কোনও কলেজে মেয়েদের ব্যায়াম-শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে ব্যায়াম জিনিষটা এত বেশী প্রয়োজনীয় যে স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষরা এইদিকে আরো বেশী দৃষ্টিপাত করলে ভাল। স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হলে সারাবছর নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম চর্চা করা উচিত, কিন্তু কোনও সময়েই অতিরিক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু স্কুল কলেজের মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে অনেক সময়ে তারা একেবারেই খেলাধূলা করে না আবার কোনও খেলার প্রতি-যোগিতা সামনে থাকলে তাতে পুরস্কার লাভ করবার আশায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করে। এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়ে বরং অবণতি হবারই সম্ভাবনা বেশী।

কোনও স্কুল কলেজে বা ক্লাবে গিয়ে ব্যায়াম চর্চা করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁরাও ইচ্ছা করলে নিজের ঘরে বসে রোজ কিছুটা ব্যায়াম করতে পারেন। এমন অনেক ব্যায়াম আছে যা করতে কোনও সরঞ্জাম লাগেনা, অতি স্বল্প পরিসর ঘরের মধ্যেও যা সুন্দর ভাবে করা যায়। এমন অনেক

ব্যায়াম আছে বিশিষ্ট ডাক্তারদের মতে যা বিশেষ ভাবে মেয়েদের শরীরেরই উপযোগী। গত শ্রাবণ মাসের "মেয়েদের কথায়" সম্পাদিকা এই রকম কয়েকটি ব্যায়ামের কথা বলেছেন। এর পরেও "মেয়েদের কথার" পাতায় আমাদের এ বিষয়ে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। "মেয়েদের কথায়" পাঠিকা মেয়েদের, বিশেষ করে মায়েদের কাছে আমার এইটুকু নিবেদন যে তাঁরা যেন নিজেদের ও নিজেদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, কারণ সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনই প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব, আর দেহের স্বাস্থ্য না থাকলে মানসিক স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না।

পুরাতন বাক্স।

শ্রীনলিনী চক্রবর্তী।

পুরাতন খালি বাক্স বা কৌটা সব সময়েই আমাদের কাজে লাগে। ছোট-বড়-মাঝারি যে কোনও মাপেরই হোক, আর কাঠের, টিনের বা কার্ড্‌বোর্ডের, যে জিনিষেরই তৈরী হোক, সব রকমের বাক্সই কাজের জিনিষ। বড় বড় বাক্স-তোরঙ্গ-সিন্দুক থেকে আরম্ভ করে, বিস্কুটের টিন, জুতোর বাক্স, সাবানের বাক্স, এমন কি ছোট ছোট ওষুধের বাক্স পর্যন্ত আমাদের কাজে লাগে। আমাদের শোবার ঘরে থাকে কাপড় রাখবার তোরঙ্গ। তাকে তোলা বা টেবিলে সাজানো থাকে সেলাই বাক্স, টুকিটাকি রাখবার ছোট ছোট বাক্স, আবার ভাঁড়ার ঘরে সারিসারি সাজানো থাকে ডাল মশলা রাখবার ছোট ছোট বাক্স ও টিন। বাক্স না হলে আমাদের কোনও কাজই চলেনা, অথচ কত সময়ে কত বাক্স আমরা ফেলে দিই, সেটাকে কোনও কাজে লাগানো যেতে পারতো কিনা ভেবেও দেখিনা। এই সব পুরানো ভাঙা বাক্স ও কৌটা গুলিকে আমরা ইচ্ছা করলেই একটু হাতের কাজের সাহায্যে আবার নতুনের মতন করে নিতে পারি। আবার অদরকারী বাক্সের ওপর একটু কারিকুরি করে বেশ নতুন নতুন সৌখিন জিনিষ তৈরী করা যেতে পারে। আমাদের ঘরের চারদিকে নানারকমের বাক্স যখন রাখতেই হয়, তখন এগুলিকে যদি আমরা ঝকঝকে নতুনের মতন করে রাখতে পারি তাহ'লে আমাদের ঘরখানিরই শ্রী ফিরে যাবে।

পড়বার টেবিলে বা ঘরের তাকে আমরা অনেক সময়ে কলম-পেন্‌সিল-ছুরি ইত্যাদি রাখবার জন্য ছোটছোট কাগজ বা কাঠের বাক্স রাখি। এই সব বাক্স পুরাণো হয়ে গেলে পর এগুলির গায়ে

খানিকটা রঙীণ কাগজ বেশ পরিস্কার করে আঠা দিয়ে আটকে দিলেই আবার এগুলিকে নতুনের মতন দেখাবে। ইচ্ছা করলে তার ওপর কোনও পছন্দ মতন ছবি কেটে আটকে দেওয়া যেতে পারে। নিজে ছবি আঁকতে পারলে একটু রঙ্ ও তুলির সাহায্যে ছবি এঁকেও পুরাতন বাক্সকে নতুনের মতন করে নেওয়া যেতে পারে। ঘরের পর্দা, বিছানার সুজনি, টেবিলের চাদর, সব যদি একটি বিশেষ রঙের হয়ে থাকে, তাহ'লে সেই ঘরে যে সব বাক্স সাজানো থাকবে সেগুলিও সেই রঙের হওয়া উচিত।

শ্রাবণ মাসের "মেয়েদের কথা"তে আমি কাগজ-কাটার কথা ও "ষ্টেন্সিলের কাজের" কথা কিছু লিখেছিলাম। পুরাতন বাক্সে নতুন কাগজ লাগাবার পর সেই কাগজে অন্য রঙের কাগজ কেটে ফুল-লতা-পাতা-মানুষ জন্তু বা কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তৈরী করলে বেশ সুন্দর দেখায়। ষ্টেন্সিলের কাজও কার্ডবোড্ বা কাঠের বাক্সের ওপর বেশ সুন্দর হয়।

সেলাই বাক্স জিনিসটা আমাদের খুব কাজে লাগে। কিন্তু সেলাই বাক্স কার্ডবোর্ডের না করে কাঠের বা টিনের তৈরী করলে বেশী ভাল, কারণ কার্ডবোর্ডের বাক্স সহজে ভেঙে যেতে পারে।

সাধারণ কাঠের বা টিনের বাক্স ও তার ঢাকনা নিজের পছন্দ মতন রঙের ছিটের বা রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুড়ে নিলে বেশ সুন্দর সেলাই বাক্স হয়। বাক্সের ভিতরেও সেই রঙের বা তার সঙ্গে মানানসই কোনও রঙের "লাইনিং" (lining) দিয়ে নিতে হবে। এই "লাইনিঙের" গায়ে গায়ে থাকবে ছোট ছোট খোপ—ছুঁচ-সূতো-কাঁচি ইত্যাদি রাখবার জন্য, আর বাক্সর মাঝখানে থাকবে সেলাইয়ের কাপড়গুলি। এইরকম বাক্স তৈরী করবার সময়ে মনে রাখা উচিত যে কাপড় দিয়ে বাক্স মুড়বার সময়ে কাপড়ের ধারটা যেন কোনও দিকে বেরিয়ে না থাকে, তাহলে, সহজেই তা ছিঁড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত কাপড় মুড়ে সেলাই করবার সময়ে হাতের সেলাই যেন খুব পরিস্কার হয়, বাক্সের কোনগুলি যেন সাবধানে পরিস্কার করে মুড়ে দেওয়া হয়, তা নাহলে সুন্দর দেখাবে না।

প্রসাধনের টেবিলেও কাঁটা-ফিতে-পাউডার ইত্যাদি রাখবার জন্য নানারকম বাক্স ও কৌটার দরকার হয়। এইগুলিকে নতুনের মতন করে নিয়ে টেবিলটা সুন্দর করে সাজানো যায়। এক টেবিলের ওপর যে সব বাক্স থাকবে সেগুলি একরঙের হলেই ভাল, অন্ততঃপক্ষে একধরণের রঙ্ হওয়া চাই। ফিতে-কাঁটা রাখবার জন্য কাগজ বা কাপড় মোড়া বাক্স রাখা যেতে পারে। টিনের বাক্স বা কৌটর গায়ে কাগজ না লাগিয়ে কিছু "এনামেল পেণ্ট" (enamel paint) কিনে লাগিয়ে নিলে সুন্দর দেখায়। কাঁচের কৌটর ভিতর দিকে তুলি দিয়ে এনামেল পেণ্ট্ লাগিয়ে নিলেও ভাল হয়। আবার কেবল একরঙের পেণ্ট্ না লাগিয়ে যদি দু'তিনরঙ্ মিশিয়ে একটু কারিকুরি করা যায় তাহ'লে তো কথাই নাই।

শুধু যে শোবার ঘর ও পড়বার ঘরগুলি সুন্দর করে সাজালেই গৃহিণীর ঘর সাজানো শেষ হয়ে গেল তা নয়—ভাঁড়ার ঘরটিকেও সুন্দর করে সাজানো দরকার। প্রতিদিনকার অনেক কাজই

মেয়েদের এই ঘরের মধ্যে বসে করতে হয়। কাজেই এই ঘরটিকে যদি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যায়, তাহলে সেই সব কাজকে আর শাস্তি বলে মনে হবে না। ঘরের তাকগুলি যদি বেশ ঝেড়ে মুছে রঙ্ করে রাখা যায়, তার ওপরের বোতল ও বৈয়ামগুলি যদি বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যায়, আর ডাল-মসলার কৌটাগুলি যদি রঙ্ করে নতুনের মতন করে নেওয়া যায়, তাহ'লেই ঘরের শ্রী ফিরে যাবে। আমার পরিচিত একটি সুগৃহিণীর ভাঁড়ার ঘরে দেখলাম যে তিনি ডাল ও মসলাপাতি সব রেখেছেন ঠিক এক ধরণের টিনে, প্রত্যেকটি টিন এক রকমের কাগজ দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু পাছে টিন চিনতে অসুবিধা হয় তাই সেগুলির ওপর পরিস্কার করে ডাল মসলার নাম লিখে রেখেছেন।

অপরিচ্ছন্ন ভাঁড়ার ঘরে বসে কাজ না করে পরিস্কার সাজানো ঘরে বসে কাজ করলে গৃহকর্ত্রীর শরীর ও মন দুইই ভাল থাকবে।

শুধু যে ছোট ছোট বাক্সকেই নতুন করে নেওয়া যায় তা নয় বড় বড় কাঠের বা টিনের তোরঙ্গ আর সিন্দুককেও রঙ্ দিয়ে নতুনের মতন করে নেওয়া যেতে পারে। টিনের তোরঙ্গ বা হাতবাক্স পুরানো হয়ে গেলে বড় বিশ্রী দেখতে হয়ে যায়। এইগুলিকে দোকানে দিলে তারা নতুনের মতন রঙ্ করে দেয়। কিন্তু এইটুকুর জন্য দোকানদারের শরণাপন্ন হবার কোন দরকার নেই। একটা মোটা তুলি কিনে নিজের হাতেই পুরানো বাক্সের গায়ে রঙ্ দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দরজা-জানলার রঙ্ "বয়েলকরা" তিসির তেলে গুলে কাঠের বাক্সের গায়ে লাগিয়ে দিলে খুব সুন্দর দেখায়।

এইরকম ভাবে পুরাতন বাক্সকে নতুনের মতন করে নিলে শুধু যে নিজেরই সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তি হয় তা নয়, অন্যকেও বেশ উপহার দেওয়া যেতে পারে। কোন আত্মীয় বা বন্ধুর জন্মদিনে নিজে হাতে রুমাল তৈরী করে নিজের তৈরী সুন্দর একটা বাক্সের মধ্যে করে উপহার দিলে তারা খুবই খুসী হবে। ছোটদের লজঞ্চুস বা চকোলেট উপহার দেবার সময়ে যদি একটা খুব বাহারে রঙীন বাক্সের মধ্যে করে দেওয়া যায় তাহ'লে তাদের আনন্দ হবে খুব, আবার তার ওপর যদি রঙ বেরঙের জন্তু পাখীর ছবি থাকে, তাহ'লে তো কথাই নাই! বিলাতি অনেক ছবি আঁকবার বা লিখবার সরঞ্জাম সুন্দর সুন্দর বাক্সের মধ্যে করে কিনতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে ওই সব সরঞ্জামগুলি আলগা কিনে নিজের তৈরী একটা বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেলাই বাক্স তৈরী করেও বেশ উপহার দেওয়া যেতে পারে।

''সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি।
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।''

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের কথা

দরিদ্রদেশে জিনিষপত্রের মহার্ঘতা বিশেষ দুঃখের কারণ। শুধু বিলাসদ্রব্য নয় শরীরের মোটা ভাতকাপড়ও ক্রমশ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে! সকলের মুখেই তাই এইকথা শুনি—"যুদ্ধটা এবার থামলে হয়—"

যুদ্ধ থাকবার সম্ভাবনা কিন্তু এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বলে যে ব্যাপারের উল্লেখ করে থাকি তার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ইংরাজ যেভাবে তার সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করছে তাতে শীতের পরে বড় যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়; অপরদিকে জাপান অপেক্ষা করছে সন্দেহজনকভাবে।

এখনকার যুদ্ধের কেন্দ্র রাশিয়ায় যে প্রলয় সংঘটিত হচ্ছে তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এতবড় যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। রাশিয়া সেদিনকার শক্তি, জগতের মহাশক্তিপর্যায়ে তার স্থান সদ্য স্বীকৃত হয়েছে মাত্র; কিন্তু সেই রাশিয়া ইউরোপকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে জার্মানীর বিজয়-অভিযানের গতি প্রতিহত করে। জার্মানীর পৈশাচিক শক্তির শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার্য, কিন্তু রাশিয়া নির্ভর করছে তার জনগণের বিশ্বস্ততার উপর, তার মধ্যে পঞ্চমবাহিনীর অভাবের উপর। তাছাড়া রাশিয়ার বিরাটত্ব তার ভরসা; রুষ-সৈন্য যতই হটুকনা কেন, জার্মানীর এত সৈন্য নাই যারদ্বারা সমগ্র সোভিয়েটরাষ্ট্র সে অধিকার করতে পারে। এইরূপ যুদ্ধ স্বল্পকালের মধ্যে থামেনা।

ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রভাব আংশিকভাবে আমাদের উপর পতিত হলেও একথা সত্য যে তজ্জনিত যে ক্ষয় ও ক্ষতি তা আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্পই অনুভূত হচ্ছে। বরংচ কেউ কেউ চাকরী পাচ্ছেন, অনেক বড় ব্যবসায়ী রাজসরকারের মোটা কনট্র্যাক্ট পেয়েছেন এবং অনেক দেশী ব্যবসায়ের মালিক বিলাতী জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কিছু স্বচ্ছল অবস্থার মুখ দেখছেন। বরংচ যুদ্ধের পর তাঁদের এ সৌভাগ্য টিকবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাস্য। নিষ্প্রদীপ এবং পেট্রোলের অভাব ভিন্ন অন্য অসুবিধা নাগরিক জীবনে তেমন প্রকট হয়ে উঠছে না। আলোচনা, সভা, মীটিং ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবেই চলে যাচ্ছে। নারী প্রগতিও স্থগিত নাই।

মৌলিখকভাবে কলিকাতায় ও বাহিরে নানা মহিলাসমিতির কাজকর্মের বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছায়; কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশ করবার মত নির্ভরযোগ্য লিখিত বিবরণ আমরা পাইনা। পাঠিকাদের নিকট ও সমিতি সমূহের নিকট,—বিশেষ করে যাঁরা আমাদের পত্রিকা নিয়মিত ভাবে পেয়ে থাকেন তাঁদের নিকট, আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন তাঁদের কাজকর্মের বিবরণ মাঝে মাঝে আমাদের পাঠাতে না ভুলে যান।

গত ৯ই নভেম্বর, রবিবার, শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা সমিতির দক্ষিণকলিকাতা শাখা সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হয়। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহ্‌রুর নির্দেশানুযায়ী দেউলীর অনশনকারী রাজবন্দীদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে সভার আলোচনা আরম্ভ হয় ও সভানেত্রীর অভিভাষণের পর নূতন কার্যকরী সমিতি গঠন করে কাজ শেষ হয়। আমরা এই সঙ্ঘের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

* * * * *

আমাদের পত্রিকার নিয়মাবলীর সঙ্গে প্রতিমাসেই এই কথা প্রকাশ করা হয় যে কোন গ্রাহিকা যদি কোন মাসের কাগজ না পান তবে মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের লিখে জানালে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করব। এরূপ দুএকটি মৌখিক অভিযোগ কোন কোন সাধারণ বন্ধুর মারফত আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু এইরূপ অভিযোগের অসুবিধা এই যে সেগুলি আপিসে ফাইল করা যায় না, ফলত সেগুলির নিস্ফল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। তাছাড়া পত্রিকার অপ্রাপ্তি দুই কারণে হতে পারে, ডাকঘরের দোষে অথবা আপিসের ঠিকানা লেখার দোষে। লিখিত অভিযোগ পেলে ভুলের অনুসন্ধান করা সহজ হয়, বিশেষত যদি অভিযোগকর্তৃর ঠিকানা তাতে স্পষ্টভাবে দেওয়া থাকে। যাঁরা বৎসরের মাঝখানে গ্রাহিকা হয়েছেন এবং পূর্বের কোন সংখ্যা পাননি তাঁরাও আমাদের লিখে জানালে সুবিধা হয়।

* * * * *

আগামী মাসে "মেয়েদের কথা"র রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সেই সংখ্যা ক্রমপ্রকাশিত প্রবন্ধ বা গল্পের অংশ ভিন্ন সাধারণ বিষয় কিছু থাকবে না।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
—ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার নাই।"

রবীন্দ্রনাথ।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।৵০ আনা ; যাণ্মাষিক মূল্য ১৷৹ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৵০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন ; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। **গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।**

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

আগামী মাসে--

"মেয়েদের কথা"র

"রবীন্দ্র-সংখ্যা"

প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যায় ক্রমপ্রকাশিত প্রবন্ধ বা গল্পের অংশ ভিন্ন সাধারণ বিষয়

কিছু থাকিবে না

বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন

কর্ম্মাধ্যক্ষ—

মেয়েদের কথা

১৭২।৩, রাসবিহারী এভেনিউ,

পোঃ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

Printed at Bhowanipur Art Press, 82-A, Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar Chakravartty and Published by same from 172-3, Rashbehari Avenue, Ballygunj, Calcutta.

মেয়েদের কথা

সম্পাদিকা —

রবীন্দ্র সংখ্যা

বিজ্ঞাপন দাতাদের নিকট আবেদন করিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক "মেয়েদের কথার" নাম উল্লেখ করিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট আবেদন করিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "মেয়েদের কথার" নাম উল্লেখ করিবেন।

যদি
হাসতে চান
সচিত্র ভারত
পড়ুন।
প্রতি সংখ্যা দুই আনা
নমুনার জন্য পত্র লিখুন।
২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সূচি পত্র—পৌষ ১৩৪৮

রবীন্দ্র সংখ্যা।

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | পৌষ—১৩৪৮ | ৯ম সংখ্যা

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচি পাতা হয়ে এলো দলে দলে অরণ্যের মাঝে।
বাতাসে মুক্তির দোলে খেলো ছুটি ক্ষণিক বাঁচিতে;
বিশুদ্ধ আত্মার স্বাদ দেহ নিলো আলোয় নাচিতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ ফাল্গুন
১৩৩২

রবীন্দ্রস্মরণ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

শোকের সময় সমদুঃখী যারা তাদের একত্র হবার বাসনা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের পার্থিব পরমায়ুর অবসান হয়েছে। তাই আজ আমরা,—তাঁর অমেয় আত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারীরা—ঘরে ঘরে, সভাসমিতিতে, পত্রিকার পৃষ্ঠাবলিতে, মিলিত হচ্ছি তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার জন্যে। আপনারা আমাকে ডেকেছেন। আপনাদের সঙ্গে আমার যে একটা অন্তর্গূঢ় আত্মীয়তা আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে তা অনুভব করছি। আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা অনুপযুক্ততার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়ে আপনাদের কাছে টেনে এনেছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাদের এ আহ্বান গ্রহণ করছি।

যে কথাটি অহরহ এখন আমার মনে জাগছে শুধু তাই আপনাদের কাছে নিবেদন করব। রবীন্দ্রনাথের পালা সাঙ্গ হল, এইবার আমাদের পালা।

শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহের বিচিত্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে যাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ হয়, ইহলোকের বিচ্ছেদেও সে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে আমাদের স্মৃতিতে। তাঁদের মধ্যে যা কিছু চিরন্তন তাই থাকে আমাদের চিতসঞ্চিত হ'য়ে। যা কিছু নশ্বর, শ্মশানবহ্নিতে ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। আমাদের সকলের অন্তরে রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত মূর্তির একটি অস্পষ্ট ও অপূর্ণ আবছায়া রইল। এখন আমাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সেটিকে উজ্জ্বলতর ও পূর্ণতর করে তোলা, আমাদের ব্যক্তিগত শুদ্ধি ও সাধনার দ্বারা।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মস্রষ্টা। দেহমনে যে অতুলনীয় সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাকে সহস্রদল পদ্মের মত ফুটিয়ে তুলেছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের কাছ থেকে প্রাণের খোরাক সংগ্রহ ক'রে। এই বহুমুখী আত্মসৃষ্টিই ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই সৃষ্টিশক্তিতে মানুষ বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তিময় সৃজনধর্মী চৈতন্যের কণা।

গাছপালা পশুপক্ষী বেড়ে ওঠে আত্মপ্রাণশক্তির বলে পরিস্থিতির আনুকূল্যকে আত্মসাৎ করে। আমরা স্বেচ্ছায়, আত্মপ্রচেষ্টায়, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির গ্রহণ বর্জনের সাহায্যে নিজ নিজ জীবনকে যেমন গড়ে তুলতে পারি তেমনি আবার বিকৃত ও ধ্বংসানুগামী ক'রে তুলতে পারি আপনার কর্মফলে।

তৈত্তিরিয় উপনিষদের ঋষি বলছেন—

'স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্ম বসেছিলেন তপস্যায়। যা কিছু দেখছি সবই তাঁর সেই তপস্যার ফল। রবীন্দ্রনাথে আমরা দেখি অভিজাতী তপস্বীকে। তাঁর আত্মরচনা শুধু কাব্যে নয়। তিনি অনিন্দ্যসুন্দর জীবনশিল্পী। যিনি

সুন্দরকে আকার দান করতে পারেন তিনিই ত শিল্পী। এই চারুশিল্পকলায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, দেহপ্রসাধন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সাহিত্য রচনা বিশ্বমৈত্রী অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিল।

শিক্ষিত বাঙালীর মুখে আজকাল culture বা সংস্কৃতি শব্দটি সর্বত্রই শুনতে পাওয়া যায়। যদি একবার কল্পনা করি যে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি, তাহ'ল এ সংস্কৃতির ধারণা আমাদের কোথায় থাকত? তিনি যেন হিন্দুস্থানের বুকে নলকূপ বসিয়ে উপনিষদের অমৃতধারা, সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যসুধা, পৌরাণিক ইতিকথার সারনির্যাস, বৈষ্ণব কাব্যের রসপ্রপাত, মধ্যযুগের সাধুভক্তমরমীদের মর্মবাণী, বাংলার আউলবাউলদের স্বতঃস্ফূর্ত গভীরতম উপলব্ধি, এমন কি পল্লীলক্ষ্মীদের মেয়েলী ছড়ার মধুময় পুনরাবৃত্তি বাংলার ঘরে ঘরে বিতরণ করে গেছেন। প্রাচীন সাহিত্যকে তিনি রূপায়িত করেছেন নবরোমান্টিক রসায়নে। দাম্পত্যপ্রেমকে অনুরঞ্জিত করেছেন প্রাণবান প্রতীচ্য তারুণ্যের শুভ্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে। যে গান একদা গৃহে পরিবারে ছিল নিষিদ্ধ আজ সে গান বাংলার ঘরে ঘরে আলো বাতাসের মত ছড়িয়ে গেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী বন্ধু বান্ধব সকলকেই এক আসরে বসিয়েছে সঙ্গীতের সুধাপানে। যে নৃত্যকলা ভারতের, শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের দলবদ্ধ দেহসঙ্গীত, কোল ভীল সাঁওতাল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক সুসভ্যজাতির পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব ব্যাপারে অঙ্গীভূত হয়ে আছে, সেই নৃত্যহিল্লোলকে তিনি উদ্বেলিত করেছেন নিরানন্দ বাংলার মরাগাঙে। সহস্র ধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণগঙ্গোত্তরী উৎসারিত হয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুদ্বুদ্ধ ক'রে তোলবার জন্যে। ধর্মে অর্থে ও ভোগে সত্য স্বাস্থ্য কল্যাণ ও আনন্দকে জাগ্রত করেছেন তাঁর মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে। তাঁর বিচিত্র ও অপ্রমেয় দানের অবধি নেই।

রবীন্দ্রনাথ অকুতোভয় ও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। রাষ্ট্রিক জীবনে সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর স্বপ্ন ও প্রয়াস সারাজীবনব্যাপী। তাঁর উদার সার্বভৌমিক হৃদয় পূর্ব ও পশ্চিমের যোগসূত্রটি অমোঘদৃষ্টিতেই দেখেছিল। মানুষের মধ্যে নরোত্তম যাঁরা তাঁরা দেশকাল সম্প্রদায়ের গণ্ডীর অতীত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করবার জন্যে বিশ্বভারতীয় শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটি তাঁর উত্তর জীবনের অতন্দ্রিত সাধনার ফল। তিনি হয়েছিলেন বিশ্বপথিক, ভারতের মৈত্রীবার্তা দেশ দেশান্তরে প্রচার করবার জন্যে এবং সর্বদেশীয় নরনারীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আত্মীয়তাসূত্রে আপনাকে সম্বদ্ধ করবার ঐকান্তিক আগ্রহে।

কবিগুরু স্ত্রীপুরুষের যুগলজীবনের আদর্শকে যেমন শাশ্বত দম্পতী হরগৌরীর অপ্রমত্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের আলোকে উদ্‌ভাসিত করেছেন তেমনি আবার নারীকে পুরুষের কর্মসঙ্গিনী ও সহযাত্রিণীরূপে চলিষ্ণু করতে প্রয়াসী হয়েছেন এই প্রগতিশীল যুগযাত্রার দুর্গমপথে। সর্বোপরি নারীকে তার আত্মনিরূপণের কর্ত্রী ও আত্মমর্যাদার অধিকারিণী করবার জন্যে তাঁর প্রবীণ লেখনী ধারণ করেছেন শেষ জীবনে।

অন্তিমকাল পর্যন্ত ভগ্নদেহে কিন্তু পরাক্রান্ত অকুতোভয় অন্তরে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন সুদূরগামিনী ঋষিদৃষ্টির অনুসরণে ক্রমাভিসারী কল্যাণ আনন্দ ও শান্তির পথে

স্মৃতির রক্ষার স্থান আর কোথায় আছে আমাদের অন্তর ছাড়া? আমাদের অন্তর্লোক গঠিত হয় আত্মিক সঞ্চয়নে, রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় পরিস্থিতির আনুকূল্যে। রবীন্দ্রস্মরণের যুগ এইবার লাভ করল তার অরুণরাগ বাংলার পূর্বাশায় তাঁরই চিতাবহ্নিতে। আমাদের নব সবিতার অভ্যুত্থান ও অভিযান সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত সাধনায়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, জীবন-ব্যাপী তপশ্চর্যা, আরব্ধ কর্মানুষ্ঠান যদি আমাদের পারিবারিক সামাজিকও রাষ্ট্রিক জীবনে অধিগত হয় সকলের সম্মিলিত সাধনায়, তবেই তাঁর স্মৃতিকে আমরা রক্ষা করতে পারব। তিনি আমাদের ত্যাগ করেননি। আমরা যেন তাঁকে আমাদের জীবনে নিরাকৃত না করি। 'অণিরাকরণমস্তু'। *

"রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১"

শ্রীলীলা মজুমদার।

যাঁর কীর্ত্তি তাঁকে মানুষের বিস্মিত দৃষ্টি যতদূর যেতে পারে, তার চেয়েও ঢের উপরে নিয়ে গেছে; শত শত মুগ্ধ সমালোচক যাঁর কথা শত মুখে ব'লে শেষ করতে পারে নি; এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষের কথা মানুষ শ্রবণ করবে, ততদিন তিনি অমর হয়ে থাক্‌বেন। একসারি বইএর যে কোনটা একটু খুলে ধরলেই তার ঐ দুইখানি লাল, কিম্বা কালো, কিম্বা অন্য কোন রংএর, মলাটের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে মুখে সংযত হাসি, আর চোখে গভীর প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়াবেন। তিনি কোনদিনও মরবেন না।

কিন্তু রাখী-পূর্ণিমার দিন, দুপুর বেলায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি মরে গিয়েছেন। সুদীর্ঘ জীবনের অনেক দুঃখ শোক আশা আনন্দ ভোগ ক'রে তিনি লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের মতন মরে গেলেন। কি শান্তিময় মৃত্যু! দেখ্‌লাম এক মুহূর্ত্তে তিনি আছেন, পর মুহূর্ত্তেই নেই; মাঝখানে কোন শ্রীহীণ ব্যবধান নেই।

---

*"Customs Recreation Club" এ সভাপতির সম্ভাষণ। ৯।৯।৪১

প্রথম রবীন্দ্রনাথকে ছোটবেলা থেকে স্কুলের ক্লাশের বইএ, খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায়, জনসভায়, রঙ্গমঞ্চে নানান্ মনোহরণ বেশে দেখেছিলাম। আর দ্বিতীয় জনকে প্রথম দেখ্‌লাম ১৯৩১ সালে, যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হয়নি, দার্জিলিংএ। সঙ্গে ছিলেন দিনুবাবু; তাঁদের কথায় আর গানে মায়ালোক সৃষ্টি হয়েছিলো।

সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অধ্যাপনা করতে অনুরোধ করেন। এবং আমি তার ফলে এক বৎসর তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জান্‌বার সুযোগ পেলাম। মনে আছে, প্রথম যেদিন শান্তিনিকেতনে গেলাম, বিকেলবেলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উত্তরায়ণের প্রশস্ত বারাণ্ডায়, যতদূর মনে পড়ছে ফিকে গোলাপী মতন বেশে, গলায় সাদা ফুলের মালা পরে বসেছিলেন। যুগ-যুগান্তর ধ'রে আমার মতন তরুণীরা কবির অপরূপ রূপের যেমন স্বপ্ন দেখে থাকে, ঠিক তারই আদর্শ।

সেখানে প্রথম বুঝ্‌লাম দু'রকমের কবি থাকে। একজনের সম্বন্ধে আরেকজন বিখ্যাত কবি বলেছেন—

"Weave a circle round him thrice
And close your eyes with holy dread,
For he on honey-dew hath fed
And drunk the milk of Paradise."

আর একজনের মধ্যে ঐ উন্মাদটির বদলে দেখ্‌তে পাই প্রসন্নরূপ, যে জলে স্থলে, আকাশে, আলোকে, গাছের সবুজ পাতায় আর পায়ের নীচের শ্যামল ধরণীতে, চক্ষু বুলিয়ে সৌন্দর্য আহরণ ক'রে আনে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বহুবার আশ্রমের বহু ছোট মলিন কথা, ছোট বিরক্তি, ছোট অভিযোগ নিয়ে গেছি, আর তিনি যেই ঠোঁট-দুখানি আল্গা ক'রে প্রসন্ন প্রশান্ত অভিবাদন করেছেন, আর কিছু বল্‌তে পারি নি; মনে মনে বুঝেছি এতে কাজের অসুবিধা হতে পারে কিন্তু যেখানে অমন honey-dew বিতরণ হচ্ছে, কেমন ক'রে কুশ্রী কথা বলি? কিন্তু ঐ honey-dew তাঁকে অস্বাভাবিক ক'রে দেয়নি, ভয়ঙ্কর ক'রে তোলেনি। বহুবার মনে হয়েছে তিনি ঐ দ্বিতীয় দলের মানুষ, পৃথিবীর কালো মাটি যাদের চোখের রোদ লেগে সোনালী হ'য়ে যায়। বহুবার মনে হয়েছে এ মূঢ় পৃথিবীর ভুলভ্রান্তিতে অধৈর্য্য হ'লেও তিনি হ'লেন প্রসন্নতার কবি, প্রশান্তির কবি, যাঁর মুখ থেকে এই কথা নিঃসৃত হওয়াই স্বাভাবিক—

"এই যা দেখা এই যা ছোঁয়া এই ভালো, এই ভালো,
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে, কান্না হাসির গঙ্গাযমুনায়,
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।"

তিনি চলে গেলে পরও বারবার আমার মনে হয়েছে কেন তাঁর জন্য শোকসভা করবো ? যুগযুগান্তরে এমন জীবন ক'জনার হয় ? আমাদের বাংলাদেশকে কোয়াসা থেকে টেনে একেবারে লোকচক্ষুর সামে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রূপরসের অধিকারী ক'রে দিয়ে গেছেন। একশত বৎসর পরে যারা কবিতা পড়বে তাদের পর্য্যন্ত মনে করে বলেছেন—

"আজি নব-বসন্তের আনন্দের লেশমাত্র ভাগ
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,
…আজিকার কোন রক্ত-রাগ. অনুরাগে সিক্ত করি
পারিবনা পাঠাইতে তোমাদের করে.
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে ?"

এমন মানুষ কি সমালোচনার কাছে ধরা দেয় ? মনে পড়ছে দশ বছর আগে হঠাৎ একদিন সখ ক'রে বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাশের ছেলেদের Shellyর sky-lark পড়াতে বস্‌লেন। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম তাঁর মাথার উপর দিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রান্তসীমার বাইরে দিগন্তবিস্তৃত ঘন সবুজ শালবন, আর তার মাঝখানে, দূরে, একটা ফুলে ভরা পলাশগাছ, রাজার বেশে বন আলো ক'রে রয়েছে। আর আমাদের আর তাদের মাঝখানে ভাঙ্গা খোয়াই। কি অপরূপ সমাবেশ ! আমরণ বুকে জমিয়ে রাখ্‌বার মতন কি অপরূপ স্মৃতি।

সেটা ছিলো জয়ন্তীর বৎসর। আমি যখন গিয়ে প্রথম আশ্রমে যোগ দিলাম, তখনও সেখানকার দৈনন্দিন নিয়মে বিঘ্ন ঘটে নি, উৎসব কোলাহল কিছু আরম্ভ হয়নি। সকালবেলা কাজের আগে সমস্ত বিদ্যালয় লাইব্রেরির সামে মিলিত হ'য়ে বৈতালিক গান শুন্‌তাম। শান্তিনিকেতনের সেই শুকো হাওয়া, আর সকালবেলার পাখীর আওয়াজগুলো, আর সদ্য ঘুম থেকে ওঠা তরুণ মুখগুলি, আর পরিস্কার সূর্য্যের আলো, এ সমস্তও মনে করে রাখ্‌বার জিনিষ। এ সমস্ত আয়োজনের পেছনে যেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। এমন ক'রে দিনটাকে স্থরু করতে এ যুগে কজনার মনে হয়। আবার দিনের শেষে উত্তরায়ণের পেছনের হল্‌টাতে বস্‌তো রিহার্সেলের পালা। নাচ, গান, অভিনয়। সে এক রাজকীয় রিহার্সাল। উপভোগ্য, কিন্তু সকালের সেই শান্ত আরম্ভটা থেকে স্বতন্ত্র।

সেই জয়ন্তীর রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমার মনে হ'ত বেঁচে থাকাও একটা চারু শিল্প। এই ভালোমন্দ সুন্দর অসুন্দর মেশানো সংসারটাতে থেকে, মন্দটাকে জেনেও তা'কে প্রত্যাখ্যান ক'রে সুন্দরটাকে নিয়ে তার সঙ্গে বাস করতে হয়। শোয়া, বসা, চলা, কথা বলা, প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাসকেও সুন্দর ক'রে দেওয়া যায়।

তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হ'ত কবি কেন বাইরের আচরণ সম্বন্ধে এত সাবধান, আশ্রমের ছাত্রদের আর অধ্যাপকদেরও বার্‌বার এ বিষয়ে কেন এত সতর্ক করে দেন। অন্তরটা অমলিন

থাকলেই তো হ'ল। এখন বুঝতে পারছি অন্তরের সংবাদ নেবে এত কাছে পৃথিবীর কজনই বা আসে ; অধিকাংশ লোকের সংগে আমাদের বাইরের আচরণেরই সম্বন্ধ, তাই তিনি ঐ জিনিষটাকে বড় ক'রে দেখ্তেন। সুন্দর ক'রে বাঁচবার তো কোন একটা নিয়ম বাঁধা প্রণালী নেই, জীবনটার প্রতি মুহূর্ত্তকে সুন্দর করা ছাড়া।

কত যে অসংলগ্ন কথা মনের মধ্যে ভীড় ক'রে আসে। সুন্দর ক'রে বাঁচার কথা বল্তে মনে হ'ল একদিন রবীন্দ্রনাথকে বল্তে শুনেছি আমাদের বাঙালী ছেলেমেয়েরা সুন্দর ক'রে বাংলা বল্তে পারে না। এ কথা তিনি ভাষার কথা মনে ক'রে বলেন নি, উচ্চারণের কথাতেই বলেছিলেন। যখন অভিনয়ের জন্য ছাত্রীদের প্রস্তুত করতেন বারংবার এই আক্ষেপ করেছেন। তার উপর সেটা ছিলো তাঁর ছবি আঁকার যুগ। জীবনের পলায়মান মুহূর্ত্তগুলির একটিকেও যেন তিনি ব্যর্থ হ'তে দিতেন না। এত সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে আশ্রমের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করবার তাঁর অবসর হ'ত। এক সময়ে তিনি ছেলেদের সঙ্গে বাস করতেন। কিন্তু আমি যখনকার কথা বল্‌ছি তখন তাঁর দেহ বড় ক্লান্ত, নিজে আশ্রমের মধ্যে যেতে পারতেন না ব'লে আশ্রমকে নিজের কাছে টেনে আনতে চাইতেন।

দেখ্তাম সকল বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিবেচনা, প্রয়োজন হ'লে কঠিন বিচারকও হ'তে পারতেন, আবার এ সবের পেছনে একটা লোক বাস করতো যার কাছে কেঁদে পড়লে বিপন্ন লোকের তংক্ষণাৎ ব্যবস্থা হ'য়ে যেতো। এ সময়ে তাঁর আচরণ দেখে তাঁরই এক শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের কথা মনে পড়তো যিনি দয়া-পরবশ হ'য়ে হাতের কাছে যা পেতেন, নিজের হোক কি পরের হোক, এমন কি অতিথি অভ্যাগতের চাদর ও লাঠি পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে দান ক'রে বস্তেন।

মনে আছে সেটা রাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার বছর ছিলো ব'লে সকলেই একটু উদ্বিগ্ন ও সন্দিগ্ধ থাক্তেন। এমন সময় শান্তিনিকেতনে একজন অনির্দ্দিষ্টবয়সী সুবিপুলা চীনা মহিলার আগমন হ'ল। তার এক ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি কাপড়চোপড় ছাড়া আর কোন পরিচয়ই পাওয়া গেলো না। তার কৌতূহল ছিলো অদম্য, কৌশল অভাবনীয় এবং স্বভাব ছিলো হিংস্র। তাকে সরাবার জন্য আমরা সকলে যখন বদ্ধপরিকর হ'লাম, সে গিয়ে গুরুদেবের চরণে কেঁদে পড়লো, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আশ্রমে থাক্‌বার এবং আশ্রমের হাস্পাতালে সাহায্য করবার অনুমতি দিয়ে ফেল্লেন, তার কোন যথার্থ পরিচয় না জেনে, এবং তার সম্বন্ধে নানান্ সন্দেহ শুনেও। এমনি ক'রে সবাইকে তিনি পরাস্ত করলেন।

আমার একটা ধারণা যে পৃথিবীর প্রতিভাধান মানুষেরা সমস্ত পৃথিবীর সম্পত্তি, তাঁরা তাঁদের পরিবারের ও নন্, তাঁদের দেশেরও নন্। তা হ'লে আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও পৃথিবীর কাছে ছেড়ে দিতে হবে। শুনেছি সেক্সপীয়র ছাড়া আর কোন যুগের কোন কবিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক নিশ্বাসে নাম করবার সাহস কারু হয় নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের শতমুখী প্রতিভার কাছে সেক্সপীয়রও হার মেনে যান। বোধ হয় জগতের এমন কোন সভ্য ভাষা নেই যাতে কবির কোনও না কোনও

একটা রচনা তর্জ্জমা হয় নি। এমনি যাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্য স্মৃতিসভা করা বা স্মৃতিমন্দির তোলার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু যেমন আমাদের অকৃতজ্ঞ মনকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, মাটির দেহ নিয়ে কত দেবোপযোগী সামগ্রী পেয়েছ তুমি, রোদ আর দক্ষিণের হাওয়া, সুনীল আকাশ আর স্রোতের জল, আর আলো আর সবুজ গাছপালায় ঢাকা ধরণী, তেমনি মাঝে মাঝে এও স্মরণ করিয়ে দিতে হয়—"রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়েছিলে, হজরত মহম্মদকে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে, যীশুকে মেরে ফেলেছিলে, তবু আরও কত পেয়েছো দেখ—কালিদাস, কৃত্তিবাস, সেক্সপীয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ বিধাতার অপূর্ব্ব দানসামগ্রী। এ দিয়ে তোমাদের কী লাভ হ'বে? সুন্দর ক'রে বাঁচ্‌তে পারবে? সুন্দর ক'রে মরতে পারবে?"

আজ রবীন্দ্রনাথের এই দিনে শেষ কথা কী বলার আছে. এইটুকু ছাড়া -

"যেথা চলিয়াছো সেথা পিছে পিছে
স্তব গান তব, আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার—"

শোকের ভাষা।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

সে আজ খুবই অল্প দিনের কথা, কোন এক রবীন্দ্র-জয়ন্তী-সভায় বক্তৃতা করতে অনুরুদ্ধ হয়ে বড় জোর গলায় বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম—"আজ এখানে বক্তৃতা করতে আসিনি, এসেছি আনন্দ প্রকাশ করতে। রবীন্দ্রনাথ যে আজও আমাদের মধ্যে স্বশরীরে বর্ত্তমান রয়েছেন, বাঙ্গালীর পক্ষে এর চেয়ে বড় আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। আজ থামিয়ে দাও নীরস বক্তৃতা!—আজ গাও গান, বাজাও বাঁশী, ছড়াও ফুল, কর উৎসব, কর অভিনয়, কর আবৃত্তি।"

সেদিন বক্তৃতা করতে চাইনি, কারণ সেদিন হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশের সুন্দরতর ভাষা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম গানে, অভিনয়ে, আবৃত্তিতে এবং আরও অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে। সেদিন হৃদয়াবেগ প্রকাশের অসংখ্য পথ ছিল আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত।

আজ কিন্তু যে কথা বলতে চাই ; যে গভীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করতে চাই ; তার প্রকাশের একটিও পথ কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। আজ আমরা সত্যই অসহায়।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে আজ সমগ্র পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত, একথা সত্য, এবং রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের কবিরূপে চিন্তা ক'রে আমাদের শোকের স্থূলত্বকে আমরা অনেকখানি মুক্তিদান করতে পারি, sublimate করতে পারি, একথাও সত্য। কিন্তু কালের ব্যবধান, সময়ের দূরত্ব মানুষের যে দৃষ্টিকে সুদূরপ্রয়াসী করে তোলে, আমাদের সেই দৃষ্টি আজ সাম্প্রতিক শোকের ঘনাশ্রু-আবরণে অবরুদ্ধ, সীমাবদ্ধ।

আজ তাই বিশ্বের কথা মনে পড়ছে না ; এমন কি ভারতবর্ষের কথাও আজ মনে জাগছে না। আজ শুধুই মনে পড়ছে বাঙ্গালাদেশের কথা। আজ বারবার কেবলই মনে হচ্ছে, বাঙ্গালী আজ যা হারালো, তা কোন দিন ফিরে পাবে না। তাই এ শোকের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না,—তাই নীরবতাই আজ আমাদের একমাত্র ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীশান্তা দেবী

আমাদের জ্ঞানোদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের "জীবন ব্যাপিয়া ভবন ছাপিয়া" এই "ধরণীর মাধুরী বাড়াইয়া" যে মহামানব বিরাজিত ছিলেন শ্রাবণ পূর্ণিমার ঘন বর্ষার দিনে আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রিয় বন্ধু ও শিষ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন ১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া ছিলেন,

> "বর্ষার নবীন মেঘ এলো ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে
> বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
> তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায়
> ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;

বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার সে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি পরে?"

আজ কবির কথাই আমরা ব্যথাহত চিত্তে কবিকে ডাকিয়া বলিতেছি। এ যুগের বাঙালী যাঁহার ভাষায় কথা বলিয়াছে, যাঁহার সুরে ও ছন্দে গান গাহিয়াছে, যাঁহার চিন্তাধারার ভিতর দিয়া আপনার ছোটবড় সুখদুঃখ আনন্দবেদনার সরুমোটা সকল রেখাঙ্কণ ও ফিকা গাঢ় সকল রংগুলিকে চিনিতে শিখিয়াছে, তাঁহার বাণীর উৎসমুখ আজ রুদ্ধ। আজ বাঙালীর মধ্যে, ভারতবাসীর মধ্যে যাহা সত্য, যাহা নিত্য, যাহা সুন্দর, যাহা মঙ্গল, যাহা জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে ভাষা দিবে কে? কবিই বলিয়াছেন,

যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বাররাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
আজকার নিশিথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি :"

এই মহাকবি ও মহামানবকে সৃষ্টি করিতে ভারতবর্ষে বিশ্বশিল্পীর কত শতাব্দীর পর শতাব্দীর অন্ধকার যুগ কাটিয়া গিয়াছে। সেই কবিরই "বহ্নিতেজে পূর্ণ বাণী," তাঁহারই "বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বিচিত্র রেখার আলিম্পন" অনাগত যুগের যাত্রীদের একমাত্র পাথেয় হইবে, যতদিন না আবার কোনও শতাব্দীর ক্রোড়ে মহাশিল্পী আর একটি মহাকবি ও মহামানবকে জাগাইয়া তোলেন।

কিন্তু তিনি ত কেবলমাত্র তাঁহার বাণী ও চিন্তামালাতেই সম্পূর্ণ নহেন। তিনি স্বয়ং যে তাহার চেয়ে অনেক বড়। তিনিই বলিয়াছেন,

"আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিলো প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?"

যাহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ পাইয়াছিল, তাহাদের সে জগৎ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে। দেবতার অভিশাপে স্বর্গ হইতে যেমন অনেকে মর্ত্ত্যে নির্ব্বাসন হইত, আজ মনে হয় আমাদেরও সেইরূপ স্বর্গচ্যুতি হইয়াছে। আমরা কোনও দেবতার অভিশাপের ফলে ধূলিমলিন শুধু মাটির পৃথিবীতে

আসিয়া পড়িয়াছি। এ পৃথিবী সেই "নিত্যনব সঙ্গীতের হারে সজ্জিত" রবীন্দ্রনাথের "সুন্দরী পৃথিবী" নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই পৃথিবীর গানে

"আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।"

আর আজিকার আমাদের এই "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী"তে কি আছে? চতুর্দ্দিকে প্রলয়বহ্নি ছাড়া আর ত আমরা কিছু দেখিতেছি না।

কবির ভক্তরাই যে শুধু কবিকে ভালবাসিয়াছিলেন ও চাহিয়াছিলেন তাহা নয়, কবি স্বয়ং এই পৃথিবীকে "ভালবাসার শতপাকে" বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই বলাকাতে বলিয়াছেন,

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।"

আবার বলিতেছেন,

"এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে সহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম হয়ে যেত কালো।"

কবি-স্মৃতি

শ্রীসুকুমারী দত্ত।

তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যালোকে তোমার পরম আগমন,
লভিলাম চিরস্পর্শমণি,
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি ॥

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যাঁরা, যাঁরা স্মরণীয় এবং বরণীয়, তাঁরা কখনই কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের বা কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না,—পৃথিবীর সূর্য্য-চন্দ্র আলোবাতাসের মতই তাঁরা মানবসাধারণের নিত্যকালের সম্পদ্। তাই "আমাদের রবীন্দ্রনাথ" দেশে-কালে-বদ্ধ বিংশ শতকের ভারতীয় কবি নন, পৃথিবীর সর্বকালের রবীন্দ্রনাথ।

তবে কি আমাদের বিশিষ্ট কোন গৌরব নেই? আছে বৈ কি। সূর্য্য ত পৃথিবীর সকল দেশেরই একান্ত আপনার বস্তু, তবু জাপানীরা তাকে নিয়ে বিশেষ গর্ব করে, নিজের দেশকে তারা ডাকে "নিপ্পন্"—উদিত সূর্য্যের দেশ। অর্থাৎ সকলের আপনার ধন এই যে সূর্য্য—এর রশ্মি তারা প্রথম দেখতে পায়, নবারুণের প্রথম জ্যোতিটুকুর অধিকারী তারাই। এইত তাদের বিশিষ্ট গৌরব। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদেরও এই স্বতন্ত্র অধিকার। বিশাল বটগাছ যেটুকু ভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী স্থানকে সে স্নিগ্ধ পল্লবের নিবিড় ছায়ায় ঢেকে রাখে; দীপাধার যতটুকু স্থান জুড়ে দাঁড়ায়, দীপের আলো তার চেয়ে অনেক বড় আয়তনকে উদ্ভাসিত ক'রে রাখে। আমাদের রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গালাদেশে জন্মেছিলেন বটে কিন্তু আলো বিলিয়েছেন নিখিল জগৎকে। তবু আমাদের একটু বিশিষ্ট গর্ব করবার অধিকার তিনি দিয়ে গেছেন। এই বাঙ্গালার বাতাসে তিনি প্রথম শ্বাস নিয়েছিলেন এবং অন্তিম শ্বাস ফেলেছেন। এই বাঙ্গালার আলোতে তিনি প্রথম চোখ মেলেছিলেন এবং শেষ চোখ মুদেছেন। বাঙ্গালার মাটিতে তিনি জীবনে সঞ্চরণ করেছিলেন, মরণে এই মাটির ওপর দিয়েই তাঁর শেষ বিজয়ের শোভাযাত্রা হল,—বাঙ্গালার ধূলি তাঁর চরণস্পর্শে পবিত্র হ'য়েছে। বাঙ্গালাভাষাতে তিনি প্রথম "মা" বলে ডেকেছিলেন, এই ভাষাতে তাঁর সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি রূপ পেয়েছে এবং এই ভাষাতেই তিনি শেষ কথা উচ্চারণ করেছেন। এই বাঙ্গালাকে তিনি বিশেষ ক'রে ভালবাসতেন, যে জাহ্নবী তাঁর চিতাভস্ম বহন করছে, তাকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেছিলেন,—"গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।" এই আমাদের বিশেষ গৌরব। 'মানুষ-রবীন্দ্রনাথ' সারা বিশ্বের, বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গালারই।

রবীন্দ্রনাথের দেহ যখন চিতায়, তখন আকাশে একটা আশ্চর্য দৃশ্য। দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নিজের সমস্ত গৌরব, সমস্ত আলো, বর্ণ এবং বৈচিত্র্য দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, শ্রাবণের পুঞ্জ মেঘকে। কবি ভালবাসতেন ঐ দৃশ্য। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হ'ল, অস্তরবির মতই মহিমায় মৃত্যু হল আমাদের কবির। সমস্ত গৌরবে পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে, অন্তিম আশীর্বাদে তাকে উজ্জ্বল সুন্দর ক'রে এই যে বিদায়, এতে কবির সূর্যের অনুরূপ মহিমাই প্রকাশ পেয়েছে। সেদিনের আকাশে আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল, পশ্চিম আকাশ যে-আলোয় রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল, তারই অরুণ-প্রতিবিম্ব ছিল পূর্বাকাশের গায়ে—একই জ্যোতিতে চক্রবালের দুটি প্রান্ত রঞ্জিত হয়েছিল। তিথিটা ছিল রাখী-পূর্ণিমা; পূর্ব-পশ্চিমের সকল দূরত্ব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে ঐ অস্তসূর্য যেমন সোনা-রূপায় জড়িত রঙ্গীন রাখীতে দুটি দিক্‌কে এক ক'রে দিয়ে গেল, আমাদের কবিও তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমকে নিজের মহিমায় রাখী বন্ধনে বেঁধে দিয়ে যাবার ব্রত নিয়েছিলেন। আকাশ সেদিন যেন নত হ'য়েছিল চক্রবালের প্রান্তে,—অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে ভাস্‌ছিল, অসীম আকাশ আর এই সীমার পৃথিবী দুঃখে পরস্পরের কাছে এসেছিল।

শুধু বাঙ্গালা ভাষায় অথবা বাঙ্গালা দেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যে এবং পৃথিবীর সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসামান্য। তবু আমরা বাঙ্গালীরা তাঁর প্রতিভা অথবা ব্যক্তিত্বে যতটা অভিভূত হয়েছিলাম এমন আর কোন দেশের অধিবাসী নয়। তাঁর প্রতিভা বিশ্বজনীন, দেশ-কালের সীমা-মুক্ত, তবু তার স্বাভাবিক স্ফুরণ হয়েছিল বাঙ্গালা ভাষাতে, তাই আমাদের ওপর তাঁর প্রভাব এত প্রবল। আমরা পৃথিবীর জল বাতাসের মতই সহজে, স্বাভাবিকভাবে তাঁকে জীবনে গ্রহণ করেছিলাম। উদার আকাশ, শ্যামল শস্যক্ষেত্র যেমন পৃথিবীর দান ব'লে স্বচ্ছন্দ-মনে গ্রহণ করি, তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও আমরা জীবনলক্ষ্মীর প্রসাদ বলেই সহজে বরণ করেছিলাম। এর কারণ আছে; প্রকৃতিকে জীবনে স্বীকার করতে আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কারণ সে স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতাও তেমনি অনায়াসের সৃষ্টি,—মনে হয় যেন হেমন্তের শস্যক্ষেত্রে তারা স্বর্ণশ্যাম ধান্যের মতই ফলেছে, বসন্তের অরণ্যাণীতে বিচিত্র বর্ণ পুষ্পের মতই ফুটেছে। শিল্পীর প্রচেষ্টা ধরা পড়ে না এত স্বাভাবিক। কবির গান তাঁর সত্তার গভীর অভিব্যক্তি। এত সুর, এত মাধুর্যের সঞ্চয় আমাদের কবির মধ্যে ছিল যে তাঁর সমস্ত অন্তর প্রকৃতি এক অনবদ্য কোমলতায় পরিষিক্ত ছিল,—এ কোমলতা তাঁর গানে সুর হ'য়ে ক্ষরেছে, মাধুর্য হ'য়ে ঝরেছে। নিবিড় বেদনার অশ্রু তাঁর গানে টলমল করে, আবার গভীর আনন্দও তাঁর গানে কূল ছাপিয়ে ওঠে। কথার যেখানে শেষ, গানের সেখানে আরম্ভ; রবীন্দ্রনাথের কাব্য যা বলতে পারেনি তাঁর গান তা বলেছে। তাঁর কাব্যের পরিস্ফুট অর্থের মধ্যে যা ফুটে উঠ্‌তে পারে নি তাঁর গানের সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনায় তাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। গানের মধ্যে তিনি বিশ্বকে,—বিশ্ববাসীকে আর সর্বোপরি বিশ্বদেবতাকে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। বিধাতার বিচিত্র রূপ আছে তাঁর গানে,—কখনও তিনি সেই মহানের পায়ের ধূলায় মাথা লুটিয়ে দিচ্ছেন, আবার কখনও বা উদার

ভৈরব সুরে তাঁর সাড়া পাচ্ছেন। সহজকে কঠিনের মধ্যে তিনি দেখ্‌তে পেয়েছেন, সেইখানে তাঁর সাধনা অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

সেদিন রাখী পূর্ণিমায়,—রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণ পূর্ণিমায়, যখন চাঁদ উঠল, মেঘে মেঘে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেল, শ্রাবণের বাতাস বইল, তখন মনেই হ'ল না যে কবি নেই। মনে হ'ল ঐ চাঁদে, ঐ ফুলে, অধীর বাতাসে, উদার আকাশে কবি যেন শতধা মিশে আছেন। বেদে আছে বিশ্বসৃষ্টির পূর্বাহ্ণে সৃষ্টির দেবতা বল্‌লেন, "একোঽহং বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়"—আমি এক বহু হব—তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি বহু হ'য়ে মিশে রইলেন। আমাদের কবিও তাঁর কল্পলোক রচনার পূর্বে ঐ সংকল্পই করেছিলেন, তাই তাঁর সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে আজ তিনি এমন নিঃশেষে মিশে গেছেন। ছিলেন এক হ'য়েছেন বহু। প্রকৃতি যেন অঞ্চলের আশ্রয় থেকে টেনে নিয়ে তাঁকে মর্মের মাঝখানে গ্রহণ করেছেন; এই তো কবির যথার্থ অমরতা।

জীবনে তিনি ভালবেসেছিলেন পৃথিবীকে আর মানুষকে বলেছিলেন—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

তাঁর সে বাসনা সফল হ'য়েছে। আজ প্রকৃতির লাবণ্যবৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি অজস্র ভাবে সঞ্চারিত হ'য়ে গেছেন, আর মানবের হৃদয়ের শ্রদ্ধায় তাঁর অবিনশ্বর আসন পাতা হ'য়েছে।

কবি কখনও মরেন না, আজ তাই আমাদের কবি আনন্দস্বরূপ হ'য়ে পৃথিবীর হৃৎস্পন্দনে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁরই কথায় আমরা তাঁর মৃত্যুকে অস্বীকার করছি, বলছি,

—'মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি,
এই নদী
হারাত তরঙ্গ-বেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।'

নিখিল মানবের সুখেদুঃখে তিনি আবেগ হয়ে রইলেন; এই-ই ত তাঁর কবি জীবনের সার্থক পরিণতি। স্থানে আর কালে তাঁর পরিব্যাপ্তি যত সুদূরপ্রসারী, এত বোধ হয় আর কোন সাহিত্য সেবীর ভাগ্যে ঘটেনি।

"রবীন্দ্রনাথ মানে সাহিত্যের এক সহস্রাব্দী",—একথা যে সদ্যঃশোকের অতিভাষণ নয়, তার সাক্ষ্য দেবে বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙ্গালাসাহিত্য কি ছিল আর তার পরে কি হয়েছে ভাবতে গেলে মনে হয় কোথায় যেন সাহিত্যের একটি যুগের ইতিহাস লুপ্ত হয়েছে।

পৃথিবী ঘুমিয়ে ছিল। অচেতন প্রকৃতি অনাগত যুগের স্বপ্ন দেখছিল, এরই মধ্যে এলেন রবীন্দ্রনাথ, রবির মত সোণার কাঠির স্পর্শে তন্দ্রালস পৃথিবীকে জাগিয়ে দিলেন ; আমাদের চোখে দিলেন আনন্দের অঞ্জন, তিমির কেটে গেল। আমরা জেগে উঠে দেখলুম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, উদ্দাম স্রোতে উচ্ছলিত হয়ে সে ছুটে চলেছে সুদূর সিন্ধুর উদ্দেশে। দেখলুম পাখী গায়, ফুল ফোটে, বসন্ত আসে। মলয় পবনের স্পর্শে শীতের সুপ্তিজড় প্রকৃতি জেগে উঠে সাজ্‌তে বস্‌ল। মাঘের কুহেলিকা কেটে গেল, প্রকৃতি ধন্য ধন্য গেয়ে উঠল, মানুষ দেখল পৃথিবীর ধূলিও মধুময়।

কবি চাইলেন নদীর দিকে,— আমাদের চোখ পড়ল, 'সোনার তরী'তে, 'খেয়ায়' মন তার সঙ্গে অজানার উদ্দেশে গৃহহারা হল। সেই প্রথম আমরা উদার চোখে সুদূরের দিকে দেখতে শিখলুম। মাটির পৃথিবী থেকে চোখ তুলে কবি চাইলেন আকাশের দিকে— আমরা দেখলুম বলাকা উড়ে যাচ্ছে— ধরণীর ঊর্ধ্বে, অবিরাম গতিতে। আমাদের মন তাদের সঙ্গী হয়ে দূর মানসের দিকে যাত্রা করল। তাই আজ ভাবি, একাধারে কবি আর দ্রষ্টা এমন আর ছিলনা, আর বুঝি হবেও না। তাঁর সাধনায় কাব্য আর দর্শনকে তিনি রাখীবন্ধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন,— এ শুধু সম্ভব হয়েছিল তাঁর দেবদুর্লভ প্রতিভার ফলে।

কিন্তু শুধু বুদ্ধিমত্তার কঠিন দীপ্তিই তাঁকে অমর করেনি ; অসামান্য প্রতিভার সঙ্গে যে দুর্লভ হৃদয়বত্তার সমাবেশ ছিল তাঁর মধ্যে তা-ই তাঁকে চিরস্মরনীয় করেছে। নির্বিশেষ ভাবে তিনি মানুষকে ভালবেসেছিলেন, তাই তিনি সর্বদেশে সর্বকালে সমগ্র মানব জাতির পরমাত্মীয়। তাঁর বিষয়ে সংবাদ-পত্র বলেছিল The Poet, the Philosopher, and the Patriot, কবি, দার্শনিক ও দেশভক্ত। কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ, --কিন্তু দেশভক্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি বিরাট হৃদয়ের বিকাশ। দেশকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন, দেশের দুঃখ অপমান তাঁর হৃদয়ে সাড়া জাগাত। এই সেদিন মিস্‌ র‍্যাথবোনের উদ্ধত অভিযোগে ভগ্নস্বাস্থ্য অশীতিপর বৃদ্ধ যখন রোগ শয্যায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন, তীব্র, ওজস্বিনী ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন, তখন বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হল। বুঝলুম জরা তাঁর দেহকেই পঙ্গু করেছিল, তাঁর মনকে ক্লীব করতে পারেনি। তাই স্বদেশের বিরুদ্ধে অন্যায় দোষারোপ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর মনে এত প্রবল প্রতিধ্বনি জাগাল। এমনি ওজোময়ী চিঠি তিনি আর একবার লিখেছিলেন যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতি-বাদে নাইট্‌ উপাধি ফিরিয়ে দেন। সেখানেও এই বিরাট হৃদয় দেশবাসীর দুঃখে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তাই সে চিঠি বিশ্বের সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। শুধু কাব্যে গানে নয়, জীবনেও আর্তের সঙ্গে তাঁর গভীর সমবেদনা ছিল। লোকে বলে, জমিদারীতে খাজনা আদায়ের সময় তিনি বলতেন, —"ওরে ব্রাহ্মণ এসেছে কিছু ভিক্ষে দিবি?" —এমনি ছিল তাঁর প্রাণ! —যেখানে সহজ দাবী সেখানেও স্নেহটুকু বিসর্জন দিতেন না। কোথায় কোন কারাকক্ষে কোন বন্দীরা জয়ন্তী উৎসবে কবিকে অভি-

নন্দিত করেছে, তাঁর হৃদয় তাতে সাড়া দিয়েছে, কোথায় কারা দুর্ভিক্ষে, বন্যায় অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে, কবি লেখা দিয়ে, অভিনয় করে তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

দেশের সেবা বহু উপায়ে করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু নেতাদের মধ্যে বিরোধে পীড়িত হয়ে নীরবে সরে এসেছিলেন, বলেছিলেন,

বিদায়—দেহ, ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত' আর নাই,
এগিয়ে সবে যাওনা দলে দলে
বরমাল্য লওনা তুলে গলে
আমি এখন বনছায়া তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই ॥

যাবার আগে সকলকে প্রণাম ক'রে, আশীর্বাদ ভিক্ষা নিয়ে গেছিলেন। এত ক্ষুব্ধ বেদনাও কিন্তু তাঁকে বিদ্রোহী করেনি, শান্তভাবে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছিলেন। রাজনীতি ছেড়েছিলেন কিন্তু দেশপ্রীতি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিসর্জন দেননি, তাই শেষ দিন পর্যন্ত দুঃখীর দুঃখ গভীর ভাবে তাঁকে স্পর্শ করত।

মৃত্যু তাঁর কিছুই ধ্বংস করতে পারেনি,—তাঁর ক্ষণিকতাটুকু ঝরিয়ে তাঁকে নিত্যকালের সভায় গৌরবে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। মৃত্যু তাঁর কাছে ভয়ের ছিলনা, এ তাঁর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। বারে-বারে নানাসুরে তিনি মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন, বলেছেন মৃত্যু তাঁর চিরবাঞ্ছিত শ্যাম। মৃত্যুকে তিনি খণ্ড বলে, বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে পারেননি,—তাকে পরিণতির পথ বলেই, জেনেছেন। মৃত্যু ধ্বংস নয়, বিনাশ নয়,—পূর্ণতার তোরণ। তিনি বলেছেন,

জীবন আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা।

এই যাত্রীবধূর পথে যদি ক্ষনিক অন্ধকার আসে তবে সে ত' জ্যোতির্ময় প্রভাতেরই অগ্রদূত। তাই মৃত্যুর জন্য তাঁর নির্ভয় প্রতীক্ষা,—তাই তিনি বলেন,

একলি যাওব তুঝ অভিসারে
যাঁকো পিয়া তুঁহু কী ভয় তাহারে?
ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি
পন্থ দেখাওব মোর ॥

এ শুধু কবিত্ব নয়, এ গভীর অনুভূতির ফল। যখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তখনও তার করাল মূর্ত্তিকে সহাস্যে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মৃত্যুশয্যার রচনাতে বলেছেন,

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারেবারে
এসেছে আমার দ্বারে,
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান,—ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত ;
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার ॥

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা,— জীবনের মিথ্যা এ কুহক
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,

দুঃখের পরিহাসে ভরা
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে ॥

এমন বলিষ্ঠ মনে মৃত্যুকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ জীবনকে তিনি যথার্থ ভালবাসতেন। জীবনের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল নিবিড় অথচ অনাসক্ত. তিনি বলেন

এমন একান্ত করে পাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সে-ও সেই মত।

যে চিরানন্দময় বিধাতাকে তাঁর গীত অঞ্জলির মত নিবেদন করেছিলেন, মাল্যের মত উপহার দিয়া ছিলেন মানবের সেই পরমতম বন্ধুকে মৃত্যুর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এই সন্দেহবাদের যুগে বিধাতার ওপর রবীন্দ্রনাথের একান্ত সনির্ভর বিশ্বাস বড় মধুর। উপনিষদ্ বলেন 'রসো বৈ সঃ'— আমাদের কবিও তাঁকে আনন্দময় বলেই জেনেছিলেন। সেই আনন্দ সিন্ধুর অতলের দিকে যে গভীর প্রশান্তি তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

বিশ্বের মধ্যে বিশেষকে লাভ করাই ছিল তাঁর সাধনা। এই সাধনায় তিনি নিজের মধ্যে সংহৃত ছিলেন, নিবিড় স্তব্ধতায় সত্য নিরঞ্জনকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন,

কোলাহল ত' বারণ হল
এখন কথা কানে কানে,
এখন শুধু প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।

তিনি জানতেন ভক্ত আছে বলেই ভগবান্, তাই কঠোর সাধনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেননা, বৈরাগ্যসাধনকে মুক্তির পথ বলে বরণ করেননি। তিনি অনুভব করেছিলেন গভীর আবেগে প্রাণের মর্মস্থল থেকে যে ডাক ওঠে তা বিধাতার কানে পৌঁছয়। তাই তিনি চিত্তকে সেই প্রাণের ডাকের সাধনাতেই দীক্ষা দিয়েছিলেন।

সুখেদুঃখে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি এক অখণ্ড অসীমকে দেখতে পেয়েছিলেন, এবং সর্ব অবস্থায় তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন। আনন্দের সময় তাঁকে সখা বলেছেন, আবার দুঃখের বেশে তাঁকে দেখেও ভয় করেননি,—এ তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য। এই অধ্যাত্মসাধনাতেই তাঁর গভীর পরিচয় আছে। তিনি বলেছেন, "যে অনাদি অসীমের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি, সেখানকার উৎস থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রাপথের পাশে পাশে, মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে আমার তাপ জুড়িয়েছে, আমার ধূলো ধুয়ে দিয়েছে,—সেই তীর্থের জল ভরে রইল আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়কন্দর থেকে বারবার যে বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে পৌঁচেছিল কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায় কত হাসিতে, শরতের ভোরবেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথরাত্রে, কত ধ্যানের শান্তিতে, পূজার আত্মনিবেদন, দুঃখের গভীরতায় কত গ্রহণে, কত ত্যাগে কত সেবায়,—তারা আমার দিনের পথে সুর হয়ে বেজেছিল, আজ তারাই আমার রাত্রের পথে দীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। সেই অন্ধকারের ঝরণা থেকেই আমার জীবনের অভিষেক,—সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ ; আজ আমি তাকে বলতে পারব, হে চিরপ্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যাকিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মত প্রকাশ করেছ রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত।"

এই-ই তাঁর চরম উপলব্ধি, তাই মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন নি, বন্ধুর দূত বলে আমন্ত্রণ করেছেন। কালের নিকষপাষাণে তাঁর কীর্তি আজ সোনার রেখা টানতে সুরু করেছে।—তিনি আজ স্তুতি নিন্দার অতীত, তবু আজ তাঁর স্মৃতির কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে আমরাই ধন্য হলাম।

রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছেদে আমাদের যে-শোক এ ব্যাকুল হবার নয়, —আড়ম্বর করে' ঘোষণা করবার নয়, —এ হ'ল নীরবে উপলব্ধি করবার বস্তু। মৃত্যু যাঁকে অমর করে দিয়েছে তাঁর তিরোধানে বিহ্বল হয়ে' বিলাপ করলে তাঁর জীবনের অপমান হবে, —তাঁর মৃত্যুর মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে। এ শোকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আবেগ অতি তুচ্ছ, মূল্যহীন। তাঁর বিয়োগে সমগ্র মানব জাতি প্রিয়জন হারিয়েছে, —এ বৃহৎ, মহান্ শোক। উচ্ছ্বাসের সমারোহে এর গভীরতা যেন ঢাকা না পড়ে। তাঁর মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয় কে যেন মৃদুস্বরে আবৃত্তি করছে,

শান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন
নত করো শির।

শান্ত হয়ে একে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। কবিকে বুঝতে হবে তাঁর বাণীর মধ্যে দিয়ে। যে বিরাট আদর্শের পতাকা তিনি জীবনে বহন করে' গেছেন, সেই আদর্শকে সমাহিত হয়ে ধারণ করতে হবে, তা হলেই তাঁর স্মৃতির যথার্থ মর্যাদা রক্ষা পাবে। জীবনে তিনি খণ্ড ও ক্ষণিককে অস্বীকার করে সাম্যের সুষমার এবং পরিপূর্ণতার জয়গান গেয়ে গেছেন; আজ যদি সেই উদার আদর্শ আমাদের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, যদি তা আমাদের তুচ্ছ ঈর্ষ্যাদ্রোহ বিভেদবৈষম্যের ওপরে নিয়ে যেতে পারে, —যদি সত্য, শিব ও সুন্দরকে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবেই কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।*

অমর গীতি

শ্রীবাণী রায়।

অনুভূতি-স্বপ্নমাখা রঙীন যে দিন
সেদিন তোমারি দান জীবনেতে কবি:
আমার আমিরে খুঁজি ক্লান্ত অবশেষে
তোমারি কাব্যেতে চিনি আপনার ছবি।

দিবসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজো বাজে বীণা,
আজো শুনি কার গান দিগন্তের পারে?
সোনার প্রত্যুষ মেঘ ভাসে নভোতলে,
কার বাণী কাঁপে শুধু প্রভাত-তারায়?

প্রভাত তারায় হায়, রজনীর যামে
অনির্ব্বাণ গীতি জাগে, অবিরাম সুর;
গীতহারা কবিকণ্ঠ নীরব আজিকে,
আকাশবাতাস তবু মূর্চ্ছনা-বিধুর!

---

* ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত স্মৃতিবাসরে পঠিত।

চিঠি ও লেখা

"উত্তরায়ণ"
শান্তি নিকেতন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
১৪নং নিউ রোড, আলিপুর,
কলিকাতা।

ও

কল্যাণীয়েষু,

বিশ্বপরিচয় বইখানা তোমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিলুম, তারি সঙ্গে ফাউ একখানা ছড়ায় ছবি পাবে। ডাঙায় নাচতে পারি বলেই জলে সাঁতার কাটার অধিকার যে পাকা হবে এমন কোন কথা নেই। বিজ্ঞান সরোবরের ঘাটের কাছটাতে খুব হাত পা ছুঁড়েছি, প্রাইজ পাবো এমন আশা করিনে। বিজ্ঞানের আবহাওয়ার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনটা চন্দ্রলোকের মতোই। যতটা সাধ্য, হাওয়া খেলিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে মনে ছিল, কিন্তু হাওয়াটা ওজনে ভারী হয়েছে এমন নালিশ কাণে উঠেছে। মাল থাকবে অথচ ভার থাকবে না এমন যাদুবিদ্যা ওস্তাদের পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানের একটা রসালো উপক্রমণিকা লেখা তোমারই দ্বারা সাধ্য, কেন না তোমার ভাণ্ডারে বাক্যরস এবং অর্থমূল্য দুইই আছে পূরো পরিমাণে; অতএব দেশকে বঞ্চিত করোনা। একদিন ক্লাস চালিয়েছিলে, আজ আসর জমাতে হবে। ইতি—৫।১০।৩৭

তোমাদের—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবমন্দির আঙিনাতলে
শিশুরা করিছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারীদলে
দেখেন ওদের খেলা।

(শ্রীউমা মৈত্রের লেখন পুস্তক হইতে)

শ্রীমতী সুপ্রভা রায় কল্যাণীয়াসু

"HIGHWINDS"

SHILLONG.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

টুলু, ক'দিন বিষম ব্যস্ত ছিলুম। কলকাতা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেচে। আর পারিনে। তবু তোমাদের মায়ার খেলার অভিনয় নিয়ে একরকম ভুলে ছিলুম—মনে হচ্ছিল মায়াকুমারীদের সুরের মায়াজালেই জগৎটা ঘেরা কিন্তু সে মায়া কেটে গেছে, জাল ছিঁড়েছে—এমন নিয়ত যে গোলমালের মধ্যে আছি তার আওয়াজটার ভিতর পিলুবারোয়াঁর কোনো সুরই লাগচেনা। অতএব আজই আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই বোলপুরে যাত্রা করচি। তোমার শিলঙের চিঠি পড়ে মনটা উতলা হল—কিন্তু "মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই।" ডাকঘরটা বার পাঁচেক অভিনয় হয়ে গেছে। কি রকম হয়েছিল সে কথা নিজের মুখে বলে কাজ নেই—লোক পরম্পরায় যা শুনতে পাও তার থেকে কতকটা বুঝতে পারবে।

কিন্তু দেখো, মায়ার খেলার সুরগুলো ভুলে এসোনা যেন। আজ আর সময় নেই। সুকুমার ওদিকে আসর জমিয়েচে কেন? নতুন পালার সৃষ্টি হচ্চে কি? ইতি ৬ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বের হৃদয় মাঝে
কবি আছে সে কে?
কুসুমের লেখা তার
বারবার লেখে;
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
বারবার মোছে,
অশান্ত প্রকাশব্যথা
কিছুতে না ঘোচে।

(শ্রীসুজাতা দাসের লেখন পুস্তক হইতে)

রবীন্দ্রনাথ।

(১)

শ্রীবীণা দাস।

তোমার নিখিল তেমনি রয়েছে সাজি
মরমী বন্ধু, তুমি চলে গেছো দূরে,
তোমার বিশ্ববীণার তন্ত্ররাজি,
ওগো লোকাতীত, বাজিবেনা নব সুরে।

আজো হেথা আছে, ফুল, পাখীগাওয়া,
নব কিশলয়ে মনের বারতাখানি,
আছে মধুমাসে মদির মধুর হাওয়া
শ্যামল বনের মর্ম্মরে কানাকানি।

হে কবি, তবু তো সকলি ছন্দোহীন,
রূপের পূজারী তুমি সেথা নাহি হায়,
নিতি অনুরাগে কে তাহারে নিশিদিন
ভরিয়া তুলিবে অপরূপ সুষমায়

শুভদিনে এই মর্ত্ত্যের খেলাঘরে,
এসেছিলে কবি, বেসেছিলে তারে ভালো,
নিবিড় আবেশে পরম মমতা ভরে,
ভুবনে জ্বেলেছো নবীন আশার আলো।

ভুলেছো কি আজ মাটীর মানুষে কবি ?
ভুলেছো কি তার সুখদুখ বেদনারে,
ক্ষণে ক্ষণে তব হৃদয় পরশ লভি
বিকশিত যাহা প্রতিদিন বারেবারে ?

আজিও তেমনি নয়ন মেলিয়া রাখি,
ধরণী খুঁজিছে প্রভাতরবিরে প্রাতে,
আজিও সন্ধ্যা উদাস মলিন আঁখি
চাহিছে সুদূরে সুগভীর বেদনাতে।

হেথা পরপার আলোকে উঠিছে ভরি,
হে জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্ত অরুণরাগে,
অসীম যে পথে গিয়েছে হে পথচারী
চরণপরশে জীবন কমল জাগে।

যে অনাদিলোকে তোমার আসনখানি
সেথায় বিরাজে সৌম্য মূরতি তব,
ওগো দূরগামী, পরশ পাবনা জানি,
তব শুভাশীষ তবুও মাগিয়া লব।

হে ঋষি, তোমায় প্রণমি যুক্তকরে,
নমিছে মানব ঐ তব শ্রীচরণে,
যুগে যুগ গেলে, দিন গেলে দিন পরে,
ভুবন ভরিবে তব বন্দনা গানে।

---

(৩)

(শ্রীসুচরিতা দাস।)

দিবসরাতি সুরের স্রোতোধারে
যে সুধা তুমি করিয়া গেলে দান,
রহিল তাহা প্রাণের বীণাতারে ;
সে অমৃতের নাই যে পরিমাণ।
ফুলে বনে, নদীর স্রোতে আকাশ পরপারে
শেষের মাঝে অশেষ হয়ে বাজিবে তব গান।

---

(৩)

(শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরী।)

আমি তোমায় বুঝি নাই, তুমি মোরে বুঝেছ,
তাই তব কবিতায়, পরিচয় দিয়েছ।
মোর মনে ছিল যত আশানিরাশা,
অতীতের যে সকল ভোলা পিয়াসা,
তারে তুমি ভাষা দিয়েছ,
মোর কথা মোর হয়ে তুমি কয়েছ।
কবীন্দ্র, তুমি মোর জীবনের কবি,
তোমাতেই দেখিয়াছি জীবনের ছবি।

শ্রীকল্যাণী সেন, এম, এ
সম্পাদিকা—"মেয়েদের কথা"

পূর্ণিয়া
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮।

কল্যাণীয়াসু—

মা—তোমার সম্পাদিত—"মেয়েদের কথা" বলে' পত্রিকাখানি আমি নিয়মিত পেয়ে থাকি এবং আগাগোড়া পড়েও থাকি। মেয়েদের জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় কথা যথেষ্ট থাকে। তার মধ্যে কোথাও কোথাও (অলিখিত থাকলেও) পুরুষদের কর্ত্তব্যও আভাসে উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়,—কোথাও তীব্রতা নাই। উহাই লেখার সৌন্দর্য্য। কঠোর বস্তু আঘাতই ক'রে থাকে, কাজ করেনা। "মেয়েদের কথা" এ সম্বন্ধে সচেতন দেখে আনন্দ পাই।

আমাকে পত্রিকাখানি পাঠাও, আমি পড়ি, কিন্তু প্রতিদানের পথ পাইনা। বার্দ্ধক্যে ও রোগে লেখার আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হয়েছি,—সে নিজেই বিদায় নিয়েছে, তাই কুণ্ঠা বোধ করি। কিন্তু ভাবি —পুরুষদের লেখায় "মেয়েদের কথা"র আসল উদ্দেশ্যটি ও বিশেষত্বটি বজায় থাকে কি? "মেয়েদের কথার" সত্যিকার মূল্য যে মেয়েদের কথার মধ্যেই রয়েছে! শিক্ষিতা মহিলারা লিখছেন—এই তো বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক হচ্ছে।

এখন থাক ও কথা। দেখলাম "মেয়েদের কথার" আগামী সংখ্যাটিকে "রবীন্দ্র সংখ্যা" করবার ইচ্ছা করেছ। এটি কেবল ইচ্ছাই নয় কর্ত্তব্য। বহু ভাগ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতির আধার রূপে পেয়েছিলুম, রবির উদয় হয়েছিল। অধিক লেখবার শক্তিসামর্থ্য আমার নাই, আমি কেবল তাঁর একটি কথাই উল্লেখ করি,—দুর্ল্লভ ছন্দোবন্ধনে ভাবের আভাসে, অসীমের মাধুর্য্যকে সীমার মধ্যে প্রকাশের তিনি যে জীবনব্যাপী সাধনা রেখে গিয়েছেন, বিদগ্ধজনের তা চিরদিনই অনুভবের বা বোধের বস্তু হয়ে থাকবে। তাঁর সে প্রয়াস সার্থক হয়েছে—অবগুণ্ঠিতা সুন্দরীর বদন রহস্যের মতো সেই আড়ালটুকু চিরদিনই বোধের সূক্ষ্ম অবরোধের কাজ করবে। উপাদেয় আহার্য্যের রস শত চর্ব্বণে উপভোগ করেও যেমন আশ্ মেটেনা কেবল—"আহা আহা কি মধুর" ছাড়া বলবার কিছু থাকে না, ভাষার দুরাশা সেখানে পরাস্ত!

দেশকে তিনি যে ঐশ্বর্য্য দিয়ে গেছেন, দীনা বঙ্গদেশ তা নিয়েই চিরদিন বড় হয়ে থাকবে। সাহিত্যের পূজা করলেই তাঁর পূজা করা হবে,—কোনো স্মৃতি-সৌধই তার সমতুল হবে না। সাহিত্যিক ভ্রাতা ভগ্নীর কাছে এইটি আমার শেষ প্রার্থনা। আমরা যেন—সাহিত্য সেবার দ্বারা তাঁর গড়া কীর্ত্তি-স্তম্ভের শীর্ষমুকুট সম, তাঁকেই দিন দিন উচ্চ হ'তে উচ্চতরে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত কোরে রাখতে প্রয়াস পাই। দেশের সম্মান তার মধ্যেই অপেক্ষা করবে,—ম্লান হবে না।

তাঁর আশীর্ব্বাদ তখন নূতন পথ খুলে দেবে, যে সব সাধ অপূর্ণ রেখে গেছেন ও আভাসে বলে গেছেন—

"মনে যে আছিল গানের আভাস্
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ্
সহিলনা সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁচিল তার্।"

ভাগ্যবান ভক্তের দ্বারা তা পূরণ করে' দেবেন।

দেশের দুঃখে তিনি বড় ব্যথা সঙ্গে নিয়ে গেছেন,—দেশকে তিনি ভুলতে পারেন না,—ভুলবেন না। এই আমার বিশ্বাস।

একটা অন্যকথা বলে' শেষ করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পাদি অনেকেই পড়েছেন, তাতে আকৃষ্ট হয়েছেন। এ সব স্মৃতি অনুষ্ঠান তারি পরিচয় দেয়। কিন্তু তাঁর সরস বাক্যালাপ উপভোগ করবার সুযোগ, সকলের ঘটেছে কিনা জানিনা। তিনি বাক্যালাপেও কিরূপ রহস্যপ্রিয় ছিলেন, সহজ সাধারণ আলাপেও শ্রোতাদের কিরূপ মুগ্ধ করে রাখতেন, সে সম্বন্ধে তাঁর একটি দিনের একটি কথা আজ মনে পড়ছে।

তখন তিনি তাঁর পরম বন্ধু ও আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি, ব্যারিষ্টার ৺ অতুল প্রসাদ সেনের লক্ষ্মৌ ভবনে অতিথি। আমরা তখন চা'য়ে চুমুক দিচ্ছি আর নানা কথাও চলছে।

কোর্টে অতুল প্রসাদের একটা জরুরী মামলার কাজ ছিল। তিনি কোর্টের পোষাকে এসে, —অপরাধীর মত 'কিন্তু ভাবে' রবীন্দ্রনাথের নিকট ঘণ্টা খানেকের ছুটি চাইলেন, বললেন—"একজনকে বুঝিয়ে, ভার দিয়েই এখনি চলে আসব।"

রবীন্দ্রনাথ একটু যেন আশ্চর্য্যভাবেই বললেন,—"অতুল, তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমি খুশিই হচ্ছি। এতে অতো কুণ্ঠার কারণ কি! কর্ত্তব্যপালন পুরুষের ধর্ম্ম,—সেটা, আগে। আমাদের সবই তো গিয়েছে বা যেতে বসেছে। পূর্ব্বে বাংলা দেশের পাইক্‌রা কী লাঠিই খেল্‌তো —তার প্রশংসা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কোন কোন খ্যাতনামা জমিদারেরা তাদের পুষতেন। রাত্রে তারা দশবিশ ক্রোশ দূর গ্রামে গিয়ে ডাকাতি কোরে রাত ৩।৪ টার মধ্যে ফিরে আসতো। বড় লোকের আশ্রয়ে অনেকটা নিরাপদেই থাকতো। সম্ভ্রান্ত ধনীদের সর্বস্বান্ত করবার যোগ্যতাতেই তাদের খ্যাতি ছিল। সুসভ্য আমলে অমন আয়ের ব্যবসাটা উঠে যেতে বসেছিল। সভ্যদেশের প্রথাই স্বতন্ত্র, এখন বিদেশ থেকে, অপরাধবধের আইন কানুন শিক্ষান্তে তোমরা ব্যারিষ্টার নাম নিয়ে আসো। তাতে রাতের সেই বে-আইনী ডাকাতি একদম কমে গেছে। অমন কাজটি দিনের আইনী ডাকাতদের দখলে এসে যাওয়ায়—নামান্তরে ব্যবসা বজায় রয়ে গিয়েছে,—না গারদ না জেল, আবার

minus অপরাধ ও অপবাদ! সভ্য জিনিসের কী decent finish! দেশের ক্ষতিও হয়নি, দেশকে ব্যবসাটি খোয়াতে হয়নি।

"কর্ত্তব্য পালনে যাবে (আবার দিন দুপুরে), তাতে অতো 'কিন্তু' হওয়া কেনো। শিবাস্তে পন্থা। আমরা বেশ আছি।" ইত্যাদি—তাঁর মতো কোরে কে বলতে পারবে, আমি নিজের ভাষা মিশিয়ে, আভাস দিলাম মাত্র। অতুল প্রসাদ নির্ব্বাক! মৃদু হাস্যে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিরন্তন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

তোমার শ্মশানধূম পরিব্যাপ্ত আজি বিশ্বময়,
অণুতে অণুতে পঞ্চভূতে মিশে রয়।
অগুরে অনন্ত জন্মা তুমি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তাই লভিয়াছ নবজন্মভূমি।
আজি হ'তে কত শতাতীত বর্ষপরে
নব নব যুগে তুমি উপনীত হবে জন্মান্তরে
অনাগত বংশপরম্পরানুগ পুনরাবির্ভাবে,
নিখিলের নরনারী তোমারে আপন চিত্তে পাবে।

মৃত্যুর নিষ্পন্দ সমাপ্তিতে
তোমার আত্মিক দীপ্তি পারিবেনা কভু নির্বাপিতে।
তোমার কবিতা
নিখিলের অন্তর্লোকে শাশ্বত সবিতা
নিত্যকাল অযুত কিরণে
সৌন্দর্যে আনন্দে প্রেমে উষরে ফুটাবে মুঞ্জরণে।

বাংলার ঘরে ঘরে আজি তুমি সাধনার ধন,
তোমার অজস্রদানে যাহা আমরণ
বিলায়ে গিয়াছ গানে গানে,
সে সঙ্গীত মরুপ্রাণে প্রাণের প্লাবন যেন আনে।

তরুণ তরুণীদল হোক্ সেই প্রেমে
যুগলিত, যার মন্দাকিনী ধারা এসেছিল নেমে
স্বর্গ হ'তে অতীন্দ্রিয় শুচি শুভ্র আনন্দপ্রবাহে
তোমার বাণীর কুঞ্জে ; নবযুগ উল্লাসে উৎসাহে
আসুক বরণ করি তারা,
মুক্তিপথে হোক্ তারা সহযাত্রী দ্বিধাশঙ্কাহারা,
বীরজায়ামাতা
যাহারা আহিতাগ্নিকা তাদের উদ্গাতা
তুমি কবি ; আগামী ভারতে
তুমি রথী, প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের যুগলাশ্ব রথে।

১১।১২।৪১

রবীন্দ্রকাব্যে নারী।

সাহিত্য সৃষ্টির সর্বপ্রধানা প্রেরণাদাত্রী নারী। ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে আছে পুরুষ দর্শক, তার সামনে প্রকৃতি নৃত্য করছে, তার থেকে হয়েছে সৃষ্টি ; সাহিত্য জগতে দেখা যায় নারীই সভার অধিষ্ঠাত্রী, পুরুষ তাকে লক্ষ্য করে রসসৃষ্টি করেছে। কাব্যাস্বাদ নাকি "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ", কিন্তু সেই ব্রহ্মাস্বাদের সন্ধান কোথায় ? চণ্ডীদাস সে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন রামীর প্রেমে, রামী তাই—"বেদমাতা গায়ত্রী", তাই তিনি রামীকে বলেছেন—"তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনারস।" দশভুজা বাঙালীর আরাধ্যা, স্ত্রীশক্তির তিনি প্রতীক, "যা দেবী শক্তিরূপেণ সর্বভূতেষু সংস্থিতা" বলে শারদীয়ার আবাহন করা হয়। রবীন্দ্রনাথও শক্তিরূপিণীকে দেখেছেন জগতের লীলায়, রূপরসগন্ধবর্ণের বিচিত্রতায়।

সর্বযুগেই নারী পুরুষকে আকর্ষণ করেছে, সে "বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী", তাই তার রূপে—

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে
চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্ত ধারা।"

"বিশ্বের প্রেয়সী" উর্বশী নারীর এই মূর্তির প্রতীক,—

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদিরগন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম লুব্ধকবি ফিরে মুগ্ধচিতে,
উদাম সঙ্গীতে"

কিন্তু এই মূর্তি, ঈর্ষা-কামনা-সম্পর্কিত এই চিত্র নারীর সমগ্র পরিচয় দেয় না। উর্বশীর পাশে এমন একজন এসে দাঁড়ায় যার মুখ "অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য-সুধায় মধুর", মানবকে সে বাসনামুক্ত করে "অনন্তের পূজার মন্দিরে' ফিরিয়ে আনে। এ সেই নারী যার পবিত্রতার উপর কবি সুরদাসের "বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক" ছায়া ফেলতে পারেনি, এ সেই লক্ষ্মী, যে "দেবের করুণা মানবী আকারে", সেই শক্তি, যে "উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল, উদ্যত যেন বাজ।"

নারীর কুসুমকোমল সুকুমারমূর্তি আঁকা কঠিন নয়, কিন্তু তার যে মূর্তি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি" তাকে রূপ দেওয়া অসামান্য শক্তির কাজ। নারীর ধীশক্তির মূল্য অস্বীকার করাই পুরুষের স্বভাব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছেন। তাঁর কাব্যের নারীচরিত্র দৃঢ় অনমণীয় বুদ্ধির বলে বলবতী, অন্তরের মূল্যে তার মূল্য, মণীষার রূপে রূপ।

যেখানে নারীর অন্তরের ঔজ্জ্বল্য অস্বীকৃত সেখানে তার মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে যেখানে ক্রীড়াপুত্তলী সেখানে তার অপমান। "বুকভরামধু বাংলার বধূ"র হৃদয়ের অমৃতপাত্র যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেইখানে বালিকাবধূর এই আক্ষেপ—

"কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভাল বলে, বলেনা কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করেনা স্নেহ।"

এই পরীক্ষায় রক্তমাংসে গঠিত দেহের দামে নারীর মূল্য নির্ণিত হয়। এই "Doll's House" এর কারাগার ভেঙে ফেলতে না পারলে নারী তার গৃহসাম্রাজ্য বজায় রাখতে পারবে না।

প্রণয়ের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে নারীজীবনের এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে—

"এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছে অন্যমনে;
সর্বত্র ছিলাম আমি এখন এসেছি নামি,
হৃদয়ের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র গৃহকোণে।"

এই ব্যর্থতার জন্য নারীর নিজের দায়িত্ব কিছু কম নয়। নিজ প্রতিভায় প্রকাশিত হলে যে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যশালিনী সে যদি ভিখারিণীর বেশ ধারণ করে তবে তার মূল্য কেউ দেবেনা নিশ্চয় ; তাই তার অভিযোগের উত্তরে পুরুষের অভিযোগ এই —

"ভিক্ষা, ভিক্ষা সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হল যদি কমল আসনা ?
তাই আর পারিনা সঁপিতে সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমাছাড়া ছিলনা তোমার বাড়া,
তোমারেও ছেড়ে আজ আছে চরাচর।"

Tolstoyর Anua Kareninaতে এমনি একটি ব্যর্থতার কথা চিত্রিত হয়েছে। রূপমুগ্ধ Vronsky Annaর কাছে তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উদ্দাম প্রেম নিয়ে এসেছিল ; Anna তাকে গ্রহণ করল, কিন্তু রাখতে পারবার মত ঐশ্বর্য তার অন্তরে ছিলনা, তাই মৃত্যুই তার কলঙ্কমুক্তির একমাত্র উপায় রইল।

এই প্রেম ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে প্রেমের মূল কামনায় সে প্রকৃত প্রেম নয়, ক্ষণস্থায়ী মোহমাত্র —

"এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুই পারেনা হায় বাঁধিয়া রাখিতে,
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।"

তাই রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম যুগেই এর রুদ্ধ বাতাস থেকে কবির স্বভাবশুচি প্রতিভা আপনাকে রক্ষা করতে চেয়েছে—

"দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ,
চুম্বনমদিরা আর করায়োনা পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।"

সমস্ত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করা, দুর্বল তুষ্ট প্রেমের পরিবর্তে তাই কবি স্বাধীন সবল আত্মদানকে বাঞ্ছনীয় করেছেন—

"স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধোনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।"

কবির কাব্যে কামনার নিষ্ফলতা বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে প্রেম দুঃসাহসভরে সমগ্র মানবকে কামনা করেছে, যে আত্মার রহস্যশিখাকে আঙ্গুলের মধ্যে চেপে ধরতে চেয়েছে, মানবাত্মার শুভ্র শতদলকে সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে কেটে নিতে চেয়েছে, তাকে অশ্রুজলে স্বীকার করতেই হল—

"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

* * *

নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে

চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই॥"

তারপরে কবি বিজয়িনীর মূর্তি চিত্রিত করেছেন, যখন তাঁর পদতলে মদন আর কামনার সায়কগুলি নির্বাকবিস্ময়ের পূজা-উপচার স্বরূপ ঢেলে দিয়েছে তখন—"নিরস্ত মদনপানে

চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

এ সে-নারী নয় ফুলধনুর দহনজ্বালায় যে ঘর ছেড়ে কুল ভেঙে উন্মত্তের মত বেরিয়ে পড়েছে, তার প্রিয়তমের জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়েছে ; এ সেই মহীয়সী, মদন যার কাছে পরাজিত, সুরদাসের কামনাবহ্নি যার কাছে নির্বাপিত, এ সেই সুমিত্রা, যে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে আত্মবলিদান করেছে কিন্তু রাজার কামনার আবর্তিত উদ্বেল প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেনি। প্রেমের এই সাত্ত্বিক জ্যোতি শুধু তামসিকতাকেই পরাভূত করেনা, এর প্রসন্ন মহিমার কাছে রাজসিকতার গর্বও ম্লান হয়ে যায়।

নারীজীবনের ব্যর্থতার আর একটি দিক দেখা যায় 'মুক্তি"তে—

"এ সংসারে এসেছিলেম ন'বছরের মেয়ে,

তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে

দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এ জীবনটা টেনে টেনে শেষে

পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।

সুখের দুখের কথা

একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিলো কোথা?

এ জীবনটা ভাল, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যাহোক একটা কিছু,

সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।"

গৃহকর্মে নিমজ্জিত হয়ে থেকে সে আদর্শ বধূর সুনাম অর্জন করেছিল কিন্তু অপূর্ব সুন্দর এই জগতের কোন পরিচয় সে পায়নি বলে জীবনটা তার ব্যর্থ হল। বাঙালী মেয়ের এই চিরন্তন ব্যর্থতা। "বাঁশীওয়ালার" ডাক তার কানে আসে, অন্তরে সাড়া জাগায়, কিন্তু চারদিক থেকে বাধা এসে দাঁড়ায়। "মুক্তি"তে সে তার নিজের মহিমা বুঝতে পেরেছে—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,

আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী,

আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,

মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"

কিন্তু সে যে বন্দিনী, মরণ বাসরঘরের ডাক যতদিন না আসবে ততদিন তার মুক্তি নাই। পরবর্তীকালের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মেয়েকে ইহজন্মেই মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। সে বাঁশীওয়ালাকে ডেকে বলেছে -

"আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ করে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয়নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।"

এই অশিক্ষিত, অর্ধবিকসিত স্বাভাবিক চেতনার মধ্যে বাঁশীওয়ালার ডাক আসে, বিশ্বের যা-কিছু স্বাধীন, প্রবল, দুর্ধর্ষ, তার রক্তধারায় দোলা দেয়—

"আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
রাতের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,—
পাঁজরের উপর আছাড়-খাওয়া
মরণ সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।

যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সঙ্কীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণিমার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।"

তবু শান্ত মেয়ে মাথা নিচু করে যায়, "সবাই বলে ভালো।"—"মুক্তি"র বধূকেও সবাই বলেছিল—"লক্ষ্মী সতী, ভালোমানুষ অতি" কিন্তু সে মরণ সাগরের কিনারায় দাঁড়িয়ে বুঝেছিল সে এই প্রশংসায় তার কোন লাভ হয়নি, এই নারী তাই মিথ্যা আচার ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেনা, সতীত্বের

মিথ্যা জ্ঞানের দোহাই তাকে ঘরে ধরে রাখতে পারবেনা সে ঘোমটা খুলে দিয়ে সোজাসুজি এসে দাঁড়াবে তার বাঁশীওয়ালার মুখোমুখি—

"তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোন থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ গাওয়া নূতন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নামবেনা গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি,
রাগিণীর আবছায়ায় বসে।"

এই দীপ্তিমতী অভাবনীয়া, অপূর্বকল্পিতাকে রূপ দিতে কবির লেখনী কম্পিত হয়নি. বরংচ তিনি পূর্বগামীদের হাস্যছলে ডাক দিয়েছেন এই সাহসিকার তেজ সহ্য করবার জন্য—

যে নারীর মধ্যে প্রতিভার জ্যোতির্মূর্তি অব্যাহতভাবে ফুটেছে তার রূপ কবি দুইদিক দিয়ে দেখিয়েছেন। একজনকে তিনি অর্ধপরিচয়ে দেবী করেছেন, আর একজনকে পূর্ণপরিচয়ে সহচরী করেছেন। এই দুই গুণের একপাত্রে মিলন সম্ভব হতে পারে ; না হলে অমিতের ভাষায় বলতে হয় —"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার সে ভালোবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যে প্রেয়সী, সেই যখন দেবী হয় নারীর সেইরূপের বর্ণনা "রাতে ও প্রভাতে" কবিতায় চিত্রিত হয়েছে--

"কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

* * *

তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
নবীন মিলনসুখে।"

কিন্তু মিলনরাত্রির এই আবেশমধুরা নারী পরদিন প্রভাতে দেখা দিয়েছে দেবীমূর্তিতে—

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সম্মুখে উদিলে হেসে।
আজি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।"

এই জন্যেই বোধহয় কবির জীবনদেবতা, কবির "কবিতা কল্পনালতা" নারীমূর্তিধারিণী। প্রথমে সে "আধচেনা শোনা",—"এই পৃথিবীর প্রতিবেশিণীর মেয়ে।" তারপরে সে অন্তরলক্ষ্মী হয়ে কবির হৃদয়ে মহিষীগৌরবে প্রতিষ্ঠিতা—"ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিণী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

তবু এই জীবনে কবির গৃহে দেবীর অধিষ্ঠান হলনা। কবি তাকে চারিদিকে দেখেছেন, বারেবারে ধরা দিয়েছেন, কিন্তু বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেননি। কবি Browning এর "Life in a Love" এর কথা মনে হয়— "Escape me?

Never!
Beloved!
While I am I and you are you,
While the world contains us both,
I the lover, you the loth."

রবীন্দ্রনাথের সাধনাও তাই—

"শুধু তরঙ্গের মত ভাঙিয়া পড়িব,
তোমার তরঙ্গপানে বাঁধিব মরিব
শুধু; আর কিছু করিবনা।"

এই নারী হয়ত পূর্বজন্মে কবির গৃহের বনিতা ছিল, এখন বিশ্বের কবিতারূপিণী হয়েছে, হয়ত সে পূর্বজন্মে যা ছিল, পরজন্মে আবার সেই রূপ ধারণ করবে, মাঝে শুধু একটি জীবনের এই ব্যবধান—

"কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমার জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি।"

অন্যত্র—"মানসী রূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্য সুন্দরী। * *
* * * *
* * জানি আমি জানি সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখাচোখি
সেই পরজন্ম পথে, দাঁড়াব থমকি'
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে' চমকি'
লভিয়া চেতনা"

আবার কবি Browning এর কথা মনে হয়। ঈর্ষ্যার সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করে এমনি আধ্যাত্মিক গৌরব দিয়ে নারীমূর্তি চিত্রিত করতে পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে হয়ত একমাত্র তিনিই পারতেন। পূর্বজন্মের যে প্রেয়সীকে এ জন্মে পাওয়া গেলনা তার বিষয়ে তিনি বলেছেন -

"Doubt you if, in some such moment
As she fixed me she felt clearly,
Ages past the soul existed,
Here an age 'tis resting merely,
And hence fleets away for ages,
While the free and sole and single
It stops here for is, this love way
With some other soul to mingle?"

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম যুগে স্বর্গের দেবরূপিণী এই নারী কবির জীবনদেবতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে ; পরেও কবির অন্তরবাসিনী মানসী অলক্ষ্যে বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়েছে, শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, অমৃত লোকের আহ্বান নিয়ে এসেছে মরলোকে—

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারই সন্ধানে তুমি, নারী,
দুবাহু বাড়ালে ॥

তাইত কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে ;
মানসতরঙ্গভরে বাণীর সঙ্গীত শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে,
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে।"

সাধারণ জীবনযাত্রার পথে নারীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে ভয়ের কথা এই যে হয়ত এই রূপে সে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারেনা, "অর্ধেক মানবী আর আর অর্ধেক কল্পনা" থেকে যায়। তাহলে সে সকল কাজে প্রেরণা দিতে পারবে, কিন্তু অতিশয় নৈকট্য সইতে পারবেনা। এই নারী সংসারের নিত্যসহচরী নয়। একে নিত্যকার বন্ধনে বাঁধলে এর যে দিকটা কল্পনা, তার বাস্তবিকতা মানসরাজ্যের সুখস্বপ্ন চূর্ণ করে; যেদিকটা আগে দেখা যায়নি সেদিকটা ফাঁকি দেয়। "শেষের কবিতায়" অমিত লাবণ্যকে এইভাবে চেয়েছিল, তাই লাবণ্য কঠিন হয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে বল্ল—"মিতা, ভালবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি; তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাক, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভাল লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু তুমি একটুও দায়িত্ব নিওনা, তাতেই আমি সুখী থাকব।" "শেষের কবিতার" শেষ কবিতায় তাই লাবণ্যর উক্তি এই—

"তোমার হয়নি কোন ক্ষতি
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাকো, তাহার আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবেনা মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগ বেগে

ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোন ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাব রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিবনা মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।"

এই নারীকে দূর থেকে পাওয়ায় সাফল্য, নৈকট্যবন্ধনে নয়। নিরবসাদ মুক্তিতে এর চরম সার্থকতা, পাওয়ার পূর্ণতা, তাই এর চরম দান। একে যে মাতা, কন্যা বা বধূরূপে পেলনা তার সেই না পাওয়াতেই চির-চাওয়ার সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

নিত্যকার সংসারে যে প্রতিভাময়ীর মূর্তি দেখি তাতে দূরের আবরণ নেই, জানার মধ্যেই সে পরিপূর্ণ। জীবনের দুর্গম পথের সহচরীরূপে সে অভয়বাণী এনে দেয় —

"হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহ জিনি,
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো, তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।"

এই নারী মানসিক শক্তির তীব্র জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী, এর দীপ্তির কাছে মালিণ্য লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে—

"যেন তার চক্ষুমাঝে
উদ্যত বিরাজে,
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা।"

এই নারী পৃথিবীতে দেবতার দেবলোক রক্ষা করবে, মানুষকে তার অন্তরের সত্যের রাজ্যে জাগ্রত করবে। এ মহাদেবের তৃতীয় অক্ষির অগ্নি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে ক্ষুদ্রতাকে দহন করবার জন্য—

জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দূষে

অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরণীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।"

এই কঠিন সম্মান বহন করবার যোগ্যতা পুরুষ সহজে অর্জন করতে পারে না—

"এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টঙ্কার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী।"

এই নারী কুশ্রীকে অবজ্ঞা করে দূর করেছে, ক্ষুদ্রতাকে পরাজিত করেছে, পুরুষকে অমৃত লোকের পথ দেখিয়েছে, তবু এ কল্পনারাজ্যবাসিনী নয়, জগৎকে এ সুখেদুঃখে সম্পূর্ণ করে জেনেছে।

'নিষ্ফলকামনায়' কবি প্রশ্ন করেছিলেন –

"মহাকাশ ভরা—
এ অসীম জগৎজনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ-মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি
পারিবি নিয়ে যেতে
চির সহচরে
চির রাত্রিদিন
একা অসহায় ?"

তখনও তাঁর প্রতিভা নারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণ শক্তির সন্ধান পায়নি, তাই এই প্রশ্ন। পুরুষ নারীর পথ প্রদর্শক, এই ধারণা তাঁকে ব্যাকুল করেছিল—

"যে-জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত, জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে ?"

কিন্তু নারীর পথনির্দেশ করবার ক্ষমতা পুরুষের না থাকলেও ভয়ের কারণ নেই, নারী যে আপন শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিতা। তবু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই সময়কার একটি উক্তিতেও নারীর দৃঢ়তার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। "কড়ি ও কোমলে" সংসারের কোলাহলে বিহ্বল, বিচলিত কবি এই নারীকে বলেছেন—

"তোমার চরণে আসি জাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে-দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি
সে দিকে হেরিবে সবে পথ"

কামনাসঙ্কুল প্রেম মোহ মাত্র, সংসারের দুঃখতাপসহনশীল, সাহচর্যমূলক যে প্রেম সে মোহমায়ার মত সহজে মিলায়না, তাই প্রিয়তমার প্রতি কবির এই আহ্বান—

"চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখেদুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসিকান্না ভাগ করি, ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।"

প্রিয়াকে তিনি যেখানে আহ্বান করেছেন সেই হাটের মাঝে ভগবানকেও তিনি পেয়েছেন। তাঁর জীবন, ধন, ধর্ম, সমস্তই সমর্পিত হয়েছে সেই ব্রহ্মের পাদপদ্মে এই বিরাট বিশ্ব যাঁর প্রতিকৃতি স্বরূপ, মানুষের মধ্যে যাঁর প্রকাশ। তাঁর হৃদয় যেখানে বিশ্বমানবকে আপনার বলে পেয়েছে নারীকেও তিনি সেইখানেই সঙ্গিনীরূপে চেয়েছেন; তাকে মিলনকুঞ্জের আলস্যআবেশে কামনার সামগ্রীরূপে চাননি, চেয়েছেন দুঃখতাপসহনশীলা পার্শ্বচারিণীরূপে। এই আহ্বানে নারী যে সাড়া দেবে এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে চিত্রাঙ্গদার মুখে এই উক্তি দিয়েছেন—

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখেদুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

কবি Tennyson এর

"Woman is not undeveloped man
But diverse" ইত্যাদি

অথবা "The woman's cause is man's
They rise or fall together." ইত্যাদি বর্ণনার কথা মনে পড়ে।

পরস্পরকে চিনে, জগতকে জেনে যে প্রেম তার পথে বাহির হয় তার এই বাণী—

"দুজনের চোখে দেখেছি জগত,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।"

এই নারী বিশ্বের দুঃখতাপ সহ্য করে বহির্জগতের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বলে যে কবিচিত্তের কল্পলোকের অর্গল খুলতে পারেনা তা নয়; পার্শ্বচারিণী সহধর্মিণীর কাছে যে প্রেরণা কবি পেয়েছেন তার কথা পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে "ছবি" কবিতায়—

"মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে প্রভাতে তুমিইতো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।"

এই শক্তিশালিনী, প্রতিভাময়ী, বিদুষী নারী পুরুষের অর্ধভাগিনী অর্ধাঙ্গিনী।

অনেকের বিশ্বাস বিদুষী নারী নারীত্বের লীলাময়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু যে বিদুষী সুন্দরীর ছবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্মুখে এনেছেন নারীসুলভ কোনো চতুরতাই সে ভোলেনি, তার বিদ্যার বোঝার তলে লাবণ্যবিলাসের কোনো ছলাকলাই সে হারিয়ে ফেলেনি—

"বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময়;
বুদ্ধি তার ললাটিকা
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহঙ্কার,
বিদ্যারে সে করেছে অলঙ্কার।"

সকল দেশের সকল যুগের কবি নারীকে যে সকল গুণের অধিকারিণী বলে চিত্রিত করে এসেছেন সেই সেবা, ক্ষমা, ধৈর্য তার চরিত্রের দৃঢ়তায় আরো সুন্দর হয়েছে। সুখের দিনে যে "প্রসাধন সাধনে চতুরা" দুঃখের দিনে তার দেবীত্ব আত্মপ্রকাশ করে দৃঢ় নির্ভরযোগ্যরূপে—

"এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইকো তার মনে,
সংসারজনতা মাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা ভরা
সকল উদ্বেগভার হরা!
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
দুর্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে বহে যায় কত
বারে বারে
প্রভা তার মুছিতে না পারে।"

কবি নবীনচন্দ্র সুভদ্রাকে আর্যনারীর আদর্শ বলে গ্রহণ করিছিলেন। সেবার মূর্তিরূপিণী হয়ে সে পূজা অর্জন করেছিল, তার সেবাব্রতের আন্তরিক উদারতার কাছে পুরুষের শত্রুমিত্রবিভাগ তুচ্ছ হয়ে যেত; আবার যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথাশ্বরশ্মি নিজের কঙ্কণপরা হাতে তুলে নিল তখন পুরুষোচিত কর্মপটুতাও তার কাছে সহজ হল। নারীর সেবায় শৌর্যে মিলিত এই যে ভীষণ মধুর মূর্তি, এই যে বিদ্যুৎছটা, যে রমণীয় হলেও "মরে নর তাহার পরশে," এই প্রতিভার পরিপূর্ণতায়, অনন্ত্র কাহিনী কবি নারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ দেখেছেন। নারীজাগরণের দিনে কবির লেখনী নারীর দাবীকে অঙ্গ দিয়েছে—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা?
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবগত দিনে?
শুধু শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লবো চিনে
সার্থকের পথ?
কেননা ছুটাবো তেজে সম্মানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে?
দুর্জয় আশ্বাসে

দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ ?

জগতের কঠিন কাজে পুরুষের একাধিপত্য এতদিন স্বীকৃত হয়ে এসেছিল, অধুনিক যুগে নারীও তার দাবী জানাল। তার তৃষ্ণা আছে, তৃষ্ণা মিটাবার ক্ষমতাও আছে। দৃঢ় ধী ও অবিচল মনুষ্যত্বই নারীর আভরণ, লজ্জা নয়; দশের কাছে "লক্ষ্মী সতী" বলে প্রশংসা পাওয়া তার জীবনের চরম সার্থকতা নয়। নির্ভরতার লীলা শুধু যে নারীকে দুর্বল করে তা নয়, পুরুষের যোগ্য সম্মানও' তার দ্বারা হয়না—

"যাবোনা বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী ;
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিণী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে লগ্ন কি একান্ত বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।"

জীবনের দুর্গম পথে নারী পুরুষের সহচরী। জীবনের দুঃখযন্ত্রণার সময়ে নির্ভরপূর্ণ আশ্রয়ভিক্ষায় সে পুরুষের পথের বিঘ্ন নয়। ভগবান বুদ্ধ নাকি বলেছিলেন নারী শ্বেতাস্থিকা কীটের মত পুরুষের অনুষ্ঠান ধ্বংসই করতে পারে, এই অভিযোগের প্রতিবাদ আজকে কবি তার কণ্ঠে দিয়ে গেলেন। ইতিহাসে বলে এসেছে কামিনী সকল অনিষ্টের মূল, সেই মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্তকথার মুখর ভাষণ নারীকে ক্ষান্ত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী নিদারুণ সংকটের দুর্যোগরাত্রে বিড়ম্বিত পুরুষকে স্বীকার করতেই হবে নারীর মহিমা—

"দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে,
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কবো তারে—"মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।"
সমুদ্রপাখীর পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুঙ্কার

পশ্চিম পবন হানি,

সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।"

অন্তঃপুরের সুরক্ষিত অচলায়তন আধুনিক যুগের সকল আঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ় নয়। কালের আঘাতে যেদিন তুচ্ছ আচারের জীর্ণ সৌধ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে সেদিন নারীর অমর মহিমা সমস্ত আবর্জনা দূর করে স্বপ্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করবে। রূপ-লাবণ্যের লীলাচঞ্চলতার দিন সেদিন নয়। সেই দিন নারীর আন্তরগৌরবে উজ্জ্বল। নারী-কবি মানকুমারী বসু তাঁর সুভদ্রার মুখে যে প্রার্থনা দিয়েছেন—

"মনসিজ! তুমি যদি সদয় দাসীরে,
দীনতা, জড়তা, ব্রীড়া, প্রলাপাদি মম
লহ দেব: আমাসহ সেই শুভক্ষণে
হবে তাঁর দরশন, সে সুখ সময়ে
আমারে রাখিও সত্য সুভদ্রা করিয়া।"

আধুনিক সবলারও সেই প্রার্থনা; যা তার বাইরের আবরণমাত্র তাই শুধু যেন তার প্রিয়তমের চোখ না ভোলায়, তার অন্তরে যে ঐশ্বর্য জ্যোতিষ্মান হয়ে রয়েছে তাকেই রূপ দেবার ভাষা যেন তার কণ্ঠে মিলনের দিনে সে পায়—

"হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা
রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা!
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্ত্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে।
নির্বারিত স্রোতে
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।

আমাদের কথা

কবিগুরুর উদ্দেশে ক্ষুদ্রশক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হল। অকিঞ্চিৎকর হলেও এ ব্যর্থ হবেনা জানি, কবির কাব্যেই এর আশ্বাস পেয়েছি, তাঁর কাছেই শিখেছি যে ভগবানের ঝুলি থেকে তণ্ডুলকণা স্বর্ণ-কণা হয়ে ফিরে আসে।

*　　*　　*　　*　　*

কিছুদিন থেকেই বারে বারে শোনা যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের যুগ নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে, ছোটো কবিরা তাই সাড়ম্বরে রবীন্দ্রোত্তর যুগের আবাহন করে রবীন্দ্রনাথকে কাব্যরণাঙ্গন থেকে সরে দাঁড়াতে বলছিলেন। সৌম্য সহাস শান্তির শুভ্র নিশান তিনি উড়িয়েই রেখেছিলেন, তবু রবীন্দ্রযুগকে ঘোষণা করবার প্রয়োজন হয়নি, প্রদীপ্ত সূর্যের রশ্মির মত সে স্বতঃপ্রমাণিত। আজ তিনি নেই বলেই তাঁর প্রতিভাকে সে পরবর্তী যুগ আচ্ছন্ন করে ফেলবে একথা বিশ্বাস্য নয়, তবে আজ তিনি নেই বলেই এইকথা অন্তত একবারও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবার প্রয়োজন হয়েছে যে তাঁর যুগকে অপসারিত করবার মত কবি জন্মাননি, সহস্রাব্দীর মধ্যে জন্মাবেন কিনা সন্দেহ।

*　　*　　*　　*　　*

আজকালকার তরুণদের মধ্যে অনেকেরই মনের বিশ্বাস এই যে আধুনিক যুগের উপযোগী কোনও বাণী রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যাননি, আজকের দিনের কবি তিনি নন, তাই কাব্যের রূপ, ভাব ও চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁরা নূতনতরো নেতৃত্বের সন্ধান করেন।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে নেতৃত্ব বলতে যা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথকে তার মধ্যে আবদ্ধ করা কোনোকালেই সম্ভবপর ছিলনা ; দলনেতৃত্বের মধ্যে যে দলাদলির ভাব থাকে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত সর্বদাই তার বহু উর্ধে বিরাজ করেছে। তিনি দেশকালের গণ্ডীর অতীত ছিলেন, দেশের সঙ্গে তাঁর এই সম্বন্ধ ছিলনা যে তার রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পথ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ করবেন অথবা তার পরিচালন করবেন ; কিন্তু একথা সত্য নয় যে তিনি দেশের অনুসরণযোগ্য কোন কথা বলেননি এবং একথা আরো মিথ্যা যে আধুনিক সভ্যতায় তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন।

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ বলেছিলেন বিজ্ঞান অপ্সরীর ডানা কেটে নেয়, রামধনুকে বিবর্ণ করে, অর্থাৎ বিজ্ঞান কাব্যের পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের বৃহত্তর লোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার তো করেনইনি বরংচ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশ্বভারতীর ত্রৈমাসিক পত্রিকার রবীন্দ্রজন্মদিবস সংখ্যায় শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"Had he not been famous as a great poet and prose writer, he would have become famous for the range and variety of his studies."

এবং রবীন্দ্রনাথ যে সব বিষয়ের বই সর্বদা পড়তেন তার এই তালিকা দিয়েছেন—

"Farming, philology, history, medicine, astrophysics, geology, biochemistry, entomology, cooperative banking, sericulture, indoor decorations, oil, pottery, looms, lacquer work, tractors, plantgrafting, meteorology, synthetic dyes, parlour, games, Egyptology, roadmaking, incubators, woodblocks, elocution, stall-feeding, jiu-Jitsu, printing."

আমাদের নিজেদের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা অতি সঙ্কীর্ণ বলেই আমরা বিজ্ঞান ও ধর্মকে মিলিয়ে নিতে পারিনা, মনে করি কবি অথবা সাধককে বিজ্ঞানবিরোধী হতেই হবে তাই রবীন্দ্রনাথের—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর"

অথবা—

"ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট,
নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা।"

ইত্যাদি ছত্র উদ্ধৃত করে দিয়ে আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করি যে তিনি সভ্যতার প্রাক্‌বিজ্ঞান সনাতন যুগে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতম বিজ্ঞানের লীলাভূমি, নাস্তিকের দেশ, রাশিয়ায় গিয়ে এই কথা বলবার জোর পেয়েছিলেন—

"সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথিরই মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবল ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনখানে আছেন?"

অন্যত্র—

"যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনও রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড় শত্রু হতে পারেনা—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুকনা। * * * * শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে কেননা তার মার আরামের মার।"

তাই কবি তাঁর কাব্যে বারেবারে অজ্ঞানান্ধতার, লালসার ও মোহের ধর্মকে ধিক্কার দিয়ে নিজেকে ও মানবসমাজকে জ্ঞানের উদারক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম যুগের কাব্যের অন্তরে অন্তরে বৈজ্ঞানিকের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা ধ্বনিত হয়েছে এবং পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ যে ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে কাব্য রূপ ধারণ করেছে সেরূপ বিশ্বের কোনো যুগের কোনো কবির লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়নি। ভারতের সাধক কবি রাশিয়ার বহুধিকৃত নাস্তিকতার বিষয়ে বলে গেছেন—

"অন্য দেশের ধার্মিকেরা এদের যতই নিন্দা করুক আমি নিন্দা করতে পারবো না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।"

এমন কি তিনি সে দেশে উপনিষদের বাণীর সত্যতা প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছেন—"উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—

ব্যক্তিগত লোভেতে করেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই একের থেকে যা আসবে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে এই কথাটা বলচে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড় বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো—'মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং' কারো ধনে লোভ করোনা। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলে ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।"

সেই দেশের সঙ্গে তুলনা করে উপনিষদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের বিষয়ে তিনি বলেছেন—

"আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাৎলামির জন্য শাস্তি দিই তালগাছকে।"

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষ"কে তাঁর মতামতের শেষ প্রমাণ বলে পাঠ করেন তাঁরাই কবিকে যান্ত্রিকসভ্যতা ও সাম্যবাদের বিরোধী বলে মনে করতে পারেন। তিনি যখন "ভারতবর্ষ" রচনা করেন তখনও সাম্যবাদের আদর্শ জগতে প্রত্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং সেইজন্যই তিনি প্রতিযোগিতামূলক পাশ্চত্য সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন ভারতের পিতৃভাবপূর্ণ সভ্যতাকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেছিলেন। পুঁজিবাদের উপর স্থাপিত যে যান্ত্রিক সভ্যতা, তাকেই তিনি মন্দ বলেছেন। তিনি যে কল বলেই কলের বিরোধী ছিলেননা, যে যন্ত্র সমবায় মানুষের মনুষ্যত্ব শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠেছে তার বিরোধী ছিলেন সে কথা 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থেই স্পষ্টভাবে উক্ত রয়েছে। তারপর রাশিয়ায় সাম্যের প্রত্যক্ষ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত দেখে তিনি যে তাকে স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি এ কথাও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তাঁর পূর্বের সাম্যবাদের উপর অনাস্থার উল্লেখ করে তিনি জনগণের বিষয়ে বলেছেন—

"আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেচি, মনে হয়েচে এর কোন উপায় নেই।" তারপর রাশিয়ার অভিনব উদ্যমের কথা—

"রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলচে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়চে তা দেখে আশ্চর্য হচ্চি।"

এখানকার সত্যকার সাম্য ও তজ্জনিত নবলব্ধ গৌরব কবিকে মুগ্ধ ও আশ্চর্য করেছে—

"শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্য নয়—মধ্য এসিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষাবিস্তার করে চলেচে—সায়ান্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায়, এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভীড়, কিন্তু যারা দেখচে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য ক'রেচি এদের চিত্তের জাগরণ ও আত্মমর্যাদার আনন্দ।"

যে মুহূর্তে সাম্যবাদের আদর্শ কবির চোখের সামনে রূপ ধারণ করেছে, যে মুহূর্তে যন্ত্র ও কৃষি-সমবায় তার লুব্ধ বীভৎসতা হারিয়ে জনসাধারণের সম্পত্তি হয়েছে তখনই কবি তাকে চিনেছেন।

"রক্তকরবী" ও "মুক্তধারা" যন্ত্রসভ্যতার সেই রূপের বিরোধী যেখানে পুঁজিবাদীর লোভ যন্ত্রদানবের সাহায্যে মানুষকে শোষণ করছে। যেখানে আর্থিক ও যান্ত্রিক উভয় পরিবর্তন একসঙ্গে ঘটেছে সেই রাশিয়ার সমবায়প্রচেষ্টার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--

"সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারেনা। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"

সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে কবি সর্বদাই স্বীকার করেছেন; তাঁর শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্গত "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিষয়ে তিনি বলেছেন—

"এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানারকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেচে বাধাকে ফাঁকি দিতে পারেনি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েচে; অপরপক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেচে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েচে।"

যে বুদ্ধিমান জাতি বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করল—

"সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে তাদের জন্য অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।"

এইজন্য কবি বলেছেন—

"পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্বজয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবেনা, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য।"

বিশ্বব্যাপারে এই "বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস"ই মানুষের মুক্তির সোপান, তার অভাবই বন্ধন ও মৃত্যুর কারণ, কেননা— "মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটেনা * * * * তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়; এই জন্যে সকলের কাছেই সে ঠকছে, পুলিশের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত।"

বিজ্ঞানবিৎ স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা ভয় দূর করে পথ প্রস্তুত করে কারণ "বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন।"

এই রাজ্যেও উপনিষদের বাণীর সত্যতা প্রতিফলিত হল—

"আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেচেন, যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ— সমাভ্যঃ অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি একটুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম, কাল একরকম নয়।'

বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই প্রকৃত সাধক বৈজ্ঞানিক হলেন

"এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল স্বরাজও সে পাবে, আর পেয়ে সে রক্ষা করতে পারবে।"

এ সেই স্বরাজ 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"—সেই লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়ের অতীত লোকে উত্তীর্ণ হবার সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস "নৈবেদ্যের" মধ্যে স্পষ্ট ; "বলাকায়" সেই অলঙ্ঘ্য সৃষ্টিনিয়মের অনন্ত গতি বৈজ্ঞানিক কবির রসঃসাধনায় কাব্যরূপ ধারণ করেছে।

বাহ্যজগতে বিজ্ঞান মানুষকে দৈহিক আরাম দিয়েছে বলে তার আত্মা মুক্তিলাভ করেছে ; কিন্তু ওই "আর সব স্বরাজ" কে ছোট করে ঐহিক লাভটাই যখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন লোভের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মানুষ মারে এবং মরে। "রক্তকরবীর" যবনিকান্তরালস্থ রাজা এর প্রতীক্।

অর্থ ও যন্ত্র মানবের মুক্তির জন্য প্রযুক্ত হলে সাফল্য লাভ করে, নতুবা -

"বহুলত্বের কোন চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে যোলো অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হোতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার ঝোঁক চেপে যায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়।" তাই আমেরিকায় গিয়ে কবির চিত্ত সেখানকার স্বার্থপর ধনলোভকে ধিক্কার দিল—"আটলান্টিকের ওপারে ইটপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে—"তালের মচমচের অন্ত নেই কিন্তু সুর কোথায় ?"—আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো সুর লাগেনা। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে 'ততঃ কিম ?'।"

তখন মানবধর্মের সত্যরূপ আত্মপ্রকাশ করে, পূর্বদেশের বাণী সত্য হয়ে ওঠে, উপনিষদের মিলনমন্ত্র সার্থক মনে হয়। একদিন বহির্বিজ্ঞানকে অবহেলা করে প্রাচ্যদেশ অধোগতি লাভ করেছিল, আজ ধর্মকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসমুখী -

"এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত ও নির্জ্জীব ; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

পশ্চিমের কবি যেদিন বলেছিলেন—

"The East is East and the West is West
And the twain shall ne'er meet."

সেদিনও লোভমূলক সভ্যতার ব্যর্থতা এমন প্রকট হয়ে ওঠেনি, সেদিনও শ্বেতকায় মানুষের বহন করবার জন্য কিছু বোঝা বাকি ছিল এই পৃথিবীতে; কিন্তু সেদিন থেকেই পূর্বদেশের সাধক কবি, অনুন্নত পরাধীন ভারতের কবি মানসপটে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের ছবি দেখতে পেয়ে বলে এসেছিলেন 'মা গৃধঃ'। আজ যখন বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের অগ্নিকুণ্ডে পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এক কটাহে ধূমায়িত তখনও আমরা এই কথা মনে করে আশার সঞ্চার করব যে হয়ত পরম দুর্যোগেই [illegible] মিলনকে সম্ভব করে মানবসভ্যতাকে তার সংকট থেকে রক্ষা করবে।

বিজ্ঞাপন।

নানা গোলমালে এইবারের পত্রিকা দেরী করে বেরোল ; পত্রিকার বর্দ্ধিত কলেবর দেখে আশা[illegible] মার্জনা করবেন। আগামী বারে সময়নিষ্ঠ হবার চেষ্টা করব।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।/০ আনা; ষাণ্মাসিক মূল্য ১॥০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸/০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। **গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।**

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

পাদ।

এবং সে

Printed at Bhowanipur Art Press 82-A, Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar Chakravartty

CALCUTTA DYEING & CLEANING CO.

HEAD OFFICE: 21-3, CHOWRINGHEE ROAD. PHONE CAL. 5572

সূচি পত্র—মাঘ, ১৩৪৮

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।৴০ আনা ; যাণ্মাষিক মূল্য ১॥০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৴০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন ; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, অন্যথা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন্ মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ } মাঘ—১৩৪৮ { ১০ম সংখ্যা

সুনিভৃত

শ্রীঅরুণা সিংহ।

একথা বলিতে চাহি ফুটে
হৃদয় সম্পুটে
তোমারে পেয়েছি আমি ধেয়ানের নিস্তব্ধ গহনে,
কর্ম্মময় জীবনের অবসর খনে
একমুঠা শুভ্ররুচি শেফালীর মত
করিয়াছ মোর গানে শাখা অবনত।
"যে আমি দীনের মত কাঁদে মর্ম্মমাঝ
অপ্রাপ্তি তৃষায়—তারে নাহি ভয় লাজ।
তাহারে জেনেছো তুমি—দেছ বরাভয়—
ঘুচায়েছ দ্বিধাময় সকল সংশয়।
আমার হৃদয় পদ্ম উৎকণ্ঠ আবেগে
কখনও লুটিয়া পড়ে
কখনও ফুটিয়া ওঠে বেগে
তার সব ওঠা পড়া—জানি সর্ব্বক্ষণ
হে তপন বরিয়াছে তোমারি কিরণ।

মানব-জীবনের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে দার্শনিক Guyau র উক্তি।

শ্রীসরলাবালা সরকার।

একটি বিশেষ আভ্যন্তরীণ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার নাম কর্ত্তব্য এবং এই শক্তি প্রকৃতিগত ভাবে স্বভাবতই সমস্ত শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ।

যে বৃহত্তম কার্য্য করিবার ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের ভিতর অন্তর্নিহিত ভাবে রহিয়াছে তাহার গূঢ় উপলব্ধিই সেই বিষয়ে প্রথম সচেতনতা – যাহা আমাদের করা উচিত।

আমাদের মনে হয়—বিশেষতঃ কোন এক বিশেষ বয়সে—স্বীয় ব্যক্তিগত জীবন যাপনের জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত শক্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে এই শক্তি আমরা জনসেবায় নিয়োজিত করিতে পারি।

এই যে জীবনীশক্তির অতিরিক্ত প্রাচুর্য্য যাহা নিজেকে কর্ম্মের মধ্যে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে— এই চেতনা যে পরিণতিতে গিয়া পৌঁছায় সাধারণ কথায় তাহাকেই বলা হয় স্বার্থত্যাগ, অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে—, সেই চেতনার পরিণতি হইতেই সাধারণে যাহাকে 'স্বার্থত্যাগ' নামে অভিহিত করে তাহাই উৎপন্ন হয়।

আমরা অনুভব করি যে আমাদের অধিকারে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ; এই অনুভূতি আমাদের পরিচালকস্বরূপ হয়। সেই শক্তি আমরা অন্যের প্রয়োজনে দান করি, কখনও বা সুদূর সমুদ্রে পাড়ি-দিবার আয়োজন করি, কখনও বা শিক্ষাবিস্তার কার্য্যের ভার স্কন্ধে তুলিয়া লই, কখনও বা আমাদের সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায় ও সহনশীলতা লইয়া অন্যান্য সহযোগীর সহিত একযোগে কোন এক সাধারণ কার্য্যে লাগিয়া যাই।

অন্যের দুঃখে আমাদের যে সহানুভূতি সে সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা জ্ঞানের মধ্য দিয়া অনুভব করি আমাদের মনে যত চিন্তা—আমাদের হৃদয়ে যত সহানুভূতি—এমন কি আমাদের জীবনে যত ভালবাসা, আনন্দ ও অশ্রু আছে তাহা আমাদের নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করার অনেক অতিরিক্ত।

আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দিক দিয়া ফলাফল সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া সে গুলি আমরা অপরকে বিতরণ করি। প্রকৃতিতে আমরা দেখিতে পাই কোন উদ্ভিদ, যখন তাহার ফুল ফুটানোর প্রয়োজন হয় সে ফুল ফুটায়, যদিও ফুল ফুটাইলেই সে মরিয়া যাইবে, প্রকৃতি আমাদের নিকটেও সেইরূপই দাবী করে।

মানুষ নৈতিক উর্ব্বরতার অধিকারী, সেই অধিকারবোধই তাহাকে স্মরণ করায় যে তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে বৃহৎ জীবনের মধ্যে ব্যাপ্ত করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে একেবারে বিলীন করিয়া দিতে হইবে।

এই বিস্তার লাভ করাটাই সত্যকার জীবনের প্রকৃত স্বরূপ। জীবনের দুটি দিক আছে, একদিক নিজের জন্য খাদ্য সংগ্রহ এবং সেই খাদ্যে নিজের পরিপুষ্টিসাধন। আর একদিক সৃষ্টিকার্য্যে সহযোগিতা এবং উর্ব্বরতা। তাই জীবন যতই বেশী আপনাকে দান করে ততই তাহার দান করিবার শক্তি ও প্রয়োজন আরও অধিক হইয়া উঠে ইহাই জীবনের নিয়ম।

ব্যয় করা জীবনের অবস্থাগুলির মধ্যে একটি প্রায়োজনীয় অবস্থা, এটি যেন নিশ্বাস গ্রহণের পর প্রশ্বাসত্যাগ। জীবনের পাত্র ভরিয়া গিয়া কানা উপচাইয়া পড়িবে তাহাই প্রকৃত জীবন।

আমাদের জীবনের সহিত সেই উদারতা অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত যাহার অভাব হইলে আমাদের জীবন প্রাচুর্য্যহীন হয়; যাহার অভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকিয়াও মরিয়া যাই, ভিতরে ভিতরে শুখাইয়া যাই। আমাদের ফুল ফুটাইতেই হইবে, নৈতিকতা ও নিস্বার্থপরতাই জীবনের পুষ্প স্বরূপ।

এই ফুল ফুটাইবার দিকেই প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কেবল বাঁচিয়া নয় বাঁচিয়া থাকাকে সার্থক করা চাই। বস্তুতঃ এই কথাটা স্মরণ করাইলেই যথেষ্ট হয় যে হাজার হাজার এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যেখানে মানুষ ইচ্ছা করিয়া বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে অথবা বিপদের দিকে ধাবিত হইয়াছে যদিও সময় সময় সে গুলি খুবই গুরুতর।

জীবনের কেবল তরুণ বয়সে নয় সমস্ত বয়সেই—এমন কি যখন চুল পাকিয়া গিয়াছে তখনও মানুষ ধাবিত হইয়াছে ঐ সংগ্রাম ও বিপদের আকর্ষণের জন্যই।

বীরজনোচিত কার্য্য কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে কিম্বা অন্য সংগ্রামেই নয়,—চিন্তাজগতের সাহসিক অভিযানে এবং ব্যক্তিগত জীবন ও সামরিক জীবনের সংশোধনে ও পুনর্গঠনে ও বিপদের দায়িত্বগ্রহণ আছে। যখন প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে কোন এক অভিনব সিদ্ধান্ত অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়, বিজ্ঞানের দিক দিয়াই হোক্ বা সামাজিক কোন পরিবর্ত্তনের দিক দিয়াই অথবা চিন্তাজগতে কোন নূতন আদর্শের দিক দিয়াই হোক্ তাহাকেও আমরা বীরজনোচিত অভিযান বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, সে অভিযান কোন ব্যক্তিগত কার্য্যে বা সামাজিক অনুষ্ঠানের দিক দিয়াই হউক না কেন। এবং এইরূপ সাহসিক কার্য্যেই সমাজের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় এবং নৈতিক অগ্রগতি গতিশীল হয়।

পুণায় স্ত্রীশিক্ষা।

ডি, কে, কার্ভে।

(শ্রীকল্যাণী সোম অনুদিত)

সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে পরিচালিত নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য পুণা আজ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'সারভেন্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', 'ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্ট্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট', হিষ্টরিকেল রিসার্চ এসোসিয়েশন', 'প্রভাত ফিল্ম কোম্পানী' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

পুণা পশ্চিমভারতের শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। পুণার 'ফারগুসন কলেজ' বিখ্যাত স্বার্থত্যাগী লোক শিক্ষকগণের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এক বিশিষ্ট উদাহরণস্থল; পুণায় অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃষিবিদ্যার কলেজের সমজাতীয় কলেজ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে আর নাই।

পূর্ব্বে সমগ্র প্রেসিডেন্সীতে মহিলাগণের উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। শিক্ষার্থিনীরা সহশিক্ষার বিরোধী না হওয়ায় তখন স্বতন্ত্র মহিলা কলেজের অভাব বোধ হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে পৃথক শিক্ষাপ্রণালী এবং পাঠ্যসহ মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকলেজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, এবং বর্ত্তমানে চারিটি মহিলাকলেজ বিদ্যমান আছে।

সমগ্র প্রেসিডেন্সীর মধ্যে পুণাই হিন্দুমহিলাদের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিল। বোম্বাইয়ে পার্শি এবং শ্বেতাঙ্গ বালিকাদের জন্য বেসরকারী উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু হিন্দু বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় ছিলনা। ডাঃ আর, জি, ভাণ্ডারকার এবং বিচারপতি এম, জি, রাণাড়ে প্রমুখ ব্যক্তিগণ পুণায় একটি উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনকল্পে এক সমিতি গঠন করেন। তাঁহারা একটি প্রশস্ত স্থান নির্বাচন ও প্রধানত দেশীয় রাজন্য ও মন্ত্রিবর্গের নিকট হইতে প্রায় একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেন্টকে একটি উচচ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। এইরূপে পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে, গবর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহারই উপর বর্ত্তমানে ঐ বিদ্যালয়ের ভার অর্পিত রহিয়াছে এবং তদবধি উহা সমভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। সেই সময়ে এই বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস থাকায়, সম্পন্ন হিন্দুবালিকাগণ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষালাভার্থে বোম্বাই হইতে পুণায় আসিত।

মহিলাদিগের মাধ্যমিকশিক্ষাবিস্তারে ইহার পরবর্ত্তী প্রচেষ্টা পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পুণায় অধ্যাপক কার্ভের বিধবাশ্রম স্থাপন। অল্পবয়স্কা, মেধাবিনী অথচ দরিদ্রা বিধবাগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য সাহায্য করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্ত্তিকালে প্রতিষ্ঠানটি বালিকা ও মহিলাদিগের একটি বোর্ডিং বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির ইতিহাস আশ্চর্য্যজনক; কেবলমাত্র ছয়জন বিধবাকে লইয়া যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা চারিশত প্রাণীর বাসস্থান। বালিকা ও মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা তিনশত,

এবং শিক্ষয়িত্রী ও কর্ম্মচারিগণ উহার সংলগ্ন স্থানে সপরিবারে বসবাস করিতেছেন। ইহা পুণা সহর হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত এবং আগন্তুকগণের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ঐ স্থানের কর্ম্মিবৃন্দের জন্য যে সকল বাসভবন আছে তাহার মূল্য প্রায় দুইলক্ষ টাকা। ওখানে ছাত্রীদিগকে মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাদানকল্পে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও তৎসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রীগণকে শিক্ষাদানের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত একটি ট্রেনিং কলেজ অথবা নর্ম্মালস্কুল আছে।

হিন্দু বিধবাশ্রমসমিতি ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার অশেষ উন্নতি করিয়াছে। স্বর্গীয় স্যার বিঠলদাস, ডি, থ্যাকারসে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে সুদের পোনেরো লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন, এবং সেই রাজোচিত দানের জন্য পরবর্ত্তিকালে উহা "শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকারসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" নামে অভিহিত হয়। বিধবাশ্রমের কর্ম্মীরা পঁচিশ বৎসরকাল পুণাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর নির্ব্বাহ করেন, তৎপরে উপরিউক্ত দানের সর্ত্তানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র বোম্বাইযে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক একটি মহিলা কলেজ এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। উভয় প্রতিষ্ঠানই সুন্দর বাসভবন সমন্বিত এবং কলেজটির সংলগ্ন পঞ্চাশজন ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি ছাত্রীনিবাস রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের পর পঁচিশবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া বোম্বাই, পুণা ও আমেদাবাদে উহার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে। সরকারী অথবা আধাসরকারী যে কোন কর্ম্ম পাইবার পক্ষে মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ডিগ্রী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমতুল্য বলিয়া গণ্য হয়।

পুণার সেবাসদনসমিতি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী ভাবে কাজ করিতেছে। এই সমিতিকর্ত্তৃক একটি উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় এবং একটি মহিলাদের ট্রেনিং কলেজ পরিচালিত হইতেছে। এই সমিতিটি ত্রিশবৎসরের অধিককাল ধরিয়া কার্য্য করিতেছে। স্বর্গীয় জি, কে দেবদার ও স্বর্গীয়া রমাবাঈয়ের প্রচেষ্টাই ইহার স্থায়িত্বের মূল কারণ।

অপর একটি বেসরকারী সমিতির দ্বারা আগরকর উচ্চবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "শুধারকের" (সংস্কারক) পরিচালক ও সুমহৎ সমাজসংস্কারক আগরকরের নামানুসারে উহার নামকরণ হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহারাষ্ট্রের জনমতকে সমাজ সংস্কারের পক্ষে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।

মাধ্যমিক স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই সকল প্রচেষ্টা ব্যতীত আরো দুইটি সমিতি বর্ত্তমানে বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালনা করিতেছে।

এইভাবে মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষা আশাতীত ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরুষদিগের কলেজগুলির পরিচালনার্থে যে তিনটি বৃহৎ সমিতি আছে তাহাদের অধীনস্থ প্রত্যেকটি কলেজের সংলগ্ন মহিলাদিগের স্বতন্ত্র ছাত্রীনিবাস আছে এবং স্বগৃহ হইতেও বহুসংখ্যক ছাত্রী ঐ সকল

যাদু।

শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী।

[with appologies to all ঠাকুমা স্থানীয়াs]

ঠাকুমা যখন ছিল আইবুড়ো,
ছিল কচি হয়নিকো বুড়ো !
তখন নাকি বশীকরণ, যাদুমন্ত্র বলে,
প্রেমাস্পদের মনটারে জয় কোরত নানা ছলে।
ঠাকুমা আজও বলে " খাটতো তারা কত
বিশ্বখুঁজে পুরুষ পেতে আপন মনের মত।
কৃষ্ণচূড়ার বলয় পরে,
ঘুরে ঘুরে বনবাদাড়ে,
আনতো বুনো শিকড় কত,
মনচোরা ফুল শত শত।
তাদের ধারণ করলে পায়ে
কিংবা বেটে মাখলে গায়ে,
কিংবা তারে মারলে ছুঁড়ে
ঠিক পুরুষে আনতো দুঁড়ে।

তখন দাদু ছোকরা বেজায়,
দিদুর চোখে তাই বুঝি হায়,
দেখল যেন কিসের আলো,
মোর দিদুরে বাসল ভাল—
ঘাটের পথে যেতে,
মুচকি হেসে ঠাকমা সেদিন
চাঁদ পেল যে হাতে।

ঠাকুর্দ্দারে রাখতে টেনে,
প্রেমের কুহক ঢালত কানে,
কোন শিকড়ে অঙ্গে রেখে
কোন কুসুমের সুবাস মেখে,
জানতো না কো কেউ,
(তবু) তুলত দিদু দাদুর প্রাণে
নিত্য প্রেমের ঢেউ

আমার কিন্তু সন্দেহ হয়
ফুল-শিকড়ের কাজ ও যে নয়—
দিদুর চোখের কাজল রেখা,
চক্ষে প্রেমের লিখন মাখা।
কোমরের ঐ শিকড়ে নয়,
চলার দোদুল ভঙ্গিমায়,
উঠল দুলে দাদুর প্রাণ,
—তার পরে ঐ মধুর গান,
দাদুরে মোর করল বশ ;
ঠাকমা বলে ও যাদুর যশ।

ঠোঁট দুটির ঐ রসাস্বাদ,
সুহাস, সলাজ দৃষ্টিপাত,
এতে কি গো নেইকো যাদু,
এতেই ভোলেনিকো দাদু ?
ঠাকমা হয়তো জানতো না,
তর্ক করেও মানতো না,
উৎস যাদুর তার সাথে
ছিল তা সে জানতো না,
জানলে পরেও মানতো না।

মানস সরোবর

শ্রীনলিনী চক্রবর্তী।

"আচ্ছা, বল্‌তো বুড়ির বয়স কত ?"

"ওরে বাসরে, ওর বয়সের গাছ পাথর নেই। পঁয়তাল্লিশ ? পঞ্চাশ ?"

"দূর পঞ্চাশ কি করে হবে ? চুল তো পাকেনি এখনও।"

"না, মানে পঞ্চাশ না হোক, তবু কাছাকাছি কিছু একটা "

কাঠের পার্টিশনের পিছনে বসে সুলতা রায় মেয়েদের খাতা দেখতে দেখতে বুঝতে পারে যে তার সহকর্মিনীরা তার সম্বন্ধে যে আলোচনা করছে সেটা তাকে শোনাবার জন্য করছে না ; কিন্তু কেমন জানি একটা সঙ্কোচ এসে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে বাধা দেয়। কি বলবে সে ওদের ? ওদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে যদিও সে বেশ কয়েক বছর এক স্কুলে কাজ করেছে, কিন্তু তেমন ভাল করে পরিচয় হয়নি তো কারো সঙ্গে। ওরা নিজেদের মধ্যে দিদি-ছোট বোন সম্পর্ক পাতিয়ে দিব্যি হাসিগল্পে অবসর সময় টুকু কাটিয়ে দেয়। সুলতা কিন্তু হেড মিস্‌ট্রেস্‌ থেকে আরম্ভ করে, সহকর্মিনী ও ছাত্রী পর্য্যন্ত সকলের কাছেই "মিস্ রায়"—তার নাম বোধহয় সকলে ভুলেই গেছে।

পাশের ঘরে অণিমা বলছিল "জানো মিনতিদি, আমি আজ পর্য্যন্ত মিস্ রায়ের সঙ্গে বিনা দরকারে একটাও কথা বলিনি কোনওদিন—অথচ প্রায় এক বছর একসঙ্গে কাজ করছি।"

"শুধু তুমি কেন, আমরা কেউই বলিনি।"

বাসন্তী বলল "ওর নিশ্চয় কোনও একটা মানত আছে, মৌনব্রত ট্রত গোছের।"

সবাই হেসে উঠল।

মঞ্জু বলল "আমার কিন্তু ভাই বড্ড রাগ হয়, কেন ও ওরকম হাঁড়ি মুখ করে থাকে সব সময়ে ? মুখ দেখলে মনে হয় যে একহাঁড়ি দুধ রাখলে দৈ হয়ে যাবে।"

আবার সবাই হাসল।

অণিমা বলল "তোমার রাগ হয় ? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে। মেয়েরা তো ওকে যমের মতন ভয় পায়।"

"এটা কিন্তু আমার উচিত মনে হয় না—ছেলেমানুষ মেয়েদের ভাল করে শিক্ষা দিতে হলে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। মিস্ রায়কে মেয়েরা এত ভয় পায় যে ওর ক্লাসে পড়া বুঝতে না পারলেও জিজ্ঞেস করে নেয় না।"

অণিমা আর মঞ্জু ততক্ষণে সাজ পোষাকের আলোচনা সুরু করে দিয়েছে। মঞ্জু বলল "মিস্ রায়ের পোষাক দেখলে আমার গা জ্বালা করে। টিচার হতে হলে কি অমনি নোংরা ভূত

সেজে থাকতে হবে? বেশী সাজগোজ নাই বা করলেন, তবু ভুলেও কি একটা সুন্দর সাড়ি কি জামা পরতে নেই বা পরিষ্কার করে চুল বাঁধতে নেই?"

বাসন্তী বলল "ওরে, আজ আমাদের কারো ডিউটি' নেই—চল্ দল বেঁধে একটা সিনেমা দেখে আসি।"

সকলে উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল এ কথায়, তারপরে গল্প করতে করতে যে যার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল সাজপোষাক করবার জন্য।

সুলতাকে তারা কেউ দেখতে পায় নি। দেখতে পেলেও তাকে ডাকতো না অবশ্য, কারণ প্রথম প্রথম অনেকবার তারা তাকে তাদের সঙ্গে বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কোনও দিনই তাকে নিয়ে যেতে পারে নি।

মেয়েদের খাতার গোছা হাতে তুলে নিয়ে সুলতা ক্লান্তপদে তার নিজের ঘরের দিকে চলল। ক্লাসের ঘণ্টাগুলি আর স্নান-খাবার সময় টুকু ছাড়া প্রায় সমস্ত সময়টাই তার কাটে এই নিরানন্দ শ্রীহীন ছোট্ট ঘরটির মধ্যে।

কতগুলি মেয়ে হাত ধরাধরি করে বারান্দায় বেড়াচ্ছিল আর গল্প করছিল। সুলতাকে দেখতে পেয়েই তারা দৌড়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সুলতার কানে এল চাপা গলার স্বর "ওরে পালিয়ে যারে—রায়বাঘিনী আসছে!"

নিজের ঘরে ঢুকে সুলতা আজ পনের বছর পরে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। তার চোখে পড়ল একটি অকালবৃদ্ধার মূর্তি—চুলগুলো তার কোনওমতে টেনে একখানা গ্রন্থি পাকানো, পরণে একখানা শাদা জামা ও "পাড়-উঠে-যাওয়া" শাদা সাড়ি, ভাবলেশহীন, বিরস মুখ। সে ভেবে দেখল যে মঞ্জু অণিমারা ঠিক কথাই বলেছে। এই স্কুলেই তো সে পাঁচ বছর চাকরি করছে, তার আগে আরো কত স্কুলে, কিন্তু গত পনের বছরের মধ্যে সে একদিনও কারো সঙ্গে হেসে কথা বলেছে বলে তো মনে পড়ে না। আয়নার দিকে তাকিয়ে সুলতা হাসতে চেষ্টা করল, তার মনে হল যেন সে কত বছরের অনভ্যাসের ফলে হাসতে ভুলেই গেছে। সত্যিই কি তাকে পঞ্চাশ বছরের বুড়ির মতন দেখায়? এই তো মিনতিদি রয়েছেন তার থেকে বয়সে বড় কিন্তু তিনি সর্বদা এমনভাবে ছেলেমানুষ টিচারদের হাসিগল্পে যোগ দেন যে তারা তাঁকে প্রায় সমবয়সীর মতন মনে করে। সুলতাকে তো তারা অনায়াসে "বুড়ি" বলে উল্লেখ করল। অথচ পনের বছর আগে এই সুলতা একদিন মঞ্জু-অণিমা-বাসন্তীর মতনই একুশ বাইশ বছরের হাস্যমুখী তরুণী ছিল তাদেরই মতন সে ভালবাসত সাজতে, গল্প করতে, সিনেমা দেখতে।

সেই শিলঙ্ শহরে তাদের ছবির মতন সুন্দর ফুলবাগানে ঘেরা ছোট্ট বাড়ীটি, তার পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ে ঝরনার ধারে ধারে আঁকা বাঁকা লাল রাস্তা উঠে এসেছে, কাঁচের জানলার মধ্য দিয়ে দেখা যায় পাহাড় বনের মধ্যে মধ্যে লাল ছাতওয়ালা বাড়ী-

গুলি, দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আরো বহুদূরে আকাশের গায়ে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ। সে ছবি আজো তার চোখের সামনে গতরাত্রে দেখা স্বপ্নের মতন পরিষ্কার ভেসে ওঠে, কিন্তু নিজেকে আর সে সেই ছবির মধ্যে কল্পনা করতে পারে না। সেই যে ছোট্ট মেয়েটি ফ্রক পরে, রিবন বেঁধে পাহাড়ে বনে লাফালাফি করত, সেই যে আনন্দময়ী তরুণী বেণী দুলিয়ে রঙ্ বেরঙের সাড়ি পরে বাবা-মা-ভাইবোনের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হেসে খেলে দিন কাটাত—সেই কি এই রায় বাঘিনী? সেই হাস্যমুখী, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মেয়েটি, না ছিল সুন্দরী, না ছিল প্রতিভা-শালিনী, কোনও অসাধারণ গুণ বা ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল না, তবু সুলতার মনে পড়ে যে, সেই মেয়েটিই ছিল বাপমায়ের নয়নের মণি, ভাইবোনের আদরের "দিদিভাই" আর বন্ধু-বান্ধবীদের সকলেরই প্রিয়পাত্রী।

জীবনের প্রথম বাইশটা বছর একটা অখণ্ড সুখস্বপ্নের মতন সুলতার মনে পড়ে। তারই মধ্যে কখন একদিন সে যে শৈশবের ছেলেখেলা ছেড়ে তার খেলার সাথীদের মধ্যেই একজনকে কেন্দ্র করে যৌবনের সুখস্বপ্ন রচনা করতে সুরু করেছিল সে কথা তার মনে নাই। কবে কোনদিন যে অজয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সে কথা তার মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে বাল্যকালের খেলাধূলার শতসহস্র সুখস্মৃতি। কোন্‌দিন কেমন করে যে সেই ছেলেমানুষি সখ্য গভীরতর ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল সে কথাও তার মনে নাই। কোনও নাটকীয় কথায় বা ব্যবহারে তারা পরস্পরকে ভালবাসে নি। কেবল মনে পড়ে যে তার সুখস্বপ্নের শেষ কয়েকটী বছরে আকাশ যেন আরো নীল আর পৃথিবী গাঢ়তর সবুজ হয়ে উঠেছিল। এমন ফুল আর কোনওদিন ফোটেনি, পাখীতে এমন গান গায় নি। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে ফার্ণে ও বনফুলে ভরা ছোট ছোট পায়ে চলা পথগুলি আর কোনওদিন এমন মনোরম হয়ে ওঠেনি।

তাদের বাড়ীর পাশের ছোট্ট ঝরনাটির ধার দিয়ে সুলতা পাহাড়ি মেয়ের মতন অবলীলাক্রমে উঠে যেত। লোকালয় পার হয়ে অনেক উপরে উঠে ঘন পাইন বনের মধ্যে ঝরণার ধারে একটা শ্যাওলা ধরা বড় কালো পাথর ছিল তাদের দুজনের অতি প্রিয় জায়গা। ভুলেও কোনওদিন এর কথা তারা অন্য কোনও খেলার সাথীর কাছে প্রকাশ করে নি। এইখানে ঝরনার জলধারা একটুখানি পাথরের ফাঁকে বাঁধা পাড় একটা ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি করেছিল, অজয় তার নাম দিয়েছিল "মানস সরোবর"। তারা বলতো সে এর ধারে এসে বসলেই তাদের মনের সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। শৈশবে এরই ধারে তারা অনেক বাঘ শিকার করেছে, যখের ধন উদ্ধার করেছে, এর জলে অনেক নৌকা জাহাজ ভাসিয়ে খেলা করেছে। এরই ধারে বসে তারা কৈশোর যৌবনে কত আকাশ কুসুম রচনা করেছে, সাহিত্য রাজনীতি আলোচনা করেছে। এখনও সুলতা প্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট দেখতে পায় সেই ঘন পাইন বনের মধ্যে কালো পাথরের ধারে তাদের কল্পনার "মানস সরোবর," তারই পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে একটি ছেলে, তার মুখ দেখতে পাওয়া

যায় না, কিন্তু তার মাথার কোঁকড়া চুল থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ, সুগঠিত দেহের প্রত্যেকটি রেখা সুলতার পরিচিত। পা টিপে টিপে একটি মেয়ে পিছন থেকে এগিয়ে আসে, কিন্তু সে এসে পৌঁছাবার আগেই ছেলেটি কেমন করে জানি তার আগমন টের পেয়ে যায়, একটু হেসে সে উঠে দাঁড়ায়।

তারপরে একদিন সুলতার সুখস্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। তার বাবার অসুখ, কলকাতায় এনে তার চিকিৎসা, তার জন্য তাদের যথাসর্বস্ব বিক্রী করা, তার বাবার মৃত্যু—এ সমস্ত ঘটনা সুলতা পৃথক্‌ভাবে মনে করতে পারে না, কারণ এর পরের কয়েকটা বছর তার কাছে মনে হয় একটা আতঙ্কময় দুঃস্বপ্নের মতন। রোগ-শোক-অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে কেমন করে যে সে কেবল মাত্র নিজের চেষ্টার জোরে টিউশনি করে করে আই-এ বি-এ পাশ করেছিল, তারপর স্কুলে চাকরি জোগাড় করেছিল, সেকথা আজ সুলতা ভেবেই পায় না। তার মার শরীর ও মন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। বাবা মারা যাবার সময়ে তার ভাইবোনগুলি সকলেই ছিল নেহাৎ-ই ছোট, তাদের খাওয়া-পরা, লেখাপড়ার সব খরচই চালাতে হয়েছিল একা সুলতাকে। প্রথম কিছুদিন সে অজয়ের চিঠি পেয়েছিল। অজয়রা যখন শিলঙের সংসার তুলে দিয়ে অন্য দেশে চলে যায় তখন সুলতাকে সে কথা জানাতে ভোলেনি। অজয় তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছিল; কিন্তু সুলতা লিখেছিল সে রুগ্না, বৃদ্ধা মা ও নাবলক ভাইবোনদের একমাত্র আশ্রয়স্থল সে—তার এখন নিজের কথা ভাববারও সময় নাই। তারপরে অজয় কোথায় গিয়েছিল সে খবর সুলতা জানতে পারে নি, জানবার চেষ্টাও করেনি। অন্যান্য সব সুখস্মৃতির সঙ্গে অজয়কেও সে অতীতের গর্ভে বিসর্জন দিয়ে এসেছিল।

সুলতার মা আজ আর ইহলোকে নাই। তাই ভাইবোনদের সকলেরই দূর দেশে বিয়ে বা চাকরি হয়েছে, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখা ছাড়া তাদের কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নাই তার। সুলতারই দোষ। প্রথম প্রথম তার বোনেরা, ভাইরা ও তাদের বৌয়েরা প্রায়ই তাকে ডাকত কিছুদিন গিয়ে তাদের বাড়ীতে থাকবার জন্য। কিন্তু সুলতা কেমন জানি নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছিল, সে কারো বাড়ীতে যেত না। অবশেষে তারাও তাকে প্রায় ভুলে গিয়ে যে যার নিজের সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

সুলতার একঘেঁয়ে জীবনে কোনও গভীর দুঃখ বা সুখের অনুভূতি ছিল না। আজ বহুদিন পরে তার পুরানো জায়গা টন টন করে উঠে জানিয়ে দিল যে ছাত্রী-পড়ানোর-কল রায় বাঘিনীর মধ্যে আগেকার সেই সুলতা রায় আজও বেঁচে রয়েছে।

কিন্তু এত তার দুঃখই বা কিসের? আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সুলতা আবার হাসতে চেষ্টা করল। এখন তো তাকে কারো জন্য কোনও চিন্তা করতে হয় না। রোজকারও সে আজকাল যথেষ্ট করছে। ইচ্ছা করলে সে বেশ আরামেই থাকতে পারে। ঠিক কথাই বলেছে

মঞ্জু অণিমারা, কি এমন তার বয়স হয়েছে যে সে নিজেকে এরকম "বুড়ী" বানিয়ে সব আনন্দ উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ?

সেদিন রাত্রে রায়-বাঘিনী স্বপ্ন দেখল পনের বছর আগেকার সুলতাকে, শিলঙ্ পাহাড়ের গায়ে তাদের ছবির মতন সুন্দর, গোলাপ লতায় ঢাকা ছোট্ট বাড়ীটিকে, আর ঝরণার ধারে কালো পাথরের পাশে তাদের মানস সরোবর।

পরদিন থেকে সুলতার পরিবর্তন দেখে তার ছাত্রীরা আর অন্যান্য টিচারেরা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম সে একটা ভালো কাপড় পরলে বা হেসে কারো সঙ্গে কথা বললে তারা চোখটিপে মুখ চাওয়া-চাওই করত, আড়ালে হাসি ঠাট্টা করতো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা স্বাভাবিকভাবে তাকে নিজেদের দলে টেনে নিল। "মিস রায়" ক্রমে "সুলতাদি"তে পরিণত হল। সুলতার এই পরিবর্তনে সকলের চেয়ে বেশী খুসী হয়েছিল মঞ্জু, অণিমা আর বাসন্তী।

মঞ্জু বলতো "এসো সুলতাদি, তোমার চুলটা আমি বেঁধে দিই। এমন সুন্দর চুল যদি আমার থাকত, তাহ'লে আমি দিনে পাঁচবার পাঁচ রকম করে চুল বাঁধতাম, আর তুমি সে কি ছিরি করে রেখেছ চুলের তার ঠিক নাই !"

সুলতা হেসে বলত "বেশ তো, আমার চুলটাই না হয় পাঁচবার পাঁচ রকম করে বেঁধে দিও।"

স্কুল থেকে এসে অণিমা কোনও দিন বলত "চল সুলতাদি, আজ সিনেমা দেখে আসি, 'চিত্রায়' খুব ভাল ছবি আছে।"

সুলতা তাদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত।

দোকানে গেলে মঞ্জু, অণিমা আর বাসন্তী সুলতাকে চেপে ধরত "এবার তোমাকে একটা রঙীন সাড়ি কিনতে হবে, মিনতিদি যদি রঙীন সাড়ি পরতে পারে, তুমি কেন পরবে না ?"

তাদের অনুরোধে এড়াতে না পেরে সুলতা রঙীন সাড়িই কিনত, সুন্দর সুন্দর জামার কাপড় কিনত।

কিন্তু তবু সুলতা কিছুতেই ঠিক আগের মতন হতে পারত না। তার মনে হত যে সে প্রথম এত বেশী সুখ ও তার পরে এত বেশী দুঃখ পেয়ে নিয়েছে যে কোনও সুখ বা দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করবার শক্তি আর তার নাই। এখন থেকে তার সারা জীবনটাই হবে একঘেঁয়ে, অনুভূতি হীন। তবু সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে, হাসতে, গল্প করতে।

ইষ্টারের ছুটির আগে কমন রুমে বসে মঞ্জু একদিন বলল "এসো, এবার ছুটিতে একটা নতুন কিছু করা যাক।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠিল "কি করা যায় ?"

মঞ্জু বলল "ঈষ্টারের সঙ্গে মহরম আর নববর্ষ জুড়ে লম্বা ছুটি পাওয়া গেছে—চল দল বেঁধে কোথাও ঘুরে আসা যাক।"

"কোথায় যাবে ?"

কেউ বলল "শান্তিনিকেতন," কেউ বলল "রাজগির," কেউ বা বলল "মধুপুরে চল বেশ জায়গা।"

সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহ প্রকাশ করল সুলতা, সে বলল "চল শিলঙ্ ঘুরে আসি, বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি শিলঙ্ কাটিয়েছি, কিন্তু তার পরে আর যাই নি কখনও।"

সকলে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে, এর আগে কেউ কোনওদিন নিজের অতীত জীবনের বিষয়ে তাকে একটি কথাও বলতে শোনে নি।

অণিমা জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু, শিলঙে কোথায় গিয়ে উঠব আমরা ? তাছাড়া অনেক খরচ পড়বে না ?"

"তোমরা অন্য যে সব জায়গার নাম করছ সেগুলোর তুলনায় শিলং যাবার রেল ভাড়াটা অনেক বেশী পড়বে বৈ কি, তেমনি কেমন সুন্দর একটা নতুন দেশ দেখা হবে বলতো ? থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না ! আমার পরিচিত একজনদের হোটেলে আমি অল্পখরচেই বেশ ভাল ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তোমরা সত্যি যদি যাবে তো চল, আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল যে সুলতা, বাসন্তী অণিমা আর মঞ্জু, এই কদিনের ছুটীতে শিলঙ্ বেড়িয়ে আসবে।

হেড মিস্ট্রেসের অনুমতি নিয়ে তারা ছুটি হবার আগের দিনই কতকগুলো ক্লাস কামাই করে শিলঙ্ মেলে গিয়ে চড়ে বসল। একঘেয়ে রুটিন বাঁধা জীবনযাত্রা থেকে বেরোবার আনন্দে ছেলেমানুষ টিচার তিনটি গল্পে, গানে, হাসিতে সমস্ত গাড়িটা ভরিয়ে তুলিছিল, আর সঙ্গের ফুর্তির ছোঁয়াচ লেগে সুলতাও যেন আবার ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন ভোর না হতেই রেলের লাইনের দু'ধারে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি দেখতে পেয়ে আজন্ম সমতল-ভূমিতে লালিত মঞ্জু, অণিমা আর বাসন্তী আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।
সুলতা বলল "আরে দূর, ও কি পাহাড় নাকি, আগে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে নিই, ওপারে মোটরের রাস্তায় অনেক সুন্দর পাহাড় পাবে।" তারা বলে উঠল "ওই বুঝি ব্রহ্মপুত্র দেখা যাচ্ছে।"

"ওমা, ওই যে, ওধারে নিশ্চয় কামাখ্যার পাহাড়।"

"ওঠো, নামো শিগ্গির—কুলি কুলি !"

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দিয়ে তারা ট্রেণ থেকে নেমে ষ্টিমারে ও ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ষ্টিমার থেকে নেমে মোটর বাস্‌এ চড়ে বসল।

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে মোটরের রাস্তা চলেছে। যতই উঁচুতে তারা উঠতে থাকে রাস্তা ততই সুন্দর হয় ! সুলতার সঙ্গিনী তিনটির হাসি আর উচ্ছ্বাসের বিরাম নাই—দেখ দেখ,

"ওই পাহাড়ি মেয়েগুলোর পোষাক কিরকম মজার!"

"বাঃ, ভারি সুন্দর তো ফার্ণগুলি।"

আরে, কত পাইন গাছ দেখ, নীচে তো এগুলিকে দেখিনি!" সুলতা বলে "কিন্তু শিলঙে পৌঁছে দেখতে পাবে সবই পাইন গাছ, অন্য গাছের সংখ্যা খুব কম।"

তার সঙ্গিনীরা অবাক হয়ে শোনে।

ক্রমে শিলঙে এসে তারা পৌঁছে গেল, সুলতা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে পরিচিত হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল. সে দেখল যে শিলঙে অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে, রাস্তা হয়েছে—অনেক বড় হয়েছে সহরটা। কিন্তু নিজের মনের চির সমুজ্জ্বল স্মৃতির সঙ্গে তুলনা করে তার মনে হল যে শিলঙের আকাশ-বাতাস-পাহাড়ঝরণার কিছুই আর আগের মতন সুন্দর নাই।

রোজ দু'বেলা সুলতা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের লেক দেখায় ঘোরদৌড়ের আর গল্‌ফ মেলার মাঠ দেখায়, বড় বড় জলপ্রপাত দেখতে নিয়ে যায়। কিন্তু বহু-পরিচিত একটি ছোট ঝরণার কাছে পাহাড়ে রাস্তায় যেতে কিছুতেই তার মন সরে না। সে জানে যে সেখানকার সে গোলাপফুলে ঘেরা ছোট বাড়িটি নিশ্চয় ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা বাড়ি দেখতে যেতে তার ভয় করে পাছে তাতে তার মনে যে পরিস্কার ছবি আঁকা আছে সেটা বিন্দুমাত্রও ঝাপসা হয়ে যায়।

সন্ধ্যা বেলায় সুলতা বসে বসে মঞ্জু অণিমা বাসন্তীর কাছে তার ছোট বেলাকার গল্প বলে। মঞ্জু বলে "তোমাদের বাড়ি তো দেখালে না সুলতাদি। কোনদিকে থাকতে তোমরা? চলনা একদিন সেইদিকে বেড়াতে যাই।" কিন্তু সুলতা রোজই সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, বলে "দূর পাগলী, যে কত বছর আগেকার কথা, যে সব বাড়ির আজকাল কোনও চিহ্নও নাই।"

কলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন কোনও একটা ছুতো করে মঞ্জু অণিমা বাসন্তীদের অন্য দিকে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে দিয়ে সুলতা কম্পিত বক্ষে একটা খাড়া লাল মাটির পাহাড়ে রাস্তা বেয়ে উঠে চলল। পাইনবনের মাঝখানে. ফুলবাগানে ঘেরা, গোলাপলতায় ঢাকা সেই ছোট্ট বাড়িটা আর ছিল না. কিন্তু তার আশেপাশে অনেক নতুন বাড়ি তৈরী হয়েছিল। সুলতা একটি বারও না থেমে পরিচিত ঝরণাটার ধার দিয়ে পাথর বেয়ে উঠে চলল সেখানে ঘন পাইন বনের মধ্যে তখনও মানুষের বসতি হয়নি। বহুদিন অনভ্যাসের পরে একটানা এতক্ষণ পাহাড়ে উঠে সে হাঁপিয়ে পড়েছিল। তার স্বপ্নের মতন মনে পড়ে গেল পনর বছর আগেকার তরুণী সুলতা কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে এই পথ দিয়ে উঠে "মানস সরোবরের" ধারে যেত।

ঝরনার চঞ্চল জল যেখানে একটা বড় কালো পাথরের আড়ালে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে এসে সুলতার মনে হল যে সে স্বপ্ন দেখছে—সেই পনের বছর আগেকার স্বপ্ন, যে স্বপ্ন আজকাল সে প্রায় রোজই দেখে। সমস্ত শিলঙ্ শহরটার এই পনের বছরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে, ঘন পাইন বনের ছায়ায় এই ছোট্ট

ঝরণার জলে তৈরী খেলবার "মানস সরোবর"টি ঠিক পনের বছর আগেকার মতনই ছিল। আর তার ধারে, সুলতার দিকে পিঠ করে, গালে হাত দিয়ে বসেছিল একটি ছেলে, পনের বছর আগে যে সত্যিই ওখানে ওরকম ভাবে বসে থাকতো, কিন্তু এখন সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েছিল। সুলতা ভাল করে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখল যে সেই ছেলেটি তখনও সেখানে বসে আছে, তেমনিভাবে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বসবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত সুলতার কাছে চিরপরিচিত। তবে কি এইটাই সত্যি ? আর তার পনের বছরে যা যা ঘটেছে, অথবা যা যা ঘটেছে বলে সুলতা মনে করেছে, সে সবই একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন ?

সুলতা দু-এক-পা এগিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দে ছেলেটি চমকে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবার পরে সে বলে উঠল "সুলতা তুমি এখানে ?

পনের বছর আগেকার একটি তরুণ ছেলের পরিবর্ত্তে এই পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে সুলতা দেখবা মাত্র চিনতে পারল।

হেসে সে বলল "আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ অজয় ? হবারই কথা। আমিও তোমাকে এখানে দেখে প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি বা দিবাস্বপ্ন দেখছি।"

"কি আশ্চর্য্য, গত পাঁচ বছর আমি শিলঙে, তোমাকে তো আর কোনও দিন দেখতে পাইনি।"

তারা দুজনে সেই কালো পাথরটার ওপরে বসল। অজয় সুলতার মুখে শুনল তার বাবা মা ভাই বোনের কথা। সুলতাও অজয়ের কাছে তার বাবা মা ভাইবোনের সব খবরই পেল। তারপরে দুজনেই একটু অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে গেল, কি বলবে ভেবে না পেয়ে।

অজয়ই প্রথমে কথা আরম্ভ করল "মনে আছে সুলতা, এই ঝরনার নাম আমরা দিয়েছিলাম মানস সরোবর ?"

"মনে নেই ? কত খেলা করেছি, গল্প করেছি এখানে। আমরা কল্পনা করতাম যে এর ধারে এলেই আমাদের মনের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে।"

"আজ কিন্তু মনে হচ্ছে যে আমাদের সেই কল্পনাটাই সত্যি। জানো সুলতা, আজ পাঁচবছর আমি শিলঙে আছি, কিন্তু আর একদিনও মানস সরোবরের ধারে আসিনি, কারণ পুরাণো দিনগুলির কথা মনে করে বড্ড খারাপ লাগত। আজকে কি জানি কেন এখানে এসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম, আর কোথা থেকে হঠাৎ কোন্ মন্ত্রের বলে তুমি নিজেই এসে উপস্থিত হলে বল তো ? আজকে মনে হচ্ছে যে মানস সরোবরের ধারে সত্যিই আসার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

সুলতার মনে হল যে শিলঙের আকাশ আবার পনের বছর আগেকার মতন ঘন নীল হয়ে উঠেছে, পাইনের পাতাগুলি হয়েছে তেমনি গাঢ় সবুজ, আর কালো পাথরের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট ঝরণাটি বয়ে চলেছে সেটা গত পনের বছরের মধ্যে কোনও দিন আজকের মতন মিষ্টি কুলুকুলু গান করেনি।

বাঘের গল্প।

"পরশুদিন একটা বড় ভারি ঘটনা ঘটে গেছে ; একটা বাঘ—"

"বাঘ !"

"হ্যাঁ, বাঘ, কালো ডোরাওয়ালা হলদেরঙের বাঘ। একটা বাঘ একেবারে আশুতোষ বিল্ডিংসের—"

"আশুতোষ বিল্ডিংস্ ? কলকাতা !!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কলকাতা, –কলকাতায় বাঘ থাকতে পারেনা ? দুদিন আগে এখানে সুন্দর বন ছিল, দক্ষিণ রায়ের রাজধানী ; আজও চিড়িয়াখানায় হাজার হাজার বাঘ রয়েছে।"

"কিন্তু আশু "

"দেখ, যদি বারেবারে বাধা দাও তো বলতে পারবো না। বিশ্বাস হয় তো চুপ করে শোন, না হয়, গোলমাল করোনা উঠে যাও।"

"আচ্ছা, আর কথা বলবনা—তুমি গল্প বল।"

"তবে শোনো, একটা বাঘ তো একেবারে দোতালায় উঠে এসেছে। তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট, ঘণ্টা পড়তে বাকি বেশী নেই, এখনই সব ক্লাস থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসবে ; যারা করিডরে করিডরে ধন্না দিয়ে মেয়েদের কুষ্ঠী কেটে বেড়ায়, তারা সবে এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, সবচেয়ে ভালো জায়গাগুলির আশেপাশে একটু চাঞ্চল্যের ভাব।

"যে মোটা বেঁটে ছেলেটি হকিষ্টিক হাতে নিয়ে কমনরুমের দরজার ঠিক সম্মুখে দাঁড়িয়ে, ষ্টিকটা ও হাতটা ঠিক কি ভাবে বিন্যস্ত করলে দুটোর গৌরবই চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পাবে তারই গবেষণায় ব্যস্ত ছিল, তার মুখটা খুলে গেল, অনেক চেষ্টায় একবার সে মুখ বুজল, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাঁ-টা বৃহত্তর হয়ে উঠল—সে ছুটে পালাল। যে ছেলেটি বড় কলারওয়ালা, গলাখোলা সার্টের কলার মুখের একদিকে ও খাতার কোন অপরদিকে কামড়ে ঘুরছিল, আচমকা তার সার্টের কলার অনেকখানি ছিঁড়ে গেল, খাতাটা যে ছিটকে কোথায় গেল তার অনুসন্ধান করার প্রয়োজন সে বোধ করলনা। একটি ছেলে অতি বিরক্তবদনে বাইরনিরীতির ভ্রূকুটি টেনে বর্মা চুরুট খাচ্ছিল, আধখাওয়া চুরুটটা সে হঠাৎ গিলে ফেল্ল। বেয়ারা টুলে বসে ঢুলছিল, সে চোখ চেয়েই তার ছোট টুলটির তলায় ঢুকবার ব্যর্থ চেষ্টায় এত রকমের অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল যে কোন সার্কাসের মালিক সেখানে উপস্থিত থাকলে 'হাড়হীন মানুষ' সাজবার জন্য বেশী মাইনের চাকরি তার নিশ্চয়ই জুটত।

"বাঘটা কমনরুমের দরজায় একটুখানি মাথা গলাল ; কিন্তু তার ভেতর থেকে 'চিঁ চিঁ' 'প্যাঁ প্যাঁ' 'ক্যাঁ ক্যাঁ' প্রভৃতি নানা রকমের অতিলৌকিক শব্দ আসতে তৎক্ষণাৎ সে মাথাটা বার করে

নিতে বাধ্য হল, শব্দ কিন্তু থামলনা, সরু গলায় প্রথমে 'বেয়ারা, বেয়ারা' ও তারপর পুলিশ, পুলিশ বলে চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

"যে সব মেয়েরা বাইরে ছিল, সবচেয়ে কাছের ক্লাসটিতে ঢুকে তারা খিল বন্ধ করে দিল; ততক্ষণে কাছাকাছি সব ঘরগুলির দরজাতেই ভিতর থেকে খিল পড়েছে, ওপরের ফ্যান্‌লাইট দিয়ে দু'একটি অসমসাহসিকের মাথা মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে আবার আড়াল হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে একটা বিষম হৈ চৈ।

"এই সময়ে কাদের একজন চাপকান পরা বেয়ারা কমনরুমের সামনে এসে ডাকল 'আঃ চুক চুক, চুক—জলি, জলি।'—বাঘটা এতক্ষণ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে একলাফে এগিয়ে এসে তার হাত চাটতে লাগল। বেয়ারা তার গলায় চেনকলার এঁটে দিল।

"ইংরাজি ক্লাসের উজ্জ্বল তারকা মিস স্বরীটা ডাট্ তখন ক্লাস থেকে আসছিলেন, ব্যাপার দেখে দৌড়ে এসে বাঘের ভিজে নাকের ডগাটিতে একটি চুমু খেয়ে বল্লেন "ও নটি, নটি, নটি ডার্লিং।" —ডার্লিঙের ল্যাজটি ততক্ষণে দ্রুত সঞ্চালনের ফলে খসে যাবার উপক্রম করেছে।"

"কি যে বল, এমনি করে কেউ কখন বাঘ পোষে?"

"বাঘ নয় রে, বাঘ নয়, চীনে বোর-হাউণ্ড, বাঘের দাদা।"

"যাই বল, আমার বিশ্বাস হ'লনা"

"ওই তো আজকালকার মেয়েদের দোষ—কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই।"

মুখোস।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

(২)

মধ্যপাড়ার জীবন চন্দ্র রায় সম্পন্ন গৃহস্থ। দেশে পাকা বাড়ী, পুষ্করিণী, আমবাগান ও চলনসই জমিদারী ছিল। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতিবর্গের উপর ঐ সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া বিবাহের পর রাজদরবারে মোটা মাহিয়ানার চাকুরী লইয়া তিনি লক্ষৌতে থাকিতেন।

তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র অলক বর্ত্তমানে কলিকাতার বাসা বাড়ীতে থাকিয়া এম্, এস্‌সি পড়িতেছে। কন্যা নীরাও বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি সন্তান ব্যতীত ইঁহাদের অন্য কোন সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই সুতরাং সন্তান দুইটি রায় দম্পতির বড় আদরের:

অলক আর নীরাও পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু তাহাদের ঝগড়া ঝাটি, খুন্‌সুটিরও অভাব ছিলনা। ভালবাসিয়া সুশীল বালক বালিকার মত মিলিয়া মিলিয়া থাকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র

বিষয় নিয়া কলহ, তাই নিয়া মায়ের কাছে অভিযোগ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আড়ি করিয়া কথা বন্ধ করাতেই তাহাদের আনন্দ ছিল বেশী। রায়গৃহিণী মোহিনী বলিতেন "লোকের একঘর ভাইবোন থাকে, তারা কি করে বল্‌তো ? তোদের দুটির জ্বালাতেই তো বাড়ীর ছাদে কাক চিল বস্‌তে পায় না।".

নীরা চেঁচাইয়া বলিত, "আমি কত কষ্ট করে আমের আচার করেছি, তোমার রাক্ষুসে ছেলে খাবে কেন ?"

মোহিনী হাসিয়া বলিতেন "আচার কার জন্য করেছিস শুনি, 'দাদা আম ভালবাসে, দাদার জন্য আচার কোরব,' এই ব'লে তো আম এনে আচার করেছিল্। যার জন্য করেছিস্ সে-ই যদি খেয়ে থাকে, এত ঝগড়া কিসের ?"

ধরা পড়িয়া নীরা আরো চটিয়া যায় "ব'য়ে গেছে ওর জন্য আমার আচার কোর্‌তে। কেন, আমি খেতে জানিনে ?"

অলক আচারের হাত চাটিতে চাটিতে বলে "আ-হা, যে-ওনার আচার হ'য়েছে, কাক্‌কে দিলে পর্য্যন্ত খায়না, তার আবার চোট্ কত ?

ইহার কিছুদিন পরে জীবন বাবুর পেন্‌সন হইয়া গেল। মোহিনী দেবী বলিলেন "চাক্‌রীর মায়ায় তো চিরটাকাল বিদেশে পড়ে রইলে, দেশের বাড়ীঘর জমি জমা কিছুই ভোগে এলনা। ছেলে মেয়েও নিজের দেশ চিন্‌লে না। মেয়েও তো বড় হ'য়ে উঠ্‌লো, এই ছাতুখোরের রাজ্যে থাক্‌লে কি আর পাত্র জুট্‌বে ? এখানকার বাড়ীতে তালা দিয়ে রেখে, চল এবার কিছুদিন দেশে গিয়ে থাকি।"

জীবন বাবু সম্মত হইলেন, নীরাও খুব লাফাইতে লাগিল, গ্রাম্যজীবনসম্বন্ধে পুথিগতবিদ্যা ছাড়া তাহারঅন্য অভিজ্ঞতা ছিলনা, সুতরাং নতুন জীবনের আশায় সে আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠিল।

তখন অলককে চিঠি লেখা হইল, কারণ জীবন বাবুর অফিসের কাজ ছাড়া সাংসারিক অন্য কোন কার্য্যে পারদর্শিতা ছিলনা। সংসার গুছাইয়া লইয়া তাঁহাদিগকে গ্রামে নিয়া পৌছাইবার জন্য অলক কলিকাতা হইতে আসিল।

নীরা বলিল "মিথ্যে কেন মা গ্রামে যাচ্ছ ? তোমার সাহেব ছেলের গ্রাম পোষাবে না।"

মুখ ভ্যাংচাইয়া অলক বলিল "সায়েব ছেলেতো কোলকাতাতেই থাক্‌বে, বিবি মেয়েরই মুস্কিল হবে। সেখানে টকি হাউস নেই ফ্যান্ লাইট্ও নেই, বিবির বিবিয়ানা চল্‌বে কি করে ?"

তাঁহারা দুপুর রাত্রে গিয়া মধ্যপাড়ায় পৌছিলেন, সরকারকে পূর্ব্বেই চিঠি লিখিয়া রাখা হইয়াছিল, সে গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

পরিদিন সকালে উঠিয়াই অলক বলিল আজই সে কলিকাতা চলিয়া যাইবে কারণ মিথ্যা কামাই করিয়া লাভ নাই।

গ্রামের কল্পনায় যত আনন্দ ছিল, বাস্তবে তত আনন্দের কারণ নাই দেখিয়া নীরা কিছু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সেই সমুদয় অসুবিধার অংশ গ্রহণ না করিয়া দাদা আজই কলিকাতায়

চলিয়া যাইবে শুনিয়া নীরা ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিল "উঃ বাবুর পড়ার দিকে যেন কতই মন ! দু'দিন এখানে থাকলে পড়া যেন নাশ হ'য়ে গেল আর কি ? সায়েবের গাঁয়ে মন বস্‌বেনা, সে কথা খুলে বল্‌লেই তো হয়। নীরার এইসব বক্র উক্তি উপেক্ষা করিয়াই অলক চলিয়া গেল।

গ্রামে আসিয়া নীরার যেন দিন কাটেনা। জীবন বাবু বহুদিন পরে স্বাধীন জীবন পাইয়া খুবই আনন্দে আছেন, গ্রামের হাওয়ায় তাঁহার অম্বল, বাতের বেতনাও কম বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহিরের ঘরে দুপুরে রাত্রে বেশ্ একটা দাবা খেলার আড্‌ডা বসিল। মোহিনী দেবী বধূ বয়সেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বহুদিন পরে জ্ঞাতিবর্গের সহিত, নানা প্রকার সম্ভাষণ, আপ্যায়ন মিষ্টভাষণে তাঁহারও দিন ভালই কাটিতে লাগিল। মুস্কিল হইল নীরার, গ্রামে তাহার বয়সী কোনো মেয়েই প্রায় অবিবাহিতা ছিল না, কাজেই সঙ্গী হিসাবে তাহাদের সহিত সে মিশিতে পারিত না।

প্রাতঃকালে তাহাকে একজন শিক্ষক পড়াইয়া যাইতেন, তা' ছাড়া সমস্ত দিন তাহার কোন কাজ ছিলনা। কোনো সময় বাগানে একটু বেড়াইয়া কোনো সময় দিনশেষে গোপাল সহ রাখালের গৃহে প্রত্যাবর্তন দর্শন করিয়া তাহার সময় কাটিত। অবশ্য দাদা যদি কাছে থাকিত এই গ্রাম্য জীবনই তাহার কত আনন্দের হইত। মুখ খুলিয়া একটু ঝগড়া করিয়াও বাঁচিত ! মাগো ! লোকের যে কেন একটা ভাই থাকে !

গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িল। দীর্ঘ তপ্ত দ্বিপ্রহর, আহারান্তে জীবন বাবু ও মোহিনী দেবী একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন। এমন সময় নীরা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া মায়ের গায়ের উপর একখানা চিঠি ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল "নাও তোমার সায়েব ছেলের চিঠি ! তখনই বলেছিলাম পাড়াগাঁয়ে যেওনা, তোমার সায়েব ছেলের সেখানে মন বস্‌বে না।"

জীবন বাবু ও মোহিনীর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল দুজনেই 'কিহয়েছে' বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। "চিঠি পড়েই দেখ" উত্তেজিত হইয়া নীরা বলিল। মোহিনী দেবী চিঠি পড়িয়া বলিলেন অলকের চিঠি এসেছে। তা' এত রাগ কর্‌ছিস্ কেন ? সেতো লিখেছে, ছুটী হ'য়ে গেছে, শীগ্‌গীরই আস্‌বে। তবে কবে আস্‌বে সেটা ঠিক্ ক'রে লেখেনি।

ঝঙ্কার দিয়া নীরা বলিল "তা' লিখ্‌বেন কেন, এসব আমাকে ঠকাবার ফন্দী। কিন্তু এবার আমি কিছুতেই ঠক্‌ছিনে, তুমি দেখে নিও।"

জীবনবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে ঠকাবার ফন্দী কি রকম ?"

রাগ ভুলিয়া উৎসাহিত হইয়া নীরা বলিতে লাগিল "তুমি বুঝি ভুলে গেলে বাবা ? সেই যে একবার গরমের ছুটির সময় এসে ভিখিরি সেজে গান গাইলে ! আমি একদম চিনতে পারিনি, বল্‌লুম চাল নেবে ? ও বল্‌লে না পয়সা চাই। ওর কথা বলার ধরণে আমার বড় রাগ হ'ল, আমি বল্‌লুম পয়সা পাবিনে। অম্‌নি সে 'কি, পয়সা দিবিনে ?' বলে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধর্‌লে।

আমি চীৎকার ক'রে উঠ্লুম, মা ছুটে এসে চিন্তে পেরে হেসে ফেল্লেন। বাব্বা, কী ভয়টাই পেয়েছিলাম।

জীবনবাবু হাসিয়া বলিলেন ' তবে তো তোকে খুব ঠকিয়েছিল।"

"তারপর পূজোর ছুটিতে হকার সেজে এসেছিল, সেবার মা শুদ্ধু চিন্তে পারেননি, না মা ?"

মা বলিলেন "হ্যাঁ, সে এক রগড় ! আমি নীরা কেউ চিন্তে পারিনি। যে সব জিনিষ পূজোয় আমাদের জন্যে কিনে এনেছিল, হকার সেজে এসে গাঁঠ্রি খুলে সেই গুলোই দেখাতে লাগ্ল। বলে 'মাইজি, একটা আচ্ছা ব্রোচ্ আছে নেবে দেখি ব্রোচ্টাতে নাম লেখা আছে নীরা। তবু বুঝিনি। শেষে বল্লে ভাল ছবি আছে নেবে ? বলেই নিজের ছবি বার্ করলে। তখনই চিন্তে পার্লুম হকারটি কে।"

নীরা বলিয়া উঠিল, "এবারেও তেম্নি একটা প্ল্যান্ ঠিক করেছেন, তাই তারিখ লেখা হয়নি। বাব্বা, কি ঠক্ ছেলে তোমার !"

মোহিনী হাসিয়া বলিলে "মেয়েটাই বা কিসে কম যায় ? এখানে এলে তো রাত দিন তার সঙ্গে লাগ্বি, সেই জন্যেই তো সে আসতে চায় না।"

মায়ের কথায় নীরা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, "তোমার ছেলের জন্যে কে পথ চেয়ে আছে শুনি ? না এলে আমার বয়েই গেল।"—বলিয়াই রাগিয়া চলিয়া গেল।

মোহিনী চিন্তিতা হইয়া বলিলেন ' কবে আস্বে ঠিক্ ক'রে না জান্লে আলো নিয়ে ষ্টেশনেই বা লোক যাবে কি করে ?" রাত দুপুরে গাড়ী, তাতে গাঁয়ের পথ দু'মাহল আড়াই মাইল দূরে ষ্টেশন, এমন পথে সে কবে হেঁটেছে ? জীবনে তো কখনো আসেনি, সেবার রাতে আমাদের পৌঁছে দিয়ে ভোরের গাড়ীতেই চলে গেল। অচেনা দুরন্ত পথ একা আস্তে ভারী কষ্ট হবে।"

জীবন বাবু বলিলেন সব কথা খুলে লিখে দাও যে আস্বার সময় ঠিক্ মত না জানালে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে।"

(১০)

তন্দ্রা বড় হইয়া উঠিল। পিতাকে সর্ব্বক্ষণ কাছে না পাইলেও সে আর পূর্ব্বের মত অধীর হইয়া ওঠে না, তাহার শিক্ষার জন্য, তিন চারিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের কাছে সে লেখাপড়া গান ও সেলাই শেখে। তাহাতে তাহার দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়া যায়। তবু পিতার সঙ্গই জগতে তাহার বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে চূণীলাল একটু একটু করিয়া কন্যার সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন। কন্যাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল অন্যত্র থাকাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। বাগান-বাড়ীতে পূর্ব্বের মত আমোদ উৎসব এখন আর হয় না, তন্দ্রা বড় হইয়াছে, তাঁহার এই লজ্জাকর কাহিনী কন্যার কর্ণগোচর হওয়ার আশঙ্কাতে তিনি অনেক সংযত হইয়াছেন। বাগানবাড়ীতে কোনদিন উৎসবে মত্ত থাকিলেও তন্দ্রা অসুস্থ হইয়াছে বা তন্দ্রা তাঁহাকে খুঁজিতেছে শুনিলে তিনি ছুটিয়া চলিয়া আসেন। বন্ধুগণের সমস্ত সতর্কতা ধূলিসাৎ হইয়া যায়, পীড়িতা কন্যার শিয়র হইতে

কেহ তাঁহাকে একটি বারও উঠাইয়া আনিতে পারেনা। কিন্তু কুসঙ্গীগণের কুপরামর্শে কুঅভ্যাস তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না কন্যাকে এড়াইয়া মাঝে মাঝে তিনি সঙ্গীগণের সহিত মিশিয়া কদর্য্য কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। তন্দ্রার পিসীমা কন্যার বিবাহ দিতে দেশে আসিয়াছিলেন, তিন চারি দিনের জন্য তিনি তন্দ্রাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। তন্দ্রা পিতাকেও সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিল, পিতা বলিলেন তিনি বিবাহের দিন গিয়া পৌছিবেন।

এই সময়ে বহুদিন পরে বাগানবাড়ীতে নতুন পৈশাচিক লীলা আরম্ভ হইল। নবীনমুদী মাল আনিতে সহরে গিয়াছিল, সেই সুযোগে জমিদারের লোকজন তাহার অসামান্য সুন্দরী পত্নী পুষ্পকে ধরিয়া বাগানবাড়ীতে লইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। অন্য কক্ষে পানোন্মত্ত বন্ধুগণ অচৈতন্যাবস্থায় মাঝে মাঝে জড়িত স্বরে কি যেন বলিয়া উঠিতেছে। সম্মুখে দুর্দ্দান্ত জমিদার, সুরার মত্ততায় টলমল্ করিতেছেন।

পুষ্প ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "আমাকে বাড়ী যেতে দিন, আমার স্বামী এসে আমাকে খুঁজবেন।"

জড়িত স্বরে চূণীলাল বলিলেন "তোমার স্বামী একজন মুদী, আমি গ্রামের জমিদার, আমাকে তোমার পছন্দ হ'চ্ছেনা?" বলিয়াই সেই ভীতিবিহ্বলা নারীর হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলেন। পুষ্পের শুষ্ক কণ্ঠ হইতে একটা ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ অন্ধকার রজনীর বুক চিরিয়া উর্দ্ধে উঠিল।

বাগান বাড়ীর সম্মুখের পথ ধরিয়া, একহাতে একটা সুট্‌কেস, ও আরেক হাতে একটা বিকট মুখোস্ হাতে নিয়া অলক ষ্টেশন হইতে বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। নিজের মনে চিন্তা করিয়া নিজের মনেই সে হাসিতেছিল—"নীরিটা হল্‌ঘরটার জানালার কাছে নিশ্চয়ই শোয়—হাঁা, সেদিন লিখেছিল শুয়ে শুয়ে গাছ পালার মাথা নাড়া দেখি। হলঘরটা ছাড়া অন্য কোন ঘরে অত মাথা নাড়া দেখা যাবে না। মুখোস্‌টা পরে জানালার সম্মুখে গিয়ে মোটা গলায় ডাক্‌ব 'নিরি!' উঃ—কী চম্‌কানোই চম্‌কাবে!" মুখোস্‌টা কিনিয়া কলিকাতার বাসায় আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বহুবার সে দেখিয়াছে, এখন যদিও নিজে দেখিতে পাইবেনা, তবু মুখোস্‌টা মুখে আঁটিয়াই তৃপ্তিলাভ করিল। তাহার যেন আর দেরি সহিতেছে না।

এমন সময় পুষ্পের আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া সে কান খাড়া করিল।

ঘরের ভিতরে পুষ্প প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া অলক ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। সমস্ত ঘরে শূন্য মদের বোতল গড়াগড়ি করিতেছে, মদের তীব্র গন্ধে ও স্থানের বীভৎসতায় সে যেন ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ব্যাপার বুঝিতে তাহার দেরী লাগিল না, মেয়েটীর ভয়কাতর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বিমূঢ়তা দূর হইয়া গেল, বলিল "কি হয়েছে আপনার? বলুন, কোনো ভয় নেই।"

বিকট মুখোস্‌পরা অলককে ঘরে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া নতুন বিপদের আশঙ্কায় পুষ্প অধিকতর শঙ্কিতা হইয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই অলকের আশ্বাস বাণী তাহাকে সাহসী করিয়া তুলিল। বলিল "মন্দ উদ্দেশ্যে এরা আমাকে ঘর থেকে ধ'রে এনেছে।"

চুণীলাল অলককে দেখিয়া রুখিয়া বলিলেন "কি সাহসে তুমি জানালা দিয়ে ঘরে এলে ?"

অলক বলিল "আমার বিচার পরে হবে, কিন্তু আপনার এ কী ব্যবহার ?"

"আমার কাজের কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব ?" বলিয়া চুণীলাল ঘুষি বাগাইয়া আসিলেন "বেরোও, আমার ঘর থেকে বেরোও, নয়তো তোমাকে খুন কোর্‌ব।"

অলক দৃঢ় স্বরে বলিল "এঁকে না নিয়ে এক পা-ও নড়্‌ব না।"

"তবে মর" বলিয়া উত্তেজিত চুণীলাল গৃহপার্শ্বস্থ আল্‌মারী হইতে রিভল্‌ভার বাহির করিয়া আনিলেন। অলক ও পুষ্প উভয়েই চমকিত হইয়া চাহিল, চুণীলাল অলককে লক্ষ্য করিয়া রিভল্‌ভার বাগাইয়া ধরিলেন।

ক্ষিপ্র হস্তে অলক রিভল্‌ভার সহ চুণীলালের হাত চাপিয়া ধরিল, তু'জনের মধ্যে বেশ্‌ একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইল, ব্যাপার দেখিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া পুষ্প মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

চুণীলাল অলককে গুলি করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, অলকও প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অলক দেখিল লোকটা আসুরিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আসুরিক শক্তিও লাভ করিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে অলক নিজের জীবন বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল, এইরূপ একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সে হঠাৎ রিভলভারের মুখটা একটু ঘুরাইয়া দিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ চুণীলালের আহত দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, অলক দেখিল গুলি বক্ষ ভেদ করিয়াছে, রক্তে বক্ষতল ভাসিয়া যাইতেছে। আহতের কণ্ঠ হইতে বার তুই গোঁ গোঁ শব্দ উত্থিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কপালের ঘাম মুছিয়া অস্ফুটস্বরে অলক বলিল "একজনের এ দশা হতই, উপায় ছিলনা।"

রিভল্‌ভারের শব্দে পুষ্পের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, চোখ্‌ চাহিয়া উঠিয়া বসিতেই ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া অলক বলিল "চেঁচাবেন না, অনেক বিপদে পড়তে হবে। চলুন এখান থেকে পালাই।" বলিয়াই পুষ্পের অবশ দেহকে তুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সে জানালা দিয়া বাহিরে নামাইয়া দিয়া নিজেও লাফাইয়া পড়িল। পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর পথ চিন্‌তে পারবেন ? চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। এখানে থাক্‌লে অনেক কুৎসা রটনা হবে বিপদও কম নয়।"

অলক একহাতে সুটকেস্‌ ও অন্য হাতে বিবশা পুষ্পকে ধরিয়া মুখোস্‌ মুখেই অগ্রসর হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

রন্ধন।

ভাপা বরফি

শ্রীহরিপ্রিয়া দাশ

উপকরণঃ- তিন ভাগ ছানা, একভাগ শুক্‌নো ক্ষীর, পরিমাণ মত চিনি, বাদাম পেস্তা ও গোলাপী আতর।

প্রণালীঃ—প্রথমে ছানা এবং ক্ষীরকে শীল নোড়া বা চাকি বেলুনে বাটিয়া লইবেন। তারপর ছানা ও ক্ষীরকে একসঙ্গে চট্‌কাইয়া, পরিমাণ মত চিনি ও সামান্য একটু গোলাপী আতর দিয়া মাখিয়া একটী কাঁধা উঁচু থালাতে রাখুন। হাত দিয়া চাপিয়া বেশ প্লেন করিয়া দেবেন। তাহার উপর বাদাম পেস্তা কুচাইয়া দেবেন এবং এক চামচ চিনি ছিটাইয়া দেবেন। তারপর একটী হাঁড়ি কিংবা ডেকচি জলে অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া উনুনে বসাইবেন। সেই হাঁড়ির মুখে সন্দেশের থালাটি বসাইয়া আর একটী থালা দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিবেন। সন্দেশের থালাটী যত বড় হইবে হাঁড়ির মুখটাও তত বড় হওয়া চাই। কারণ ফুটন্ত জলের ভাপটা যেন থালার পিছনে সব জায়গায় লাগে। মিনিট ১০ কুড়ি পরে ঢাকা খুলিয়া যখন দেখিবেন যে উপরের চিনি গলিয়া গিয়াছে এবং চক্ চক্ করিতেছে তখন নামাইবেন। পরে ঠাণ্ডা হইলে বরফি আকারে কাটিয়া লইবেন।

কেহ ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধেক ছানা ও অর্দ্ধেক ক্ষীর দিতে পারেন তাহাতে বর্‌ফি একটু নরম হয়।

পটলের দোল্‌মা

শ্রীপ্রতিমা দাশ

উপকরণঃ--পটল, গরম-মসলা ধনে, জিরে, গোলমরিচ, আদা, পোনামাছ, হলুদ, লবণ, চিনি, দধি, ঘৃত ও ময়দা।

প্রণালীঃ—প্রথমে পটলগুলি খোলা ছাড়াইয়া ভাল করিয়া ধুইয়া একদিক ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলুন এবং তাহার ভিতর হইতে বীচিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবেন। তারপর ঐগুলি (পটল) ঘৃতে ভাজিয়া আলাদা তুলিয়া রাখুন। মাছটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আধভাজা করিয়া কাঁটাগুলি বাহির করিয়া ফেলুন। ধনে, জিরে, আর গোলমরিচ ভাজিয়া, গরম-মসলা গুঁড়াইয়া এবং ইহাতে পরিমাণ মত লবণ দিয়া চট্‌কাইয়া পটলের ভিতর পুরিয়া দিন তাহার পর ময়দা দিয়া কাটা মুখ বন্ধ করিয়া দিন। একটী কড়া আগুনে বসাইয়া উহাতে খানিকটা ঘৃত, গোটা এলাচ,

লবঙ্গ, দারুচিনি এবং তেজপাতা এবং পটলগুলি ছাড়িয়া দিন। একটী বাটীতে খানিকটা আদাবাটা কাঁচা ধনে, জিরে, গোলমরিচ এবং হলুদ বাটা জল দিয়া গুলিয়া উহাতে ফেলিয়া দিন, পরিমাণ মত লবণ এবং চিনি দিন। দু, তিন মিনিট পরে খানিকটা দই ফেলিয়া দিন। তারপর একটু কাই কাই থাকিতে নামাইয়া ফেলুন।

আমাদের বাড়ী।

বড়লোক বন্ধুর বাড়ী নেমতন্ন খেয়ে এসে হয়ত মাঝে মাঝে আমাদের মনে একটা অসন্তোষের ভাব জাগে। নিজেদের ছোট ঘরগুলি দেখে হয়ত বেশী ছোট, বেশী অন্ধকার বলে মনে হয়। হয়ত বন্ধুর আয়নার টেবিল, পড়বার টেবিল, কাপড়ের আলমারি, বইয়ের আলমারি দেখে মনে হয়,—আমার যদি এরকম থাকত।

টাকা দিয়ে বন্ধু যা কিনতে পারে, আমি তা কিনতে পারব না সত্যি, কিন্তু আমার ঘরে এমন একটা কিছু থাকতে পারে যা আমার বন্ধু হাজার হাজার টাকা দিয়েও কিনতে পারবে না। সেটি আমার "আমি"। মানুষের ব্যক্তিত্ব যেমন তার চেহারা থেকে, তেমনি তার ঘরবাড়ী থেকেও ফুটে বেরোয়।

আমাদের বাঙালীদের একটা মস্ত দোষ এই যে আমরা ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা বুঝি না। ইংরেজেরা তাদের বাড়ীর সামনে ফুলের টব সাজিয়ে রাখে, আমাদের বাড়ীর সামনে ঝোলে ছেঁড়া নেতা; ওদের ঘরদোর, আসবাবপত্র ওরা ধুয়েমুছে, পালিশ করে, চকচকে করে রাখে, আর আমাদের হয়ত দরজার কোণে ঝুল, জানলার তাকে আর দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ভাঙা টিন আর শিশি, হয়ত বা বিছানার আধময়লা চাদর থেকে বিশেষ একটী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এইসব কারণেই, যখন বড়লোক বন্ধু আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে তখন তার সাজান বসবার ঘরের কথা ভেবে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

গরীব বলেই যে দুঃখী হতে হবে তার কোন মানে নেই। গরীবের ঘরও সাজিয়ে রাখার গুণে সুন্দর হতে পারে। ঘর সুন্দর করার প্রথম সোপান ঘর পরিষ্কার করা। আমার ঘরটি যদি ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করতে থাকে, যদি প্রত্যেকটি জিনিষ যথাস্থানে রাখা থাকে তাহলে মনে হবে যেন আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে গিয়েছে। একজন গৃহিণীর কথা জানি, যাঁর পরিচ্ছন্নতার সখ এত বেশী ছিল যে তিনি জলের কলের পেতলের মুখগুলিকে পর্য্যন্ত মেজেঘষে চক্‌চকে করে রাখতেন।

থাকতে হবে, কেননা ঘোর রঙের দেওয়াল দেখতে ভাল লাগে না। পর্দার রঙ তখন ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। যে ঘরের দেওয়াল নীল তাতে নীল পর্দা সবুজ দেওয়াল হলে সবুজ পর্দা, ঘি-রঙের দেওয়াল হলে কমলা বা লাল রঙের পর্দা দেওয়া যায়।

ঘরের আসবাবের পালিশ খারাপ হয়ে গেলে সামান্য খরচেই আবার করিয়ে নেওয়া যায়, তবে একথা মনে রাখতে হবে যে পালিশ করা জিনিষ নিত্য পরিষ্কার না রাখলে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য নানারকমের পালিশ কিনতে পাওয়া যায়, তবে তার্পিণ তেল দিয়ে ঘষে চক্‌চকে রাখাই সস্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। আসবাব কোরা কাঠের হলে দরজা জানলার রং কিনে লাগিয়ে নেওয়া যায়, তবে এমন রং বাছতে হবে যার সঙ্গে ঘরের দেওয়াল ইত্যাদির মিল আছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জানালাগুলিও রং করে নেওয়া যায়। এই রং করবার জন্য মিস্ত্রী ডাকবার দরকার নেই, একটা ভাল মোটা তুলি জোগাড় করে নিতে পারলে নিজেই করে নেওয়া যায়।

বাড়ীতে খোলা ছাত বা বারন্দা থাকলে সেটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে বসবার জায়গা করা যেতে পারে। মাটির টব, হাঁড়ি, ফিনাইল বা কেরোসিনের টিনে গাছ লাগিয়ে জায়গাটীতে বেশ বাগান করা যায়। অল্প খরচে গাছের আধারগুলিকে রং করিয়ে নিতে পারলে সুন্দর দেখায়। এরকম বাগানে অবিশ্যি খুব ভাল গাছ হবে না, তবে মরশুমি ফুল বেশ ফুটবে। বর্ষার ফুলের মধ্যে জিনিয়া, দোপাটি, আর শীতের ফুলের মধ্যে মোরগঝুঁটি সূর্যমুখী, কসমস, গাঁদা খুব সহজে হয়; দেশী ফুলের মধ্যে সবজয়া, নয়নতারা, অপরাজিতা, বেল, রজনীগন্ধা তো আছেই। অনেক জাতের গোলাপ গাছ টবে বেশ ভাল ফুল দেয়; পাতা বাহারের গাছ লাগালেও বেশ সুন্দর দেখায়। ফুল ফুটলে শুধু যে ছাত বা বারান্দার শোভা তা নয়, ফুল তুলে ঘরও সাজান যায়।

জায়গা বেশী থাকলে মাঝে মাঝে দু'চারটা কাজের গাছও লাগান যায়, যেমন বেগুন, টোমেটো, লঙ্কা ইত্যাদি। অনেকে কলসীতে লাউকুমড়ো লাগান, তাতে যদিও ফল ফলবে না তবু ডাঁটা শাক খাওয়া চলবে। এ ছাড়া সুলফ, ধনে, পুদিনাও বেশ সহজে করা যায়।

সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকলে মানুষের মনের আনন্দ বাড়ে, জীবন পূর্ণতা পায়। ভাল জিনিষ সকলেই ভালবাসে, কিন্তু অল্পের মধ্যে ক'জন ভালভাবে থাকতে পারে? যারা পারে, তাদের মনের শান্তি ও সন্তোষ সবারই কামনীয়। ভাঙা ঘরেও যদি নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তবে তাতেই লক্ষ্মীশ্রী ফুটে ওঠে।

প্রবাসী বাঙালী।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার

আমি সাহিত্যিক নহি; সাহিত্য-রসিক বলিয়াও স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। সাংবাদিকের গৌরবও আমার প্রাপ্য নহে। সামান্য সংবাদপত্রসেবীরূপে পরের কথা অপরকে শোনাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করি মাত্র, তাহা লইয়া সাহিত্য সভায় মোড়লী করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি আসিয়াছি প্রবাসী বাঙালীর, আপনাদের নিতান্ত আপনারজন যাঁহারা দূরে, বহুদূরে অথবা নিকটে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, আপনাদের সুখদুঃখের কথা ভাবিয়া যাঁহারা আনন্দিত ব্যথিত হইয়া ওঠেন, আপনাদের সহিত একাত্ম বোধ করিয়া যাঁহারা উৎফুল্ল হ'ন, তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব লইয়া। অবশ্য এই প্রতিনিধিত্ব আমার স্বয়ং সৃষ্ট এবং আমি স্বয়ং নির্ব্বাচিত। কিন্তু আবাল্য প্রবাসী বাঙালীদের আনন্দ বেদনার সহিত পরিচিত থাকিবার প্রচেষ্টার জন্য এ প্রতিনিধিত্বে হয়ত আমার দাবী আছে।

আমার নিজস্ব বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই। একই কথা বহুবার বলিয়াছি; নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অভাবে হয়ত সে কথা কাহাকেও বোঝাইতে বা অল্প কয়েকজনকেও শোনাইতে পারি নাই; সেইজন্য সেই কথাই বারবার বলিয়া যাইব।

প্রবাসী বাঙালী আমরা বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া গর্ব্ব করি। কিন্তু সেই ভিত্তিতে আজ আঘাত পড়িয়াছে। তাহার কারণ বহুবিধ। বাংলা দেশেই আজ বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন। এ সম্বন্ধে আপনারা চিন্তা করিতেছেন ও করিবেন—কিন্তু ইহার উপর আমাদেরও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলিয়া এ চিন্তা আমাদেরও স্পর্শ করিয়াছে।

আমাদের নিজেদের দিক দিয়া সমস্যাটি দ্বিবিধ। মাতৃভূমির সহিত আমাদের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন—সাময়িক পত্রের সাহায্যে ভাষার সংযোগ এখনও আছে—প্রবাসী বাঙালী নেতৃবৃন্দ যাঁহাদের উপর আমাদের সাংস্কৃতিক (এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ভার ন্যস্ত তাঁহারা নিজেরাই ত্রিশঙ্কু হইয়া পড়িয়াছেন; বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই—ক্রমবর্দ্ধমান জীবনতত্ত্বে তাঁহারা খেই হারাইয়া ফেলিতেছেন বলিয়া প্রবাসের সহিতও তাঁহাদের যোগসূত্র নাই।

এই আভ্যন্তরিক শক্তিহীনতার সহিত বাহিরের আক্রমণ আমাদের ক্রমশঃ পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। বাংলা ভাষার সহিত হিন্দি উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার প্রতিযোগিতা, আমাদের সরকারী বেসরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরতা অথচ সরকারের এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব, অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বচ্ছলতা, আমাদের সামাজিকতার

অভাব, এইরূপ অনেক কিছুই মিলিয়া মিশিয়া প্রবাসী বাঙালীত্ব বেশীদিন বজায় রাখিতে দিবে কিনা সন্দেহ।

স্বদেশবাসী তথা প্রবাসী বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে যদি এই ছেদ সত্যসত্যই পড়ে তাহা হইলে আশঙ্কার কথা। এবং দুঃখের কথা ইহাই যে বাংলা দেশের ভিতরে এবং বাইরে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় যে কয়টি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কেহই এই সমস্যাটির ব্যাপক রূপ বা স্বরূপ কল্পনা করিতে চাহিতেছেন না। ইহা কি আমাদের জাতিগত মেরুদণ্ডহীনতার পরিচায়ক নহে?

দুই চারি কথায় সমস্যাটির গুরুত্ব আপনাদের বোঝাইতে পারিব না। হয়ত নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিব—না হয় নিজের মনেই গুমরাইয়া মরিব। সমস্যার যে সমাধান নাই, এমনও নহে। কিন্তু সেজন্য ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। সেরূপ পরিকল্পনা করিবার বা তাহা কাজে লাগাইবার মানসিক বা বাহ্যিক পরিবেশ এখনও আমাদের হয় নাই, একথা সত্য, তবুও সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদিগকে এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে।*

*পাটনার বেহার হেরাল্ড ও প্রভাতীর সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র একটি বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির লিখিত অভিভাষণ।

ছায়া-ছবি

বসন্ত সেন।

'মেয়েদের কথা'র বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে 'ছায়া-ছবি নামে একটি সিনেমা-বিভাগ খোলা হ'ল। ব্যাপক শিল্প হিসাবে ছায়া-ছবি নির্ম্মাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান ক'রে আছে, বাংলা দেশেও সিনেমা শিল্প ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছে, তা'ছাড়া অবকাশ রঞ্জন ও লোকশিক্ষার দিক থেকেও সিনেমা মেয়েদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কম নয়, আজকাল বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের মেয়ে সিনেমায় যোগদান করেছেন, অবশ্য, সিনেমায় যোগ দেওয়া তাঁদের উচিত কিনা, এ বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক উঠ্‌তে পারে, কিন্তু সে আলোচনা আমরা এখন করব না, তবে আর্টের সাধনা ছাড়াও সিনেমা যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটা নতুন পথ মেয়েদের কাছে খুলে দিয়েছে, একথা অস্বীকার করা চলে না।

আধুনিক যুগে সিনেমা আজ পুরুষদের মতো বাংলার মেয়েদেরও সমাজ-জীবনে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়্‌ছে। তাই, যে পত্রিকায় আধুনিক নারী-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়, যেখানে সিনেমা সংক্রান্ত আলোচনারও স্থান থাকা উচিত বলে মনে করি। পাঠিকা ও লেখিকাদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন এই নতুন বিভাগটিকে তাঁদের চিন্তা ও রচনা-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

আমাদের কথা।

আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কাটল। যুদ্ধ এবার আমাদের দরজায় এসে হানা দিয়েছে; বসে বসে এই যুদ্ধের কারণ সমূহের বিচার করবার সময় আর নেই। এই মৃত্যুলীলা সাম্রাজ্যবাদ বা গণতন্ত্র যার ব্যাপারই হোক না কেন এর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আসন্ন হয়েছে।

আত্মরক্ষার প্রথম উপায় যে পলায়ন তা কলিকাতাবাসীরা মাসাধিককাল ধরে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করছেন। 'পলায়ন' কথাটা শুনতে যেমনই হোক না কেন, যাঁদের সেরূপ সুযোগ ও সুবিধা আছে তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক স্থান সমূহ ত্যাগ করাই সুবিধাজনক, এবং যাঁরা কাজের গতিকে বাধ্য হয়ে কলকাতায় রইলেন তাঁরাও ছেলেপিলেদের বিপদ থেকে দূরে পাঠানই সঙ্গত বলে মনে করছেন। অপরপক্ষে এখন লোক লক্ষ লক্ষ আছেন যাঁদের সেরূপ অর্থসঙ্গতি নয়, তাঁদের জন্য কোন ব্যবস্থা হতে পারে কিনা তা সকলেরই চিন্তা করে দেখা উচিত।

ছোট শিশুদের জন্য সহরের বাইরে, বিপজ্জনক স্থান থেকে দূরে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে, নার্সারি স্থাপন করা অসম্ভব নয়। এমন পিতামাতা আছেন, যাঁরা, এরূপ ব্যবস্থা হলে সন্তানের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেও তাদের দূরে পাঠাতে চান; এমন অনেকে আছেন যাঁরা সন্তানের আংশিক ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ; সঙ্গে সঙ্গে এমনও অনেকে আছেন যাঁরা ব্যয়ের কোন অংশই গ্রহণ করতে পারবেন না। এই কাজের কিছুটা খরচ সাধারণের চাঁদা থেকে চলতে পারে, কিন্তু এত বড় পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভবপর হবে না। কর্পোরেশনের নিকটে সমবেতভাবে আবেদন করলে তাঁদের সহায়তা ও জনসাধারণের চেষ্টা মিলিয়ে নিশ্চয়ই একটা উপায় করতে পারা যায়।

বাংলার ছাত্রসম্প্রদায়ের কথাও ভেবে দেখা দরকার। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হওয়ার পর থেকে কলিকাতার বিদ্যালয় সমূহের অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই যুদ্ধ যে বহুদিন ব্যাপী হবে সেরূপ আশঙ্কা অনেকেই করেছেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষা-অভাবে বাংলার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারবেন তরুণ বয়সে, বিশেষত বয়ঃসন্ধির সময়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া কতটা ক্ষতিকর। বাংলার বহুসংখ্যক তরুণতরুণীর ভাগ্যে যাতে সে সংকট না ঘটে তার জন্য বিপজ্জনক স্থানসমূহের বাইরে শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়েছে। বাংলার বাইরে অথবা বাংলারই পল্লী-অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানে কলিকাতাবাসীরা একেকটি উপনিবেশের মত স্থাপন করেছেন, কলিকাতার বিদ্যালয়গুলি সেই সব স্থানে স্থানান্তরিত করতে পারলে তাদের বিশেষ ক্ষতি না করেও বাংলার মাতাপিতাদের একটি বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

যাঁরা কার্য বা অবস্থার গতিকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কলকাতায় রইলেন তাঁদের আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে হবে। এ কথা অবশ্য সর্ববাদি সম্মত যে মাথায় বোমা পড়লে

রক্ষা পাবার উপায় নেই, কিন্তু বোমা এমনই সাংঘাতিক বস্তু যে তার 'টুকরো,' 'হাওয়া,' এমনি কি 'শব্দ' পর্যন্ত বিপদের কারণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। সেগুলি থেকে রক্ষা পাবার নানা উপায় আছে। প্রত্যেক পাড়ার লোক সমবেত হয়ে সেগুলি অবলম্বন করলে অর্থের সাশ্রয় ও পারস্পরিক সহায়তাজনিত সুবিধা দুই-ই হয়। এরূপ ব্যবস্থা সহরের কোন কোন অঞ্চলে অবলম্বন করা হয়েছে। পাঠিকারা যদি চান তো আগামী মাসে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

বহু দুশ্চিন্তার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের এখনও প্রত্যক্ষভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু আমাদের মধ্যেই এখনও অনেকে রয়েছেন জাপানী বিমান আক্রমণের ফলে যাঁদের দুর্দশার অন্ত নেই। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখছি আর্ত-সেবার জন্য ভারতীয় ডাক্তার ঔষধপত্রাদি নিয়ে রেঙ্গুনে গিয়েছেন; রেঙ্গুনের যে-সকল অধিবাসী কলিকাতায় চলে এসেছেন তাঁদেরও নানাপ্রকারের অভাব ও প্রয়োজনের কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে শুধু জনমত নয়, জন-প্রচেষ্টাও সংগঠিত হওয়া উচিত।

গত ১৯শে জানুয়ারী, রবিবার, মহাবোধি সোসাইটির ঘরে ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সোভিয়েট সহানুভূতি সভায় এই আতঙ্কের মাঝখানেও যে জনকয়েক ভারতীয় ও বিদেশীয় মহিলা সমবেত হয়েছিলেন তাতে আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। এঁদের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি ছিল সংঘবদ্ধভাবে ফাসীশক্তির আক্রমণ বিধ্বস্ত জনগণের সহায়তা করা। তাঁরা যদি উপরে আলোচিত কার্যসমূহের একাংশও গ্রহণ করতে পারেন তো বড়ই আনন্দের কথা হয়।

এ প্রশ্ন অবশ্য আজ অনেকের মনেই উদিত হচ্ছে যে মেয়েদের সামান্য শক্তি কতটুকু কাজই বা সাধন করতে পারে। তার উত্তরে একটি পুরাতন কাহিনীর কথা মনে পড়ে যায়। শ্রাবস্তিপুরের মহাদুর্ভিক্ষের সময়ে যখন "বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে—

"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?"

এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে যখন সেই অসংখ্য ধনীর সভায় সকলেই নীরব রইলেন তখন সেই সেবার ভার গ্রহণ করলেন অনাথা, ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া। নারী যতই দুর্বল হোকনা কেন, সেবাব্রতে তার শাশ্বত অধিকার। সেই অধিকারে কি বাংলার নারী সমাজ জাগ্রত হবে না?

কোকনদে নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের যে সভা অনুষ্ঠিত হল তাতেও যুদ্ধজনিত দুর্ভাগ্য সমূহের প্রতিকার কল্পে কতকগুলি উদ্দেশ্য গৃহীত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে আতঙ্কের দরুণ বাংলার কোন মহিলা সদস্যারূপে ওই সভায় যোগদান করতে যাননি, গেলে, তাঁরা এই কাজের প্রয়োজনীয়তা আরো জোরের সঙ্গে জানাতে পারতেন। যাইহোক, নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের নিকট আমাদের আবেদন এই যে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবার অবকাশ নেই, এখনই এই সব কাজ করবার সময়।

এই বার আমাদের কৈফিয়ৎ দিয়ে 'আমাদের কথা' শেষ করতে চাই। এই দুর্দিনে কাগজ চালানো যে কি কষ্টকর তা অনেকেই বোঝেন। যখন বাংলাদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলি নিজেদের বিপন্ন বলে মনে করছে, তখন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে—

'হাতী ঘোড়া হল তল,
গাধা বলে কত জল'—বলে বিদ্রূপ করা যায়; কিন্তু জল যতই গভীর হোকনা কেন বন্দর যতই দূরে থাকনা কেন, আমরা এ বিপদ সাগর অতিক্রম করবার প্রাণ-পণ চেষ্টা করব। যদি আন্তর্জাতিক অবস্থা আরো খারাপ হয় তবে আমরা কলিকাতার বাইরে গিয়েও 'মেয়েদের কথা' চালাবার চেষ্টা করব, এবং আগামী বৎসর আরো কিছু উন্নতি করবারও ইচ্ছা রাখি। গ্রাহিকাদের কাছে আমাদের আবেদন এই যে শুধু অর্থ দিয়ে নয়, গল্প, কবিতা, রচনা ইত্যাদি দিয়েও তাঁরা যেন সহায়তা করেন। আমরা এখনও উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে পারি না, তাই সহৃদয়তার দান কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।

এবারে একটি **ছোট গল্পের প্রতিযোগীতা** ঘোষণা করছি। গল্পটি যে-কোন বিষয়ে রচিত হতে পারে। তার আয়তন যেন আমাদের কাগজের তিন পৃষ্ঠার চেয়ে কম বা পাঁচ পৃষ্ঠার চেয়ে বেশী না হয়। গ্রাহিকা ভিন্ন অন্যান্য মহিলারাও এতে যোগদান করতে পারেন, তবে তাঁদের দেয় চাঁদা কিছু বেশী ধার্য করা হবে। **চাঁদা গ্রাহকাদের জন্য ১৲ ও অন্য মহিলাদের জন্য ২৲।** গল্পের সঙ্গে চাঁদা না পেলে সে গল্প প্রতিযোগীতার জন্য গৃহীত হবেনা! গল্পের উৎকর্ষ-বিচারের ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা হবে, আগামী মাসে আমরা সেই কমিটির নাম প্রকাশ করব। উক্ত কমিটির বিচারফল সকলকে গ্রহণ করতে হবে, এবং সে বিষয়ে আর পত্র ব্যবহার চলবেনা। **পয়লা চৈত্রের মধ্যে গল্প আমাদের হস্তগত হওয়া চাই।** তার পরে কোন গল্প পেলে প্রতিযোগিতার মধ্যে গণ্য করা হবেনা, তবে উপযুক্ত বিবেচনা করলে মেয়েদের কথায়' প্রকাশ করব। অমনোনীত বা অগ্রাহ্য গল্প বা তার চাঁদা ফেরৎ পাঠান আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যে গল্পগুলি পুরস্কার যোগ্য না হলেও মনোনীত হবে সে গুলি ক্রমান্বয়ে 'মেয়েদের কথা'য় প্রকাশিত হতে থাকবে। পুরস্কার প্রাপ্ত; অপ্রাপ্ত, মনোনীত, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য সকল গল্পের স্বত্ব আমাদের থাকবে। **প্রথম পুরস্কার ১৫৲ ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲** দেওয়া হবে।

যাঁরা প্রতিযোগীতায় যোগ দেবেন তাঁদের গল্পের সঙ্গে উপরের নিয়মগুলি মেনে চলবার একটি **স্বাক্ষরিত স্বীকৃতিপত্র** দিতে হবে নতুবা গল্প অগ্রাহ্য হবে।

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ { ফাল্গুন—১৩৪৮ { ১১শ সংখ্যা

দেবতা

প্রেমের দেবতা, দয়া করো তারে
তোমার শাপের অগ্নি যাহার প্রাণে
জ্বেলেছে অনল ; তৃষ্ণা যাহার
কণ্ঠ শুখায়, বিরাম কভু না জানে।
দয়া করো তারে, মূক বীণা যার
হাতেতে রহিয়া বিফল বেদনা বহে ;
হৃদয় যাহার অরূপরূপের
অলীক প্রেমের বাসনা কেবল দহে।
অন্তরে তার সহস্ররাগ
উচ্ছ্বসি ওঠে, কণ্ঠে নাহিক সুর,
প্রেমের দেবতা, দয়া করো তারে,
এ বেদনা তার দয়া করে করো দূর।

অর্থ ও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার

(বেতারের সৌজন্যে)

ভারতীয় সভ্যতার মধ্যযুগে হিন্দুনারীর দুরবস্থার নানারকমের গল্প শুনে অনেকেই মনে করে থাকেন যে আমাদের দেশের নারীকে বুঝি চিরকালই ঘটিবাটি, গরুঘোড়ার মত সম্পত্তিবিশেষ বলে গণ্য করা হয়ে এসেছে, তার কোন পৃথক সত্তা স্বীকার করা হয়নি এবং সম্পত্তির অধিকার তো দূরের কথা, নিজের উপরেই তাকে কোনদিন কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়।

বৈদিক যুগ ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ। এই যুগে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার, পেয়েছিল, ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের অধিকারিণী ছিল, যজ্ঞোপবীত ধারণ করত, বেদ ও গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করত এবং বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীগণ বেদের সূক্তও রচনা করে ছিলেন। কথিত আছে যে সেই স্বর্ণযুগে ভারতীয় নারী অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে সম্পত্তিতেও পুরুষের সমান অধিকার ধারণ করত।

হিন্দু ব্যবহারবিধির ভিত্তি বেদ, এর যুক্তিসমূহ মীমাংসাতে নিবদ্ধ। এইভাবে স্মৃতিকারদের বিধানসমূহ শ্রুতির ভিত্তিতে স্থাপিত বলে হিন্দু আইনে বেদবিরোধী কোনও বিষয় থাকলে তার প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হিন্দু-আইন ভারতের সর্বত্র একরকম নয়, কেননা নানা টীকাকারের নানারকমের শাস্ত্রব্যাখ্যার ফলে এর রূপ বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসার অধিকরণগুলির অনুসরণ করে নীলকান্ত মিত্রমিশ্র জীমূতবাহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি বহু টীকাকার তাঁদের ন্যায়সূত্র রচনা করেন বলে পূর্বমীমাংসার প্রাধান্য খুব বেশী ছিল। জৈমিনি স্বয়ং বেদের অনুসরণ করে নারীর পৃথক সত্তা ও দায়াধিকার স্বীকার করে তাকের স্বামীর সম্পত্তির সমান অধিকার ও উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিলাভের ক্ষমতা দান করেছিলেন। অপরপক্ষে ঐতিসায়ন প্রমুখ একদল নীতিকার জৈমিনির কাল থেকেই নারীর অধিকারগুলিকে সুচক্ষে দেখতেননা এবং সেগুলিকে খর্ব করবার জন্য চেষ্টিত ছিলে। জৈমিনি ও বদরায়ণ এঁদের মতের খণ্ডন করেন।

জৈমিনি বেদের উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন বলে তাঁর মতের এত ঔদার্য, কিন্তু পরবর্তী যুগের নীতিকারেরা বেদকে বাদ দিয়ে স্মৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার ফলে ভ্রমে পতিত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি শ্লোকের প্রমাণ দেখিয়ে নিজমতের সমর্থন করেন। শ্লোকটি এই—

"অহৃতি স্ত্রী ন দায়ং নিরিন্দ্রিয়া।
স্থাদায়াদাঃ স্ত্রিয়োঽনৃতম্ ইতি শ্রুতেঃ॥

এর অর্থ এই যে শক্তিহীনতার জন্য নারী বিত্তাধিকার হতে বঞ্চিতা এবং বিত্তহীনা বলেই তার কোন মূল্য নাই। কিন্তু এই শ্লোকের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

আধুনিক যুগে জগদ্ব্যাপী নারীপ্রগতির ফলে সকল দেশের নারীর অধিকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের নারীই আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় হিন্দুনারীর বিত্তাধিকার সম্বন্ধীয় আইনের নানা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে। ভারতীয় হিন্দুনারীর বর্তমান অধিকারের বিষয়ে আগে আলোচনা করে পরে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করব।

আইন অনুসারে বিষয়টিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমত নারীর নিজের পৃথক সম্পত্তির বা স্ত্রীধনের উপর অধিকার; দ্বিতীয়ত—স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার।

স্ত্রীধনের বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু-আইন নারীকে সম্পত্তির অধিকার দান করেছে, এমন কি বিবাহিতা নারীরও পৃথক সম্পত্তি থাকায় কোন বাধা ছিলনা। এ ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রেও সে সম্পত্তি লাভ করে এসেছে, যদিও সে অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও নানা বিধিনিষেধে পূর্ণ।

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকৃত হলেও বিবাহিতা নারীর স্বোপার্জ্জিত অর্থ এবং কোন অনাত্মীয় ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত অর্থের উপর স্বামীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকে। অপরপক্ষে স্বামী, পিতামাতা বা অপর কোন আত্মীয়ের নিকট লব্ধ অর্থ স্ত্রীধনে পরিণত হয় এবং তার উপর তার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকে। আইনত নারীর স্ত্রীধনের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার আছে এবং তার স্বামীও তার সম্মতি বিনা তাতে হস্তক্ষেপ করতে অধিকারী নয়।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে বিবাহের ফলে আইনত স্ত্রী তার স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির সমান অধিকারিণী হয়। দায়ভাগ * আইনানুযায়ী স্ত্রীর এই অধিকারের দ্বারা স্বামীর পূর্বাধিকার কোন অংশে প্রশমিত হয়না এবং স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর এই অধিকার লুপ্ত হয়। ফলত নারী এই অধিকারের দ্বারা সম্পত্তির উপর কোন ক্ষমতাই লাভ করেনা এবং স্বামীর যথেচ্ছ সম্পত্তির ব্যবহারে কোন বাধা দিতে পারে না বলে তার এই অধিকারকে অনেকে নিরর্থক বলে মনে করেন; কিন্তু এর যে একেবারে কোন মূল্যই নাই একথাও সত্য নয়; কেননা মিতাক্ষরা * অনুসারে স্বামী যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন তবে স্ত্রীকেও তার একাংশ দিতে তিনি বাধ্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু নারীর বিত্তাধিকারসম্বন্ধীয় আইন সংশোধিত হয় এবং পরের বছরে আরো কিছু পরিবর্তিত হয়ে সেই আইন আজ পর্যন্ত কার্যকরী রয়েছে। এর দ্বারা নারীর দায়াধিকার কিছু পরিমাণে প্রসারলাভ করেছে।

পৃথকীকৃত সম্পত্তি ও মিতাক্ষরাশাসিত যৌথ-সম্পত্তিভেদে এই আইনের প্রয়োগ দুই রকমের হয়ে থাকে। পৃথক সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে সম্পত্তির সমান অংশে

---

*বাংলাদেশের প্রচলিত হিন্দু ব্যবহারবিধি

*ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত হিন্দু ব্যবহারবিধি।

অধিকারিণী এবং পুত্র ও পৌত্রের বিধবা বধূ অপুত্রকা হলেও তার স্বামীর প্রাপ্য অংশের অধিকারিণী। মিতাক্ষরাশাসিত যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধিকার গ্রহণ করে।

এইরূপে ভারতীয় আইনদ্বারা বিধবানারীর স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে বলে অনেকে তার প্রশংসা করেন, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দু একটি দেশের সঙ্গে তুলনা করে না দেখলে ভারতীয় আইনের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হতে পারে না।

প্রাচীন রোমের আইনানুসারে রোমক নারীর ব্যক্তিগত বা বিত্তসম্বন্ধীয় কোন অধিকার ছিলনা। বিবাহের দ্বারা সে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধিকারে স্থাপিত হয়ে পরিবারের সন্তানগণের সমপর্যায়ভুক্ত হত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে রোমক স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ পরাধীন ছিল এবং তার ব্যক্তিগত এবং বিত্তসম্বন্ধীয় সকল অধিকার পরহস্তগত ছিল তারপরে কালক্রমে যখন সে এরূপ অধীনতা থেকে মুক্ত হল তখন সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় বিবাহ বন্ধনও অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ল।

প্রাচীন রোমের আইনের সঙ্গে ভারতীয় আইনের তুলনা করলে দেখা যায় যে হিন্দুনারীর পবিত্রতারক্ষার ও তার দুর্বলতার প্রতিকারের নিমিত্ত তার সম্পত্তির অধিকার খর্ব করা হয়েছে কিন্তু রোমক নারীর সম্পত্তিবিষয়ে সকল স্বাধীনতার লোপ করা হয়েছে পাছে সে সম্পত্তির ব্যবস্থাবিষয়ে পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করে সেই ভয়ে। দ্বিতীয় প্রভেদ এই দেখা যায় যে ভারতীয় আইন হিন্দুনারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি এবং আইনত তাকে বিষয়কর্মাদি করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু প্রাচীন রোমের নারী সকল অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা ছিল। শেষে আর একটি প্রভেদ এই যে রোমক নারীর বৈষয়িক উন্নতি করবার সময়ে আইনত তার বিবাহবন্ধন দুর্বল হয়ে পড়েছে কিন্তু ভারতীয় আইনদ্বারা হিন্দুবিবাহনিয়মে কোন দুর্বলতা না এনেই হিন্দুনারীর আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি করা সম্ভবপর হয়েছে।

অবশ্য আধুনিক ইটালিতে আইনের আরো অনেক পরিবর্তনের ফলে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মত ইটালির নারীও প্রভূত স্বাধীনতা ও অর্থ ও সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ অধিকার লাভ করেছে।

ইংলণ্ডের প্রাচীন আইনের আলোচনা করলে দেখা যায় যে সে দেশেও প্রাচীনকালে নারীর আর্থিক অবস্থা নিতান্ত বঞ্চিতার মতই ছিল। বিবাহের পর নিজ সম্পত্তিতেও তার কোন অধিকার থাকত না, সমস্তই সম্পূর্ণভাবে তার স্বামীর অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ত। তারপর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি আইন প্রণয়ণদ্বারা ইংরাজ নারী স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা হল, নিজ সম্পত্তি বিষয়ে তার পৃথক ব্যক্তিগত সত্তা স্বীকৃত হল। ইংরাজের আইনানুসারে কন্যা পুত্রদের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তির সমান অংশ পায় এবং স্বামীর অবর্তমানে বিধবা স্ত্রী সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। ভারতীয় খৃষ্টান সমাজও এই আইনদ্বারাই পরিচালিত। প্রাচীন ইংরাজ সমাজে ভারতীয় সমাজের মতই পণপ্রথা প্রচলিত ছিল, এখন, সম্ভবত নারীর বিত্তাধিকারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই, সে নিয়ম আর নাই।

মুসলমান আইন অনুসারে কন্যা পুত্রের মত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তবে পুত্রের অংশের অর্ধেক হারে কন্যার প্রাপ্য নির্ধারিত হয়। মুসলমান নারীর পৃথক সম্পত্তি অধিকার করবার এবং তার রক্ষা ও বিলিব্যবস্থা করবার অধিকার আছে। মুসলমানের বিবাহে একপ্রকার পণপ্রথা প্রচলিত আছে, তার দ্বারা বিবাহিতা নারীর ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বিবাহের সময়ে বর কন্যাকে কিছু অর্থ দিতে স্বীকৃত হয়, এই অর্থ পাত্রপাত্রীর অবস্থানুযায়ী পাত্রীর ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই; একে দেনমোহর বলে। বিবাহের সময়ে এই অর্থ স্বীকৃতিমাত্র থাকে, কিন্তু পরে বর স্বেচ্ছাক্রমে কন্যাকে 'তালাক' দিলে সে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই অর্থ দাবী করতে পারে।

তুলনায় দেখা যায় মুসলমান আইন নারীর বিত্তাধিকার সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করেছে। এর সঙ্গে এবং ইংরাজের আইনের সঙ্গে হিন্দু আইনের তুলনা করলে দেখা যায় যে তুলনায় হিন্দু কন্যার অধিকার সংকীর্ণ। পিতার পুত্রসন্তান না থাকলেও সেই সম্পত্তিতে কন্যার জীবনস্বত্বমাত্র থাকে, কন্যার পুত্র হলে সেই সম্পত্তি তাতে বর্তায়, অন্যথা জ্ঞাতি বর্গের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত চীনদেশের নারীর অবস্থা মধ্যযুগের ভারতীয় নারীর অবস্থা অপেক্ষা মন্দই ছিল। মনুস্মৃতিতে ভারতীয় নারীকে যেমন ক্রমান্বয়ে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীনা বলে বিবৃত করা হয়েছে, চীনভাষার ৎসান্‌সুঙ্‌ শব্দটির দ্বারাও ঠিক সেই তিনপ্রকারের পরাধীনতার অবস্থাই সূচিত হয়। অন্যান্য সব ব্যাপারের মত আর্থিক ব্যাপারেও চীনানারীর পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকৃত ছিল। তারপর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের কুমিন্টাংশাসনের অবধারণদ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং এখন চীনদেশের পুরুষ ও নারীর দায়াধিকার সমান।

রুষদেশে জারতন্ত্রের আমলে নারী সর্বপ্রকার বিত্তাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা ছিল এবং পণপ্রথাও দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু নূতন শাসনের অধীনে রুষদেশে সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা আর্থিক কোন ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষে কোন প্রভেদ নাই।

যদিও ভারতবর্ষ হিন্দুনারীকে যে বিত্তাধিকার দিয়েছিল তা একমাত্র মুসলমান আইন ভিন্ন তৎকালীন অন্যান্য সকল আইন অপেক্ষা উদার, এবং যদিও আধুনিককালে ভারতীয় হিন্দুনারীর অধিকার কিছু প্রসারিত হয়েছে, তবু জগতের অন্যান্য প্রগতিশীল জাতি সমূহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে এখনও হিন্দুনারীর অধিকার আপেক্ষিকভাবে অনেকটা সঙ্কীর্ণ। এই নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে এবং ভারতীয় আইনসভার কোন কোন সদস্য নূতন আইন প্রণয়ণের চেষ্টাও করেছেন। এই আন্দোলনের ফলে দেশের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল মতের সংঘর্ষ প্রবল হয়ে আইন প্রণয়ণের পথে বাধাস্বরূপ হওয়ায় ভারত সরকার নারীর অবস্থা ও অধিকারসম্বন্ধীয় বিষয়ের সমগ্রভাবে বিচারের ভার বিশিষ্ট ব্যবহারবিদ্‌গণের দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ সভার হাতে ন্যস্ত করেছেন। এই সভা নারীর বিত্তাধিকার সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের মনোভাব ও শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণের অভিমত জানবার জন্য একটি

প্রশ্নপত্রের প্রচার করেছিলেন। এই প্রশ্নপত্রটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই এঁদের কল্পিত পরিবর্তনের প্রসার ও গভীরতার কথা বোঝা যাবে।

হিন্দু আইনমতে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার অতি সংকীর্ণ, যেমন পিতার মৃত্যুকালে কন্যা এবং বিধবা পুত্রবধূ বর্তমান থাকলে প্রচলিত আইনানুসারে পুত্রবধূ সমগ্র সম্পত্তির জীবনস্বত্ব ভোগিনী হবে এবং কন্যা কেবল বিবাহের পূর্বপর্যন্ত খোরপোষ এবং বিবাহের ব্যয় পাবে। নূতন আইনের দ্বারা কন্যার এই অবস্থার পরিবর্তনের ইচ্ছা করা হয়েছে।

প্রচলিত আইন অনুসারে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা, ধনশালিনী ও দরিদ্রা কন্যার মধ্যে দায়াধিকারের যে প্রভেদ করা হয়েছে তার পরিবর্তনের উপায়ও এই প্রশ্নপত্রের আলোচ্য। বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ আইন-অনুযায়ী অপুত্রকা, বিধবা কন্যা পিতৃসম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিতা হয়, উপস্থিত সভা তার এই অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

গৃহকর্তার মৃত্যুকালে স্ত্রী, কন্যা ও বিধবা পুত্রবধূ বর্তমান থাকলে স্ত্রী ও পুত্রবধূ সম্পত্তির তুল্যাংশ পায় কিন্তু কন্যা তাদের জীবৎকালে কিছুই পেতে পারেনা। কন্যাকে এদের সমান অধিকার দেওয়া যেতে পারে কিনা সে প্রশ্ন করা হয়েছে। এমন কি বিধবা পুত্রবধূ ও পুত্র বর্তমান থাকলেও কন্যা যাতে সমান অংশের অধিকারিণী হতে পারে সে প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছে। পুত্রের অনস্তিত্বে কন্যার সম্পত্তিলাভের বিরুদ্ধে নিতান্ত সংরক্ষণশীল ব্যক্তিও আপত্তি করবেনা, কিন্তু পুত্র বর্তমানেও কন্যাকে সমান দায়াধিকার দানের প্রচেষ্টা সত্যই অভিনব।

শুধু কন্যার পিতৃসম্পত্তিতে অধিকার নয়, স্ত্রীর স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারসম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নও এই প্রশ্নপত্রে স্থানলাভ করেছে। বিভিন্ন পুত্রস্থানীয় উত্তরাধিকারীর তুলনায় স্ত্রীর আপেক্ষিক দায়াধিকার এঁরা সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয় করে দিতে চেয়েছেন এবং অনুলোম ও অসবর্ণ বিবাহের পত্নীকে সবর্ণবিবাহের পত্নীর সঙ্গে সমান অধিকার দিবার এবং উক্তরূপ বিবাহগুলিকে সমানভাবে আইনসঙ্গত করে নেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। বহুবিবাহিত হিন্দুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্নীকে সমান অধিকার দিবার প্রশ্নও এঁরা তুলেছেন।

হিন্দু বিধবা স্বামী অথবা শ্বশুরের সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ অধিকারিণী নয়, কেবলমাত্র জীবনস্বত্ব ভোগিনী, এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায় কিনা, এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, কি ভাবে এবং কতখানি পরিবর্তন হতে পারে তার আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রচলিত আইনের অস্পষ্টতা, বিশেষ ব্যবস্থা ও সমতার অভাবজনিত দোষত্রুটিগুলি শোধরাবার চেষ্টাও এই সমিতি করেছেন। প্রচলিত ভারতীয় আইনের সমতার অভাবের একটি কারণ এই যে ভারতের নানা অংশে প্রাচীন স্মৃতির নানা টীকা প্রচলিত আছে; উপরন্তু কোনো কোনো সময়ে কোন মত গৃহীত হবে তাই নিয়েও সমস্যা উপস্থিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকপরিষদ যদি সমগ্র ভারতের

একটি সাধারণ আইনব্যবস্থার প্রণয়ণ করতে পারেন তবে আইনের অনেক অসামঞ্জস্য এবং তজ্জনিত অসুবিধাও দূরীভূত হতে পারে।

মেয়েদের দায়াধিকারের আইনের যে পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে একথা মেয়েরা সাধারণত অস্বীকার করেন না, এবং ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখলে সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয়প্রকার মতাবলম্বী পুরুষেরও এ বিষয়ে সহানুভূসম্পন্ন হওয়া উচিত।

যাঁরা বিধবাদের দুঃখ বুঝেছেন, প্রচলিত পণপ্রথার জন্য কন্যার বিবাহ দেওয়া আজকাল যে কত কঠিন তা যাঁরা জানেন, এবং আধুনিক যুগের সংকটময় আর্থিক অবস্থার দরুণ স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলেই যে ভাবে অর্থোপার্জন ও সংসারপ্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যে কখনই নারীকে দায়াধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চাইবেননা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অপরপক্ষে আরো প্রগতিশীল যাঁরা. যাঁরা সর্বক্ষেত্রে, সর্ববিষয়ে নরনারীর সমান অধিকারের পক্ষপাতী. যাঁরা বিশ্বাস বরেন যে এই অর্থসর্বস্ব যুগে আর্থিক স্বাধীনতা ভিন্ন নারী কখনও পুরুষের সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে সমর্থ হবেনা তাঁরা যে শুধু এই পরিবর্তনগুলিকে সাদরে সংবর্ধনা করে নেবেন তা নয়, আরো সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন তাঁরা প্রার্থনা করবেন।

যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যমতের পক্ষপাতী, সেই সংরক্ষণশীল ব্যক্তিরও এরূপ পরিবর্তনের বিরোধী না হওয়াই যুক্তিসম্মত। কেননা, বেদ যখন প্রাচীন হিন্দু আইনের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়েছে তখন অপৌরুষেয় বেদ নারীকে যে অধিকার দিয়েছিল পরবর্তী কালের পুরুষরচিত, অপ্রামাণ্য স্মৃতি-গ্রন্থের খাতিরে সেই বৈদিক নিয়মের অন্যথা করা কখনই সনাতনমতের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

বস্তুত, প্রাচীন ও আধুনিক সকল পন্থার লোকেরই যে বিষয়ে একমত হওয়া উচিত সেই বিষয়টি সাধারণের নিকট থেকে হে এত বিরোধিতা লাভ করল এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে সমাজ ·বা আইনের সংস্কারের দিক থেকে নারীকে তার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার যতই চেষ্টা করা হোকনা কেন, নারী নিজে যদি নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না হয় তবে কিছুতেই কিছু ফল হবেনা। এ কথা ভারতের অনেক নারী বুঝেছেন বলে কোনো কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত নারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এই বিষয়ের আলোচনা ও প্রচারের আয়োজন করা হয়েছে।

শুধু প্রচার ও আন্দোলনের দিক দিয়ে নয়, সাধারণ জ্ঞানের দিক দিয়েও—নিজ অবস্থা বুঝে মেয়েরা যাতে অনুরূপভাবে চলতে পারেন, যাতে অজ্ঞান, অসহায় নারীকে পদে পদে ঠকতে না হয় সেইজন্যঃ এই বিষয়ের আলোচনা মেয়েদের করা উচিত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারীর স্থান

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী

রুশ-জার্মান মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে রুশনারীর অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪১ সালের জুনমাসে জার্মানী যখন দশবছরের অনাক্রমণ চুক্তি অগ্রাহ্য করে রাশিয়াকে আক্রমন করে তখন আমরা হিট্‌লারকে গর্ব করে বলতে শুনেছিলাম যে রাশিয়া জয় করতে তাঁর ছয়মাসও লাগবে না। পরপর হিটলারের অনেকগুলি দর্পিত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে দেখে অনেকে মনে করেছিলেন যে নাৎসী সৈন্যদল বুঝি এক অদ্ভুত দানবীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত, কোনও মানব জাতির পক্ষে তার গতি রোধ করা সম্ভবপর নয়। গতমহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের মধ্যে থেকে সোভিয়েট রাশিয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সে তো আজ মাত্র কয়েক বৎসরের কথা। সেদিনের শিশুরা আজ সবে যুবক যুবতী। কিঞ্চিদূর্দ্ধ বিংশ বছরের মধ্যে তারা জারসাম্রাজ্যের দরিদ্র, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে গড়ে তুলেছে একটি শিক্ষিত প্রগতিশীল জাতিকে, পৃথিবীতে আজ যার তুলনা নাই। জাতীয় উন্নতির পথে তারা সে রণবিদ্যাকে অবহেলা করেছে তা নয়, কিন্তু তার আগে তারা চেয়েছে দেশের সর্বসাধারণের জন্য ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা। অপরদিকে গত মহাযুদ্ধে পরাজিত প্রতিহিংসালিপ্সু জার্মানী নাৎসীদলের নেতৃত্বে তার সমস্ত শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করেছে দেশবাসীকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে ও যুদ্ধের মালমশলা জোগাতে। সেইজন্য অনেকে মনে করেছিলেন যে ইয়োরোপের অন্য অনেক শক্তির মতন রাশিয়ার লালফৌজও বুঝি অনতিবিলম্বে— নাৎসী জার্মানীর বশ্যতা স্বীকার করবে, কিন্তু নভেম্বর মাস থেকে যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। প্রতিশ্রুত তিনমাসের মধ্যে জার্মানী রুশ জয় করতে তো পারলই না, মস্কো ও লেলিনগ্রাড জয়ের স্বপ্ন তার স্বপ্নই রয়ে গেল, উপরন্তু দুইহাজার মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণের প্রত্যেক অংশেই জার্মান সৈন্য পিছু হটতে আরম্ভ করল।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথমেই আমরা ষ্ট্যালিনকে বলতে শুনেছিলাম যে তাঁর ভরসা কেবলমাত্র রাশিয়ার সৈন্যদলের ওপরে নয়, রাশিয়ার প্রত্যেকটি গৃহস্থের গৃহ তাঁর দুর্গ, এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিচারে প্রত্যেকটি রুশবাসী তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিক। গত কয়েকমাসে এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধ আরম্ভ হবামাত্র আমরা দেখতে পেলাম একদিকে যেমন দলে দলে রুশযুবক স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হয়ে এসে সৈন্যদলে যোগ দিতে লাগল, অন্যদিকে রুশনারী রাষ্ট্র ও সমাজ-চালনার প্রায় সমগ্র ভার নিজের হাতে তুলে নিল, দলে দলে তারা সমবেত কৃষিক্ষেত্র গুলিতে ট্র্যাক্টর চালিয়ে কাজ করতে লাগল যাতে যুদ্ধের সময়ে দেশে খাদ্যের অভাব না হয়। দলে দলে মেয়েরা এরোপ্লেন ও জাহাজ, বন্দুক, কামান ও গোলাগুলি তৈরী করতে লাগল যাতে যুদ্ধের সময়ে অস্ত্রের অভাব না হয়।

অসংখ্য রুশনারী ডাক্তার ও নার্সের কাজ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গেল আহত সৈনিকদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য।

শুধু তাই-ই নয়, রুশ সৈন্যদলেও শতকরা দশজন স্ত্রীলোক, তাদের মধ্যে সাধারণ বিমানচালক ও নাবিক আছে, এমন কি বড়বড় যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেন ও সৈন্যদলের সেনাপতি পর্যন্ত আছে।

রুশনারী অন্তঃপুরচারিণী অবলা নয়, স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সে শক্তিস্বরূপিণী, রুশযুবকের পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সমান কষ্ট স্বীকার করে ও সমান বীরত্ব প্রদর্শন করে আজ রুশনারী লড়ছে—স্থলে, জলে ও বিমানপথে।

রাশিয়ার মেয়েদের এই অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী আমরা ভাল করে বুঝতে পারব না, যদি না তার পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়াতে নারীর স্থানও তার জাগরণের ইতিহাস কিছুটা আলোচনা করে দেখি।

মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে রাশিয়াতে নারীর স্থান উর্দ্ধে ছিলনা। সমাজে বা রাষ্ট্রে তার কিছুমাত্র অধিকার ছিলনা, আজীবনকাল তাকে পিতা, পতি বা পুত্রের অধীনে অন্তঃপুরে বাস করতে হত। নারী আন্দোলন বলতে যদি আমরা বুঝি পুরুষের তৈরী অন্যায় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর আন্দোলন, তা'হলে রাশিয়াতে কোনও দিনই নারী আন্দোলন হয়নি। রুশবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার নারী শক্তি জেগে উঠেছিল—পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীর স্বাধীনতার দাবী নিয়ে নয়, কতগুলি মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নরনারী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার দাবী নিয়ে। আজকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পাই যে রাশিয়াতে মেয়েদের যেরকম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরকম নাই। এই স্বাধীনতা রুশনারী পেয়েছে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নয়, সহযোগিতা করে।

আজ রুশ জার্মান মহাযুদ্ধে রাশিয়ার নারী ও পুরুষ যেরকম ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার একটি মাত্র তুলনা পাওয়া যেতে পারে সেটা হল রুশবিপ্লবের কাহিনী। বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে যখন সোভিয়েটতন্ত্র স্থাপিত হল, তখন সেই রুশনারী পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল।

সোভিয়েট রাশিয়াতে মেয়েদের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা আছে। শুধু যে তারা সকলেই ভোট দিতে অধিকারিণী তাই নয়, যে কোনও উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পদ তারা অধিকার করতে পারে। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ার সর্বোচ্চ আইন-সভা সুপ্রীম সোভিয়েটে ১৮৯ জন মহিলা ডেপুটি ছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোনও রাষ্ট্রে মহিলারা এরকম স্থান অধিকার করেন নি। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে শত শত মহিলা জজ, জুরি, মেয়র ইত্যাদির কাজ করে থাকেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে আইনের চক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে সমান। বিবাহিতা নারী ইচ্ছা করলেই তাঁর বিবাহের পূর্বেকার পদবী ব্যবহার করতে পারেন। সোভিয়েট আইনে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই বিবাহ বিচ্ছেদ অতি সহজ। পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বামী-স্ত্রী অনায়াসে তাদের সম্বন্ধ

ছিন্ন করতে পারে, কোনও কারণ প্রদর্শন করতে তারা বাধ্য নয়। কিন্তু যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তাহ'লে বিবাহবিচ্ছেদের পরে সোভিয়েট আইন সন্তানের দায়িত্ব মাতা ও পিতার উপর সমান ভাবে ন্যস্ত করে।

সোভিয়েট সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। এমন কোনও শিক্ষালয় বা সমিতি, হোটেল বা আমোদ প্রমোদাগার সোভিয়েট রাশিয়াতে নাই, যা কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য অথবা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। সোভিয়েট নারী পুরুষের সঙ্গে সমানে সর্বত্র যাতায়াত করতে পারেন সমাজ তার গতিবিধি নিয়ে কুৎসা রটনা করে না। তার মানে এই নয় যে সোভিয়েট রাশিয়াতে ছেলেরা ও মেয়েরা সমানে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলেছে। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে প্রভেদ তারা বোঝে, বরং অন্যান্য জাতির চেয়ে ভাল করেই বোঝে। কিন্তু সোভিয়েটসমাজ স্ত্রী ও পুরুষের জীবনযাত্রা বিভিন্ন নৈতিক মাপকাঠিতে যাচাই করে না। মেয়েদের পক্ষে যে কাজ বা যে ব্যবহার অন্যায় বা অশোভন বলে তারা মনে করে অনুরূপ ব্যবহার ছেলেদের পক্ষেও অন্যায় বা অশোভন বলে মনে করা হয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাজ্যে স্ত্রী-শিক্ষা যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে, পৃথিবীতে আর কোথাও সেরকম নাই। সুবৃহৎ রুশ-রাজ্যের প্রত্যেকটি শিক্ষালয় বালক ও বালিকারা, যুবক ও যুবতীরা এবং প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষেরা একসঙ্গে সমান ভাবে শিক্ষালাভ করেছে। রুশদেশের মেয়েরা সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে আইনবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য ও বাণিজ্য—এমন কি যুদ্ধবিদ্যা ও নৌবিদ্যা সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় ছেলেদের সঙ্গে সমানে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের মেয়েরা সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। একদিকে দেখতে পাই রুশ-সীমান্তের মধ্যে এমন কোনও কাজ নাই যা করবার অধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। সমান কাজের জন্য ছেলেদের ও মেয়েদের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, অন্য অনেক দেশের মতন মেয়েদের কম দেওয়া হয় না। অন্যদিকে দেখি সোভিয়েট রাজ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে, প্রত্যেকটি সুস্থ লোককে কোন না কোনও কাজ করতেই হয়। ছেলেদের ও মেয়েদের প্রথম থেকেই কোনও একটি বিশেষ জীবিকার জন্য সুশিক্ষিত করা হয়, মেয়েরা কেবল "ঘরকন্নার কাজ" করবে মনে করে তাদের শিক্ষার অবহেলা করা হয় না। সেইজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে মেয়েরা যেমন ভাবে সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সব রকম কাজ করছে এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে করছে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এটা সম্ভবপর হয়নি। *

---

* মেয়েদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার আর একটি সুফল এই হয়েছে যে সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে থেকে বেশ্যাবৃত্তি প্রায় উঠে গেছে।

বিবাহিত মেয়েরাও যাতে বাইরের কাজ ভালভাবে করতে পারে সেই জন্য তাদের গৃহকর্মের যথাসম্ভব লাঘব করা হয়েছে। একটি সুবৃহৎ রন্ধনশালায় অনেকগুলি পরিবারের রন্ধনকার্য সুসম্পন্ন হয়। একটি যন্ত্রচালিত "ধোপাখানায়" অনেকগুলি গৃহস্থের বস্ত্র পরিস্কৃত হয়। মেয়েদের সন্তান জন্মের আগে দুই মাস ও পরে দুই মাস পূরো বেতনে ছুটী দেওয়া হয়, চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে কখনও কখনও এই ছুটি আরোও বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যে সব মায়েরা সন্তানকে স্তন্যপান করান তাঁদের প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর কিছুক্ষণের জন্য অবসর দেওয়া হয়। মায়েরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন সন্তানদের যত্ন নেবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে অসংখ্য "নার্সারি" ও "কিণ্ডার গার্টেন স্কুল" আছে। এই সব প্রতিষ্ঠান গুলিতে শিশুদের সুশিক্ষিতা বিচক্ষণ ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে এমন সুন্দর ভাবে রাখা হয় যে কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সব মায়েরাই তাঁদের সন্তানদের এখানেই রাখেন।

মেয়েদের এইরকম উন্নতি যে কেবলমাত্র রাশিয়ার ইয়োরোপীয় অঞ্চলে হয়েছে তাই নয়—সাইবেরিয়ার সুদূরতম প্রান্তে, যেখানে মেয়েরা পঁচিশ বছর আগে একেবারেই অশিক্ষিতা ছিল—সেইখানে পর্যন্ত আজ তারা সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে। পূর্ব রাশিয়ার নারী জাগরণ সম্বন্ধে গত বৈশাখ মাসের "মেয়েদের কথায়" শ্রীরেণু চক্রবর্তী (রায়) যা লিখেছেন তারপরে আর কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

আমাদের কারো কারো মনে সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে একটি ধারণা আছে যে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার ফলে ও বিবাহ বিচ্ছেদ অত্যন্ত সহজ হয়ে যাওয়াতে, রাশিয়াতে পারিবারিক বন্ধন বুঝি একেবারে আলগা হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল। মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার অধিকাংশ মেয়েই বিয়ে করে এবং বিয়ের পরে পতিপুত্র নিয়ে সুখে জীবনযাপন করে। রাশিয়ার জনসাধারণকে অন্য সব দেশের তুলনায় কম পরিশ্রম করতে হয়, অথচ তারা পারিশ্রমিক পায় বেশী, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নির্দোষ আমোদ প্রমোদের সুযোগ পায় অনেক বেশী। সেই জন্য স্বামী স্ত্রী পরস্পরের ও সন্তানদের সাহচর্য উপভোগ করতে পারে অনেক বেশী। যদিও সোভিয়েট রাশিয়াতে বিবাহবিচ্ছেদ অতি সহজ, তবু কার্যত দেখা গেছে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় সেখানে বিবাহবিচ্ছেদের আনুপাতিক সংখ্যা কিছু বেশী নয়। এর প্রধান কারণ হয়তো এই যে ছেলেরা ও মেয়েরা সমানভাবে সুশিক্ষিত হওয়াতে ও উভয়পক্ষের সম্পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা থাকাতে তারা কেবলমাত্র হৃদয়ের নির্দেশ অনুসারেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, টাকা বা মানসম্ভ্রমের লোভে নয়। সেইজন্য আইন বা সমাজ তাদের জোর করে বেঁধে না রাখলেও স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সন্তানের প্রতি ভালবাসাই পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা পুরুষের "গৃহকর্ত্রী" বা "লীলাসঙ্গিনী" মাত্র নয়। তারা দেবীও নয় দাসীও নয় তারা মানুষ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তারা পুরুষের প্রকৃত সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী।

সেখানে প্রথম থেকেই ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথকভাবে দেখা হয়নি—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে সমানভাবে মানুষের সম্মান, শিক্ষা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য আজ বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সব দেশেই যদিও নারী জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, তবু সেখানে প্রকৃতরূপে জাগতে পেরেছেন কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট মহিলা। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার নারী-সাধারণের মধ্যে অসাধারণ মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবাসী

শ্রীইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীতের হেলা-রোদ শেষের বেলা
'কলেজ ষ্ট্রিটে' তব বাঁকিয়ে ফেলা,
সেই ক্লান্ত ফেরীওলা, পূর্ণ ট্রাম,
ওগো নগরী তব দেহ কি অভিরাম!
কোলের কাছে তব
হেরিনি রূপ নব—,
দূরের দেশে আজি কি হেরিলাম
নগরী তব দেহ কি অভিরাম!

আজিকে মনে জাগে তপ্ত কোলে
প্রাণের দোলে যাহা নিত্য দোলে
সেই শতেক কোলাহল, শতেক ধ্বনি,
নিতি চলেছে রাজপথে কি বিকিকিনি!
বিজলী দীপজ্বালা
তোমার গৃহমালা,
নিরালা হৃদি মোর লইল জিনি
চলেছে রাজপথে কি বিকিকিনি!

স্মরণ করি তোমা এ নিরজনে,
কত যে সুখ স্মৃতি জাগিল মনে—
কত যে হাসিখেলা, কত যে আলো গান,
কত সে সুখদুখ, কত সে অভিমান,

প্রতিটি ধূলিকণা
আজি যে লাগে চেনা,
আজি যে ভাল লাগে প্রতিটি জনে—
যাহার মুখখানি জাগিল মনে।

মনেতে জাগে মোর গলির ঘর,
স্বপন বোনা কত তাহার পর,
কত যে দিন রাত কত যে শুভ সাঁঝ
তাহার ছোট বুকে লেখা যে রয় আজ
কত সে পড়া শোনা
কত সে আলোচনা
কত সে আনাগোনা বাহির ঘর,
স্বপন বোনা কত তাহার পর।

শান্ত দুপহর কিসের ছুটি
ঘরেতে পাঠ-ভোলা বন্ধুদুটি,
তার টেবিলে বই খাতা, কলম কালী,
থাকে সবই তো প্রস্তুত, পড়েনা খালি!
তর্ক পথ বেয়ে
কোথায় গেছে ধেয়ে,
হারায় খেই দেখে হাসিছে যুটি,
ঘরেতে পাঠ-ভোলা বন্ধু দুটি।

'কলেজ' ছোটা সেই করিয়া পড়াসাজ,
" 'ডিবেট্' কিবা হবে?" "বলিবে কেবা আজ?"
"সান্ধ্য বক্তৃতা ক'দিন ধরে হবে?"
বক্তা নাম করা—সকলে তাই রবে।
"বড় যে ভীড় করে
বিকালে পাঠাগারে
বই যে পাইনাক হয়না কোন কাজ!"
কলেজ ছোটা সেই করিয়া পড়াসাজ।

চোখেতে ঢুল আসে দুপুরে 'ক্লাসে',
দুষ্ট ছেলে মেয়ে দেখিয়া হাসে,

"মৈত্র" "নোট" দেন দ্রুত ও অবিরাম,
লেখনী ছুটাইতে গায়েতে ছোটে ঘাম !
তাঁহার "নোট" লাগি
কত যে রাগারাগি
কত যে ছোটা পিছে "ক্লাসের" শেষে,
দুষ্ট ছেলে মেয়ে বাঁচেনা হেসে।

আজিকে দীপালির আলোর মালা
তোমার বুকে বুঝি সাজিয়ে জ্বালা,
আজিকে পথে ঘরে কত না বাজী পোড়ে,
তারায় ভরা নভে নূতন তারা ওড়ে,
শিশু ও বুড়া সুখে
আজিকে হাসিমুখে
ধরেছে চারিদিকে প্রদীপমালা
আলো যে বুকে তব সাজিয়ে জ্বালা।

নগরী নাগরীলো ! মনে কি আসে
প্রবাসী কোন মুখ, চোখে কি ভাসে ?
চলেছ নিজ বেগে আপন মদ ভরে
পিছনে পড়ে যেবা তাহারে মনে করে'
বৃথায় হেলা ফেলা
কাটিবে তব বেলা !
রূপসী চল বুঝি নবীন প্রিয় আসে,
পুরান কোন মুখ চোখে কি কভু ভাসে ?

হারায় গেলে পথে একটি চেনা মুখ
হাজার মুখ মাঝে, জাগে কি কোনো দুখ ?
উতলা উৎসব— নিশির শেষ যামে
আঁধারে একাকিনী স্মর কি তার নামে ?
ঝরে কি আঁখি বারি
যে গেছে লাগি তারি
মায়ের ব্যথা ভরে কাঁপে কি তব বুক
হারায় গেছে বলে একটি চেনা মুখ !

মুখোস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

পরদিন দারোগা পুলিশে মধ্যপাড়া ছাইয়া ফেলিল। সংবাদ দিয়া তন্দ্রাকেও আনা হইল। হতচেতন হইয়া তন্দ্রা পিতার মৃতদেহের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িল।

নায়েবমশায় যথেষ্ট শোকাকুল হইলেও গোপনে নিজে ঘটনার তদ্বির করিলেন। পেয়াদা বেয়ারা ও ভৃত্যগণ তাঁহাকে পুষ্পের ঘটনা বলিল। জমিদারের দুর্ব্ব্যবহারে সকলেই তাঁহার উপরে বিরক্ত ছিল, অথচ নবীন মুদী নিরীহ উৎপীড়িত লোক, তাহার প্রতি সকলেরই করুণা হইল। নায়েব মশায় সকলকেই শিখাইয়া রাখিলেন যে পুষ্পের ঘটনা কেহ যেন প্রকাশ না করে। তাহা হইলে নিরর্থক নিরপরাধ নবীন ও পুষ্পকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সকলেই সম্মত হইল। অত্যাচারী জমিদার মরিয়াছে না হাড় জুড়াইয়াছে, তাহার হত্যা-কারীকে দণ্ড না দিয়া তাহাকে বরং পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য, সুতরাং পুলিশের কাছে কেহ কোনো কথা না বলাই স্থির করিল।

নায়েব মশায় পুলিশকে বলিলেন "রাত্রে তিনি তাঁহার ঘরে কন্যার কাছেই শয়ন করিতেন। কোনো বিবাহোপলক্ষ্যে কন্যা কাল স্থানান্তরে যাওয়ায় তিনি বাগান বাড়ীতে ছিলেন, তাহার পর কি হইল, কেহই বলিতে পারে না।"

দারোগা দারোয়ানকে সে যাহা জানে বলিতে আদেশ করিলে দরোয়ান বলিল সে কিছুই জানে না; বাবুলোক কোই এ ঘরে, কোই ও ঘরে ছিল। সে খৈনি মুখে দিয়ে জাগিয়ে বসিয়ে ছিল। রিভলভারের শব্দে পয়লা সে ভাবলো স্বপনউপন, কুছু হোবে; তারপর বাবুর গোঙানী শুনিয়ে তুরন্ত গিয়ে দেখি বাবু মাটিতে পোড়িয়ে আছে। কোন আদ্‌মি আইলো, কাঁহাসে আইলো, কিধারসে চলিয়ে গেলো, কিছুই সে জানে না। কোই অসুর উসুর হোবে, এইরূপ সে মালুম করিতেছে। তখন দাস দাসী লোক জন সকলকে ডাকিয়া পুলিশের লোক বিস্তর জেরা করিল, কিন্তু মূল সূত্র খুঁজিয়া পাইল না।

তন্দ্রা সহসা মুখ তুলিয়া তাহার রোদনরক্ত চক্ষু দুইটি দারোগার চোখের উপরে স্থাপিত করিয়া বলিল, "ভাল করে তদ্বির করুন, যত টাকা লাগে খরচ করুন, আমার বাবার অত্যাচারীকে ধরা চাই-ই।" বলিতে বলিতেই সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দারোগা বলিল চেষ্টার আমি ত্রুটি কোরবো না মা, আশা করি দোষী ধরা পড়বে।

তন্দ্রা চোখ মুছিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "হ্যাঁ, দোষীকে বার কোরতেই হবে। যে আমার বাবার রক্ত এমন ক'রে ক্ষয় করেছে, তার বুকের রক্তে এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। বাবা, তুমিও মার কাছে চ'লে গেলে? তবে আমি কার কাছে থাকব? আমি যেতে না দিলে তুমি তো কোথাও যেতে না, তবে আজ কেন গেলে?"

নায়েব মশায় নিজের চোখ মুছিয়া বলিলেন "শান্ত হও দিদি—"

তন্দ্রা তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল "শান্ত হব আমি? সেই দিন শান্ত হব যেদিন বাবার হত্যাকারীর বুকের রক্ত দেখব। বাবা, তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন তোমার হত্যাকারীকে প্রতিশোধ দিতে না পারব ততদিন পর্য্যন্ত আমি কোনো ভোগসুখে লিপ্ত হব না। ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে থাকব। আমার সমস্ত জীবনের কাজই হল তোমার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। বাবা!"

সমস্ত মধ্যপাড়াকে চষিয়া ফেলিয়া পুলিশ বিদায় লইল। মৃতদেহের সৎকার হইল। দিন চলিতে লাগিল। মহিষাসুর যে দেবতার হাতেই নিপাতিত হইয়াছে এ বিষয়ে গ্রামবাসিগণ নিঃসন্দেহ হইল। এত পাপ ধর্ম্ম কতদিন সহিতে পারে? দেবতা যে এভাবে অসুরনিপাত করিবেন তাহা পূর্ব্বেই জানিত বলিয়া কেহ কেহ আবার আত্মশ্লাঘা প্রচার করিতে লাগিল। শাস্ত্রবাক্য কি মিথ্যা হইতে পারে?

পিতার শ্মশান হইতে ফিরিয়া তন্দ্রা সেই যে ঘরে গিয়াছে, কেহ আর তাহাকে ঘরের বাহির করিতে পারিল না। কন্যার শিক্ষার জন্য চুণীলাল অনেক টাকা বেতন দিয়া শিক্ষক রাখিয়াছিলেন, তাহারা এখন বসিয়া বেতন পাইতে লাগিল। নায়েবমশায় এ বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিতে গেলে সে কাঁদিয়া বলিল "আর কেন নায়েব দাদু, ওদের বিদেয় ক'রে দিন। আমার জীবনে আর কিছুরই দরকার নেই।"

তন্দ্রার পিসামহাশয়, পিসীমা, দূর সম্পর্কের কাকা, কাকীমা, মামীমা প্রভৃতি আসিয়া বৃহৎ অট্টালিকা পূর্ণ করিয়া ফেলিল, রাত দিন দীর্ঘশ্বাস, হা হুতাশ ও বিলাপ করিয়া তাহারা শোকে আহুতি জোগাইতে লাগিল। উষাকালে তন্দ্রা বাগানে গিয়া রাশীকৃত ফুল তুলিয়া আনিত, তারপর স্নান করিয়া আসিয়া চন্দন ঘষিয়া অভুক্ত অবস্থায় পিতামাতার বৃহৎ তৈলচিত্রের সম্মুখে বসিয়া দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া পূজা করিত। বেলা গড়াইয়া পড়িত, অভুক্ত তন্দ্রার জন্য বাড়ীর সকলেই অভুক্ত অবস্থায় থাকিত।

তন্দ্রা গায়ের মূল্যবান অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল, সাধারণ দুইচারি খানা, যাহা না পরিলে নয়, তাহাই শুধু পরিয়া রহিল। তিন চারিটা আলমারী উজাড় করিয়া কাপড় নামাইয়াও একখানা সাধারণ সাড়ী পাইল না। সমস্ত সাড়ীই তাহার বাবার দেওয়া, সবই মূল্যবান সুদৃশ্য সাড়ী। স্তূপাকার

সাড়ীর উপরে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তারপর সাড়ীগুলি পাট করিয়া আল্‌মারীতে তুলিয়া রাখিল।

নায়েব মহাশয়কে ডাকাইয়া সে বলিল "দাদু, আমার খানকতক সাড়ী দরকার।"

নায়েব মহাশয় খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ তো, কমলালয়ে যতরকম ডিজাইন আছে, সবরকমের একেকখানা সাড়ী পাঠিয়ে দিক্, আজই লোক পাঠাচ্ছি।"

"না দাদু, কোনো ডিজাইন চাইনে, সাদা জমির উপর কালো আর লাল পাড়।"

এতক্ষণে নায়েব মহাশয় ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ক্ষুন্ন হইলেন।

আত্মীয় স্বজন যাহারা আসিয়াছিল, যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া একে একে বিদায় লইতে লাগিল। শোকার্ত্ত তন্দ্রাকে লইয়া নায়েব মশায় বড় বিপদে পড়িলেন। তাহার একটা ভাই বোন পর্য্যন্ত ছিলনা যে তাহাদের লইয়াও দুইদণ্ড সে ভুলিয়া থাকিবে। ইহাদের প্রতি নায়েব মশায়ের মমতার অন্ত ছিল না, চুণীলালের মৃত্যুর পর বিশাল জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব ও তাঁহার মাথায় পড়িয়াছিল। কি করিলে সবদিক্ ভাল হয় তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তন্দ্রার নিকটতম আত্মীয়গণের সহিত পরামার্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, বাড়ীতে এইসব ঘটনার সম্মুখীন হইয়া না থাকিয়া তন্দ্রা এখন কিছুদিন কলিকাতার বাড়ীতে থাকিবে। সেখানে একজন বয়স্কা গভর্ণেস্ তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। বাড়ীতে যে সব আশ্রিতা আত্মীয়া আছেন, কেবল মাত্র প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া নহে, গঙ্গাস্নান ও কালিদর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে তাঁহারাই গিয়া তন্দ্রার অভিভাবিকা হইয়া থাকিবার আগ্রহ দেখাইলেন। কিন্তু ইহারা অহরহ এই সব প্রাচীন কথার আলোচনা ও শোক প্রকাশ করিয়া তন্দ্রার প্রাণের ক্ষত শুকাইতে দিবেন না এই সব চিন্তা করিয়া এই সব আব্‌হাওয়া হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ নূতনত্বের মধ্যে আনিয়া ফেলিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

তন্দ্রাকে এই সব কথা জানাইলে সে বলিল, মা বাবাকে এখানে ফেলিয়া সে কলিকাতা যাইবে না।

বিব্রত হইয়া নায়েব মশায় তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, "পাগলি মেয়ে, মা বাবা কি তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন? তুই যেখানে যাবি, তোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও যাবেন।

অবশেষে তন্দ্রা নির্লিপ্তভাবে বলিল "যেখানে হোক্ একভাবে জীবনটা কাটালেই তোলো।"

তন্দ্রার যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। যাত্রাকালে সে পিতামাতার শয্যাগৃহে লুটাইয়া কাঁদিল। সে যে কলিকাতায় একজন পরের কাছে থাকিবে ইহা যেন সে সহিতে পারিতেছিল না "মা, বাবা, আমার সব কষ্টই চেয়ে দেখ্‌বে? তবু কাছে ডেকে নেবেনা? মা, তোমার কথা রাখিনি ব'লে

রাগ করেছ বুঝি ? বলেছিলে সব সময় বাবার কাছে থাক্‌তে, কিন্তু আমিতো থাকিনি, আমার কাছ ছাড়া হ'য়েই বাবার এ ভাবে প্রাণ গেল। মাগো, তুমি আমাকে ক্ষমা করে কাছে নিয়ে যাও। আমি আর তোমাদের কাছ ছাড়া হবো না। বাবা, তুমি ব'লে দাও, কে তোমাকে এমন ক'রে আঘাত করেছে ? তুমি না ব'লে দিলে কি ক'রে শাস্তি দেব ?''

সকলে অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিল।

কলিকাতার বাড়ী বাসোপযোগী সজ্জিতই থাকিত, তন্দ্রা যাওয়ার পূর্ব্বে বহু অর্থ ব্যয়ে আরো আস্‌বাব কিনিয়া তাহা অধিকতর সজ্জিত করিলেন।

তন্দ্রার পিসিমা ও নায়েব মশায় তন্দ্রাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। গভর্ণেসের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। প্রার্থিনীদের সমাগম আরম্ভ হইল, কিন্তু তন্দ্রার ও তন্দ্রার পিসীমার কাহাকেও পছন্দ হয় না। অনেক প্রার্থিনী বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাওয়ার পরে ললিতা দেবী নাম্নী একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে তাঁহাদের মনে ধরিল। তাঁহার কোনো ডিগ্রী ছিল না, কিন্তু তাঁহার মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া তন্দ্রার মায়ের কথা মনে পড়িল. সে বলিল "নেই বা থাকুল ডিগ্রী, আমি আপনার কাছেই থাক্‌ব, পড়ার জন্য দাদু অন্য বন্দোবস্ত কোর্‌বেন।" তন্দ্রার কথা শুনিয়া নায়েব মশায় হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন "বেশ্ তো, তাই হবে, যাঁর কাছে থেকে তোমার ভাল লাগ্‌বে, তুমি তাঁর কাছই থাক্‌বে।'' তারপর ললিতা দেবীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন "আপনার কোনো সন্তানাদি আছে ?" "হ্যাঁ একটি ছেলে, এবার এম্ এ দিয়েছে। তার পড়ার খরচের জন্যই আমাকে ঘরের বার হ'তে হয়েছে। আর আজ একটি মেয়ে পেলাম" বলিয়া তন্দ্রাকে কাছে টানিয়া লইলেন।

ললিতা দেবী তন্দ্রার গভর্ণেস্ নিযুক্ত হইলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার পিসীমা নিজের সংসারে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশ)

রন্ধন

শ্রীশীলা রাও।

(১)—বীটের বড়া

উপাদান— দুটো বীট, দুটো বড় আলু, একমুঠো ভিজান চালবাটা, নারকোল কোরা।

বীট ও আলু সিদ্ধ করতে হবে। বীট খোসা ছাড়িয়ে কিংবা কেটে সিদ্ধ করলে তার লাল রং একেবারে চলে যায় এবং মিষ্টি স্বাদও থাকেনা, তাই বীট আস্ত সিদ্ধ করবে—মুখের কাছটা কেটে বাদ দিয়ে, পরিস্কার জলে ধুয়ে নিয়ে, একটা হাঁড়িতে বেশ খানিকটা জল দিয়ে উনানের উপর চাপাতে হবে।

আলু ও বীটসিদ্ধ বেটে নিয়ে, একটু নারকোল কোরা সঙ্গে বেটে দিয়ে বাটা চাল ও নুন দিয়ে মেখে বড়া ভাজতে হবে।

(২)—সিলোন কারি

বাঁধা-কফি আর কুমড়ো বড় বড় করে কাটতে হবে, আলু এবং পটল ডালনার মত আধখানা করে দেওয়া হবে, কিছু কড়াইশুঁটি ও ফ্রেঞ্চবীন পড়বে, পেঁয়াজ কয়েকটি গোটা দিয়ে বাকিগুলিকে কুচিয়ে দেওয়া হবে, চাকা চাকা করে আদা কেটে নিতে হবে।

ঘি বেশী করে দিতে হবে। তেল-ঘি মিশিয়ে কিংবা শুধু ঘিয়েতে আস্ত তেজপাতা, গরম মসলা, আদার চাকা এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে প্রথমে খুব ভালভাবে লাল করে ভেজে নিতে হবে; তারপর সব তরকারি একসঙ্গে দিয়ে কসা হবে। কসবার সময়ে জলের ছিটে দিতে হবে।

কসতে কসতে তরকারি যখন একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন খুব ঘন (যাতে একটুও জল না থাকে) নারকোলের দুধ দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। নামাবার সময়ে চিনি, কাগজিলেবুর রস, ধনেপাতা এবং কাঁচালঙ্কা চিরে দেওয়া হবে। ঝোল যেন বেশী না থাকে, গামাখা-মাখা হবে।

গিরিডি সহরের অভিভাবক

শ্রীসুবিমল রায়

(প্রথম অধ্যায়)

পণ্ডিত শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় পূজার ছুটিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিরিডি যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতার এক স্কুলে পড়ান। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাত্রি ১০টায় যে দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়িত, তাহাতে যাত্রীর ভিড় কিছু কম হইতে পারে এই মনে করিয়া দিল্লী এক্সপ্রেসে রোয়ানা হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভোরে মধুপুরে ট্রেইন বদল করিয়া গিরিডির ট্রেইন ধরিবার ইচ্ছা। পণ্ডিত মহাশয় মধ্যম শ্রেণীর টিকেট কিনিলেন এবং জিনিষপত্র একজন কুলির হস্তে দিয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একখানি ইণ্টার ক্লাস গাড়ীতে ভিড় কম দেখিয়া তাহাতে উঠিতে গেলেন, কিন্তু ভিতর হইতে একজন গেরুয়াধারী যুবক তাঁহার পথ রোধ করিলেন। এমন সময় একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "আহা, ওঁকে আসতে দাও। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, এলে ক্ষতি হ'বে না, কিছু সদালাপও হ'তে পারে। বিশেষতঃ গুরুজী যখন আপত্তি করছেন না তখন আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।"

যুবকটি পথ ছাড়িয়া দিলেন ; পণ্ডিত মহাশয় গাড়ীতে উঠিলেন। পণ্ডিত সেই গেরুয়াধারী যুবকটিকে, প্রৌঢ় ব্যক্তিটিকে এবং তাঁহাদের গুরুজীকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। গুরুর বয়স পঞ্চাশের বেশী হইবে। মাথায় বিশাল জটা, গোঁফ দাড়ি নাই। মুখের ও জটার ভঙ্গি ভয়ঙ্কর হিংস্রতাপূর্ণ, ললাট কুঞ্চিত, চক্ষু অন্ধের ন্যায় নিষ্প্রভ। জীবিতদেহে এমন নিষ্প্রভ চক্ষু দেখা যায় না।

প্রৌঢ় শিষ্যটির পরিধানে সাদা ধুতি, কোট আর চাদর। দাড়ি নাই ; গোঁফ পাকা, মাথায় টাক। ইনি গুরুজীর গৃহীশিষ্য।

যুবক শিষ্যটি তাঁহার গুরুর অনুকরণে জটা রাখিয়া গোঁফ ও দাড়ি কামাইয়াছেন। জটার পোষণ ও ক্রমোন্নতিকল্পে নানারূপ ঔষধ ও প্রক্রিয়া অভ্যাস করিতেছেন। স্বাভাবিক চেহারা প্রীতিজনক হইলেও গুরুজীর ন্যায় হিংস্র মুখশ্রী লাভের আশায় নানারূপ ভয়াবহ মুখভঙ্গির চর্চ্চা করিয়া থাকেন এবং মুখের ভাব কিছু বদলাইতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। চক্ষু স্বভাবতঃ উজ্জ্বল, কিন্তু গুরুজীর ন্যায় নিষ্প্রভ চক্ষুলাভের আশায় দৃষ্টিতে উদাসীনতা ও শূন্যতার ভাব আনিবার চেষ্টা করেন।

গুরুজী গাড়ীর এক কোণায় দরজার ধারের বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। শিষ্যদ্বয় মধ্যের বেঞ্চ এবং পণ্ডিত শঙ্করনাথ তৃতীয় বেঞ্চখানি দখল করিয়াছিলেন। পণ্ডিত লক্ষ্য করিলেন যে, গুরুজীর

মনোভাবের সহিত চক্ষুর বিশেষ সম্বন্ধ নাই। গুরু একবার বিরক্ত হইয়া যুবকটিকে ধমক দিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখের ভাব ভীষণতর হইল বটে, কিন্তু চক্ষু পূর্ব্ববৎ নিষ্প্রভ রহিল। ট্রেইনের পাশ দিয়া স্যালভেশান আর্মির লালপোষাক-পরা একদল সাহেব আর মেম যাইতেছিলেন; গুরুজী অবাক্ হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। গুরুজীর চক্ষুর আয়তন তখন কিছু বিস্তৃত হইল বটে, কিন্তু দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাব বিশেষ ধরা পড়িল না।

ট্রেইন ছাড়িয়া দিল। প্রৌঢ় শিষ্যটি (শ্রীযুক্ত নরেশরঞ্জন ভৌমিক) পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। পথে যেতে যেতে সদালাপী সজ্জনের সঙ্গলাভ মহাসৌভাগ্য। আসুন, একটু সদালাপ হোক।"

পরস্পর নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। নরেশবাবু বলিলেন, 'আমাদের গুরুজী বেতালসিদ্ধ মহাপুরুষ; হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী মহাপুরুষ আর দেখা যায় না। আমরা গিরিডির আগের ষ্টেশন 'মহেশমুণ্ডা' যাচ্ছি; সেই ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে খাণ্ডলি পাহাড়ে গুরুজী আশ্রম করেছেন। পাহাড়টি প্রায় ৫০০ হাত উঁচু। তার আবহাওয়া তান্ত্রিক সাধনার খুব অনুকূল। তবে গ্রীষ্মকালে আমরা পাহাড়ে থাকি না; তখন বেশী জলের দরকার হয়, আর পাহাড়ে জল টেনে তোলা কিছু কষ্টকর। পাহাড়ের চারপাশে জঙ্গল আর মধ্যে মধ্যে সাঁওতালদের গ্রাম। সাঁওতালদের মধ্যে গুরুজীর খুব প্রভাব। ভূত, প্রেত, উপদেবতা আর গ্রহের কোপ থেকে তিনিই তাদের রক্ষা ক'রে আসছেন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমি তো গিরিডি যাচ্ছি, সেখান থেকে মাত্র ৩।৪ মাইল দূরেই তো খাণ্ডলি পাহাড়। আমি তবে আপনাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের মধ্যেই বাস করব?"

নরেশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, গুরুজী যেখানে আসন প্রতিষ্ঠা করেন তার চারদিকে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়। যারা তাঁর প্রসাদ লাভ করে তাদের সবরকম উন্নতি হয়, আর যারা তাঁর বিরক্তিভাজন হয় তাদের প্রাণবায়ু উত্তপ্ত হয়ে শরীরের সমস্ত রস শুষে নেয়, তাদের মনোময়কোষ আর বিজ্ঞানময়কোষে ঝগড়া বেঁধে যায়, তাদের সূর্য্যনাড়ী আর চন্দ্রনাড়ীতে জট পাকিয়ে গেরো লেগে যায়।"

গুরুজীর প্রভাবের কথা শুনিয়া পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। বেঞ্চের নীচে একটি গ্রামোফোনের চোঙা দেখিয়া পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের গুরুজী কি গ্রামোফোন শোনেন? কিন্তু গ্রামোফোন তো দেখছি না, শুধু চোঙাই দেখছি।"

নরেশবাবু বলিলেন, "ওটি গুরুজীর কল্কে, ওতে মন্ত্রপূত গাঁজা খান। গ্রামোফোন উনি শোনেন না, ওঁর সে সব ব্যসন নাই। সাধারণ গাঁজাও উনি খান না। নানারকম তেজস্কর মসলাসংযোগে মন্ত্রপূত গাঁজা খান। গ্রামোফোনের চোঙার সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন ক'রে নিয়ে

চমৎকার কল্‌কে হয়েছে। এতে গাঁজা ধরেও বেশী। তা-ছাড়া এতে অনাহতধ্বনি আকর্ষণ করে বেশী।"

যুবক শিষ্যটির সম্বন্ধে নরেশবাবু বলিলেন, "ওর বাপ একজন নামকরা সাধক ছিলেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল যে, ছেলেটি একজন সদ্‌গুরুর আশ্রয় পায়। বেঁচে থাকতে তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি; তাঁর দেহরক্ষার পর যুবকটি গুরুজীর কৃপাদৃষ্টিতে পড়েছে।"

গুরুজী এতক্ষণ মুদিতনেত্রে বেঞ্চের এককোণে বসিয়াছিলেন। যুবকটি গুরুর পার্শ্বে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। বাণ্ডেল জংসনে আসিয়া গাড়ী থামিল। গুরুজী শিষ্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাঁকিলেন, "ট্রাঙ্ক থেকে একখানা আর্য্য বেকারির পাঁউরুটি বের কর। ট্রাঙ্কের মধ্যে গঙ্গার ইলীশ ভাজা আছে, বের কর, আর কিছু সৈন্ধব নুন দেও।"

গুরুজীর ভোজন সমাপ্ত হইলে শিষ্যদ্বয় প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়েরও ডাক পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে সত্যই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

শেষ রাত্রে মধুপুর ষ্টেশনে সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া গিরিডির গাড়ীতে উঠিলেন। ভোর ৪টায় গিরিডির গাড়ী ছাড়িল। প্রায় একঘণ্টা পরে মহেশমুণ্ডা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। সশিষ্য গুরুজী গাড়ী হইতে নামিলেন। নরেশবাবু বলিলেন, "পণ্ডিতমশাই, আপনি নিশ্চয় আমাদের আশ্রমে আসবেন। পাহাড়ের নীচ থেকে আশ্রমটি দেখা যায় না। তবে পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা মরণাপন্ন পেঁপেগাছ আর বটুকভৈরবের মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তির পাশে দাঁড়ালে আশ্রমের নিশান দেখা যায়।" এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ২০ মিনিট পরে পণ্ডিত মহাশয় গিরিডি পৌঁছাইলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের পুরাতন বন্ধু অমরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র কুমুদনাথ ষ্টেশনে আসিয়াছিল। উশ্রী নদীর ধারে ইঁহাদের বাড়ী। অমরবাবু দীর্ঘকাল পরে পণ্ডিতের দেখা পাইয়া পুলকিত হইলেন। দুগ্ধ, লুচি ও মিষ্টান্ন সহযোগে পণ্ডিতের জলযোগ সম্পন্ন হইল। পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং পণ্ডিত মহাশয় প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

অমরবাবুর বয়স ৫৫ বৎসর হইবে। কিন্তু নানারোগে ভুগিয়া শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চুল দাড়ি গোঁফ পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। মনের জোরে অনেক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। গিরিডিবাসী বহুলোকের সঙ্গে দেখা করা তাঁহার অভ্যাস। আইনজ্ঞ বলিয়া ইঁহার কিছু সুখ্যাতি ছিল, এবং যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকটা উদাসীন, তবে পত্নীর পরলোকগমনের পর হইতে কিছু কিছু প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন। আইন ব্যবসা ছাড়িয়া এখন স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভের আশায় গিরিডির বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

একটি পুত্র ও একটি কন্যা বর্ত্তমান। কন্যাটি বিবাহিত এবং শ্বশুর বাড়ীতে আছেন। পুত্র কুমুদনাথের বয়স ২২ বৎসর ; বি, এস, সি পাশ করিয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স ৫০ কি ৫২ হইবে। চুল অল্প অল্প পাকিয়াছে। সাধারণতঃ সপ্তাহে দুইবার দাড়িগোঁফ কামাইয়া থাকেন। শরীর স্থূল ও নাতিদীর্ঘ, মুখমণ্ডল প্রসন্ন, নাসিকা উন্নত ও ললাট প্রশস্ত।

অমর বাবু বলিলেন, "শেষ জীবনটা নিরালায় শান্তিতে কাটাব মনে ক'রে গিরিডিতে বাড়ী করেছিলাম। তারপর দেখলাম এখানে লোক ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে ; অনেকেই এখানে বাড়ী করেছেন। অনেক বছর আগে প্রথম যখন গিরিডিতে বেড়াতে আসি তখন উশ্রীনদীর এপারে বাঘের বাচ্চা দেখেছি। হায়না, নেকড়ে, আর কুত্তা-খাউআ ব'লে একরকম জানোয়ার দেখা যেত আজকাল উশ্রীনদীর ওপারে না গেলে একটা শেয়ালের দেখা পাওয়াও ভার। তবে আমার বাড়ীটা এখন পর্য্যন্ত একটু নিরালায় আছে। উশ্রীনদীর ওপারে গেলে কিছু বেড়াবার যায়গা পাওয়া যায়। তা ছাড়া চার পাঁচ বছর আগে নির্জ্জনবাসের জন্য যে একটা উৎকট আগ্রহ হয়েছিল এখন সেটা অনেক কমেছে। গিরিডিতে সৎলোকের অভাব নাই, তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ পাওয়া যায়। আর নির্জ্জনতাসম্ভোগের জন্য মধ্যে মধ্যে উশ্রীর ওপারে বেড়িয়ে আসি।"

পণ্ডিত বলিলেন, "আমি পাঁচ ছয় বছর আগে একবার এসেছিলাম। এরমধ্যেই দেখি অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কালের প্রভাব অনিবার্য্য। সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। এখানকার স্বাস্থ্য আর জলবায়ু বোধকরি ভালই আছে ; তোমার চেহারা তো আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখছি।"

অমর বাবু বলিলেন, "এত পরিবর্ত্তনের পরেও অনেকে এখানে এসে বেশ উপকার পান। সহরে আজ কাল ধোঁয়া হয়, তিন চার রকম সহুরে ব্যারামও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তবু মোটা মুটি এখানকার স্বাস্থ্যের প্রশংসা করা চলে।"

পণ্ডিত বলিলেন, "স্থানমাহাত্ম্য তাহ'লে একেবারে নষ্ট হয়নি। তবে নির্জ্জনতা কমেছে, সৌন্দর্য্যের হানি ঘটেছে। আজ শরীরটা ক্লান্ত আছে, দুপুরে পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে বিকালে বেড়িয়ে আসব। আমার শরীরের কলকব্জা ঠিক আছে, তবে ছাত্র পড়াবার খাটুনিতে শ্রান্ত হয়ে পড়ি। একবেলা ত্রিফলার জল দিয়ে মকরধ্বজ খাই, আর একবেলা স্বল্পনারায়ণ তৈল মর্দ্দন করি। এতেই স্নায়ু চাঙ্গা হয়, উচ্চ অধিকারের ওষুধ ব্যবহার করি না।"

নানা কথার পর পণ্ডিত মহাশয় স্নানাহার শেষ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। তিনঘণ্টা পরে ঘুম হইতে উঠিয়া চিঠি লিখিলেন, শাস্ত্রপাঠ করিলেন, এবং জলযোগ শেষ করিয়া অমর বাবুর সঙ্গে পণ্ডিতের আলাপ করাইয়া দিলেন। ফিরিবার পথে মহেশমুণ্ডার গুরুজীর কথা উঠিল। অমর বাবু বলিলেন, "পথে তোমার সঙ্গে তাঁর কিছু জানাশোনা হয়ে গিয়েছে দেখছি। আমি কিন্তু

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ করবার সুযোগ পাই নি; শুধু পচম্বা যাবার রাস্তায় একদিন তাঁকে দেখেছি। চেহারায় বিশেষত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু দেখলে ভক্তির চেয়ে ভয় বেশী হয়, কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ হয়। লোক মুখে তাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছি। একটা ভয়াবহ গল্প শোনা যায়, তবে সেটা ষোল আনাই সত্যি কি না তা বলতে পারি না। একবার, সাধুজীর আশ্রম হ'বার অনেক বছর আগে, ভ্রাম্যমান সাধুজী গিরিডিসহরে টহল দিয়ে রাত্রের দিকে মৌলীভূষণ বাবুর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যে নিরীহ রোগালম্বা লোকটিকে পথে দেখলাম, সরুসরু বাদামী-রঙের গোঁফ, মাথায় টাক, তিনিই মৌলী বাবু। সাধুজীর কিম্ভূত কিমাকার চেহারা দেখে মৌলী বাবুর কুকুরটা ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। মৌলী বাবুর ছোট মেয়ে 'সুলক্ষণা' সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল; সে সমস্ত ব্যাপার দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। সাধুজী একবার তাকিয়ে দেখলেন, আর বিড় বিড় করে দুচারটে কথা ব'লে শাসিয়ে গেলেন। তার এক সপ্তাহ পরেই একজন লোক মৌলী বাবুর বাড়ীতে নানারকম ছোট ছোট জিনিষ বিক্রি করতে এল। সে একটা কেশ তৈলের শিশি মৌলী বাবুর ছোট মেয়ের হাতে দিল। তেলটার নাম 'খুলিমঙ্গল তৈল', তার গন্ধ অতি চমৎকার। লোকটা তেলের দাম নিল না। 'খুলিমঙ্গল তৈল' মেখে এক মাসের মধ্যেই মেয়েটির সমস্ত চুল পেকে গেল, আজ পর্য্যন্ত তার বিয়ে হয়নি।"

কথা শেষ করিয়া অমর বাবু দেখিলেন তাঁহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। পুত্র কুমুদনাথ বারান্দায় বসিয়া এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতেছিল। কুমুদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "এক সন্ন্যাসী দেখা করতে এসেছেন, আমার চেয়ে কিছু বড় হ'বেন, তাঁকে ঘরে বসিয়েছি।" ঘরে ঢুকিয়া তাঁহারা দেখিলেন, একটি গৈরিকধারী যুবক বসিয়া আছেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়াই সাধুজীর যুবক শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন। যুবকটি তাঁহাদের নমস্কার করিয়া বলিলেন, "গুরুজী আমাকে পাঠিয়েছেন, সামনের রবিবার দয়া ক'রে আমাদের আশ্রমে যাবেন। বিকালের গাড়ীতে যাবেন, আর রাত্রের আহার শেষ ক'রে ফিরবেন। গুরুজী আপনাদের আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন আর অনেকবার আপনাদের স্মরণ করেছেন।"

অমরবাবু বলিলেন, "খুব ভাল কথা; গুরুজীকে আমাদের নমস্কার আর ধন্যবাদ জানাবেন। আপনি একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যান। এখনো বেশী অন্ধকার হয়নি, ট্রেইন ছাড়তে ৩।৪ ঘণ্টা দেরী আছে।"

যুবকটি বলিলেন, "না, সে অসম্ভব। গুরুজী সহরে বেশীক্ষণ থাকতে মানা করেছেন। আপনাদের মনে কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু গুরুজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকি। তিনি বলেছেন, 'সাবধান বাপু, কাজ সারা হ'লে আর সেখানে থাকবে না। গিরিডির লোকেরা ঘোর সংসারী, যত্রতত্র আড্ডা আর হৈ-হল্লা, যখন তখন গান আর অট্টহাসি। তুমি সাধনায় পাকা হওনি,

সেখানকার আব্‌হাওয়া তোমার অনুকূল নয়। ট্রেইনের দেরী থাকে তো ষ্টেশনের বেঞ্চিতে ব'সে অপেক্ষা করবে।' এই জন্যই আমি আর দেরী করতে পারি না।"

যুবকটিকে বিদায় দিয়া অমরবাবু পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "এতো বড় মজা। তুমি একদিনেই সাধুজীর সুনজরে পড়েছ, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়েছি। ডাক যখন এসেছে, তখন একবার গিয়ে দেখাই যাক্ আসল ব্যাপারখানা কি। শেষ পর্য্যন্ত কিছু বিপদ না ঘটলেই হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "বিপদ আর কি হতে পারে? আমিও একটু আধটু যোগযাগ করি। স্বরোদয় শাস্ত্র, ঘেরণ্ড সংহিতা, পিশাচ তন্ত্র, এসব অনেক ঘেঁটেছি। আমার জানতে ইচ্ছা হয় যে, সাধুজীর সাধন পন্থাটি কি রকম। তাঁর শিষ্য নরেশবাবু বড়ই অমায়িক, তাঁকেও আর একবার দেখতে ইচ্ছা হয়।"

সপ্তাহ কাটিতে বিলম্ব হইল না। গল্প করিয়া, বেড়াইয়া, আর ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্কে দেখিতে দেখিতে সময় কাটিয়া গেল, রবিবার আসিয়া পড়িল। পণ্ডিত মহাশয় পঞ্জিকা ঘাঁটিয়া দেখিলেন, যাত্রার দিনক্ষণ তেমন অনুকূল না হইলেও বিশেষ অশুভজনক নহে। বৈকালের গাড়ী ধরিয়া তাঁহারা মহেশমুণ্ডা পৌঁছাইলেন। গাড়ীতে বসিয়া তাঁহারা খাণ্ডলী পাহাড় দেখিতেছিলেন, কিন্তু সাধুজীর আশ্রমের নিশান দেখিতে পান নাই। ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহারা নরেশবাবুকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেশবাবুকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারা ক্ষেত, সাঁওতাল পল্লী, আর খানাখন্দ পার হইয়া পাহাড়ের নীচে নরেশবাবুকথিত মরণাপন্ন পেঁপে গাছের তলায় উপস্থিত হইলেন এবং বটুকভৈরবের মূর্ত্তি ও আশ্রমের নিশান দেখিতে পাইলেন।

পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে অমরবাবু বলিলেন, "দেখুন নরেশবাবু, গুরুজীর প্রতি সন্ন্যাসী যুবকটির ভক্তি দেখে আমরা বড়ই প্রীত হয়েছি। সেদিন আমাদের বাড়ীতে তাঁকে কিছুক্ষণ থাকতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু গুরুজীর আদেশ বলে তিনি কর্ত্তব্য সেরেই চলে গেলেন।" নরেশবাবু বলিলেন, "যুবকটি সন্ন্যাসী নয়, ওর ব্রহ্মচারী অবস্থা। তবে সে আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, অনেক কঠিন কঠিন প্রক্রিয়া অভ্যাস করছে। সেদিন আপনাদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে গান করছিল—

চল গুরু দুজনে যাই পারে।
আমার একলা যেতে ভয় করে।
আমার দেহ ছিল শ্মশান সমান,
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে, তায় করলেন ফুলবাগান;
আবার সেই বাগানে ফুল ফুটেছে,
যোগী ঋষির মন হরে।*

---

* ইহা একটী প্রসিদ্ধ বাউল গান।

"গুরুজী গান শুনে বল্লেন, 'এতে তোমার গুরুভক্তির পরিচয় পাচ্ছি বটে কিন্তু এখন তোমাকে মরুভূমি ধ্যান শেখাচ্ছি, এখন ফুলবাগানের চর্চ্চা করা ঠিক না।' ব্রহ্মচারীটি গুরুজীর কথায় লজ্জিত হ'ল।"

পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরুভূমির ধ্যান কি আপনাদের সাধনের একটা অঙ্গ?" নরেশবাবু বলিলেন, "একটা অঙ্গ নয়, প্রধান অঙ্গ। তবে অধিকারীভেদে গুরুজী তিন রকমের ধ্যান শেখান। গোবি মরুভূমির ধ্যান হ'ল প্রথম স্তরের ধ্যান। গোবি মরুতে চীনে দস্যুর পরিত্যক্ত শিবির রয়েছে, এই রকম ভাবতে হয়; বাইরে বালি ধূ ধূ করছে আর ভেতরে শূন্য খা খা করছে, খালি একটা গিরগিটি মধ্যে মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সাধক দেখতে পাবেন, বাইরে সংসার মরু ধূ ধূ করছে, অন্তরে উদাসমন হু হু করছে, আর একটা তীব্র বৈরাগ্যের ভাব হৃদয় শিবিরে গিরগিটির মতন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরের ধ্যান হচ্ছে আরব মরুতে খেজুর গাছের ধ্যান। ভাবতে ভাবতে সাধক দেখবেন, তাঁর চুল, দাড়ি, গোঁফ, ভুরু, সব খেজুরের গাছের কাঁটার মতন খোঁচা খোঁচা হয়ে আসছে। সব পাপ, কোমলতা, দুর্ব্বলতা আর কমনীয়তা দগ্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থা একটু কষ্টদায়ক, নিশ্বাস গরম হয়ে যায়। কিন্তু সাধন ছাড়তে নেই; তৃতীয় স্তরেরর ধ্যান আরম্ভ করলেই সব আপদ ঘুচে যাবে। সাধক চোখ বুজে দেখবেন, সাহারা মরুতে প্রশান্ত উট নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে বিচরণ করছে। উটের শান্তি সাধকের মনে সংক্রামিত হ'বে।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "এসব ধ্যান কি শাস্ত্রসঙ্গত? অনেক শাস্ত্র ঘেঁটেছি, কিন্তু এরকম ব্যবস্থা কোথাও পাইনি।" নরেশবাবু বলিলেন, "অন্ততঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। কতকগুলি তন্ত্র লোপ পেয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই সব তন্ত্রোক্ত সাধনা গুরুশিষ্যপরম্পরায় চ'লে আসছে। সাধুরা অনেক লুপ্তপ্রায় সাধনপ্রণালী বাঁচিয়ে রেখেছেন। গুরুজীও বলেন যে, তাঁর বিদ্যা গুরুমুখী বিদ্যা।"

কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা পাহাড়ের উপর কিছুদূর উঠিলেন। দেখিলেন, দুইটি বিশাল চতুষ্কোণ পাথর পাশাপাশি রহিয়াছে; মাঝখানের ফাঁকে বেড়া আর চালা দিয়া আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। আশ্রমের সামনের জমি পরিষ্কার করিয়া সতরঞ্চ পাতা হইয়াছে। উহার এককোণে বাঘছালের আসনে গুরুজী ব'সিয়া আছেন। যুবক শিষ্যটি একধারে দাঁড়াইয়া আছেন। নমস্কার প্রতিনমস্কারের ঘটা শেষ হইলে সকলকে বসান হইল। সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। নীচে বনজঙ্গল, মাঠ, ক্ষেত, সাঁওতাল পল্লী আর রেলের লাইন। চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

গুরুজী বলিলেন, "আজ ব্রহ্মচারীর জীবনে এক উজ্জ্বল অধ্যায় আরম্ভ হবে, তাকে সাহারা মরুর ধ্যান শেখাব। সেই উপলক্ষ্যে দুটি নির্দ্দোষ প্রাণীর সেবা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। গিরিডিতে নির্দ্দোষ কে কে? ভেবে দেখলাম আজকাল সেখানে আটজন সুকৃতিসম্পন্ন ঋজু স্বভাব জীব আছেন। তাঁদের মধ্যে আপনাদের প্রতিই দৃষ্টি বেশী গেল।"

অমরবাবু বলিলেন, "লোকমুখে আপনার মাহাত্ম্যের কথা অনেক শুনি; আজ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে কৃতার্থ হলাম।" পণ্ডিত বলিলেন, "মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষসংশ্রয়, এই তিন বস্তু দুর্লভ। ভবিষ্যতে আপনার আশ্রম গিরিডিবাসী সজ্জনদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু হ'বে।" গুরুজী বলিলেন, "ভবিষ্যতে গিরিডিতে কোন স্তরের মানুষের আমদানি হয় তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তা হ'লেও এখানকার প্রভাব কেউ সম্পূর্ণ এড়াতে পারবেন না। লোকহিতের দিকে দৃষ্টি রেখে এখান থেকে গিরিডিবাসী সকলের উপরেই অনেকবার সাম, ভেদ,, আর দণ্ডনীতি প্রয়োগ করা হয়েছে।"

আশ্রমে একজম পশ্চিমা চাকর ছিল। সে মধ্যে মধ্যে 'জয় গুরু, জয় গুরু, নরসিং নরসিং নরসিং' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছিল। ব্রহ্মচারী শিষ্যটি একধারে শিবনেত্র হইয়া বসিয়া ছিলেন। গ্রাম হইতে তিনজন পীড়িত সাঁওতাল আসিয়াছিল। তাহারা গুরুজীর সামনে কিছু শাক সবজী রাখিয়া ঔষধ চাহিল। গুরুজী তাহাদের লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, আর রোগ বুঝিয়া গন্ধক ভস্ম, রসোন পিণ্ড আর ভূতরাজ পাতার নস্য দিলেন। পরে ব্রহ্মচারীকে লইয়া আশ্রমে ঢুকিলেন।

অমরবাবুরা নরেশবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। আশ্রমের ভবিষ্যৎ, ভক্তদের ভবিষ্যৎ, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। আশ্রমটি বড় হইলে নরেশবাবু সেখানে সস্ত্রীক বাস করিতে পারিবেন, গুরুজী এইরূপ ভরসা দিয়াছেন। যুবকটি যদিও দুই বছরের জন্য শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছেন, তথাপি মনে হইতেছে তিনি স্থায়ীভাবে আশ্রমেই থাকিবেন।

আহারের সময় হইলে চন্দ্রালোকে পাত পড়িল। ব্রহ্মচারী পরিবেশনের ভার লইলেন, নরেশবাবু আর সাধুজী কাছে বসিয়া ভোজনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রথমে অতি উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘিয়ের ময়ান দেওয়া হাতে-গড়া রুটি। অমরবাবুরা এমন নরম আর সুন্দর রুটি আর খান নাই। কিন্তু শুধু ঘিয়ের ময়ান নয়, একটি অপরিচিত বস্তুর অপূর্ব্ব স্বাদ আর গন্ধও ছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রশ্নে নরেশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ঘিয়ের সঙ্গে আর একটি জিনিষ আছে, কিন্তু সেটি যে কি তা আমরাও জানিনা। গুরুজীর একটা ঝুলিতে অনেক অদ্ভুত জিনিষ আছে। আজ দয়া ক'রে সেই ঝুলি থেকে একটা অপরিচিত জিনিষের গুঁড়ো ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।"

রুটির সঙ্গে একটি অতি মোলায়েম ডালনা পাতে পড়িল। গুরুজী বলিলেন, "মঠে মুর্গীর চল নাই, আর হাঁসের ডিম অতি সাধারণ জিনিষ। বিশেষ কৃপাভাজনদের জন্য এখানে তিতিরের ডিমের ব্যবস্থা হয়। সাঁওতাল শিষ্যেরা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে।"

খাইতে খাইতে অমরবাবু বলিলেন, "গিরিডির বর্ত্তমান মানসিক আবহাওয়া কিরকম বুঝছেন?"

গুরুজী উত্তর দিলেন, "গিরিডিতে এখন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ আছেন। প্রথম দলে

উশ্রী নদীর এপারে ব'সে ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একদল আড্ডানিষ্ঠ যুবক; কলেজ থেকে ছুটি পেয়ে হৈ চৈ করতে আসে। তৃতীয় দলে কর্ম্মক্লিষ্ট আর রোগক্লিষ্ট নানারকম লোক, বিশ্রামের লোভে আসেন। এই তিন দলকে শায়েস্তা করবার তিন রকম প্রণালী জানি।

অমরবাবু—"এঁদের অপরাধ?"

গুরুজী—"গিরিডি নানারকম উগ্রকঠোর তপস্যা আর উৎকট উৎকট প্রক্রিয়া সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে বৃদ্ধদের শান্তরসের ভজনা নষ্টামির সামিল। আর হৈচৈপরায়ণ যুবকদল পরোক্ষভাবে এই মঠের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব অস্বীকার করে। রোগী আর আফিসক্লিষ্টদের তত অপরাধ নাই, তবে তাদের উদাসীনতায় ঘা দিয়ে মধ্যে মধ্যে স্থানমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার।"

ব্রহ্মচারী একপ্রকার ঝাল চাটনি পরিবেশন করিলেন। নরেশবাবু বলিলেন, "এটি গুরুজীর এক মান্দ্রাজী শিষ্য দিয়েছেন। সৌভাগ্যবান্ আর সমঝ্‌দার ভোক্তা এলে এটি দেওয়া হয়।"

চাটনির পর সরভাজা; মঠেই তৈয়ারী। নরেশবাবু বলিলেন, "একজন নরমাংসভোজী পরমহংসের কাছে গুরুজী এই সরভাজা বানাবার প্রণালী শিখেছিলেন।"

আহারান্তে বিশ্রাম করিতে করিতে অমরবাবু প্রশ্ন করিলেন, "সাধুজী আবার কবে সহরে পদার্পণ করবেন?" গুরুজী বলিলেন, "অবতরণের ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু সে পৌষমাসে হ'বে। তখন একদিনের জন্য পাত্রাপাত্র—নির্ব্বিশেষে সকলেই আমার অভয়মূর্ত্তি দেখাব। একটি ছোটখাট সভা করব। সেখানে নানালোকের নানাসমস্যার সমাধান হ'বে ভাগ্য পরীক্ষা হ'বে অনেক অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ পাবে।"

অমরবাবুরা সাধুজীকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মচারীকে শুভকামনা জানাইয়া বিদায় লইলেন। নরেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "আজ যা খেলাম এমন আর খাইনি, যা শুনলাম তা অশ্রুতপূর্ব্বক গূঢ় তত্ত্ব।" নরেশবাবু বসিলেন, "আপনি তো আর সাধারণ পণ্ডিত ন'ন, আপনার পণ্ডা আছে তাই আপনি পণ্ডিত। গুরুজী তো আজ নিজের মুখেই বলেছেন যে আপনারাই গিরিডির নির্দ্দোষ প্রাণী!"

ষ্টেশন পর্য্যন্ত মনখোলা সদালাপ চলিল। ট্রেইন আসিলে অমরবাবুরা বাড়ী ফিরিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সারা পূজার ছুটিটা গিরিডিতেই কাটাইলেন। লোকমুখে ব্রহ্মচারী যুবকটির উৎকট তপস্যার কথা মধ্যে মধ্যে শুনা যাইত। গিরিডি ছাড়িবার সময় হইলে পণ্ডিতমহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন যে, শীতকালে বড়দিনের ছুটিতে আবার আসিবেন। অমরবাবুও বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় না আসিলে পৌষমাসে সাধুজীর সভাটা অমরবাবু একাএকা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইবেন না। ব্রহ্মচারীর তপস্যার পরিণাম কি হয় তাহাও দেখা দরকার।

একটি অপরাহ্নে

(আলোচনা)

শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায়।

যে প্রতিভা সর্বতোমুখী তার সম্যক্ পরিচয় সাধ্যায়ত্ত নয়। আবার একটা দিকের উৎকর্ষ অন্যদিককে মলিন করে রাখে। যাকে যুদ্ধবিষাণ বাজাতে দেখি তার হাতে বাঁশের বাঁশীর ধারণা অনেকেই করেনা।

সজনীকান্তের রচনা বহুমুখী। 'নির্ম্মম সমালোচক' হিসাবে সাধারণ তাঁকে দেখতে অভ্যস্ত তাই তাঁর অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা বহু সুধী ব্যক্তির দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। 'রাজহংসের' অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি যে 'শনিবারের চিঠি-র তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্কনিপুণ, ভীতিপ্রদ সমালোচকের লেখনীপ্রসূত, সেকথা বিশ্বাস করা সুকঠিন তাতে, সন্দেহ নেই। আবার 'কেড্‌স্‌ও স্যাণ্ডালের ব্যঙ্গবিদ্রূপও যে রাজহংসের' সুদূরবিলাসী কবিমনের ভিন্ন অভিব্যক্তি, তাও হয়ত অনেক সময়ে বিস্ময়ের উপাদান জোগায়।

রঙ্গব্যঙ্গ কবিতার আদি ইতিহাস আলোচনা করবার প্রবৃত্তি নেই। বহু মনীষীর রচিত সাহিত্য সমাচার প্রভৃতিতে সে বিষয়ের আদ্যন্ত আলোচনা লক্ষিত হবে, এবং যদিও Bernard Shaw তাঁর একটী চরিত্রের মুখে বারংবার বলেছেন—"Value is a matter of comparison"— তবু আমরা তুলনামূলক সমালোচনার প্রচেষ্টা কোরব না। কেবল 'কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল' পড়ে যে আনন্দ পেয়েছি তারই কিয়দংশ পাঠকবৃন্দকে বণ্টন করা যাবে।

নিরালা দ্বিপ্রহর—মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে অথচ প্রিয়জনের আলিঙ্গনের মত শৈত্য দেহমন শয্যা ও পরিধেয় আশ্রয় করেছে। কাগজে আসন্ন বোমাপতনের স্থাননির্দেশ, সন্ধ্যার সঙ্গে নিষ্প্রদীপাবস্থার ভীতি। অসহ্য লাগে! আলমারী থেকে একখানা সরু লম্বা বই টেনে নিলাম, চোখে পড়লো—

"আজিকে হঠাৎ পেয়ে তব লিপি
ভাবি, আমরি!
বোতলে কাসন, খোল তার ছিপি
যতন করি—
ছাতে লয়ে গিয়ে দেখিছ তাহাতে পড়েছে ছাতা,
'আহা-অহো' কর খানিক চিবাও ঝিয়ের মাথা,—
অথবা হইয়া উবু, বামহাতে দোক্তাপাতা,
দিতেছ বড়ি,
অথবা দেখিছ বেগুনের ক্ষেতে উইয়ের ঢিপি,
প্রাণেশ্বরী!"

মুহূর্তের মধ্যে ক্ষণ-বিরক্তি অপসারিত হোল। সহসা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে কার্ণিশে সমাসীন বায়স-কুলের ত্রাস উৎপাদন কর্‌লাম। বইখানি সজনীকান্তের 'কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল'।

চিত্রেরও সমাবেশ প্রচুর। বিমুখী পত্নীর পার্শ্বে স্থূলাঙ্গ ভর্ত্তা যোড়করে মিনতি করছে—

"মান ত্যাগ করো ওগো মানিনী,
বিবাহ অবধি হাম্ জপিনু তোমার নাম,
তোমাছাড়া কাহারেও জানিনি।

* * * *

ভয় করি নাকো তব চোখে রোষবহ্নি,
যতকাল তুমি প্রিয়া অকরুণ তন্বী—
ভয়ে নয়, ছল করে মাঝে মাঝে কোন্‌নি।"

আবার হাসি আস্‌লো। বায়সকুল এবার সবেগে স্থানত্যাগ করে দুর্জ্জনকে দণ্ড দিল। পড়ে চল্লাম ক্রমাগত—

"তাইতো মশাই তাইতো
শালা বলে ডাক্‌ব এমন পাত্র একটা চাইতো।" (নজির)

তারপর—"যে গাছ লতায়, লতা নয় তার বন্ধন,
ভাল সই চোখাচোখি, দূর ফুলচন্দন।
যদি দিয়ে ফুলবড়ি স্থক্ত ও চচ্চড়ি
বাঁধে কেউ, বলব যে, জানেনা সে রন্ধন।" (পাঁশনে)

খেলাচ্ছলে আধুনিকাদের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। চমৎকার!

কয়েকটি গল্প দেখলাম কবিতায় লেখা। শেষ পর্য্যন্ত গল্পের আখ্যানস্থাপনায় কৌতূহল ধরে রাখা গেছে, চরিত্রগুলিও সুস্পষ্ট। সাহিত্যজীবনে সজনীকান্তের কথাশিল্পে দক্ষতার কথা মনে পড়ে যায়। 'প্রাইভেট টিউটর' পড়লাম—

"প্রথম পুরুষ প্রথম নারীর প্রথম পেল দেখা।
এই শ্রীমতী পান্নাময়ী? ছ্যাবলা বাচাল ন্যাকা—
এক নিমেষে বদলে গেল সবই পূর্ব্বাপর,
রোমশ হেশের বুকের মাঝে জাগল প্রেমিকবর।"—ঊর্দ্ধশ্বাসে শেষ করলাম

প্রেমিকবরের পরিণতি— "* * * কিন্তু হঠাৎ হেশ
মির্জ্জাপুরের মেশ ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ!"

'কুমার অসম্ভব' কাব্যতে বিভিন্ন ছন্দের লীলায়িত গতি চীৎকার করে পড়ে উপভোগ করবার মত। হাতের কাছে এমন কোনও বন্ধু নেই যাকে পড়ে শুনিয়ে একসঙ্গে হাসাহাসি করি। সুতরাং

একলাই পড়ে যেতে লাগলাম, একা ঘরে একলাই হেসে যেতে লাগলাম। অবশেষে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে সুকুমার রায়ের হিজিবিজ্‌বিজের অনুসরণ করলাম। হাস্যধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অনুসন্ধান কর্ত্তে এল উঁকি দিয়ে যে কি এমন মজার দ্রব্য থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। আমার হাতে শক্ত মলাটের বই দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। ভাবলাম ওকেই ডেকে শোনাই, ও হয়তো বুঝলেও বুঝতে পারবে বিভিন্ন ছন্দের সাবলীল মায়া নৃত্য। ডাকলাম "খোকন, শোনো।" সে ভ্রূক্ষেপও করলো না।

কিন্তু খোঁচাও আছে—'Not a rose without a thron'. দুই চারিটি ব্যঙ্গকবিতা অতি সূক্ষ্ম বিদ্রূপে কণ্টকিত। শাণিত ফলকের মত তারা আঘাত করে যায়—আহত স্থান কোন ওষধি-লেপনেই নিরাময় হয়না। ব্যঙ্গ কবিতায় এবং বিদ্রূপে এরকম হাত বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই বল্লে, জানি অত্যুক্তি হবেনা। অসাধারণ মস্তিষ্ক এবং অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভিন্ন লক্ষ্য এত নির্ভুল হয়না। নির্ম্মমতা হয়তো দেখা যায়, কিন্তু নির্ম্মম হওয়াই যে Satire এর ধর্ম্ম। রুচিবিকারের দোষে অনেকে 'কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডালের' কবিকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু আবার বলা যাক্—"Call a rose by any name it will smell as sweet". স্থানে স্থানে হয়তো রস ফিকে হয়েছে, কিন্তু কখনই তা অন্তঃসারশূন্য তরলতা অথবা 'ভাঁড়ামিতে' রূপান্তরিত হবার অবকাশ পায়নি। কবিতার একটি ছত্র উদ্ধৃত করে তৃপ্তি আসে না, সমগ্র কবিতাটি পাঠকমণ্ডলিকে উপহার দিতে ইচ্ছা করে। আমাদের সাহিত্যে হাস্যরসের কবিতা এত কম এবং প্রকৃত হাস্যরসিক এত দুর্ল্লভ যে মাঝে মাঝে হাসবার প্রয়োজন বোধ করলে বিব্রত হই, তখন এইরকম পুস্তক হাতের কাছে থাকলে হয়তো সে হাসি দূরবর্তী থাকেনা।

কবিতাগুলির নায়কের বিভিন্ন 'mood' ছন্দের ও শব্দবিন্যাসের দক্ষতায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

"তোমারে বারণ করি তার সাধ্য তো নাই,
তুমি যাবেই যখন,
দূর বাবলাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদটাই
মিছা জাগায় স্বপন।"
(উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা)

অথবা "লয়েছিনু টানি রেশমী সূতায়
ছিন্ন কন্থা সীবনে,
রাজকুমারীরে কামনা যেনরে
ক্লরিল বন্য গিবনে" (কাকময়ূরম্‌)

লালিকাগুলি ও চলতি ছন্দাদি অনুরচনায় অসামান্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং সর্ব্বত্র মৌলিকতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 'কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল' কবিতাটিতে কেবল কয়েকজোড়া পাদুকার গতিবিধি

বর্ণনা করে কবি একটি প্রেমের বিয়োগ দেখিয়েছেন। শেষে হাস্যকবিতার লঘু কাঠামোতেও অনুতপ্ত পিতার বেদনা বড় সুন্দর স্পর্শ লাভ করেছে—

"ঠঠনিয়ার শুঁড়তোলা জুতা, শুঁড় আরো গেছে বেঁকে,
লোকের ধারেতে কাঁদে ঠঠনে চটি।"

হঠাৎ আবার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। অপরাহ্ন বিদায়ের দিকে, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলবে মুমূর্ষু আলোগুলো। পাতা উল্টোতে চোখে পড়লো—

"মোটের ওপর ভরসা করে থেকোনা কলকাতায়—

* * * *

কিছুই সঙ্গে টিকবে নাকো শিকেয় সবই তুলে রাখো,
খাকি খেঁকী আসছে লাখো, ফেলবে সবই গিলে।" (নববিধান)

কি সর্ব্বনাশ! যে চিন্তা এড়াতে চাই ভিন্ন পরিবেষ্টনীতে এখানে যে সেই অবস্থারই সঠিক বর্ণনা! অথচ বহুদিন পূর্ব্বের লেখা, তখনো তো শান্তির রাজত্ব ছিল! প্রতিভা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দেখ্‌ছি।

সভয়ে পাতা উল্টে গেলাম—

"ত্রিভুবন আজ উৎফুল্ল
এক হ'ল দুই উদ্‌ভ্রান্তে,
ভঙ্গুর জীবনের মূল্য
একলাটি কে পেয়েছে জানতে? (চলন্তিছন্দ)

কি বুঝলাম ঠিক বলতে পারিনা। সহসা আমিও উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লাম।

'কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হোলনা বুঝছি, কিন্তু এর জন্য দায়ী 'কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল'। এত আনন্দ হয়!

সুতরাং স্তিমিত অপরাহ্ণে বইখানি সযত্নে যথাস্থানে রেখে অত্যন্ত লঘুচিত্তে একপেয়ালা কড়া চায়ের ফরমাস দিলাম। তবু এইসব কবি আছেন বলে জগৎকে কখনো কখনো হাস্যমুখর রঙ্গশালা বলে ভ্রম হয়।

সভ্যতার খেদোক্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

দস্যুরমনে জেগেছে অনুশোচনা,
লাগে দুঃসহ লুণ্ঠনভার, কি গূঢ় পরিবেদনা
গুমরি গুমরি উঠিছে কেবল ভূকম্প সম বুকে,
বলিতে পারে না মুখে।
বহুমিথ্যার ছলে ব্যাভিচারে ভ্রষ্টা রসনা যার,
সহজ সরল অকপট বাণী
অহল্যা সম হয়েছে পাষাণী
জিহ্বা জড়িমাহতা,
কাঁদে অন্তরে অবচনে মূক ব্যথা।
শুধু যদি একবার
মুক্ত করিতে পারিত সে হাহাকার,
বচনে না হোক্ উচ্ছল ক্রন্দনে
অকথিত তার মর্মবারতা বুঝিত জগৎজনে।

ওগো কোথা তুমি শ্যামরামরঘুমণি
পতিত পাবন, ঘুচাতে পারো এখনি
দুর্বিসহ এ অন্তর্গূঢ় যাতনার গুরুভার
পদপরশে তোমার।
মিথ্যার জালে মজেছি আপনি মজায়েছি চরাচর
সাধারণ আপামর।
দুষ্কৃতিময় মোর ইতিহাস
নিরীহজনের চিরসন্ত্রাস

রক্তাক্ষরে লিখা,
কত দেশে কালে মোর বহ্নির শিখা
রাবণের চিতা সম
জ্বলে নিরবধি, সেই সাথে বুকে মম
নিরয়বহ্নি জ্বালিয়াছি নিজ হাতে,
নিভিবে কি কভু অনুশোচনার পাবনী অশ্রুপাতে ?

প্রায়শ্চিত্ত করিব কেমন করি,
মুক্তির পানে যাব কোন পথ ধরি ?
নিঃস্ব যাহারা মুমূর্ষু যারা আমার অত্যাচারে,
তাদেরে রক্ষিবারে
এ পাপের ধন নিঃশেষে যদি করি আমি বিতরণ
হইয়া অকিঞ্চন,
আর্তত্রাণে রাক্ষস নাশে
এই বাহু মোর যদি কাজে আসে
তবে কি সবার সনে
নবজীবনের মৈত্রীর বন্ধনে
বাঁধা রব নিরবধি ?
পূর্বাপরাধ ধৌত করিবে পাপীর অশ্রুনদী ?
ঘোর কলিশেষে আগামী ভবিষ্যতে
নব সবিতার আলোক প্লাবিবে তমোঘন এ জগতে ?

আমাদের কথা

আমরা ক্রমশ দুর্যোগের কালো ছায়ার মধ্যে দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। মনে পড়ে, কলিকাতায় প্রথম যখন নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা হয় তখন "দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিতা''—"সুন্দরী পুরীর" মলিনরূপ সহসা যেমন দৃষ্টিকটু লেগেছিল আজ আমাদের চোখে তেমন আর লাগেনা, বরংচ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি, এমন তারার সাজ, এমন জ্যোৎস্নার রূপালী বসন কলিকাতার আকাশকে আর কখনও কি ধারণ করতে দেখেছি? সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা দূরান্তরিত হয়ে পড়ে,—চন্দ্রমাশালিনী, তারাহারা রজনী কি অগ্নিবর্ষণ করে? কিন্তু কারো কারো কপালে আজ সত্যসত্যই "সসধর বরিখত আগি।"

বিপদ সত্যই কোথায় এবং কতখানি সে কথা শান্তভাবে বিচার করবার সময় আজ এসেছে। কলিকাতায় যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে বলবেন যে ধোপানাপিত, চাকরঠাকুর, মেথরমুচীর অভাব এবং অবশ্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিই তাঁদের পক্ষে আপাতকালের সবচেয়ে বড় বিপদ। বোমা এখনও পড়েনি, হতাহতের ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখীন এখনও আমরা হইনি কাজেই সে বিপদ এখনও প্রত্যক্ষ নয়, বিপদের আশঙ্কামাত্র।

সেই আগামী বিপদের জন্য প্রস্তুত হবার মোহড়া চারিদিকে চলছে। 'এ-আর-পি'র সরকারি প্রচেষ্টা তো রয়েছে উপরন্তু প্রায় সকলেই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নানাভাবে উদ্যোগী হচ্ছেন। গৃহে গৃহে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যক্তিগত ভাবে 'এ-আর পি' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা এবং তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কথা গতমাসে উল্লেখ করেছিলাম। তারপর রেঙ্গুনের বোমাপতনের ব্যাপার থেকে যে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার দ্বারা বোঝা গেছে যে রাজকীয় ব্যবস্থা যতই সুপরিচালিত হোকনা কেন বোমাপতনের পর জল, আলো, খাদ্য ও ঔষধপত্রাদির অভাব ঘটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী এইজন্য অনেকে ঘরে খাদ্য, ঔষধাদি সংগ্রহ করেছেন এবং টর্চ, মোমবাতি, কেরোসিনের আলো প্রভৃতির বন্দোবস্ত ও বড় পাত্রে অথবা ট্যাঙ্কে কিছুটা খাবার জল সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থার কথা ভাবছেন, এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ব্যাপক ফল পাওয়া যেতে পারেনা বলে কেউ কেউ দলবদ্ধভাবে সমবায়ব্যবস্থারও চেষ্টা করছেন।

পূর্বেই বলেছি সামান্য সামান্য কয়েকটি অসুবিধা ব্যতীত আমাদের বিপদ উপস্থিত বিপদ নয়, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন ব্যক্তির দল আমাদের সম্মুখে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হচ্ছেন। রেঙ্গুনে বোমাবর্ষণের পর অনেকে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং আসছেন। এঁদের জাহাজ সপ্তাহে দুইদিন কলিকাতায় আসে। সেই জাহাজের যাত্রীদের অবস্থা নানা দিক দিয়ে শোচনীয়। প্রথমত জাহাজে খাদ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা না থাকাতে তাঁরা অনাহারে, অল্পাহারে পীড়িত হয়ে আসছেন বলে

পৌঁছাবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থার নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তারপর অধিকাংশ লোকই পালিয়ে আসবার সময়ে টাকাকড়ি, কাপড়চোপড়, কিছুই সঙ্গে আনতে পারেননি, অনেকে 'এককাপড়ে' চলে এসেছেন, তাঁদের আশু অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই সব কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন কিন্তু অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে তাঁদের কাজ আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারছেনা। মেয়েদেরও এ সম্বন্ধে কর্তব্য আছে। আমরা চাঁদা তুলে অর্থ সাহায্য করতে পারি; তাছাড়া যে সমস্ত মহিলা সন্তানাদি নিয়ে বিপন্ন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসে পৌঁছাচ্ছেন তাঁদের আহার্য পরিবেশন ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করতে পারি। আমাদের পাঠিকারা যদি এ পর্যন্ত এ কাজে অগ্রসর না হয়ে থাকেন তবে অগ্রসর হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। যাঁর পক্ষে যে-ভাবে সম্ভব চাঁদা দিয়ে হোক, চাঁদা তুলে হোক, কাজ করে হোক, সাহায্য করুন, এই আমাদের অনুরোধ। মহিলাদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই কাজ করছেন, এবং যাঁরা এখনও কাজ আরম্ভ করেননি তাঁদের মধ্যে অনেকের কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ ও সুবিধা আছে। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাঁরা সাহায্য করতে ইচ্ছুক কিন্তু কি ভাবে এবং কার কাছে সাহায্য প্রেরণ করতে হবে জানেননা বলে অগ্রসর হতে পারছেননা, তাঁরা যদি আমাদের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন তবে আমাদের যতদূর সাধ্য সংবাদাদি দেবার চেষ্টা করব।

* * * *

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধারম্ভের পর থেকেই ভারতবাসীকে নানারূপ ছোট ও বড় অসুবিধা সহ্য করতে হচ্ছে। মোটরে পেট্রোলব্যবহারের বাঁধাবাঁধি তার মধ্যে একটি। এই ব্যবস্থার কড়াকড়ির পর থেকে এখন অনেক ভদ্রমহিলাকে ট্রাম ও বাসে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে যাঁরা এইসব যানবহনে সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্তা। ফলত, তাঁরা যে-কোন গাড়ীতে উঠে বসে অসম্ভব অসম্ভব স্থানে যাবার দাবী জানাচ্ছেন এবং ভাড়া সম্বন্ধে এমন উদারতা অবলম্বন করছেন যাতে ট্রাম ও বাস কোম্পানীর কর্মচারীরা বিপন্ন হয়ে পড়লেও অন্যান্য যাত্রীদের যে হাস্যরসের খোরাক জুটছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আসন্ন বিপদভীতির মধ্যেও যাঁরা এই হাসবার সুযোগ সৃষ্টি করছেন, জনসাধারণ কি তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন না।

* * * *

গতমাসে আমরা একটি ছোটগল্পের প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম. কিন্তু এ পর্যন্ত আশানুরূপ সহযোগিতা না পাওয়াতে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে অন্তত দশজন মহিলা এতে যোগদান না করলে এই প্রতিযোগিতার পরিচালনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। সেরূপ যদি হয় তবে প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের চাঁদা ও গল্প ফেরৎ দেব; অবশ্য তাঁরা যদি অনুমতি দেন তবে তাঁদের গল্প মনোনীত হলে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মেয়েদের কথায় ছাপাব।

* * * *

মেয়েদের কথার প্রথম বর্ষ যে পূর্ণ হয়ে এল এ কথা আজ আমরা স্মরণ করছি ও আমাদের গ্রাহিকাদেরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আগামী বৎসরে যাঁরা গ্রাহিকা থাকতে চান তাঁরা অনুগ্রহ

করে জানিয়ে দেবেন যে তাঁদের চাঁদা তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন, না আমরাই পত্রিকা ভি পি করে পাঠাব। যাঁরা আগামী বৎসর গ্রাহিকা থাকতে ইচ্ছুক নন তাঁরাও যেন পয়লা বৈশাখের মধ্যে আমাদের জানিয়ে দেন, কেননা সেই সময়ের মধ্যে আমরা যাঁদের কাছ থেকে কোন খবর পাবনা তাঁদের কাগজ ভিপি করে পাঠান হবে। ভিপি ফেরৎ এলে আমাদের বড় ক্ষতি হয় সেইজন্য এ মিনতি আমরা সবার কাছে করছি। যাঁরা আগামী বৎসর প্রথম ছয় মাসের জন্য গ্রাহিকা হতে চান তাঁরাও যেন দয়া করে আমাদের সে কথা জানিয়ে দেন, নতুবা আমরা সাধারণ নিয়মানুসারে পূরো বৎসরের দামে কাগজ ভিপি করে দেব। যান্মাসিক গ্রাহিকা হওয়ার একটা অসুবিধা এই যে তাতে বৎসরে দুইবার ভিপি গ্রহণ করার দরুণ গ্রাহিকার ডাকের খরচ দ্বিগুণ হয়।

এরমধ্যে কেউ কেউ আমাদের মৌখিকভাবে পত্রিকার অপ্রাপ্তি সংবাদ অথবা ঠিকানার পরিবর্তন জানিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই একবার 'মেয়েদের কথা'র পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছিলাম, আবার সবিনয়ে জানাচ্ছি যে চিঠি না লিখলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চিঠি পেলে সেখানা আপিসে 'ফাইল' করে রাখা যায়, কিন্তু মৌখিক সংবাদ ভুলে যাওয়া অত্যন্ত সহজ।

কলিকাতানগরে সংকটঘোষণার ফলে আমাদের অনেক গ্রাহিকা স্থানত্যাগ করেছেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেকে করবেন বলে আমরা মনে করছি, তাঁদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে তাঁরা যেন তাঁদের নূতন ঠিকানা আমাদের জানাতে না ভোলেন।

* * * *

যুদ্ধজনিত আর্থিক সংকটের দরুণ বর্তমানে পত্রিকার পরিচালনা যে কত কঠিন হয়ে পড়েছে সে কথা গতবার আলোচনা করেছিলাম। বর্ষারম্ভের প্রাক্কালে তাই গ্রাহিকা ও পাঠিকাদের সহানুভূতি এবং সহায়তা ভিক্ষা করছি। আমাদের শুভানুধ্যায়িনীদের নিকট এই নিবেদন করি যে যাঁদের গ্রাহিকা হওয়া সম্ভব এমন কয়েকজন করে মহিলার নাম ও ঠিকানা যেন তাঁরা দয়া করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরূপ সহায়তা গত বৎসর অনেকের নিকট পেয়েছি, আগামী বৎসরেও কামনা করি। আমাদের কোন গ্রাহিকা, অথবা যে কোন মহিলা যদি একসঙ্গে চারজন নূতন গ্রাহিকার নাম ঠিকানা সমেত বাৎসরিক চাঁদা (১২৲) আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাঁকে এক বৎসরের পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

'মেয়েদের কথা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালী মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগস্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি আমাদের উদ্দেশ্য সমূহের অন্তর্গত বলে প্রকাশ করেছিলাম। মাসিক পত্রিকা কিনে পড়ার মত অবস্থা অধিকাংশ বাঙালী মহিলার নয় বলে 'মেয়েদের কথা'র আয়তন ও বাহিরের চাক্‌চিক্য অপেক্ষা তার মূল্যের সুলভতার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়েছিলাম। এই অল্পমূল্যের পত্রিকা কেনাও যাঁদের সাধ্যের বহির্ভূত তাঁদের হাতে যাতে এ কাগজ পৌঁছায় সেই উদ্দেশ্যে মহিলাসমিতিসমূহকেও আমাদের পত্রিকা গ্রহণ করবার

জন্য অনুরোধ করেছিলাম; কিন্তু আমরা জানি যে গরীব বাঙালী মহিলাদের সমিতিগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই অতিশয় দরিদ্র সেই জন্য যে মহিলাসমিতির সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছে আমরা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হয়ে বিনামূল্যে অথবা অর্ধমূল্যে এবং বিনাব্যয়ে তাঁদের কাছে পত্রিকা পাঠিয়েছি। গতবৎসরে অনেকগুলি মহিলা প্রতিষ্ঠানকে আমরা এরূপভাবে পত্রিকা দিয়েছি এবং এরূপ কোন দরিদ্র সমিতি যদি আবেদন করেন তো আগামী বৎসরের পত্রিকা পাবেন।

যে-সব মহিলা সমিতি অর্ধমূল্যে কাগজ পাচ্ছেন তাঁরা যদি পয়লা বৈশাখের মধ্যে টাকা না পাঠান অথবা কোন খবর না দেন, তবে বৈশাখ মাসের পত্রিকা ভিপি করে পাঠান হবে। সেই সময়ে ১৶০ দিলে সমস্ত বৎসরই তাঁরা কাগজ পাবেন।

সে সব সমিতিকে আমরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাঠিয়ে থাকি তাঁরা আগামী বৎসরও পত্রিকা চান কিনা দয়া করে আমাদের জানাবেন, নতুবা তাঁদের কাগজ পাঠান আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এখনও 'মেয়েদের কথার' আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল হয়নি যাতে বিনামূল্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক পত্রিকা বিতরণ করা যেতে পারে, সেইজন্য গতবৎসর যে সব সমিতিকে বিনামূল্যে পত্রিকা প্রেরণ করা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে কোনটির যদি একবৎসরের মধ্যে এতটুকু অবস্থার উন্নতি হয়ে থাকে যাতে পত্রিকার ডাকের খরচা (বৎসরে।০) অথবা আংশিক মূল্য দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেটুকু যেন তাঁরা আমাদের দয়া করে পাঠিয়ে দেন। এরূপ সহযোগিতা পেলে আমাদের পক্ষে অন্যান্য মহিলা সমিতির মধ্যেও ব্যাপকভাবে পত্রিকা প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

গতবৎসর গ্রাহিকা পাঠিকা এবং কোন কোন লেখক ও লেখিকা আমাদের রচনা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ সহয়তা আমরা আশাতীতরূপে পেয়েছি এবং যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আগামী বৎসরও এরূপ সহায়তা কামনা করি। কোন কোন মান্যগণ্য ব্যক্তি পত্রদ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার উপযুক্ত ভাষা আমাদের নাই। যে সব পত্র আমরা পেয়েছি সেগুলি ক্রমান্বয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করবার সংকল্প করেছি।

ছায়া-ছবি

★

পরিচালিকা

বসন্তসেনা

সিনেমায় যোগদান করা বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে ভালো কি মন্দ, গত সংখ্যায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। এ-সংখ্যা থেকে যে-বিষয়ে আলোচনা সুরু হ'ল, এই আলোচনার আসরে আমরা পাঠিকাদের যোগদিতে অনুরোধ করছি।

চলচিত্র-শিল্প পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প এবং ব্যবসায় পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ টাকা এই ব্যবসাতে খাটছে। শুধু অর্থ নয়, ইয়োরোপ এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে অধিকাংশই এই শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলাদেশেও এই সিনেমা-শিল্পটি একটি Growing industry কম পক্ষে ৪৫ হাজার লোক এই সিনেমা-শিল্প থেকে জীবিকা অর্জন করছে! আমেরিকার তুলনায় বাংলার সিনেমা আজ যত নগন্যই হোক্, এর সামনে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তা' অস্বীকার করা যায় না। টাকাও ও খাট্ছে নেহাৎ অল্প নয়, হিসেব করলে কয়েক কোটির বেশীই হবে।

এখন কথা হচ্ছে, টাকা আছে, গুণী পরিচালক, নিপুণ টেক্‌নিশিয়ান আছেন, ভালো গল্পও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, তবু বাঙলা ছায়া-ছবি বিদেশের তুলনায় এত নিম্নস্তরে পড়ে' রয়েছে কেন? অভাব কিসের? ভেবে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, প্রধান অভাব সুশিক্ষিত সুরুচি সম্পন্ন শিল্পীর, অর্থাৎ চিত্র-নট ও চিত্র-নটীর।

ধরুণ, সত্যকার একটি ভালো গল্প পাওয়া গেল। গুণী পরিচালক সেই গল্পের চিত্র-নাট্য রচনা করলেন নিখুঁতভাবে। প্রথম শ্রেণীর টেক্‌নিশিয়ানও নিয়োগ করা হ'ল এবং প্রযোজক বললেন, এই রৈল আমার টাকার তোড়া, ছবি কিন্তু প্রথম শ্রেণীর হওয়া চাই, যাতে শিক্ষিত সমাজ দেখে মুগ্ধ হয়!

সবই তো পাওয়া গেল, কিন্তু প্রতিভাশালী পরিচালক, টেক্‌নিশিয়ান এবং অর্থশালী প্রযোজক — এঁরা সবাই ত' থাকবেন নেপথ্যে, চিত্র-নাট্যের চরিত্র গুলিকে যাঁরা রূপালি পর্দ্দায় প্রত্যক্ষ রূপ দেবেন, তাঁরা কই? সেই রূপদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী? শিক্ষিত ভদ্রসমাজ কোনো সাড়া দিল না। নায়ক-নায়িকা যারা এল, তাদের না আছে শিক্ষা-দীক্ষা, না আছে রুচি ও রসবোধ। তবু, তা'দেরই মুখে রঙ মাখিয়ে, পোষাক পরিয়ে ক্যামেরার সাম্‌নে দাঁড় করানো হ'ল। পরিচালক প্রাণপণে নায়ক-নায়িকার চরিত্র বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছবি যখন তোলা শেষ হ'ল, তখন দেখা গেল, হায়, শিব গড়্‌তে বাঁদর হয়েছে!

এর যা' অনিবার্য্য ফল, তা'ই হ'ল। অর্থাৎ পরিচালকের নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল এবং প্রচুর টাকা লোক্‌সান করে' প্রযোজক অতঃপর পাট বা তিসির কারবারে মন দিলেন, এইভাবে বাঙলার সিনেমা-শিল্প এক সময় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অবশ্য সম্প্রতি ভদ্রঘরের কয়েকজন শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা সমাজের অনুশাসন ডিঙিয়ে সিনেমায় যোগদান করেছেন। এর ফলে কয়েকখানি এমন বাঙলা ছবি আমরা পেয়েছি, যা' ভদ্র সমাজের 'পাতে' দেওয়া চলে। সমাজের অনুশাসন অস্বীকার করে' যে বিদ্রোহী ভদ্রবংশজাত নট-নটীর দল চিত্রাভিনয়কেই সাধনা ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভালো করেছেন কি মন্দ করেছেন, এই হ'ল আমাদের আলোচ্য বিষয়। এর স্বাপক্ষে যেমন যুক্তি আছে, তেম্‌নি বিপক্ষেও যুক্তির অভাব নেই। সেই সকল যুক্তি তর্কের অবতারনার পূর্ব্বে এ-কথাটা আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, শিক্ষিতা ভদ্রবংশের মেয়েরা সিনেমায় যোগদানের ফলে বাঙলা সিনেমা যেমন অনেকটা উন্নতির পথে এগিয়েছে, তেম্‌নি শিক্ষিতা মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটা নতুন রাস্তাও খুলে গেছে এবং সে-রাস্তা সংকীর্ণ গলি নয়, প্রশস্ত রাজপথ।

আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আরো আলোচনা করা যাবে।

"মেয়েদের কথার" নিয়মাবলী

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ৩১ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।৵০ আনা; ষাণ্মাষিক মূল্য ১॥০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৵০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে "মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের **১৫ই তারিখের মধ্যে** ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। **গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।**

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েদের কথা
চৈত্র
১৩৪৮
প্রতি সংখ্যা
।০ আনা
বার্ষিক ৩
গরম কাপড়, শাড়ী, সুট ইত্যাদি
উত্তম ধোলাই করাতে হ'লে
ক্যালকাটা ডাইং এণ্ড ক্লিনিং কোংই শ্রেষ্ঠ
হেড অফিস— ২১।৩, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
ফোন কলি: ৫৫৭২

১। "মেয়েদের কথার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ভারতবর্ষের সর্বত্র ৩৲ টাকা; ভিঃ পিঃ ডাকে ৩।৵০ আনা; ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ টাকা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৸৵০ আনা। ব্রহ্মদেশের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷০ আনা. ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়না।

২। বৈশাখ মাস হইতে "মেয়েদের কথা"র বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা লইতে হয়।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে 'মেয়েদের কথা" বাহির হয়। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ করিয়া সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে সে সংবাদ জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ প্রত্যেক পত্রেই স্ব স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা ঠিকানা পরিবর্তন করা সম্ভব নহে।

৬। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদিকার নামে "মেয়েদের কথা" কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং প্রবন্ধ মনোনীত হইল কিনা, কিংবা অমনোনীত হইলে তাহার কারণ দর্শান, অথবা মনোনীত হইলেও কোন মাসে প্রকাশিত হইবে—তাহা জানান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েদের কথা

প্রথম বর্ষ | চৈত্র—১৩৪৮ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

উপলপর্ণা ছোট পাহাড়িয়া নদী
তন্বীধারায় ছুটে চলে নিরবধি।
কত লোক আসে যায়
পসরা ল'য়ে মাথায়,
এ পারে ও পারে করে তারা যাতায়াত,
জল মোটে আধ হাত।
হাটিয়ার দিনে সাঁওতাল সাঁওতালী
দল বেঁধে পার হয় সে নদীর আধো জল আধো বালি।

আমিও একেলা সেই পথ দিয়া যাই
জানিনা সাঁতার, পার হ'তে ভয় নাই।
পিপাসা যখন পায়
সে নদীর কিনারায়
বালুকা বিথারে ছোট গহ্বর খুঁড়ি
সরায়ে পাথর নুড়ি,
অঞ্জলি অঞ্জলি তুলে ফেলি ঘোলা জল
বালু ভেদ করি ধীরে জমে' ওঠে স্বাদু জল সুশীতল।

পাতার ঠোঙায় সেই জল লই ভরি'
মিটাই পিপাসা সে অমৃত পান করি'।
ফিরে আসি যবে ঘরে
মন যে কেমন করে
সে ছোট নদীর আতিথেয়তারে স্মরি
খাওয়ালো যে ঠোঙা ভরি
বুক চেরা জল তৃষিত পান্থজনে
স্মৃতির স্বপনে কি মায়া বাঁধনে বাঁধা পড়ি তার সনে।

শিশুর খেলাই কাজ

শ্রীরমা সোম।

আজকাল জাপানি, জার্মানি প্রভৃতি হরেক রকম খেলনায় বাজার ভর্তি। কতকগুলো খেলনার কল ঘুরিয়ে দিলে কত রকম কসরৎ ক'রতে ক'রতে ছুটে চলে, আবার কতকগুলোকে টিপ্‌লে, শোয়ালে কিংবা বসালে নানারকম শব্দও করে। এসব খেলনার চাকচিক্য এবং গুণে যে শিশুই কেবল মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে তা'নয় এমন কি বয়স্করাও অভিভূত হয়। বাজারে এর চাহিদা-ও কিছু কম নয়—বাধ্য হ'য়ে দোকানদার নিত্য নোতুন খেলনা রেখে ক্রেতার মন যোগাতে ব্যস্ত থাকে। তাই অল্প বিস্তর খেলনা প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য কেনা হয়। শিশু প্রথমে খেল্‌নার চাকচিক্য ও গুণে মুগ্ধ হ'য়ে উত্তেজিত হয়, তার ভেতর কি আছে না আছে ভেঙে চুরে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়, মাঝে মাঝে তাকে জোড়া দিতেও চেষ্টা করে। খেলনার প্রতি তার কি রকম আসক্তি বা অনাসক্তি একটু লক্ষ্য ক'রলেই বুঝতে পারা যায় তার খেলার ভেতর দিয়ে। এই ভাবে খেলায় শিশুর আকাঙ্ক্ষা বেড়ে-ই চলে।

খেলার দিকে ঝোঁক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়। সে খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে মায়ের কোলে বর্দ্ধিত হয়, এবং তারই ভেতর দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়, এ'ভাবে তার শিক্ষার শুরু হয়। তাই পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষানায়করা শিশু যাতে দেখে শুনে সকল বস্তুর গুণাগুণ সম্যক ভাবে বুঝতে পারে সে জন্য খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন। বাড়ীতে সে রকম শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা না হওয়ায়, শিশুদের শেখাবার জন্য শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে এবং সেখানে শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো যাতে সহজে পরিচালিত হ'তে পারে তার জন্য শিক্ষামূলক খেলনা রাখা হয়। বাজারের কতকগুলো খেলনা একটু দেখেশুনে কিন্‌তে পারলে, অনায়াসে ছেলেমেয়েদের শেখবার কাজে

লাগান যেতে পারে। খেলনাগুলোর সাধারণ পরিচয় (আকার রঙ ইত্যাদি) লাভ ছাড়া শিশুর স্বাভাবিক (ব্যক্তিগত) নিজস্ব গুণ ও ক্ষমতা খেলনা ব্যবহারে যে ফুটে ওঠে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা দরকার।

খেলনার প্রতি অনুরাগ এখানেই প্রথমে সূচিত হয়। বারবার একই খেলা স্বাধীনভাবে খেল্‌তে পেলে শিশুর যে শুধু নিজের সংস্কৃতির উন্নতি হয় তা নয়, সে তখন চায় সমাজের উপযোগী ক'রে নিজেকে মানিয়ে নিতে। সে প্রথমে তার নির্বাচিত খেলনাটি নিজেই বারবার খেলে, তারপর সে অপর বন্ধুকেও যদি ও-রকম ভাবে খেল্‌তে দেখে তখন সে চায় তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় ক'রতে কখনও বা আগ্রহ দেখায় সাহায্য করতে। এ'ভাবেই শিশু জ্ঞান অর্জন করে।

শিশুর খেলনা নির্বাচন এবং স্বাধীনতা তার জ্ঞান অর্জনের আসল কারণ নয়। সে খেল্‌তে কত সময় দেয় তার শেখার ওপরও নির্ভর করে, এভাবে কেউবা চট ক'রে আবার কেউ বা ঠেকে ঠেকে দেরিতে শেখে। এ'রকম শেখার মধ্যে সে ধীরে ধীরে আস্থাস্থাপন করে; এ সময় সে কোন রকম চাঞ্চল্যও দেখায় না বরং খেলায় আনন্দ বোধ করে। এই পারিপার্শ্বিক আনন্দের ভেতর সে তার অপ্রীতিকর বস্তুগুলোতে ক্রমশঃ অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে আর তার আগ্রহ সহজেই বেড়ে যায়। ছোট, বেলা থেকে এরকম ভাবে অভ্যস্ত হ'লে ভবিষ্যৎ জীবনে বিরক্তিকর বিষয়গুলোকে নিজের মনোমত ক'রে নিতে তাকে বেশি কষ্ট পেতে হয় না। আগ্রহের সঙ্গে তার একাগ্রতা জন্মায়।

একাগ্রতাই শিশুকে নিজের পছন্দমত কাজে নিযুক্ত রাখে একবার যদি শিশু তার নিজের মনোমত খেলনায় মেতে যায়, বাইরের শত বাধাও তাকে অন্যমনা ক'রতে পারে না। তখন তার মন ও-গুলো নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে সে ক্লান্তি বোধ করে না যতক্ষণ না সে তৃপ্ত হয় ততক্ষণ বারবার খেল্‌তে থাকে। এই একাগ্রতার ফলে অলস চঞ্চল ও অমনোযোগী শিশু-ও ক্রমে আরও মনোযোগী হয়। এ-রকমে শিশুর বুদ্ধি-বৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন খেলনা নিজের হাতে স্বাধীন ভাবে দেখে শুনে নিতে পারায় শিশুর খেলনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় হয়। এতে তার ইন্দ্রিয় গুলোর (দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ) প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। যে বিষয়ে তার বেশি ঝোঁক এবং তার প্রকৃতি কেমন তাও সহজে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। এ'ভাবে তার জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলোকে সম্যক্‌ভাবে পরিচালনা ক'রতে পারায় ও-গুলো দিন দিন তীক্ষ্ণতর ও সুসংবদ্ধ হয়।

এ'সব নিজস্ব গুণ শিশুর মধ্যে যাতে সহজে ফুটে উঠ্‌তে পারে তার জন্য বর্তমান শিশু শিক্ষাসংস্কারক ডাঃ মন্তেসরি শিশু শিক্ষালয়ের কাজগুলোকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ ক'রেছেন। শিশুর যাতে ভাল ক'রে অঙ্গ চালনা হ'তে পারে তার ব্যবস্থা ক'রেছেন প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগে আছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, লেখাপড়া ও সংখ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা। শিশুর খেলাই কাজ—আর তারি,

কাজই হ'ল খেলা ; তাই সে শিক্ষালয়ের সব কাজগুলোকে খেলা ব'লে মনে করে, কোন কাজেই তার অবসাদ নেই, বরং সকল কাজেই তার অফুরন্ত আনন্দ।

ডাঃ মন্তেসরি প্রথমভাগে যে কাজগুলোকে ফেলেছেন, সে গুলো পারিবারিক জীবনে নোতুন প্রাণ সঞ্চার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে শিশুদের ওঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদির ওপর এবং বড় ছোটদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ক'রবে ও কিভাবে কথা ব'লবে তার ওপর দৃষ্টি রাখা। শিশু যাতে স্বাবলম্বী হ'তে পারে এবং নিজের হাতে জামা, কাপড় প'রতে ও জুতোর ফিতে বোতাম লাগাতে পারে তার জন্য কতকগুলো সুন্দর ব্যবস্থা আছে, এর সাহায্যে শিশু নিজে অপরকে দেখে সহজেই ওসব কাজ কর'তে পারে। অপরের জন্য ভাবতেও শেখে কতকগুলো কাজের ভেতর দিয়ে, তাই বাসনপত্তর ধোয়ামোছা, পরিবেশন ইত্যাদি কাজের ব্যবস্থা এই শেখার ভেতর দিয়েই হয়। খেলা-ঘরের সমস্ত কাজের ভারই শিশুর ওপর। এখানে নেই কোন শাসন, নেই কোন আদেশ, নেই কোন বাধা ও ভয়। প্রত্যেকটি জিনিষ তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ক'রে গুছিয়ে রাখ্‌তে তারা সদা ব্যস্ত। নিজের সুবিধার চাইতে অপরের সুবিধাই সে দেখে বড় ক'রে। কাজের শেষে সব জিনিষ গুলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় রেখে সে পায় বড় আনন্দ। গাছপালার যত্ন এবং জীবজন্তুর লালনপালনে শিশুর মনে কতরকম কৌতূহল জাগে, দিন দিন তার জ্ঞান ভাণ্ডার যেমন স্পষ্ট হ'তে থাকে তেমনি আবার কতকগুলো গুণ যেমন সামাজিক রীতি, নীতি, পরোপকার শিষ্টাচার ইত্যাদিতে ভূষিত হয়। এগুলো করবার জন্য তাকে খুব ধীর এবং সতর্ক হ'তে হয়, তবু-ও সে কোন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখায় না।

শিশুশিক্ষালয়ের দ্বিতীয় ভাগে যে কাজ গুলো নির্দেশ করা হ'য়েছে সেগুলোকে কাজে লাগাবার জন্য তিনি কতকগুলো খেলনা তৈরি ক'রেছেন যেমন সিলিণ্ডার, কিউব, লাঠি, বিভিন্ন রঙের চাক্‌তি, ওজন শিক্ষা, জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট কাষ্ঠ ফলক ইত্যাদি। এই খেলনাগুলো শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্যক্‌ভাবে পরিচালনায় সাহায্য করে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বৃদ্ধি করে। এ'সব খেলনার উদ্দেশ্য শুধু আকৃতি গঠন, গুণ ও নামের সঙ্গে পরিচয় করান নয়। বারবার খেলনাগুলো খেল্‌তে খেল্‌তে শিশুর মনোযোগ, যুক্তি ও বিচার শক্তি বেড়ে যায়। যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ তা' সহজেই উদ্দীপিত হয়, এমন কি এগুলোর সাহায্যে শিশু তার অপ্রিয় বিষয়গুলোর প্রতিও অনুরক্ত হয়। এ' খেলনাগুলো আবার শিশুকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ খেলারছলে লেখা পড়া ভাষা ও সংখ্যা শিক্ষায় সাহায্য করে। শিশু যে কিছু শিখ্‌ছে তা' সে আদোবে-ই বুঝতে পারে না, বরং সব কাজে মনোযোগ দেখায়।

শিশুকে প্রথমে বই প'ড়তে না দিয়ে কতকগুলো খেলনার সাহায্যে লেখাপড়া শেখবার জন্য ডাঃ মন্তেসরি যে ব্যবস্থা ক'রেছেন তা' শিশুজগতে এক অভিনব সৃষ্টি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শিক্ষামূলক কতকগুলো খেলনার সাহায্যে-ই শিশুর লেখা-পড়া ও সংখ্যা শিক্ষার সুরু হয়। শিশুদের হাতে বই না দিয়ে প্রথমে জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড এবং সমান মসৃণ, অসমান খস্‌খসে খেলনাগুলো

কয়েকটি প্রয়োজনীয় মন্তেসরি খেলনার ছবি
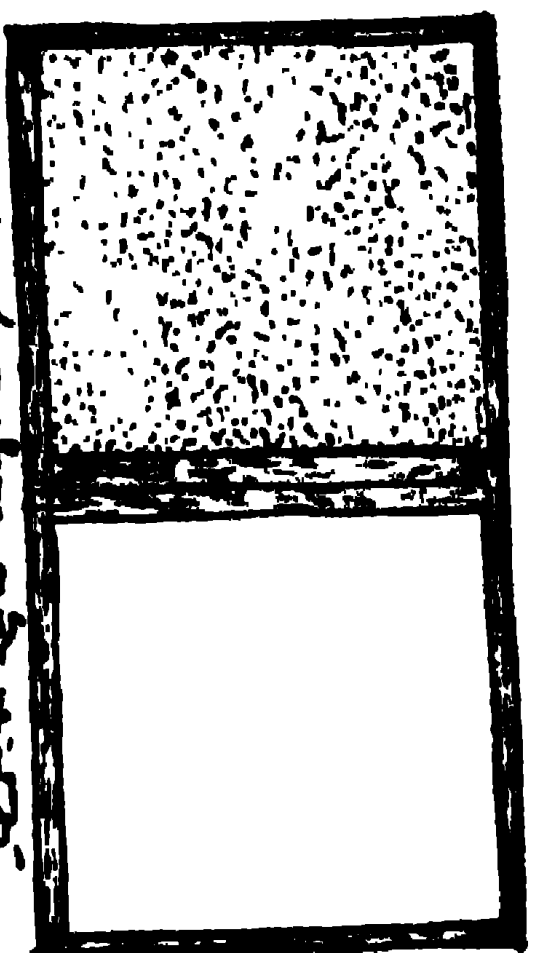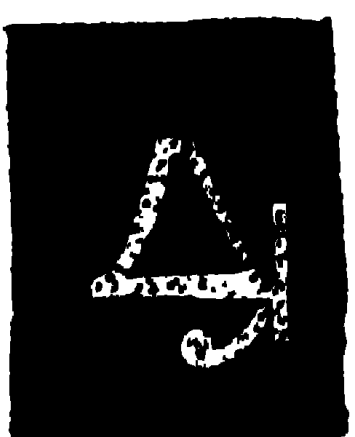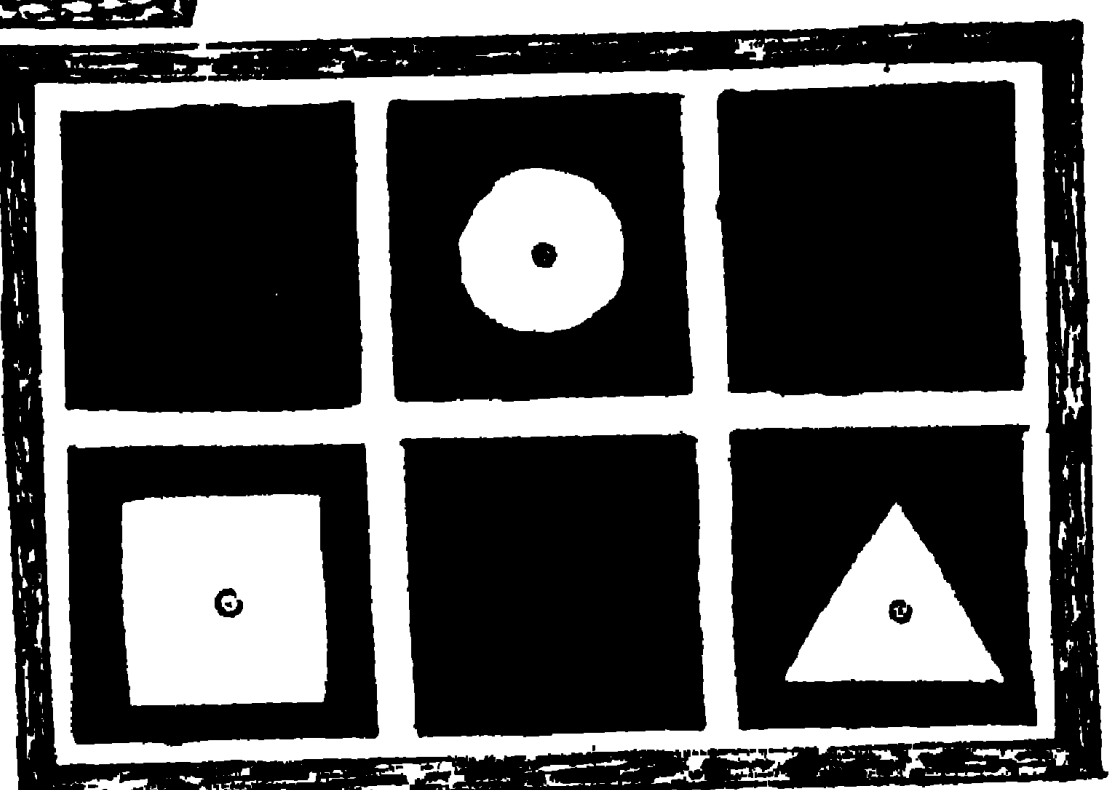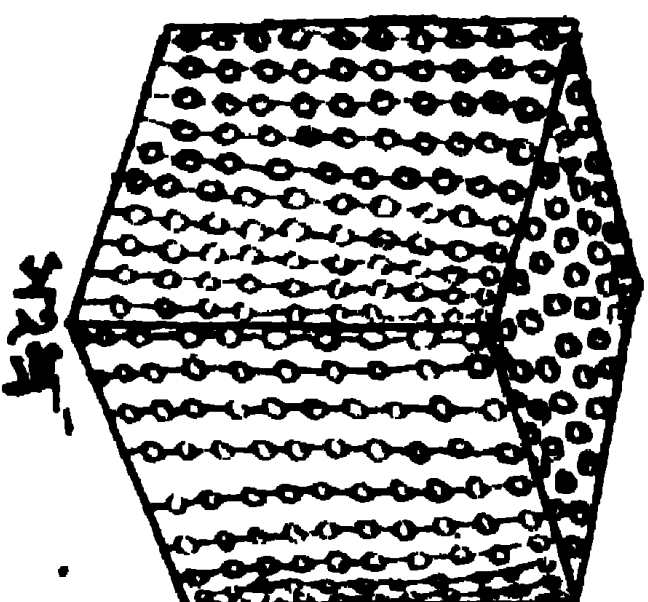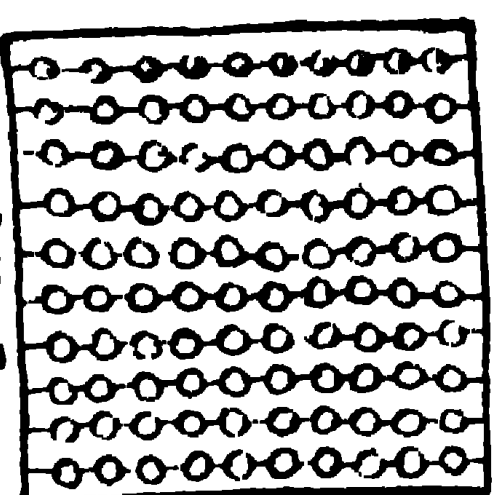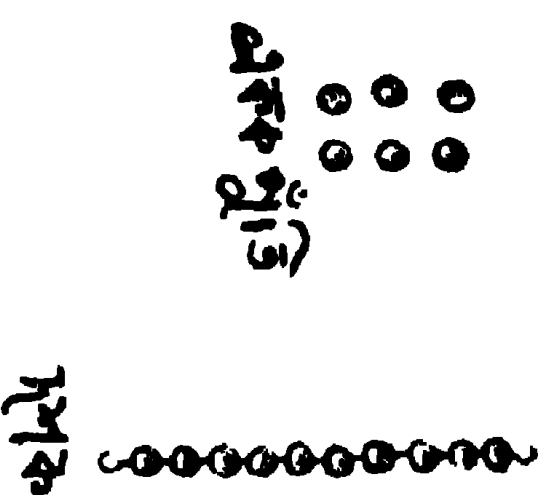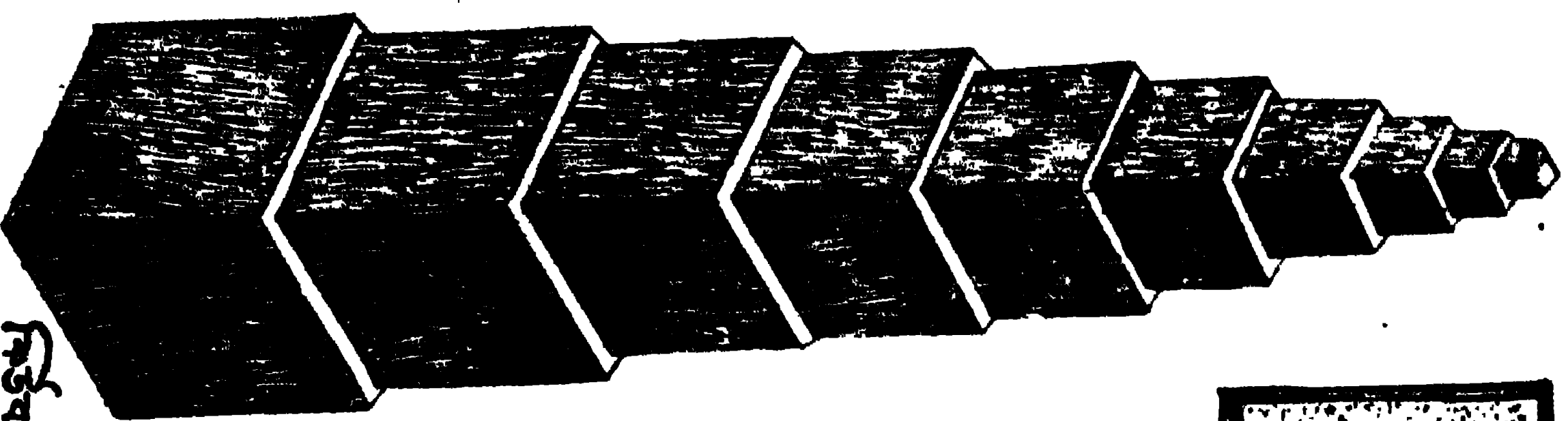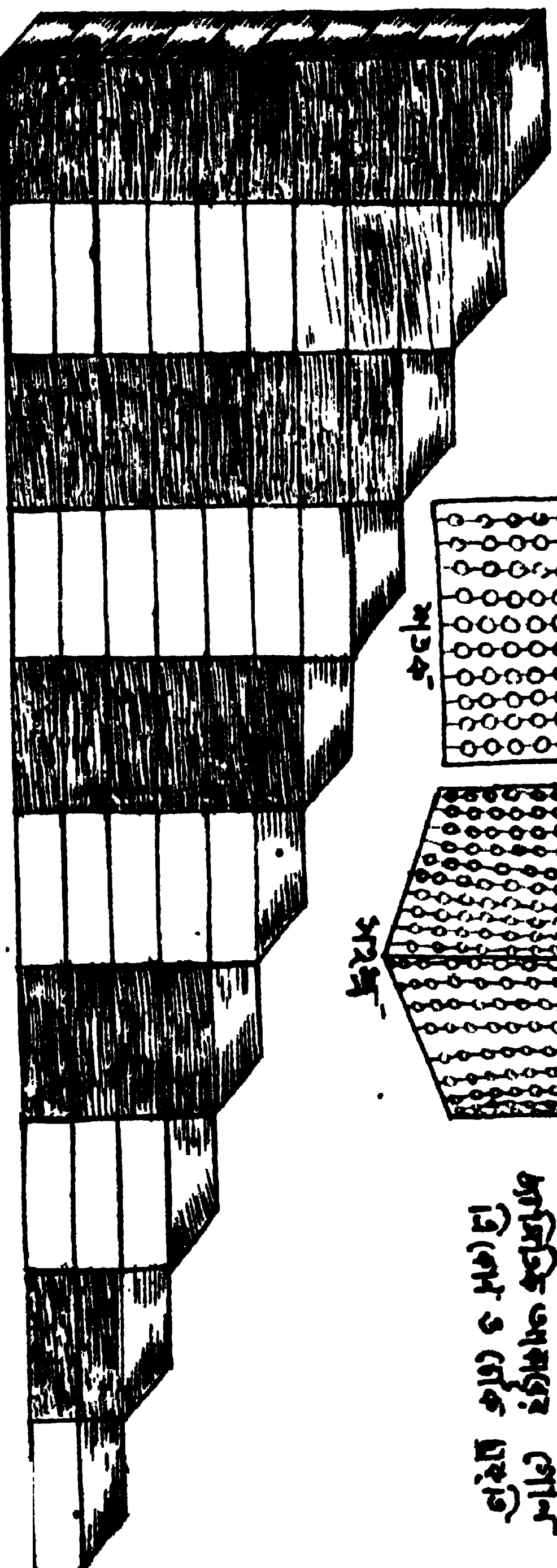
খেলতে দেওয়া হয়। খেলনাগুলোর ওপর আঙুল বুলাতে বুলাতে শিশু ও-গুলোর তফাৎ বিশেষভাবে বুঝতে পারে; এমন কি চোখ বুজে জিনিষগুলোর নাম বলে যায়।

তাই ডাঃ মন্তেসরি দু'রকম রঙীণ মোটা পিচবোর্ডের ওপর স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের শিরিষকাগজের কাটা অক্ষর তৈরি ক'রেছেন। দু'টি রঙ্ শেখাবার উদ্দেশ্যে শিশুকে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে পরিচয় করান হয়। শিশু অক্ষর গুলোর ওপর হাত বুলাতে আনন্দ পায়, সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়। এই অক্ষরগুলোর সাহায্যে তাকে বানান শেখান সহজ হয়।

জ্যামিতির নানা আকারে কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে শিশু পেন্সিল ব্যবহার ক'রতে শেখে। এ'গুলো সে প্রথমে হাত বুলিয়ে ঠিক খোপে খোপে বসায়, তারপর কাগজের ওপর ফেলে পেন্সিল দিয়ে রেখা টানে, শেষে নিজের আঁকা ছবিকে নানারকমে চিত্রিত করে। আসবাব পত্তর, বাড়ী-ঘর-দোর, সব কিছুই জ্যামিতির আকারে এবং এ'সব আকারের ভেতর দিয়ে যে সব কিছু নক্সা হ'তে পারে তা ওদের ছবির আঁকার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। এ'ভাবে শিশুর হাতের লেখা পাকা হয়।
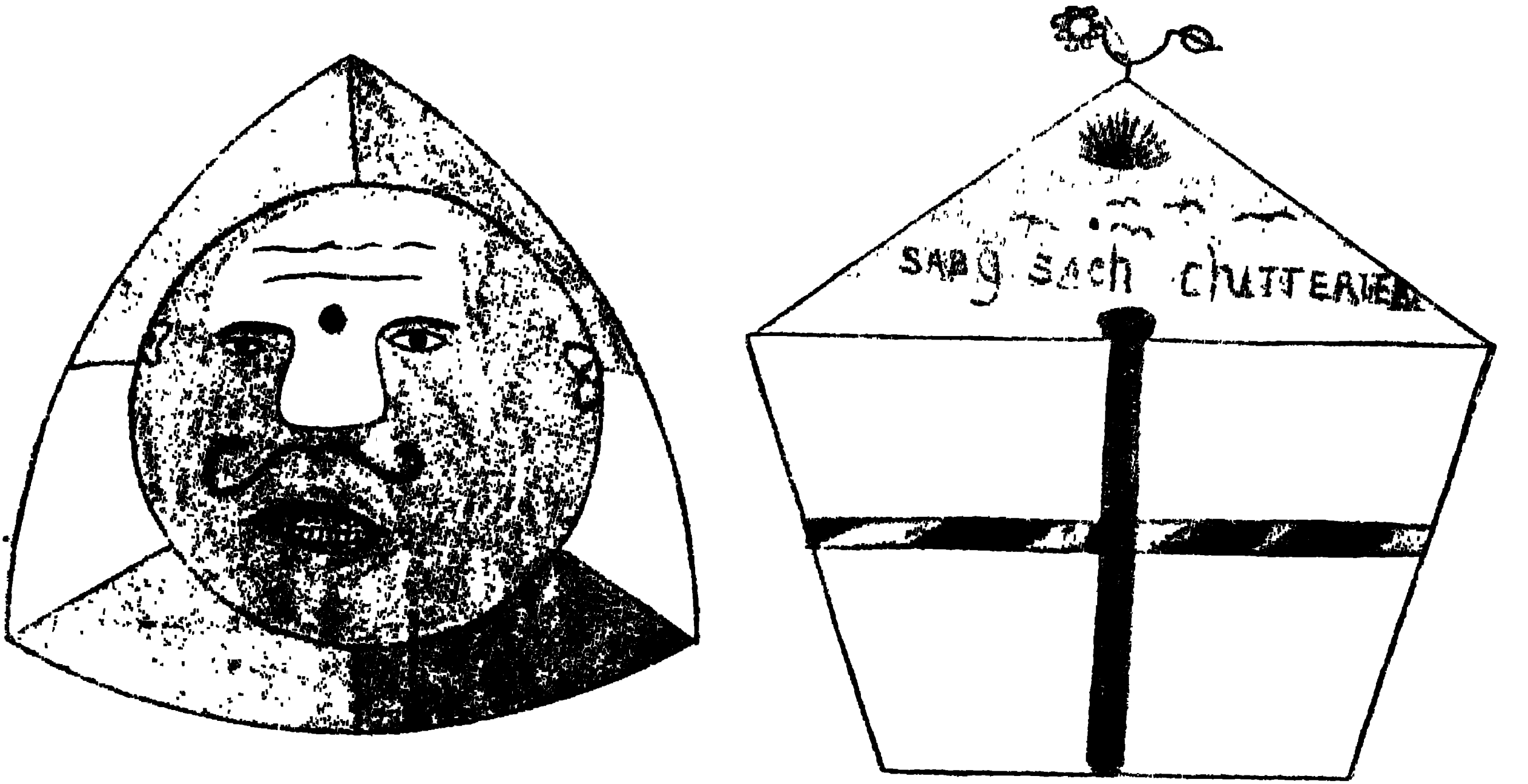
লাঠি ও কিউব নামক খেলনা দুটি দিয়ে শিশুকে ভাষা ও সংখ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এ গুলো দশটি লম্বা কাঠের টুকরো প্রথমটি ৫ ইঞ্চি, দ্বিতীয়টি ১০ ইঞ্চি, এরকমে প্রত্যেকটি ৫ ইঞ্চি করে লম্বায় বেড়ে যায়, এবং প্রত্যেক ৫ ইঞ্চি নীল ও লাল রঙে বারবার চিত্রিত করা হয়। শিশু লাঠিগুলোর লম্বা অনুসারে অর্থাৎ নীলের জায়গায় নীল ও লালের জায়গায় লাল রেখে সিঁড়ি তৈরি করে; সঙ্গে সঙ্গে পাশে সংখ্যার ছবি-ও দেয়। এভাবে ছোট লম্বা দুটি শব্দের এবং যৌগিক, অযৌগিক সংখ্যার স্পষ্ট ধারণা হয়। ক্রমে এরই সাহায্যে তার দশমিক শিখতে বেশী দেরি হয় না।

কিউব নামক খেলনাটিও দশটি চৌকো গোলাপী রঙের কাঠের টুক্‌রো। সবচেয়ে বড়টি দশ সেন্টিমিটারের। প্রত্যেকটি টুক্‌রো পাশ থেকে ক্রমে দশমাংশ ক'রে কমে, এবং সবচেয়ে ছোটটি গিয়ে এক সেন্টিমিটারে দাঁড়ায়। শিশু এগুলো দিয়ে মন্দির, সিঁড়ি ইত্যাদি তৈরি, করে, সঙ্গে সঙ্গে 'ছোট' ও 'বড়' এই দুই শব্দের তফাৎ শেখে আবার এরই সাহায্যে তার আয়তন ও বর্গক্ষেত্রের ধারণা হয়। সাত, আট বছরের শিশু আশ্চর্যভাবে পুঁতির কিউব ও স্কোয়ারের সাহায্যে বিনা আয়াসে ছোট ছোট বর্গ ও ঘনমূলের অঙ্ক কষে দিতে পারে।

ডাঃ মন্তেসরির মাত্র কয়েকটি খেলনার কথা এখানে উল্লেখ করা হ'য়েছে। শিক্ষকের অল্প সাহায্যে প্রত্যেকটি খেলনায় শিশুর মানসিক ও শারীরিক শক্তির সহজেই বিকাশ হ'তে পারে। এ'গুলোর সাহায্যে শিশু নিজের ভুল নিজেই বার ক'রতে পারে ; তাই তার শিক্ষককে বড় প্রয়োজন হয়না। খেলনা সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মত পোষণ করেন—কেউ কেউ ভাবেন খেলনাগুলো আজন্মনির্বোধ শিশুর উন্নতির জন্য তৈরী, সে গুলো আবার স্বাভাবিক শিশুর ওপর কি ক'রে প্রয়োগ করা হয়? আবার কেউ কেউ মনে করেন শিশু অনবরত খেলনা নিয়ে খেল্‌লে তার জীবন একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে ; খেলনা ছাড়া সে চলতে পারবে না। আবার কেউ কেউ ভাবেন খেলনাগুলো যা দামী এগুলো গরীবের হাতী পোষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ডাঃ মন্তেসরি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বহু গবেষণার পর বুঝতে পারেন—তিন থেকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বয়স শিশুর পেশী সংগঠনের সময়। এ সময় সে সমস্ত অঙ্গগুলোকে মানিয়ে নিয়ে ভাল করে কাজ ক'রতে পারে না। তার ওঠা বসা, জুতোর ফিতে বাঁধা বা বোতাম লাগান ইত্যাদি সে ঠিকমত ক'রতে পারে না। চোখ দুটোকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখবার ক্ষমতা তখনও অসম্পূর্ণ থাকে, সে ভাল ক'রে গুছিয়ে কোন কথা বলতে পারে না এবং যা বলে তা-ও অস্পষ্ট। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতেও তারা অক্ষম। এ দোষগুলো স্বাভাবিক শিশু ও জড়বুদ্ধি শিশুর মধ্যে একইভাবে দেখা যায়। কাজেই আজন্মনির্বোধ শিশুর উন্নতির জন্য যে উপায় কার্যকরী হ'য়েছে সেগুলো স্বাভাবিক শিশুর অভাবপূরণে যে সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, তাই তিনি এমন কতকগুলো শিক্ষামূলক খেলনা উদ্ভাবন করেন যে গুলোর সাহায্যে শিশুর অভিনিবেশ সহজেই আনা যায়।

আড়াই এবং তিন বছরের শিশুকে যখন ডাঃ মন্তেসরির উদ্ভাবিত একটি খেলনা দেওয়া হয় সে তা আনন্দের সঙ্গেই নেয়, সাধারণত তার মনে একটি সজীব কৌতূহল জাগে। কেউ তাকে খেলার ব্যাপারে সাহায্য করতে এলে কিংবা তার খেলনা ঘাঁটাঘাঁটি করলে সে তা পছন্দ করে না, বরং তাকে সরিয়ে দেয়। সে একাই তার সমস্যাটির সমাধান করতে চায়— বার বার একমনে খেলনাটি দেখতে চায় ও সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে একাগ্রতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। কোথাও ভুল করলে সে তা নিজেই বার করতে চেষ্টা করে। এরকমে তার নিজের ওপর দখল আসে, এর থেকে তার ইন্দ্রিয়শক্তিগুলো পরিস্ফুট ও মার্জিত হয়। ক্রমেই সে নিত্যনোতুন জ্ঞানের সন্ধানে এগিয়ে যায়, সে আর গণ্ডীর মধ্যে

থাক্‌তে চায় না, মৌমাছির মত নানা জিনিষের ভেতর দিয়ে তার খাবার খুঁজে বেড়ায়, আর যতক্ষণ না সে তৃপ্ত হয় গোরুর মত খাদ্যগুলোকে চিবতে থাকে। তারপর সে-ই খেলনাটিকে সরিয়ে রাখে। একঘেয়ে হ'য়ে ওঠ্‌বার সুযোগ হয় না।

খেলনাগুলোকে গরীবের হাতী পোষার মত যতটা মনে করা হয় ও ঠিক ততটা নয়। এ শিক্ষা পদ্ধতিকে কিছু বদলিয়ে অনায়াসে দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী করে তুলে বাড়ীর শিক্ষায় লাগান যেতে পারে এবং সামান্য খরচে-ই খেলনাগুলো তৈরি করা যেতে পারে। মাসিক পত্রিকা বা খবরের কাগজের নানারকম ছবি, ছোট বড় আকারের শামুক, কড়ি, বোতাম, ভিন্ন ভিন্ন গাছের নানারকম বীচি, জামা কাপড়ের ছাঁট, ভাঙাবাক্সের পিচবোর্ড ইত্যাদি জঞ্জাল হ'য়েই বাড়ীতে পড়ে থাকে। দরকার মত খেলনা বানিয়ে যদি রঙ দিয়ে দেওয়া হয়, শিশু তার চাকচিক্যে নিজেই মুগ্ধ হবে, সে নিজেও ওভাবে ক'রতে চেষ্টা করবে। তার অস্থিরতা শান্তমূর্তি নেবে। বাইরের শত বাধাও তাকে টলাতে পারবে না—বৈজ্ঞানিকের মত সে তার নোতুন উদ্ভাবন নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বে।

ডাঃ মন্তেসরির শিক্ষার উদ্দেশ্য-ই হচ্ছে—পারিবারিক জীবনে নোতুন প্রাণসঞ্চার করা। ডাক্তারীতে একান্ত আগ্রহের জন্য তিনি শিশুকে তার স্বাভাবিক আবহাওয়ার ভেতর অভিজ্ঞতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন না করে বরং তার জন্য যোগ্য পরিবেশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

আর আমাদের জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ-ই শিশুর ওপর নির্ভর করে। ওদের খেলনার জন্য আমরা কত টাকাই না খরচ করি কিন্তু একবারও কি বিবেচনা করে দেখি যে খেলনাগুলো থেকে তার ভবিষ্যৎ স্বভাবের কি আভাষ পাওয়া যাবে? খেলনা দিয়ে আমরা শুধু শিশুর খেয়াল-ই মেটাতে চেষ্টা করি, সে তাতে খুসি হয় কি না তা' বড় একটা দেখা দরকার মনে করি না, এবং বেশি খেলনা দিয়ে তার লোভ বাড়িয়ে দিই কিন্তু সন্তুষ্ট করতে পারি না। খেলার ভতর দিয়েই তার শিক্ষা, কাজেই শিশু যাতে দেশের ও দশের মধ্যে সেরালোক হ'তে পারে, ছোট বেলা থেকে দেখে শুনে সেরকম খেলনা দেওয়া-ই আমাদের একান্ত কর্তব্য—কারণ, শিশু-ই মানব পিতা।

মুখোস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা।

(১২)

এদিকে অলক পুষ্পকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, আর কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে পারিল না। সে নরহত্যা করিয়াছে এই দারুণ চিন্তা তাহার কোমল চিত্তকে অহরহ অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। একটা প্রবল ঝটিকা যেন তাহার তরুণ জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া গেল। জগতের সম্মুখে সে আর সহজভাবে নিজেকে বাহির করিতে পারিল না। ঘরের কোণে লুকাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বন্ধুগণ কেহ কেহ সহানুভূতি জানাইল, কেহ কোন চিকিৎসক ভাল চিকিৎসা করে, তাহার নাম উল্লেখ করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলিল। কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিল। অলক কাহারো কথার প্রতিবাদ করেনা. এই ছেলেটার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া বন্ধুগণ ম্রিয়মান হইয়া চলিয়া যায়।

নীরার মন ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল. ছুটিতে দাদাতো আসিলই না, উপরন্তু তাহার চিঠি পত্রও প্রায় পাওয়া যায় না, যদিও পাওয়া যায়, সে এত সংক্ষিপ্ত যে, পড়িয়া একটুও তৃপ্তি হয় না। তাহার মনে দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। মনের উষ্মা মিটাইবার জন্য সে যখন তখন মায়ের কাছে "কী সায়েব ছেলেই হয়েছে তোমার!" "পাড়াগাঁয়ে যেন আর মানুষ থাকে না" "এলে পরে তখন কে কথা কয়, তুমি দেখে নিও" "উঃ দু'ছত্র লিখলে বাবুর যেন সায়েবী আনার মুখোস খ'সে যাবে" ইত্যাদি উত্তপ্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। মা হাসিয়া বলিতেন "কি মার্কণ্ডের পাঁচালী পড়ছিস্।"

শেষে মায়ের চিত্তও অধীর হইল। ছেলের যথার্থ একটা পরিবর্ত্তন তিনিও লক্ষ্য করিলেন। দীর্ঘ ছুটীতো গেলই, তারপর দুই চারিদিন করিয়া কত ছুটি গেল, অথচ ছেলে বাড়ী আসিল না। যে ছেলে দুইদিনের ছুটিতেই লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইত, সেই ছেলে লম্বা ছুটিতেও কলিকাতার এত কাছে বাড়ীতে আসেনা কেন? তারপর চিঠিতে ভাষার সে স্বচ্ছল গতি নাই, অনাবশ্যক কথায় পাতার পর পাতা লিখিবার সে আগ্রহ নাই, এ যেন না লিখিলে নয় তাই দায়ে পড়িয়া দু'ছত্র লেখা। বন্যার মত উচ্ছল গতি যাহার, সে গতি রুদ্ধ হইল কিসে?

জীবনবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, মোহিনীদেবী গিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন "পেন্সন নিলেই লোকে সত্যি বুড়ো হয়ে যায়। ছেলেটা

ছুটি হ'লে বাড়ী আসেনা, ভালো ক'রে চিঠি পত্রও লেখেনা, কি হ'ল তার, কোল্‌কাতা গিয়ে একবার দেখে এস না। আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেও তো পার।"

অতর্কিত আক্রমণে জীবনবাবুর মুখের নল পড়িয়া গেল, কৃত্রিম আনুগত্য দেখাইয়া বলিলেন "ছেলের মার হুকুম হ'লে ছেলেকে মাথায় ক'রে আনতে পারি।" তখন জীবনবাবু কলিকাতায় গিয়া অলককে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিলেন।

অলক বাড়ী আসিলে সবচেয়ে আশ্চর্যান্বিত হইল নীরা। রাত্রে যখন আসিয়া পৌঁছিল, প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও নীরা কৃত্রিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া রহিল। অলক আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পরে শুইয়া পড়িল, একবার নীরার খোঁজ পর্য্যন্ত করিল না। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে নীরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল দাদা কখন তাহার খোঁপাশুদ্ধ টানিয়া তুলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাবী জানাইয়া নিজের চটী হইতে এক খাম্‌চা মাটী তুলিয়া তাহার মাথায় মাখাইয়া দিবে। কিন্তু অলক ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ ধুইবার জন্য পুকুরে চলিয়া গেল, নীরাকে ডাকিয়া তুলিয়া একটা কথাও বলিল না। বেলা হইলে যখন দেখা হইল সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল "নীরা ভাল আছিস্‌ তো?"

অভিমানে নীরা মুখ ফিরাইয়া লইল। এ যেন সে অলক নয়, এ যেন এক প্রবীণ ব্যক্তি, অসীম গাম্ভীর্য্য নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এত পরিবর্ত্তন কিসে ঘটিল? কে ঘটাইল?

ছেলেকে দেখিয়া মা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন কি অসুখ হয়েছে বাবা? কেন জানাস্‌নি?"

নীরাও অভিমান ভুলিয়া বলিল "এবার আমাকে জব্দ করতে পারেনি ব'লে দাদার মন খারাপ হ'য়ে গেছে।"

নীরাকে জব্দ! অলক শিহরিয়া উঠিল, সেই কালরাত্রি সেই মুখোস, সেই নারীর ইজ্জৎ বাঁচাইতে গিয়া নরহত্যা সব মনে পড়িয়া তাহার মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। দাদার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত হইয়া নীরা বলিল "কি হ'য়েছে দাদা তোমার? বলবেনা?"

অলক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, একেই শরীরটা ভাল নয়, তাতে পড়াশুনাও ভালো হয়নি, তাই মন ভাল লাগে না।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন শরীরের চিকিৎসা দরকার তো আমি গোবিন্দ কব্‌রেজকে ডাকি, তার হাত যশ আছে।

মাতাকে নিষেধ করিয়া অলক বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই রাস্তা দিয়া একটা জনতা কোলাহল করিয়া যাইতেছিল। অলকদের ছোক্‌রা চাকরটা সেই জনতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারাণ্ডায় উঠিল। অলক জিজ্ঞাসা করিল "এত গোলযোগ কিসের রে? কি হয়েছে?

ভৃত্য বলিল "জমিদার যে খুন হয়েছিলেন, তারি তদন্ত করতে খুব বড় ডিটেক্‌টিভ এসেছেন"

নিজের অজ্ঞাতেই যেন অলক স্খলিতপদে রাস্তায় গিয়া জনতার কাছে দাঁড়াইল ও সমস্ত কথা শুনিতে পাইল।

ডিটেক্‌টিভ নায়েব মশায়কে বলিল "দেখুন আমি এখানে এসে অনেক খোঁজ করে জান্‌লাম যে ঘটনার রাতে নবীন মুদীর স্ত্রীকে বাগানে ধরে আনা হয়েছিল। এই বেয়ারাগুলোই তাকে ডুলি করে নিয়ে এসেছিল। তা' এরা কিছুতেই স্বীকার কোর্‌বেনা। আরে বাপু, স্বীকার কোর্‌তে দোষ কি? তোরা তো আর খুন করিস্‌নি?" মাথায় ঝুঁটি বাঁধা উৎকলীয় দু'জন বেয়ারাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল, তাহারা ভীত হইয়া কিচির মিচির করিয়া বলিল "তাহারা কিছু জানে না, জমিদারের পাইক বল্‌লে ডুলি ব'য়ে নিয়ে যেতে, তাই তারা নিয়েছিল নইলে কি আর রক্ষা ছিল? ইত্যাদি........"

ডিটেক্‌টিভ্‌ বলিল "সেতো ঠিক্‌ কথা, তোরা হুকুম তামিল করেছিস্‌ বইতো নয়। আদালতে সে কথাই স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করবি বুঝ্‌লি?"

নায়েব মশায় দেখিলেন ব্যাপার ক্রমে জট্‌ পাকাইয়া উঠিতেছে। তিনিতো জানেন নবীনের স্ত্রীকে সেরাত্রে ধরিয়া বাগান বাড়ীতে আনা হইয়াছিল, তাহার ধর্ম্মরক্ষার্থে কোন সদাশয় ব্যক্তি যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে, ইহাও তিনি অনুমান করিয়াছেন। সত্যই ইহার জন্য হত্যাকারী শাস্তি ভোগ করুক ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। বিশেষ নবীন নিরীহ লোক, এখনই তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা কদর্য্য আলোচনা হইবে, ও নবীনকে নিয়া অযথা একটা টানাটানি হইবে, ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই নবীনের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। সেই রজনীতে নবীন গৃহে ছিলনা, জমিদারের লোক তাহার মুখ বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রভাতে নবীন যখন গৃহে ফিরিল তখন অর্দ্ধজ্ঞানহীনা পুষ্প অনবরত কাঁদিতেছে। নবীন তাহাকে অনেক কষ্টে শান্ত করিলে পুষ্প তাহাকে সকল ঘটনা ভাঙ্গিয়া বলে। পুষ্পের সতীত্ব রক্ষার জন্য দেবতা যে সহসা আবির্ভূত হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়াছেন একথা বলিয়া নবীন বার বার সেই দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছে। নায়েব মশায় এ সকল কথা প্রকাশ না করিবার জন্য নবীনকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, নবীনও প্রকাশ করে নাই। এতদিন পরে আজ এই নির্দ্দোষ দম্পতীর উপরে কলঙ্কপাত হইতে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন, বলিলেন "এ উড়ে ভূতগুলো কি বলতে কি বলে, ওদের কথায় কান দেবেন না।"

ডিটেক্‌টিভ্‌ বিজ্ঞের মত বলিল "না-না, আপনার সন্দেহের কোনো কারণ নেই. এ সত্যি খবর। আমি অনেক অনুসন্ধান ক'রে তবে এ সব খবর বার ক'রেছি। আচ্ছা, আপনারা যখন গিয়ে বাবুর মৃতদেহ পেলেন, নবীনের স্ত্রী কি সেখানে ছিল?"

নায়েব মশায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না সে ছিলনা, দরোয়ান আর বাবুর বন্ধুবান্ধব দু'চার জন ছিল।" "নবীনের স্ত্রী কোথায় ছিল?"

"সে নিশ্চয়ই তার নিজের বাড়ীতে ছিল। না থাকলে নবীন নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর খোঁজ কোর্‌তো, একটা গোলমাল হোতোই।"

ডিটেকুটিভ্‌ বলিল "আমার মনে হয়. নবীনই খুন ক'রে তার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে।"

নায়েব মশায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন "সে একেবারে গোবেচারী। এ অসম্ভব!"

"আরে রেখে দিন্ মশাই, সুবিধে পেলে কত গো ব্যাঘ্র হ'য়ে দাঁড়ায় তার ঠিক আছে কিছু? আমি একবার নবীনের ওখানে গিয়ে তাদের জেরা কোরব।"

অলক সমস্তই শুনিতেছিল, দেখিল তাহার অপরাধের বোঝা ক্রমেই ভারী হইতেছে। নরহত্যা-পাপে সেতো লিপ্ত হইয়াছে, তাহার পরে আবার অপরের জীবনের বিনিময়ে তাহাকে চোরের মত বাঁচিতে হইবে। একবার ভাবিল চীৎকার করিয়া সে অপরাধ স্বীকার করিবে, অপরের জীবনের পরিবর্ত্তে এ ঘৃণ্যজীবন সে বহন করিতে চাহেনা। কখনো ভাবিল সকলেই তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে, এখনই ধরিয়া লইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে, আর দেরী করা চলিবে না, দূর বিদেশে এখনই সে পলাইয়া যাইবে। কিন্তু সে না পারিল নিজের দোষ কীর্ত্তন করিতে, না পারিল ছুটিয়া পলাইতে। একপা' একপা' করিয়া জনতার সহিত নবীনের বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘটনার দিন হইতেই নবীনের মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছিল, আজিকার ব্যাপারে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহাকে জেরায় জেরায় ক্ষত বিক্ষত করিয়া অবশেষে অন্দর হইতে পুষ্পকে ডাকিয়া আনা হইল।

অবগুণ্ঠনবতী পুষ্প আসিয়া সঙ্কুচিত হইয়া এককোনে দাঁড়াইল। অলক পুষ্পের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। সেই বীভৎস রজনীতে এই নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়াই সে নরহত্যাকারী রূপে কলঙ্কিত হইয়াছে। ইঃ—কী নিদারুণ স্মৃতি! প্রতি মুহূর্ত্তে অলকের মনে হইতে লাগিল যে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে পুষ্প এখনই তাহার দিকে চাহিবে, এখনই তাহার সহিত পুষ্পের দৃষ্টি বিনিময় হইবে, পুষ্প হয়তো তাহাকে চিনিতে পারিয়া এখনই তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিবে ঐ যে হত্যাকারী, আত্মগোপন করিয়া আছে, উহাকে শাস্তি দাও, আমার স্বামী নির্দ্দোষ, তাঁহাকে পীড়ন করিও না।"

তথাপি অলক পলাইয়া যাইতে পারিলনা, স্থানুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ডিটেক্‌টিভ্ পুষ্পকে প্রশ্ন করিল "জমিদার যখন খুন হ'লেন, আপনি সেখানে ছিলেন?"

পুষ্প মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে ছিল না।

ধমক দিয়া ডিটেক্‌টিভ্ বলিল মিছে কথা ব'ল্‌বেন না, আমি জানি আপনি সেখানে ছিলেন।

পুষ্প নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এবার অভয় দিয়া ডিটেকটিভ্ বলিল "কে তাঁকে খুন ক'রেছে, বলুন আপনার কোনো ভয় নেই।" পুষ্প জড়িতস্বরে বলিল "জানিনা।"

অলকের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। জনতা পুষ্পের দিকেই মনোযোগ দিয়াছিল বলিয়া তাহার অবস্থা কেহ লক্ষ্য করিল না, করিলে তাহার পরিবর্ত্তন সকলেই বুঝিতে পারিত।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডিটেক্‌টিভ্ বলিল "ঘটনার সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন, অথচ বল্‌ছেন কে খুন ক'রেছে আপনি জানেন না। এর অর্থ কি? সত্যকথা না বোল্‌লে আপনার স্বামীর অকল্যাণ হবে জানবেন।"

এবার কম্পিত কণ্ঠে পুষ্প বলিল "কে একজন মুখোস্ প'রে এসেছিলেন, তিনি দেবতা।"

ডিটেক্‌টিভ্‌ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "মুখোস্‌ প'রে? লোকটার বুদ্ধি আছে। তা' দেবতাটি কোথায় অন্তর্হিত হ'লেন?"

"তিনি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই কোথায় চলে গেলেন।"

"তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন?"

"না, মুখে মুখোস্‌ আঁটা ছিল।"

"এতদিন এসব কথা বলেন নি কেন?"

"সমাজ ও পুলিশের ভয়ে বলিনি। আমার কোনো দোষ নেই, আমাকে রক্ষা করুন—" বলিতে বলিতে চোখের জলে পুষ্পের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

"হুঁঃ—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আপনার স্বামীকে সব কথা ব'লেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি বিশ্বাস ক'রলেন?"

"হ্যাঁ।"

ক্রুর হাসিয়া ডিটেক্‌টিভ্‌ বলিল "এই রূপকথা কি বিশ্বাসের যোগ্য?"

অলক টলিতে টলিতে বাড়ীতে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিতা মাতা, ভগ্নী ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গোবিন্দ কবিরাজ আসিল, নাড়ি টিপিয়া চোখের পাতা টানিয়া, জিভ্‌ বাহির করিয়া দেখিয়া, অনেক রকম ঔষুধ ব্যবস্থা করিয়া গেল। পাঁচন, সালসা, বড়ি, পর্পটি, মোদক প্রভৃতি হরেক ঔষুধ গিলিতে গিলিতে অলকের জীবন আরো দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। কিন্তু রোগের মূল বৰ্দ্ধিত হইয়াই চলিল অলকের শিয়রে বসিয়াই মোহিনী দেবী ও নীরা আলোচনা করে "এতদিন পরে জমিদারের খুনে ধরা পড়্‌ল। কেউ ধর্‌তে পারেনি, এ খুব গুণী ডিটেক্‌টিভ্‌, তাই ধর্‌ল। নবীন মুদী খুন করেছে, এম্‌নি তো হাবা গোবা লোকটা, বাড়ী বাড়ী বেনেতি জিনিষ দিয়ে বেড়ায় পেটে পেটে তো কম দুষ্ট বুদ্ধি নয়। আর খুন না ক'রেই বা কি কোর্‌বে, নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করাও ওর ধর্ম্ম। তা ব'লে আইন তো মানবেনা, নবীনকে ধ'রে চালান দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই ফাঁসী হবে, আহা! বৌটার কি গতি হইবে! ইত্যাদি"

শুনিতে শুনিতে অলকের বুকের রক্ত উদ্দাম হইয়া উঠিত। একবার ভাবিত, মাকে সকল কথা খুলিয়া বলি, আবার ভাবিত, মা এত বড় আঘাত সহিতে পারিবেন না, অবশেষে অলককে মাতৃহত্যার পাপেও জড়িত হইতে হইবে। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইতো এই আব্‌হাওয়া হইতে সে পলাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার বিবেক তাহাকে তাড়না করিল, মোকদ্দার শেষ না দেখিয়া সে কোথাও যাইবেনা, যদিই নবীনকে হত্যাকারী স্থির করিয়া তাহাকে দণ্ড দেওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অলক নিজের মুখে সকল কথা স্বীকার করিয়া নবীনকে অব্যাহতি দিবে। নরহত্যা করিয়াই তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য লুকাইয়া থাকিয়া আবার কি অন্য একজনের প্রাণ নষ্ট করিবে? অলক

পৃথিবী হইতে সরিয়া গেলে জগতের এমন কিছু ক্ষতি হইবে না, মা বাবার নীরা আছে। কিন্তু নবীনের অভাবে পুষ্প, পুষ্পের মতই সুন্দর পুষ্প, সে নিঃসহায় বিধবা হইবে। স্বামীর বর্ত্তমানেই অত্যাচারীর অত্যাচারে সে জর্জ্জরিত, স্বামীর অভাবে এ জগতে তো তাহার ঠাঁই-ই মিলিবে না। এই ভাবে মূল্যবান দুটি জীবনকে, নিজের এই তিক্ত জীবনের বিনিময়ে অলক নষ্ট হইতে দিবে না।

গ্রাম শুদ্ধ লোকের চেষ্টায় নবীন খালাস পাইল। অলক শুনিল, নবীন নির্দ্দোষ, প্রমাণিত হইয়াছে। তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া মাকে বলিল, "মা, চল, আবার আমরা লক্ষ্ণৌ চ'লে যাই, এখানে ভাল লাগ্‌ছে না—"

নীরা বিজয়িনীর মত বীর দর্পে বলিল "এইবার? বিবির তো গ্রামবাসে অরুচি দেখা গেল না, সায়েবই তো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। হার মানো—"

অনেক দিন পরে অম্লান হাসিয়া অলক বলিল "হার মানছি নীরা, তোর কাছে হার মান্‌ছি।"

দাদার উদারতায় নীরা অবাক্ হইয়া যায়।

মা বলিলেন "এখন গরম প'ড়ে এল। গরমটা শিলং থেকে তার পরে লক্ষ্ণৌ যাওয়া যাবে।"

তাহাদের শিলং যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল।

(১৩)

ললিতা দেবীর বয়স চল্লিশের উপরে। দেখিতে তিনি পরমা সুন্দরী, সর্ব্বোপরি তাঁহার মুখে একটা আভিজাত্যের ও দৃঢ়তার ছাপ্ আছে দেখিলে স্বতঃই মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। তিন বৎসরের একটি পুত্র লইয়া তিনি বিধবা হন, সুযোগ্য স্বামীর হাতে পড়িলেও অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় স্বামী কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু পুঁজি ছিল তাহা দিয়া ও নিজে উপার্জ্জন করিয়া তিনি ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন।

ললিতা দেবী দেখিলেন বয়সে বালিকা হইলেও তন্দ্রা প্রৌঢ়ার ন্যায় গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। নায়েব মশায় তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন "দেখুন মিসেস মৈত্র, মেয়েটি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে, তাই সর্ব্বদা বিরস হ'য়ে থাকে। আপনি সর্ব্বদা কাছে রেখে নানা কথায় ওকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কোর্‌বেন। আপনাকে দেখেই বুঝেছি যে, ওর মায়ের অভাব আপনি পূরণ কোর্‌তে পার্‌বেন। আপনার কাছে ওকে রেখে ওর পিসীমাও নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেছেন, আমিও যাচ্ছি। আমি সর্ব্বদাই আস্‌ব, আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব, বোল্‌বার বোধহয় দরকারও হবে না।"

ললিতা দেবী তন্দ্রাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তন্দ্রা কাহারো সঙ্গ পছন্দ করে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইল। অগত্যা ললিতা দেবী সমস্ত সংসারের তত্ত্বাবধান আস্তে আস্তে নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। তন্দ্রা মাঝে মাঝে আপত্তি করিয়া বলিত "মাসীমা, আপনি সব সময় এত খাটেন কেন? কত লোকজন রয়েছে, অত খাট্‌বার আপনার কি দরকার?"

ললিতা হাসিয়া বলিতেন "তাতে তোমার মাসীমার কোনো কষ্ট হয় না, মা, কাজ করাই আমার অভ্যাস। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বাঁধে, জানো তো?"

সেদিন তন্দ্রা আহারে বসিয়াছে, ললিতা কাছে বসিয়া মেয়ের অল্প খাওয়া নিয়া নানা অভিযোগ করিতেছেন। "এই খেয়ে শরীর থাকে? তাইতো পাঁকাটির মত শরীর, এই বয়সে আমরা লোহা চিবিয়ে খেয়ে হজম করেছি", এসব মৃদু তিরস্কার শুনিতে শুনিতে তন্দ্রা আহার শেষ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিল। ললিতা দেবী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "এখনই উঠ্ছো কি? গরম মাছের চপ্ খাও দু'খানা, এই তো হ'য়ে এল" বলিয়া তিনি ঠাকুরকে ডাকিয়া চপ্ আনিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন।

তাড়া খাইয়া ঠাকুর চপের থালা হাতে তন্দ্রার পাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বলিলেন "দাওনা চট্ ক'রে দু'খানা, তোমাদের যে নড়্‌তেই ছ'মাস। ও ছাড়া খাবারই বা আর আছে কে?"

ঠাকুরকে অব্যাহতি দিয়া তন্দ্রা উঠিয়া পড়িল. "ঠাকুর তো জানে মাসিমা, আমি মাছ মাংস খাইনে, তাই পাতে দিতে ইতস্ততঃ কোর্‌ছে।"

ললিতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "কুমারী মেয়ে মাছ মাংস খাবে না কি গো? ওই তো শরীর—"

তন্দ্রা গম্ভীর হইয়া বলিল "আমার একটা ব্রত আছে মাসিমা, সে ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মাছ মাংস খাব না।" তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ললিতা আর কথা বলিলেন না।

ঘরে এতো দিন কোনো কর্ত্রী ছিলনা, ঘর দুয়ার সব বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। ভৃত্য সঙ্গে নিয়া ললিতা দেবী বাড়ী ঘর ঝাড়িয়া মুছিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিলেন। অব্যবহৃত গৃহে কত খাট আলমারি পড়িয়া আছে, অথচ তন্দ্রা, মাটিতে বিছানা করিয়া শোয় দেখিয়া তাহার গৃহে খাট আনিয়া ধব্‌ধবে বিছানা পাতাইলেন, আলনা আলমারি, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি আনাইয়া গৃহটীকে আধুনিক ভাবে সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন।

রাত্রে শুইতে আসিয়াই তন্দ্রা বলিল "একি? আমার ঘরে খাট্ পাত্‌লে কে?"

ললিতা বলিলেন আমি ওদের দিয়েই পাতিয়েছি, অন্য ঘরে খাট্ গুলো পড়ে আছে, আর তুমি শোও মাটিতে। তাই আনিয়েছি।"

একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া তন্দ্রা বলিল "কিন্তু মাসীমা আমি তো খাটে শোবো না।"

"কেন?"

"আপনাকে তো আমি ব'লেছি যে, আমার একটা ব্রত আছে। আমার বিছানা মাটিতেই ক'রে দিতে বলুন।"

"কিন্তু মাটিতে যদি বিছে টিছে কামড়ায় —"

"না মাসিমা, কাম্‌ড়াবে না, কত জনতো মাটিতে শোয়।' অগত্যা ললিতা তাহার বিছানা নামাইয়া দিলেন।

তারপর ললিতা তন্দ্রার চুল লইয়া পড়িলেন। "ধন্যি মেয়ে, চুল গুলো পাখীর বাসা করে রেখেছে। অত গুলো ঝি রয়েছে কি জন্যে? ওরাই তো আঁচড়ে দিতে পারে। দুধের মেয়ে, তার যত্নের জন্যই তো তোরা আছিস্।" এই সব বলিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে তিনি তন্দ্রার চুল বাঁধিয়া দুটি সদ্য ফোটা গোলাপফুল তাহার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে গেলেন। মাথা সরাইয়া লইয়া তন্দ্রা বলিল "না মাসীমা, আমার খোঁপায় ফুল গুঁজবেন না। কোনো বিলাসিতা কোর্‌বোনা বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।"

"এইতো মাথায় ফুল গুঁজবার সময় মা, এর পর তো কনে বউ হয়ে মাথায় ঘোমটা দেবে।"

তন্দ্রা বলিল "মাসিমা, আমার জীবনের ইতিহাস আপনি জানেন না।' বলিতে বলিতেই তাহার দুইচোখ জলে ভরিয়া আসিল। চোখ্ মুছিয়া সে বলিল "আমার অল্প বয়সেই মা মারা যান, যাবার সময় তিনি ব'লে গেছিলেন, 'আমি যেন সব সময় আমার বাবার কাছে থাকি। আমিও সব সময় বাবার কাছে কাছে থাক্‌তে চেষ্টা কোরতাম। বাবাও আমাকে কাছে কাছে রাখতেই ভালো বাস্‌তেন—" তন্দ্রার চোখ আবার জলে ভরিয়া আসিল। ললিতাও চোখ্ মুছিয়া বলিলেন "বোলতে যখন কষ্ট হয়, তখন না-ই বা বল্‌লে।"

তন্দ্রা একটু পরে চোখ্ মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল, ' আমার এক পিস্‌তুতো বোনের বিয়েতে সেদিন আমি আমাদের পাশের এক গ্রামে গেছিলাম। সেদিনই নিষ্ঠুর ঘাতক রিভল্‌ভারের গুলিতে আমার বাবাকে হত্যা করেছে—" তন্দ্রার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ললিতা দেবীও নীরব হইয়া রহিলেন, সেই মূর্ত্তিমতী বেদনাকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

তন্দ্রা আবার বলিতে লাগিল "বাবার মৃত দেহের কাছে আমি এই প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে, যতদিন হত্যাকারীকে বাবার হত্যার প্রতিশোধ দিতে না পারব, তত দিন কোনো বিলাসিতায় লিপ্ত হোবো না।"

ললিতা দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "যার যা নিয়তি, তা' ঘট্‌বেই মা, কারোই হাত নেই। কতদিন এ ঘটনা ঘটেছে?"

"প্রায় তিন মাস হল।"

"হত্যাকারীর কোনো সন্ধান হোলো?"

"না, এখনো তদন্ত চল্‌ছে, আমার দৃঢ় ধারণা যে হত্যাকারী ধরা পড়্‌বেই।"

(ক্রমশঃ)

চলতেই থাকে, তাছাড়া এখানে বিস্তর কয়লার খনি থাকাতে মাটীর নীচ থেকেও অতি গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি আসতে থাকে। আর একরকম ধমক আছে যা সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে। যে ধমক খায় সে প্রথমে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে না, কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে প্রচণ্ড ধমক শুনে তার পীলে চমকিয়ে যায়। শুধু বই দেখে কেউ এসব শিখতে পারে না। 'সিংহনাদ রহস্য,' গর্জ্জন-তত্ত্ববারিধি' প্রভৃতি অমূল্য পুস্তক এইভাবেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এইসব ভেবে আর বই লিখলাম না।"

চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গুরুজী বলিলেন, "গোড়া থেকেই দেখছি, গিরিডির অনেক বিশিষ্ট পরিবারের লোক সভায় অনুপস্থিত। তাঁরা কি ভেবেছেন যে, এইভাবে আমার দৃষ্টি এড়াবেন ? নাকি ইঁদুর গর্ত্তে গিয়ে ম'রে থাকবে' ভেবে নিশ্চিন্ত থাকব ? হু হু শব্দে তাঁদের কর্ম্ম দগ্ধ হ'বে, সব কুকর্ম্ম পুড়ে ছাই হ'লে তাঁরা আমার কৃপার অধিকারী হ'বেন। মৌলীবাবুর বাড়ীর কাউকেও তো দেখছি না, নরেশকে দিয়ে তাঁদের কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম, তবু তাঁরা আসেন নি দেখছি।"

নরেশবাবু বলিলেন, "তাঁরা বিপন্ন আর চিন্তাগ্রস্ত, তাই আসতে পারেন নি। মৌলীবাবুর শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, তাঁর মেয়ের চুল অকালে পেকে যাওয়াতে আজ পর্য্যন্ত বিয়ে হয়নি, এই সব ভাবনায় তাঁরা সভার কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছেন।"

গুরুজী বলিলেন, "ভয় কিসের ? আমি তো বলেইছিলাম আজ এক দিনের জন্য সকলেই রুদ্রের প্রসন্ন মুখ দেখবেন ?" নরেশবাবু বলিলেন, "তাঁদের কর্ম্ম ! মহাপুরুষ অমৃত নিয়ে ব'সে আছেন, কিন্তু মৌলীবাবুরা তা কিছুতেই খাবেন না ! তাঁদের কপালে যদি আরো দুঃখ লেখা থাকে তবে অন্যে কি করবে ?" সাহারানন্দ বলিলেন, "তা বলা যায় না। মহাপুরুষের অভিশাপ পরিণামে নিশ্চয়ই মঙ্গল ঘটায়।" গুরুজী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমি পাপের যম, কিন্তু পাপীর যম নই। লিলুয়ায় আমার এক শিষ্যবাড়ীতে কিছুকাল ছিলাম। একদিন দেখলাম, দানাপুর এক্‌স্‌প্রেসের একটা এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। সেটাকে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি ভাবলাম বুঝি এঞ্জিনের দফা শেষ। কিছুদিন পরে দেখি সেটা বেরিয়ে এসে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের এঞ্জিন হয়ে গিয়েছে। কিছু শাস্তি হ'ল বটে, কিন্তু বিনাশ থেকে বাঁচল। মৌলীবাবুদেরও কতকটা তাই হ'বে। তাঁদের সিধা করব, তাঁরা ভুগবেন, কিন্তু শেষে মহৎ কৃপার অধিকারী হবেন।"

উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে একজন গুরুজীকে বলিলেন, "মৌলীবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু পিনাকী বাবু সেদিন মৌলীবাবুর বাড়ীতে ব'সে আপনার নামে অনেক বাজে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'সাধুজীকে আমি লিলুয়ায় তাঁর শিষ্যবাড়ীতে অনেকবার দেখেছি। সাধুজী আজ পর্য্যন্ত মায়া মমতা জয় করতে পারেন নি। মন্ত্রপূত গাঁজার প্রতাপে তাঁর বাইরের আবরণটা শুকিয়ে কঠিন হয়ে

গিয়েছে বটে, কিন্তু মনটা খুব নরম, ভাবপ্রবণ আর দুর্ব্বল রয়েছে। ছোট ছোট, তুলতুলে, গোলাপী রঙের ইঁদুরের বাচ্চা দেখলে যেমন একটা দয়া হয়, সাধুজীর অসহায় অবস্থা দেখলেও সেইরকম একটা দয়া হয়।' পিনাকীবাবুর কথায় মৌলীবাবুদের একটু একটু বিশ্বাস হয়েছে।"

গুরুজীর অপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে আসন্ন ঝড়ের আভাস দেখা দিল। তিনি কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "পিনাকীর মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটা গাঁট আমি বাজিয়ে দেখেছি, তার বিদ্যার দৌড় আমার জানা আছে। সে আমাদের সাধনার মূল কথাটাই বোঝেনি। আমার সম্বন্ধে যদি সে এসব অপবাদ আর কুৎসা প্রচার করে তবে বাকী জীবনটা তাকে কুত্তার এঁটো খেয়ে কাটাতে হ'বে।"

ভদ্রলোকটি বলিতে লাগিলেন, "পিনাকীবাবু আর যা বলেছেন তা বলা পাপ, শোনাও পাপ। তিনি বলছিলেন, 'একদিন সাধুজী ধ্যানের আগে অভ্যাসমত গ্রামোফোনের চোঙায় মন্ত্রপূত গাঁজা খাচ্ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রটা উচ্চারণ করতে একটু ভুল হয়েছিল। তার ফলে তিনি ধ্যানের অবস্থায় সাহারামরুতে না পৌঁছিয়ে একেবারে উত্তরমহাসাগরের তীরে উপস্থিত হ'লেন। সেখান থেকে তিনি দেশে ফিরতেও পারলেন না, আর সেখানকার এস্‌কিমোজাতীয় লোকদের মধ্যে মরুভূমির ধ্যান প্রচার করাও সম্ভব হ'ল না। অগত্যা গুরুজী সেখানেই ভূতপূজো সুরু করলেন। একজন এস্‌কিমো সরদারের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হ'ল। কিন্তু বিয়ের দিন বিকালে উত্তর মহাসাগরের তীরে বেড়াতে বেড়াতে সাদাভাল্লুকের তাড়া খেয়ে গুরুজীর ধ্যান ভেঙে গেল।' এসব অকথ্য অশ্রাব্য কথাও মৌলীবাবুরা একটু একটু বিশ্বাস করেছেন।"

একটা বিকট অস্বাভাবিক গর্জ্জনে আকাশ ফাটাইয়া গুরুজী বলিলেন, "তারা নাকাল নাজেহাল হ'বে! এর বেশী এখন বলবার দরকার নেই। ভবিতব্য যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন গিরিডিবাসী সকলে হতভম্ব হয়ে কণ্টকিত শরীরে মৌলীবাবুদের দশা দেখবে, দেখবে, দেখবে, আর পাকা ধানের মতন কেঁপে কেঁপে উঠবে!"

নরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী ভয়ে কাঠ! দর্শকগণ স্তম্ভিত! সাহারানন্দ ছুটিয়া অমরবাবু আর পণ্ডিতের কাছে গিয়া বলিলেন, "সামান্য অপরাধে একটি পরিবার ছারখার হ'তে চলেছে আর আপনারা নীরব রয়েছেন? গুরুদেবকে সামলান! সামলান!" তখন অমরবাবু গুরুজীকে বলিলেন, "সাধুজী, আপনাকে বড়ই অস্থির দেখাচ্ছে। আমার যখন রক্তের চাপ বেড়েছিল তখন যে রকম করতাম, আপনিও সেই রকম করছেন, তবে অনেক বেশী মাত্রায়।"

গুরুজী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "এখন সভা ভঙ্গ হোক! আপাততঃ একবার মঠে গিয়ে……" গুরুজীর কথা শেষ হইবার আগেই "জয়গুরু, জয়গুরু, নরসিং নরসিং নরসিং" বলিয়া পশ্চিমা ভৃত্যটি গুরুজীর দুই বগলে হাত দিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিল। আজ গুরুজীর বিক্রম দেখিয়া সে অনাবিল

আনন্দ লাভ করিয়াছে। গুরুজী ভৃত্যসহ ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। নরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী নতমস্তকে অনুসরণ করিলেন। সাহারানন্দ মধ্যে মধ্যে গুরুজীকে কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু গুরুজীর সে দিকে মন নাই।

পণ্ডিত মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন, "বোধ হয় কঠোর তপস্যায় গুরুজীর স্নায়ুবিকৃতি ঘটেছে। তপস্যার ফলে যদি পীড়া হয় তবে তার চিকিৎসা কঠিন। আমার শিশিতে যে টুকু স্বল্পনারায়ণ তৈল আছে তা সাধুজীর মঠে পাঠালে মন্দ হয় না।

অমরবাবু বলিলেন, "সাধুজীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য লাভের বিশেষ অনুকূল নয়। নরেশবাবু কতকটা গবচন্দ্রগোছের লোক, সাধুজীর প্রতি তাঁর অতিভক্তি কতকটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাহারানন্দ বুদ্ধিমান হয়েও কেন যে এমন একটা উৎকট সাধনায় সময় কাটাচ্ছে তা বোঝা শক্ত।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "ব্যাপার যে ভাবে গড়াচ্ছে তাতে মনে হয় সাহারানন্দের সঙ্গেই গুরুজীর একদিন হাতাহাতি লেগে যাবে।"

পণ্ডিত মহাশয় এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু অমরবাবুর পত্রে গিরিডির সমস্ত খবর পাইতে লাগিলেন। গুরুজীকে আজকাল খুব ব্যস্ত দেখা যায়। একটি অপরিচিত লোক সাধুজীর আশ্রমে আজকাল আনাগোনা করে, আর গোপনে সাধুজীর সঙ্গে তাহার পরামর্শ চলে। নরেশবাবু মধ্যে মধ্যে দূর হইতে এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করেন, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলায় না। সাহারানন্দ আশ্রমে থাকিলে ধ্যানধারণায় সময় কাটান, আর অন্যান্য দিন গিরিডির নানা অঞ্চলে ঘুরিয়া সাধুজীর অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করেন আর সাধুজীর সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধটাকে তাজা করিয়া রাখেন। অপরিচিত লোকটার সঙ্গে সাধুজীর যে পরামর্শ চলে, সাহারানন্দ সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। তবু একটা সন্দেহের ভাব আর অজানা বিপদের আশঙ্কা মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে জাগিয়া থাকে।

একদিন সকালে অমরবাবু বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, গিরিডির প্রসিদ্ধ কালিকানন্দ জ্যোতিষীর বাড়ীতে সাহারানন্দ ঢুকিতেছেন। আর একদিন দেখিলেন, সাহারানন্দ কতকগুলি কবচ লইয়া কালিকানন্দের বাড়ী হইতে বাহির হইতেছেন। অমরবাবুকে দেখিয়া সাহারানন্দ কবচগুলি লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। অমরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি? গুরুজীর জন্য এতগুলো কবচ? তাঁর কি খুব বেশী অসুখ?" সাহারানন্দ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না, গুরুজীর সিদ্ধ দেহের জন্য এসব কবচ নয়। এ সব মৌলীবাবুদের জন্য। কালিকানন্দ এমন সব কবচ বানাতে পারেন যাতে মানুষের পারলৌকিক মঙ্গলও হয়। মৌলীবাবুরা একটু পথভ্রান্ত, একটু দূরে দূরে রয়েছেন। যাতে তাঁরা এঁকেবেঁকে অজ্ঞাতসারে আমাদের দিকেই--আরে!, গুরুজীর দিকেই—

অগ্রসর হ'ন, সেই উদ্দেশ্যেই কালিকানন্দ কবচগুলি বানিয়েছেন।" অমরবাবু হাস্যমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কালিকানন্দ লোকটি অত্যন্ত স্থূলকায়। অতি সন্তর্পণে মৃদুমন্থর গতিতে চলেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে রক্তাম্বর, গোঁফদাড়ি আর চুল খুব ঘন। ইঁহার সাহায্য পাইয়া সাহারানন্দ কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন। ইনি সহায় থাকিলে, গুরুজীর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়াও মৌলীবাবুদের উপকার করা যাইবে।

পরদিন সকালে সাহারানন্দ মৌলীবাবুদের দরজায় উপস্থিত হইলেন; তবে গুরুজীর নিষেধ থাকায় ভিতরে ঢুকিলেন না। সাহারানন্দের ডাক শুনিয়া মৌলীবাবু বাহিরে আসিলেন, আর কিছুক্ষণ আলোচনার পর কন্যা সুলক্ষণাকে ডাক দিলেন। সুলক্ষণা স্থির ধীর ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৌলীবাবু বলিলেন, "কালিকানন্দ জ্যোতিষী এই সব কবচ সাহারানন্দজীর হাতে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। একটা তোমার মাকে পরতে বল, আর একটা তুমি নিজে পর। পিনাকী যদি লিলুয়া থেকে আসে তবে তাকেও একটা দেওয়া যাবে। আমারটা আমার কাছেই রইল।" সুলক্ষণা কবচ লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইবামাত্র সাহারানন্দ বলিলেন, "আপনি আর আপনার মা কিন্তু বাঁ হাতে পরবেন। পুরুষদের ডান হাতে আর মেয়েদের বাঁ হাতে কবচ ধারণের নিয়ম।" ব্যবস্থা শুনিয়া সুলক্ষণা আবার প্রস্থানোদ্যত হইলে সাহারানন্দ বলিলেন, "আর একটা কথা শুনুন। শনিবার কবচ ধারণ করতে হ'বে আর সেদিন শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হবে।" সুলক্ষণা তৃতীয়বার প্রস্থানোদ্যত হইলে সাহারানন্দ বলিলেন, "আর একটি নিয়ম এই—নিয়মটি হচ্ছে এই—বেশী কঠিন নয়—আচ্ছা থাক্, আপাততঃ এতেই হবে।"

সুলক্ষণা চলিয়া গেলে মৌলীবাবু সাহারানন্দকে বলিলেন, "আমাদের জন্য আপনার অনেক কষ্ট হ'ল।" সাহারানন্দ বলিলেন, "আমার কষ্ট হ'ল কোথায়? আসল পরিশ্রমটা হয়েছে কালিকানন্দ জ্যোতিষীর। তিনি একদিন আপনার মেয়ের হাত দেখতে চান।" মৌলীবাবু বলিলেন, "বেশ, তাঁকে একদিন নিয়ে আসবেন।"

কিছুদিন পরে সাহারানন্দ কালিকানন্দের বাড়ী গিয়া বলিলেন, "মৌলীবাবুরা কবচ ধারণ করেছেন। আপনি একবার মৌলীবাবুর মেয়ের হাত দেখলে তাঁরা বিশেষ সুখী হ'ন। মেয়েটির বিবাহরেখা কিরকম সেটা জানবার জন্যই বোধ হয় মৌলীবাবুর বিশেষ আগ্রহ। মোটকথা আপনি গেলে তাঁরা কৃতজ্ঞ হবেন।" কালিকানন্দ বলিলেন, "শুনেছি মেয়েটির লক্ষণ ভাল, দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয়, তবে অকালে চুল পেকে গিয়েছে। তোমার কিরকম মনে হয়?" সাহারানন্দ বলিলেন, "লোকমুখে প্রশংসাই শুনেছি। আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা সাহারামরুর ধ্যান ক'রে ক'রে আজকাল চারদিকেই মরুভূমির উট দেখি। শ্রীচৈতন্যের হয়েছিল, 'যাঁহা যাঁহা নেত্র যায়, স্ফুরে ইষ্টমূর্ত্তি,' আর আমার হয়েছে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র যায়, স্ফুরে উষ্ট্রমূর্ত্তি'; সুতরাং আমাকে জিজ্ঞাসা করা

বৃথা। আপনি সেখানে গিয়ে নিজেই দেখবেন কিরকম।" কালিকানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, যাওয়া যাবে।"

একদিন বৈকালে মৌলীবাবুর বাড়ীর সামনে থপ্ থপ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মৌলীবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কালিকানন্দ তাঁহার বিরাট থপ্থপায়মান দেহগোলকের ভার বহন করিয়া অতিকষ্টে ধীরে ধীরে আসিতেছেন। মৌলীবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন। সাহারানন্দজী যখন বলেছিলেন আপনি আমার মেয়ের ভাগ্যগণনা করতে ইচ্ছুক, তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে, সত্যিই এখানে পদধূলি পড়বে।" কালিকানন্দ বলিলেন, "সাহারানন্দের তপোবল, আপনাদের পুণ্যবল আর আমার কর্ম্মফল আমাকে এখানে ঠেলে এনেছে। আপনাদের বাড়ী সহরের এতটা বাইরে যে, অন্য শক্তি সহায় না থাকলে কিছুতেই এই দেহটাকে এখানে আনতে পারতেম না।" মৌলীবাবু কালিকানন্দকে বসাইয়া ভিতরে খবর দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় ১৫ মিনিট পরে সুলক্ষণা লুচি আর মিষ্টান্ন লইয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টান্নগুলির প্রতি আশীর্ব্বাদপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কালিকানন্দ সুলক্ষণাকে বলিলেন, "মা, আমি জানতে পেরেছি বগলাদেবীর অংশে তোমার জন্ম হয়েছে। বগলা শত্রুনাশিনী, তাই তোমার সব আপদ কেটে যাবে।" মিষ্টান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কালিকানন্দ মৌলিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মেয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়েছেন তো? শুধু হাত দেখলে চলবে না, কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হ'বে।" মৌলীবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, কলকাতার একজন ভাল জ্যোতিষী কোষ্ঠী ক'রে দিয়েছেন।"

জলযোগ শেষ করিয়া কালিকানন্দ ১৫।২০ মিনিট সুলক্ষণার হাত দেখিলেন, আর প্রায় আধ ঘণ্টা কোষ্ঠী পড়িয়া বিচার করিলেন। পরে বলিলেন, "দুই এক বছরের মধ্যেই এর বিয়ে হ'বার সম্ভাবনা আছে।" মৌলীবাবুদের মুখে অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া কালিকানন্দ বলিলেন, "যদি আমার গণনা মিলে যায় তবে আমাকে ইঁটের সমান বড় বরফি, পিঁড়ির সমান টালিগজা, আর তাকিয়ার মতন প্রকাণ্ড পান্তয়া খাওয়াতে হ'বে। আজ অন্ধকার হয়ে আসছে, আর একদিন সকাল সকাল আসা যাবে।" কালিকানন্দ ষ্টিমরোলারগতিতে দরজার দিকে চলিলেন, কিন্তু দরজার কাছে গিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি পঁয়ত্রিশটি লুচি, দশটি সন্দেশ আর তেরটি রসগোল্লা খাইয়াছিলেন; তাই চলিতে বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। মৌলীবাবু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "আজ আমাদের বাড়ীতেই থাকুন। আজ আপনার পক্ষে যাওয়া নিরাপদ নয়।" কালিকানন্দও দেখিলেন যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়; সুতরাং থাকিতে রাজি হইলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভ্রম সংশোধন—গত মাসে এই গল্পের একটি প্যারাগ্রাফ্ একটু ভুলভাবে ছাপা হইয়াছিল। ৪১৭ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি প্রকৃতপক্ষে এইরূপ হইবে...জলযোগ শেষ করিয়া অমরবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। অমরবাবু বন্ধুদের সঙ্গে পণ্ডিতের আলাপ করাইয়া দিলেন।

বিন্‌টিকিটে।

এই নাটিকার পাত্রীগণ,—বৃদ্ধা, তাঁর বধূ ও কন্যা, আধুনিকা তরুণী, বিগতযুগের মাষ্টারণী এবং লেডি টিকেটচেকার। বৃদ্ধা এবং বধূর সম্বন্ধে সবিশেষ লিখবার প্রয়োজন নাই; কন্যা খেঁদীর বয়স বছর ছয়, মাথায় বেড়া বিনুনি এবং ময়লা ঝলঝলে ছিটের ফ্রকে তাকে মানাবে। আধুনিকা উজ্জ্বল-রঙের ছাপা স্মৃতি শাড়ী ও উঁচু খুরওয়ালা জুতো পরবেন, একহাতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ ও অপর হাতে একটি রংচঙে কুশন ও একগুচ্ছ সচিত্র বিলাতি পত্রিকা, কাপড়পরা, চুলবাঁধা ও চলাফেরার ধরণে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়া চাই। মাষ্টারণী কনুই অবধি লম্বা হাত-ওয়ালা ঝলঝলে সাদা স্মৃতির ব্লাউজের সঙ্গে সরু কালো পাড় সাদা গরদ পরবেন, পায়ে একবোতামের হিলনিচু জুতো, মাথার কাপড় সেফটিপিন দিয়ে আটকানো, ভিতরে উঁচু খোঁপার অস্তিত্ব বোঝা যায়। টিকেটচেকার শাদা ফ্রকের সঙ্গে পুরুষালি জুতো ও খাকি সোলার টুপি পরবেন। প্ল্যাটফর্মের অন্যান্য পুরুষ এবং কুলি ইত্যাদির পোষাকের বর্ণনার প্রয়োজন নেই; দরকার হলে তাদের বাদ দিয়েও অভিনয় চলতে পারে।

[দৃশ্য—ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীর মেয়েদের কামরা। একজন বিধবা বৃদ্ধা অশেষ প্রকারের বোঁচকা-বুঁচকি, বধূ ও কন্যা খেঁদিকে নিয়ে বহু চেষ্টায় প্রবেশ করলেন। বৌ এবং মেয়েকে একেক ধাক্কায় উঠিয়ে দিয়ে বোঁচকা-বুঁচকি গুলি টেনে তুলতে তুলতে তাঁর কথাবার্তা আরম্ভ হল।]

বৃদ্ধা—ওরে, ও শোম্ভু, বলি একটু ধর না বাবা। একটা মনিষ্যি যে সাতে এয়েচে, তা একটু নড়ে বসতে পারে না। বলি, তুই বেটাছেলে হয়ে যদি না ধরিস, আমি মেয়েমানুষ হয়ে কি কুলিদের সঙ্গে লড়াই করব নাকি?

[ম্যাট্রিক পাশ করার পর শম্ভু ছ'মাস কলেজে পড়েছিল, নিচুকাজে সে হাত দেয়না তাই নির্বিকারচিত্তে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিড়ি খেতে লাগল। অগত্যা বৃদ্ধা নিজেই মোটঘাটগুলি টানতে ও কুলিদের নানারকমের নির্দেশ দিতে লাগলেন।]

বৃদ্ধা—ওরে, ওই ঝুড়িটা আগে এইগো দে বাবা, ওটায় টিপিন আচে; ওরে একটু সাবধানে ঠ্যাল্, অমন ছ্যাচড় মেরে ঠেলে দিলে যে সব হাঁড়ি-টাড়ি ভেইঙ্গে যাবে।—আর বিছেনেটা বাবা এই দিকে, এই দেয়াল-ঘেঁষা করে রাখ্। আরে অ খেঁদি, নে, নে, পানের বাটাটা নিয়ে নে, অ শোম্ভু কুলিদের পয়সা দিবিনে নাকি (কুলিদের প্রতি) যা যা, অই বাবুর কাচে নিগে।

[এইবার শম্ভু সম্মানজনক কাজের আহ্বান শুনতে পেয়ে 'মণিব্যাগ' হাতে করে এগিয়ে এসে কুলিদের সঙ্গে ভাড়ার আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। বৃদ্ধা এতক্ষণে দেখতে পেলেন যে বৌ ঘোমটা

সামান্য ফাঁক করে কৌতুহলী দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র জনতার দিকে চেয়ে আছে, তৎক্ষণাৎ মাথার কাপড় আবক্ষ টেনে দিয়ে—যদিও তাতে পিঠের দিকে অনেকটাই ফাঁক হয়ে গেল—তাকে এক ঠেলা দিয়ে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলেন।]

বৃদ্ধা—ওকি গা, এতটুকু বুদ্দি নেই নাকি তোমার? এই এতগুলো নোকের সামনে বেহায়ার মত দেঁইড়ে থাকতে নজ্জা করেনা?

[খেঁদিকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন।]

বৃদ্ধা—বল্লুম লুকিয়ে থাক, টিরেন ছাড়বার আগে বেরুসনি, তা ছুঁড়ির কানে গেলনা। টিকিটসায়েব এসে থানায় নিয়ে গেলে কি কবি শুনি। (বাইরে দাঁড়িয়ে যে জনতা কামরাটির দিকে লুব্ধ-দৃষ্টিপাত করছিল তাদের প্রতি) যত সব ভূতের কেত্তন একেনে; বলি ওগো সব ভালোমানুষের পো, মরবার কি ঠাঁই পাস্‌নি যে একেনে দেঁইড়ে গেরস্তর বৌঝিকে চোক দিয়ে গিলতে আচিস্? (স্বগত) আর পারিনে বাবা, জাতজন্ম আর কিছু রইলোনা।

[বৃদ্ধা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যে অতিআধুনিকা তরুণী ও বিগত যুগের মাষ্টারণী এসে উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসলেন।]

বৃদ্ধা—(হঠাৎ উঠে বসে তরুণীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) বে হয়েচে?

তরুণী—(সংক্ষেপে) না (ছবির বইয়ে মনোনিবেশ করল)।

বৃদ্ধা—এ্যাঁ—! ওমা কোতা যাবো গো!! কোন জেতের মনিষ্যি গো তোমরা! বৌমা, খাবারের পুঁটলিটা শিগ্‌গির সরিয়ে ফেল। (খানিকক্ষণ অভিনিবেশসহকারে তরুণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে) ওগো শুনচ? বলি ও শুনচ? (কাছে গিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে)বলি শুনতে পাচ্চ?

তরুণী—দেখুন, আমাকে বারবার disturb করবেননা। আপনার মত vulgar woman এর সঙ্গে কথা বলবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই।

বৃদ্ধা—আবার ইঞ্জিরি কয় দিকি! দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, কালে কালে কতই দেখব!

[ট্রেন ছেড়ে দিল। তরুণী হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে থেকে সরঞ্জাম বার করে প্রসাধন সুরু করল। খেঁদি সুযোগে অল্প অল্প করে বেঞ্চির তলা থেকে বেরোতে লাগল।

তরুণী—(সহসা খেঁদির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ভীতিবিহ্বলস্বরে) The-th There's m-m-man under th-th-the b-b-bench! (মুখে কুশন চাপা দিল)

মাষ্টারণী—(আরও লাফিয়ে উঠে) চোর, চোর, পুলিশ, পুলিশ!

তরুণী—(এলার্মচেনের দিকে হাত বাড়িয়ে) Stop the train, guard, guard!

বৃদ্ধা—(এক হ্যাঁচকা টানে দুজনকেই বসিয়ে দিয়ে ওগো তোমরা কি চোকের মাতা খেয়ে বসে আচ ? একরত্তি একটা মেয়েকে দেকে হন্যে হয়ে নাপাতে লাগল দেক !

তরুণী—(বৃদ্ধার ঠেলা যেখানে লেগেছিল সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে) How dare you !

বৃদ্ধা—আবার হাঁউমাউ করচে দেকো ! কেনেগা, আমি কি তোমাদের টপ করে গিলে নিচ্চি নাকি ? চিক্কুরি দেকে গা জ্বলে যায় ! [শয়ন ও নিদ্রা]

মাষ্টা—(ব্যাপারটি উপলব্ধি করে) বুড়িমা, ও বুড়িমা, শুনচ ? শোনোনা একটা কথা।

বৃদ্ধা—(চমকে জেগে) এঁ্যা ? কি বলচ ?

মাষ্টা—আচ্ছা ষ্টেশনে টিকিট সাহেব এসে যদি বেঞ্চের তলা দেখে তাহলে কি করবে ?

বৃদ্ধা—ওমা, সিকি কতা গো ? তবে যে আমাদের থানায় নে যাবে গো ! তবে যে !

মাষ্টা—শুনুন না—

বৃদ্ধা—ওগো, বাবাগো, আমি ধনেপ্রাণে গেলুমগো ! বামুনের মেয়ে হয়ে কেমন করে জেলের পিণ্ডি গিলব গো !

মাষ্টা—(কানের কাছে চীৎকার করে) শুনুন—আপনাকে পুলিশে ধরবে না—

বৃদ্ধা—এঁ্যা ? ফুলচন্নন পড়ুক তোমার মুখে—সায়েব বুঝি তোমার শ্বশুর।

মাষ্টা—আপনি যদি এক কাজ করতে পারেন তাহলে সাহেব কিছুতেই আপনাকে ধরতে পারবে না। ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই আপনার মেয়েকে মুড়িসুড়ি দিয়ে, খুব ছোট্ট খুকুটি সাজিয়ে কোলে শুইয়ে রাখবেন। (নিজের বাক্স খুলতে খুলতে) আমার কাছে চুষিকাঠি আর ঝুমঝুমি আছে। আমি বার করে দিচ্ছি, এইগুলো দিয়ে আপনি ওকে খেলা দিতে থাকুন, তাহলে সাহেব একেবারে সন্দেহই করবেনা।

বৃদ্ধা—(জিনিষগুলি হাতে নিয়ে) মা দুগ্গা তোমার হাত সোনা দিয়ে বাঁদিয়ে দিন, তোমার মুকে ফুলচন্নন পড়ুক। [গাড়ী থামল]

বৃদ্ধা—ওমা, এইবেরে যে সায়েব আসবে গো। অ-খেঁদি, ইদিকে আয়, আমার কোলে মাতা রেকে একেনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। (খেঁদি উঠে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে) হকচকিয়ে দেঁইড়ে রইলি যে বড় ? বলি আসবি—না আনতে হবে চুলের মুটি ধরে ? (খেঁদি শুয়ে পড়ল বৃদ্ধা তার মুখে চুষি গুঁজে দিলেন) অ-বৌমা, ওই চাদরটা দিয়ে পা দুটো ঢেকে দাওতো গো।

[বৌ চাদর ঢাকা দিয়ে দিল]

মাষ্টা—তবু বোঝা যাচ্ছে। পায়ের দিকে একটা বাক্স চাপা দিন।

বৃদ্ধা—অ বৌমা—

[বৌ একটা টিনের বাক্স খেঁদির পায়ের উপর চাপা দিয়ে দিল।]

[লেডি টিকেটচেকারের প্রবেশ।]

বৃদ্ধা— খেঁদির নাকের সামনে ঝুনঝুনি নাড়তে নাড়তে) এ কে গা? পুরুষ মানুষ না মেয়েমানুষ কিছুই বোঝা যায়না যেগো!

টিকেট—টিকেট, টিকেট, টিকেট লে-আও।

বৃদ্ধা—(ট্যাঁক থেকে দুখানি টিকিট বার করে) এই নাও বাপু, দুকোনা টিকিট, বৌমার আর আমার।

[টিকেটচেকার টিকিট নেবার জন্য হাত বাড়াবামাত্র খেঁদি মুখে চুষি নিয়েই উঠে বসল, বাক্সটা পায়ের উপর থেকে পড়ে গেল।]

টিকেট—(চমকে উঠে) ই ক্যা হ্যায়? ইস্‌কা টিকেট কাঁহা?

বৃদ্ধা—ওকি গা, এ যে দু'বচরের মেয়ে, এর আবার টিকিট কি?

টিকেট—(খেঁদিকে টেনে দাঁড় করিয়ে) ছে বরিস্‌সে কম্‌তি নহি হোগা।

বৃদ্ধা—সেকি কতা মেমসায়েব, এই কচি খুকির বয়স ছ'বচর বলচ? (সাহসে ভর করে) বলি আমার নাত্‌নির বয়সটা কি আমার চেয়ে বেশী জান?

টিকেট—ফাইন লেয়াও।

বৃদ্ধা—ও বাবা, ফানিমানি জানিনে—

টিকেট—রোপেয়া নিকালো।

বৃদ্ধা—রূপো কোতা পাবো মেমসায়েব, হামলোগ্‌ যে গরীব আদমি।

টিকেট—পৈসা দেও।

বৃদ্ধা—(সভয়ে) কত পয়সা চাওগো? চার পয়সায় হবে?

টিকেট—দো রোপেয়া দো আনা।

বৃদ্ধা—আচ্ছা, আচ্ছা, চারগণ্ডার পয়সাই না হয় দিচ্চি; আমি তোমার নেড়কি হায়, তুমি আমার মাবাপ হায়, জবরদস্তি করলে কার কাছে যাব বল?

টিকেট—দো রোপেয়া দো আনা।

বৃদ্ধা—আচ্ছা, আচ্ছা, আটআনা দিলে হবে মেম সায়েব?

টিকেট—দো রোপেয়া দো আনা। গড়বড় করনেসে সাহাবকো বোলাওয়েঙ্গে।

বৃদ্ধা—(ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে দিয়ে) তবে পুরো টাকাটাই নাও। ওগো আমায় সব্বসান্ত করে দিলে গা, এমন রাক্কুসি, ধিঙ্গি মেয়ে কোতাও দেকিনি গা—

টিকেট—জল্‌দি দেও, নেইতো থানেমে লে চলেঙ্গে।

বৃদ্ধা—ওই তো দিইচি মেমসায়েব।

টিকেট—ও ঠিক নহি হুয়া, ঔর এক রোপেয়া দু-আনা।

বৃদ্ধা—ও মেমসায়েব, এই দু-আনা নাও, আমার কাচে আর কিচুটি নেই। বামুনের মেয়ে, আশীর্ব্বাদ করে যাব, তোমার পুত্র হবে। হায় হায় কেন ওই আবাগী কেষ্টাণীটার কথা শুনেছেলুম গো, বেঞ্চির তলায় তো ভাল ছেল।

টিকেট—তব চলো থানেমে। (টানাটানি) পোলিস, পোলিস।

বৃদ্ধা—ও বাবাগো! এই নাও তোমার টাকা (টাকা নিয়ে মেম চলে গেল) হায়, হায়, আমার কি হলগো। ও মা ডাকাতে সব লুটে নিলে যে গো—ও।

যবনিকা

ফাউন্‌টেনপেন

শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী।

হৃদয়ের বন্ধু তুমি মোর,
তুমি মোরে করিয়াছ কবি,
মিলনের তন্দ্রামাঝে বিরহেতে ঘোর,
আঁকিয়াছ তুমি মোর হৃদয়ের ছবি।

অন্তরের মণি মঞ্জুষায়,
স্তব্ধ চিতে যেই ভাষা নিত্য বাজিরায়,
দীর্ঘ-শ্বাস রূপে,
তুমি চুপে চুপে,
বেদনার উৎস হতে বক্ষে তুলি তায়
এঁকেছ যে তার ছবি মোর লিপিকায়।

রূপ ও সজ্জা।

শ্রীবীণা ভট্টাচার্য।

রূপচর্চ্চার প্রধান অঙ্গ পোষাকপরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ; কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ক'রতে হ'লে পোষাকপরিচ্ছদ ও অলঙ্কার যেমনই আবশ্যকীয় তেমনই আবার পূর্ণ স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন। শুধু দামী দামী শাড়ী ও গহনা থাকলেই রূপবতী হওয়া যায়না, শাড়ী ও গহনা অনেকেরই আছে কিন্তু সে সবের ব্যবহারে সুরুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিতেও পারা চাই। অতি অল্প সংখ্যক মেয়েই সে সুরুচির পরিচয় দিতে সমর্থ। সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদের যেমন শোভন ও সুরুচিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, তেমনই আবার সেগুলি শ্লীলতাবিরুদ্ধ যাতে না হয় সেদিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা চাই ; কারণ অনেক রূপবতীই শুধু শ্লীলতাবিরুদ্ধ সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদের জন্য সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন না। স্বল্পব্যয়ে প্রসাধন ও সাজসজ্জা ক'রে যাতে দৈহিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ক'রতে পারা যায় তারও চেষ্টা করা উচিত, কারণ পুরুষরা মেয়েদের সুরুচিসম্পন্ন সাজসজ্জা পছন্দ করে, কিন্তু বিলাসিতা ও সজ্জাবাহুল্য পছন্দ করেনা।

এবার ভূমিকা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক্। বাংলা দেশে সাধারণতঃ সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ ও শাড়ী ব্যবহৃত হয় ; কেউ কেউ অন্তর্বাসও (bodice) ব্যবহার করেন ; কিন্তু আজকাল বেশ 'ফিট' করা ছাঁটের সেমিজের প্রচলন হয়েছে, নিজের মাপ অনুযায়ী সেই ধরণের সেমিজ ব্যবহার করলে আর আলাদা কুঁচি দেওয়া সায়া বা পেটিকোট অথবা অন্তর্বাসের দরকার হয় না। শাড়ী একটু ফুলে থাকলে ভাল দেখায়, অথচ পেটিকোটে কুঁচি দিতে অনেক কাপড় লাগে। উপরে বর্ণিত ছাঁটের সেমিজের ঝুল যদি পায়ের গোড়ালির একটু উপর পর্য্যন্ত করা যায় ও নীচের দিকটায় পেটিকোটের ছাঁট দিয়ে কড়া ইস্তিরি করিয়ে নেওয়া যায়, তা'হলে অল্পব্যয়ে বেশ একসঙ্গে সেমিজ ও পেটিকোটের কাজ চালানো যায় এবং দেখতেও ভাল হয়। কিন্তু সর্ব্বদা এরকম আঁট সেমিজ পরা উচিত নয়, কারণ এতে দেহের রক্ত ও বায়ু চলাচলের অসুবিধা হয়। বিশুদ্ধ খোলা হাওয়া চর্ম্মের পক্ষে ঔষধের কাজ করে ও চর্ম্মকে নরম ও সুন্দর রাখে।

ব্লাউজের গলা ও হাতা নানারকমের হ'তে পারে। খুব বেশী বড় গলা পরা সুসভ্য নয়, ছোট ও মাঝারি গলাই ভাল। ছোট গলার মধ্যে গোল ও চৌকো এবং মাঝারির মধ্যে 'ভি' বা 'ভি-স্কোয়ার' সুন্দর। অনেকে 'কলার' পছন্দ করেন কিন্তু 'কলার' মানায় শুধু তাঁদের যাঁদের গ্রীবার গড়ন লম্বা ধরণের। লেসের (lace) 'কলার' সবাই পরতে পারেন। আজকাল ব্লাউজের ছোট হাতা বা কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা হাতার পরিবর্ত্তে একটু বড় হাতারই বেশী প্রচলন হয়েছে। কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা হাতা গায়ে আঁট করে 'ফিট' করা স্যাটিন বা ব্রোকেডের ব্লাউজেই বেশী ভাল দেখায়। যে সব মেয়েরা কৃশ

তাঁদের পক্ষে কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা হাতার চাইতে একটু ফোলানো (puffed) হাতা বা তেরছা ছাঁটের ফোলানো হাতাই ভাল দেখায়। একেবারে সাদাসিদে ব্লাউজের চেয়ে তাঁদের একটু ফাঁপানো ও 'ফ্রিল' দেওয়া ব্লাউজ পরলে অতটা রোগা মনে হবে না। যাঁরা একটু মোটা তাঁদের পক্ষে বাহুর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আঁট হাতা ভাল।

ব্লাউজের গলায় ও হাতায় সূচের কাজ থাকলে বেশ সুন্দর লাগে, কিন্তু ডিজাইন বা নক্সা খুব অল্প হলেই ভাল। ব্লাউজের সমস্ত জমিতে ছোট ছোট বুটি তুল্লেও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁধের যে দিকটা শাড়ীতে ঢাকা থাকে না (সাধারণতঃ ডান দিক) সেদিকের কাঁধ থেকে বুকের দিকে একটি ফুলের গুচ্ছ নামিয়ে দিলে ও সুন্দর দেখায়। ব্লাউজে জরি বা জরির পাড় বসানোর রীতি প্রায় বিলুপ্ত হ'য়েছে। তবে শাড়ীর পাড় তেরছা করে কেটে সরু করে দুতিন সার যদি গলায় ও হাতায় লাগানো যায় তো বেশ সুন্দর হয়।

শাড়ী ও ব্লাউজের বর্ণ নির্ব্বাচন বেশ কঠিন কাজ, কারণ দেহের বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণ নির্ব্বাচন করতে পারলেই তবে সজ্জা সুরুচিসঙ্গত হয় ও সুন্দর দেখায়। সাধারণত উজ্জ্বল রংয়ের পোষাক ফর্সা বা গৌরবর্ণের মেয়েদেরই মানায়, তবে যে কোন হাল্কা রং সবাইকেই মানায়। দেহের বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে ফর্সা মেয়েরা উজ্জ্বল রং পরতে পারেন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মেয়েরা মাঝামাঝি রং পরবেন ও যাঁদের রং একটু ময়লা তাঁদের হাল্কা রং পরলেই মানায় ভাল। খুব ঘনঘন ছাপের পোষাক ব্যবহার করা কারো পক্ষেই ভাল নয়, তবে আজকাল বেশ সুন্দর সুন্দর ছাপা শাড়ী ও ব্লাউজের কাপড় বেরিয়েছে। এগুলির ব্যবহারে সুরুচির পরিচয় দেওয়া সহজ না হলেও চেষ্টা করলে একেবারে অসম্ভব নয়।

শাড়ীর পাড়ের ও ব্লাউজের রং একরকম হ'লেই ভাল হয়, কাছাকাছি হ'লেও চলে। খুব চওড়া পাড়ের শাড়ী লম্বা মেয়েদেরই ভাল দেখায়, যাঁদের দৈর্ঘ্য কম তাঁদের সরু ও মাঝমাঝি শাড়ী পরলে ভাল দেখাবে। কৃশকায়া ও স্থূলকায়া মেয়েদের পক্ষেও ঐ কথাই খাটে। কৃশকায়াদের পক্ষে সরু ও মাঝারি পাড়ই ভাল, চওড়া পাড়ে তাঁদের লালিত্যের অনাবশ্যক হানি হয়। পাড়ের নক্সা সরল ও সুন্দর হ'লেই ভাল। জরির পাড়ের মধ্যে ঢালা বা ঘনবোনা পাড়ই ভাল দেখায়।

এবার শুধু পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধেই আলোচনা হ'ল বারান্তরে অলঙ্কার সম্বন্ধে লিখবার ইচ্ছা রইল।

রন্ধন।

শ্রীশোভা দত্ত।

(১) টমেটো দিয়ে রুইমাছ।

উপাদান—টমেটো, রুইমাছ, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, ঘি, গরম মসলা। আধসের মাছে একসের টমেটো দিয়ে প্রথমে (Sauce) মতন তৈরী করতে হবে। টমেটোগুলি চারফালি করে কেটে তাতে আদাবাটা, পেঁয়াজবাটা, একটা রসুনবাটা, আস্ত গরম মসলা, চিনি ও নুন দিন। যখন টমেটো বেশ থকথকে হয়ে আসবে তখন নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে বেশ করে রসটা ছেঁকে নিয়ে একটা সসপ্যানে রাখুন। সসে একটুও জল দেওয়া হবে না, জল দিলেই পানসে হয়ে যাবে।

মাছগুলো যেন বেশ তেলওয়ালা পেটের মাছ হয়। সেগুলিকে বেশ করে নুন ও হলুদ মাখিয়ে ঘিয়ে অল্প অল্প ভেজে নামিয়ে রাখুন। পরে ঐ টমেটোর রসে এমন করে মাছগুলি ডুবিয়ে দিন যাতে প্রত্যেকটি মাছের গায়ে রস লাগে। তারপর উনুনে দশ মিনিট বসান, বেশ যখন ফুটে উঠবে তখন নামিয়ে নিন। পরিবেশন করবার আগে সিদ্ধ কড়াইশুঁটি উপরে ছড়িয়ে দিন। মাছের রং লাল হবে, উপরে কড়াইশুটি ছড়িয়ে দিলে দেখতে বেশ বাহার হবে।

(২) কইমাছ।

উপাদান—কইমাছ, আদাবাটা, পেঁয়াজবাটা, ধনে-জিরেবাটা, হলুদ ও লঙ্কাবাটা, আস্ত গরম মসলা, তেজপাতা, নুন ও ঘি। কইমাছটা, কাটবার সময়ে পেটের মাঝে চিরে চিরে দেবেন, কিন্তু খুব বেশী চেরা হয়ে গেলে মাছটা ভেঙে যাবে। একটি পাত্রে মাছগুলির সঙ্গে আদা পেঁয়াজ, ধনেজিরে, লঙ্কা, হলুদবাটা ও আস্ত গরম মসলা, তেজপাতা ও নুন দিতে হবে। মসলা যেন বেশী বেশী দেওয়া হয়। কড়াইতে বেশ ঘি দিয়ে নরম আঁচে বসাবেন। মসলাগুলি মাছের সঙ্গে এমন করে মেখে নিন যাতে মাছের গায়ে গায়ে মসলা থাকে এবং মসলামাখা মাছ কড়াইতে ছাড়ুন এবং যেমন কসবার সময়ে অল্প জল দেয় অমনি জল দিয়ে ঢেকে দিন, মসলা যেন জুড়ে না যায়। যতক্ষণ মাছ না সেদ্ধ হয় এবং মসলা না ভাজা হয় ততক্ষণ খুব নজর রাখবেন এবং অল্প অল্প জলছিটা দেবেন। মাছ বেশ সিদ্ধ হলে নামিয়ে নেবেন। একটুও জল থাকবেনা, কেবল ঘি থাকবে।

এইভাবে মাগুরমাছ রান্না করলে খুব চমৎকার খেতে হয়, তবে মাছগুলি একটু পুরু পুরু করে কাটবেন।

দিদির চিঠি।

শ্রীবড়দিদি।

স্নেহের মিনি,

তোমার চিঠিটা পেয়ে ভারি খুসি হলাম। প্রকৃত ভালবাসা কাকে বলে এ জানতে চাও কেন হঠাৎ? অবিশ্যি এ কথা স্বীকার করি যে ভালবাসার প্রসঙ্গ তরুণীমাত্রের পক্ষেই আগ্রহজনক, বিশেষত, আজকাল যখন সমাজের কোনো কোনো স্তরে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরকে ভালবেসে বিবাহ স্থির করবার রীতি প্রচলিত হয়েছে, তখন প্রশ্নটা শুধু আগ্রহজনক নয়, তোমার মত মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বহু তরুণী ভালবেসে বাগ্‌দত্তা হয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, প্রত্যেকেই কোনো একটি মুহূর্তে মনে করেছে যে তার প্রেমের মত গভীর প্রেমের উদাহরণ জগতে আর দেখা যায়নি। পরে সংসারের কষ্টী পাথরে যাচাই হ'য়ে এর মধ্যে অনেকের প্রেম সত্যকারের প্রেম বলে প্রমাণিত হয়েছে বটে কিন্তু কারো কারো জীবনে তার ফাঁকিটা যে ধরা পড়েনি তা নয়। তাই বলি প্রকৃত প্রেমকে চিনবার চেষ্টা করা তোমাদের সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়।

মনে করে দেখ অনীতার কথা, প্রবোধের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর সে বলে বেড়াত যে তার প্রেমের মত স্বার্থলেশহীন পরিপূর্ণ প্রেম জগতে দুর্লভ। সত্যি করেই, প্রবোধ তো খুবই গরিব, কাউকে দামি টিকিটে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়া কিংবা ফুল বা অন্যান্য জিনিষ উপহার দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এই সময়ে অনীতার এক বড়লোক বন্ধুর উদয় হল। ভদ্রলোকটি অবশ্য বিবাহিত, মফঃস্বলে কোথায় ভারি কাজ করেন এবং তারই সম্পর্কে দিনকয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। অনীতা তাঁর ছোট বোনের মত, পয়সারও তাঁর অভাব ছিলনা, কাজেই তিনি যে অনীতাকে সিনেমা দেখার বা ফারপোতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই; বহুদিন ও-সব ভালো ভালো জায়গায় যেতে না পাওয়ার ফলে অনীতারও যে যাওয়ার জন্য খুব আগ্রহ থাকবে তাও স্বাভাবিক; আবার প্রবোধও তো এমন স্বার্থপর ছেলে নয়, যে, যে আনন্দ সে নিজে অনীতাকে দিতে পারবেনা সে আনন্দ অন্য কেউ তাকে দিলে সে বাধা দেবে। তবু অনীতা শেষ পর্যন্ত তার আদর্শ প্রণয়ের খাতিরে তার বড়লোক বন্ধুর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল।

কাজটা যে সে ভালই করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরদিন একটু বড়াইয়ের সুরে সে আমার কাছে গল্প করল—"আমি বুঝতে পারছিলাম যে প্রবোধ আমার যাওয়াতে খুব আন্তরিক ভাবে সায় দিচ্ছিলনা, তাছাড়া যখন গরিবলোকের বউ হতেই যাচ্ছি তখন দরকার কি ও-সব কুঅভ্যাস বাড়িয়ে? তাই যদিও আমার যেতে ভয়ানক ইচ্ছা করছিল তবু গেলামনা।"

অনীতার ভালবাসা যদি সত্যি করে স্বার্থলেশহীন হত তাহলে ওর যাওয়ার ইচ্ছাই করতনা, আর গেলেও ও কোন আনন্দই পেত না; কাজেই, কিছুদিন পরে যখন শুনলাম যে ও প্রবোধের সঙ্গে বিয়ের

কথা ভেঙ্গে দিয়েছে, এমন একটি সুপাত্রের খাতিরে যে তাকে দামি দামি উপহার দিতে এবং পয়সা খরচ করে ভালো ভালো আমোদ প্রমোদের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য হলামনা। যখনই তার মুখে শুনেছিলাম যে বড়লোক বন্ধুটির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তার "ভয়ানক ইচ্ছা করছিল"—তখনই বুঝেছিলাম যে এ সে প্রেম নয় যে দারিদ্র্যের উপর জয়ী হতে পারে।

এইটাই প্রকৃত প্রণয়ের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তোমার যখনই মনে হবে কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েছ, তখনই নিজের মনকে পরীক্ষা করে বুঝতে চেষ্টা কোরো যে তার সঙ্গে কোনো অতি সাধারণ জায়গায় যেতে তোমার বেশী ভাল লাগে না তাকে বাদ দিয়েও সিনেমা বা পার্টির আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। হয়ত তোমার সিনেমার একটা ছবি দেখবার খুব সখ আছে, কিন্তু সে হয়ত তোমার সঙ্গে বাড়িতে বসে দুটো কথা বলতে চায়, তখন কোনটা তুমি বেছে নেবে, তার সঙ্গ না ওই চিত্তাকর্ষক ছবিটা? যদি তার সঙ্গের তুলনায় অন্য সমস্ত আমোদ প্রমোদ তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় তবেই বুঝবে তোমার ভালবাসা যথার্থ স্বার্থলেশহীন প্রেম।

ভালবাসা আর মোহের প্রভেদ সম্বন্ধে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, যে মোহ নিতে চায় আর ভালবাসা দিতে চায়। আমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা, তার নাম কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তার নাম প্রেম॥"

সত্যিসত্যি ভালোবাসলে অনেক ছাড়তে হয়। এ বিষয়ে নিজেকে আরো পরীক্ষা করে দেখতে পারো। মনে কর, কাউকে তুমি মনে মনে ভালবাসো এবং মনে কর যে সেও তোমাকে ভালবাসে, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ তুমি পাওনি; এ ক্ষেত্রে তুমি তার জন্য তোমার সামাজিক খাতির কতটা ত্যাগ করতে পার?

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। তুমি তো লোকের খুব নকল করতে পার, এবং পার্টি ইত্যাদিতে ওই গুণটির জন্য খাতিরও খুব পাও। মনে কর এখন একজনের সঙ্গে হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেলে. সে হয়ত একটু তোৎলা, অথবা বাঙাল টান দিয়ে কথা বলে; এখন যদি কোনো পার্টিতে বন্ধুবান্ধবেরা তার নকল করবার জন্য তোমাকে ধরে বসে তাহলে তুমি কি করবে? তার ভঙ্গির নকল করে সবাইকে হাসিয়ে নিজের খাতিরটা বাড়িয়ে তুলবে, না বিনয় করে বলবে—"না ভাই, ওটা এখনও অভ্যেস হয়নি"?

আবার মনে কর, তোমার যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তার আর তোমার মত একেবারেই মেলেনা। হয়ত তুমি মনে কর আঁটসাট, ঘোররঙের পোষাকেই তোমাকে বেশী মানায়, অথচ, সে চায় সে তুমি পাৎলা ফুরফুরে, হাল্কা ধরণের কাপড়চোপড় পর, তাহলে তুমি কি করবে? আবার হয়ত তোমার মনে হয় যে তোমাকে রংচঙে বাহারে পোষাকেই বেশী মানায়, অথচ, সে হয়ত চায় যে তুমি হাল ফ্যাশানের কাটছাঁটওয়ালা, কলারকাফওয়ালা, বন্ধ গলা, লম্বা হাতের, সাদাসিদে

কাজের মেয়েদের মত পোষাক পর. তখন তুমি কি করবে? ওকে খুসি করতে চাইবে, না ইচ্ছামত পোষাক করবে?

আর একটা উদাহরণ দেব? আজকাল তো তোমাদের হাতের আঙুলের নখের নানারকমের বাহার হয়েছে, বড় বড় নখ রেখে, তাতে রং দিয়ে চকচকে করে তোমরা সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতে চাও। তুমি কি তার জন্য ঘরের কাজ করে এই সযত্নবর্ধিত ও রঞ্জিত নখ নষ্ট করতে রাজি আছ? ছেঁড়া কাপড়চোপড় রিপু করে, পান সেজে, রান্না করে যদি তোমার চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি একটু ম্লান হয়ে যায় তবে তোমার কতটা দুঃখ হবে? আরো কত উদাহরণ দেওয়া যায়। ধর, যে ধরণের বই পড়তে বা গানবাজনা শুনতে তার খুব ভাল লাগে তুমি তা একটুও পছন্দ করনা, তুমি কি তার খাতিরে সে সবের চর্চা করতে রাজি হবে?

তুমি তার বন্ধুবান্ধবদের কতটা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে? এতটা সুযোগসুবিধা ও অধিকার তাদের দিতে পারবে কি, যাতে বিয়ের পরও আগেকার বাঁধন শিথিল না হয়?

একজন মেয়ের কথা আমি জানি, সে বলত যে পুরুষমানুষের মধ্যে তিনটি জিনিষ সে দেখতে পারেনা, — উকিল, বাঙাল আর কালো। তারপর যে লোকটিকে সে বেছে নিল, দেখলাম, তার মধ্যে যেন ওই তিন গুণের ত্র্যহস্পর্শযোগ হয়েছে। তুমি কি কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য তোমার মতামত এম্নিভাবে বদলাতে রাজি হবে?

যে লোকটিকে তুমি বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ তার সঙ্গে কি তুমি উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা. অথবা পৃথিবীর যে-কোনো দেশে যেতে রাজি আছ?

এই যে প্রশ্ন গুলি করলাম, এ গুলির উত্তরে যদি "হ্যাঁ" বলতে পার তবে বুঝব তোমার ভালবাসা যথার্থ ভালবাসা। কিন্তু, ব্যাপার কি বলত? হঠাৎ সত্যিকারের ভালবাসার বিষয়ে জানবার এত আগ্রহ কেন? টিনির চিঠিতে জানলাম, আজকাল কোনোও একটি ভদ্রলোক তোমাদের দরজায় বিশেষভাবে হাজিরা দিচ্ছেন, কিছু মৎলব নেই তো? সবিশেষ বৃত্তান্ত জানবার জন্য উৎসুক রইলাম। ইতি—

তোমাদের দিদি।

জাগ্রহি

মধুমঞ্জরী

শ্বেতধ্বজা বয়ে' রক্তিমবেশে, এস বাঙ্গালার নারী,
এক হাতে লয়ে' শান্তি সলিল,— আর হাতে তরবারি।
দুর্দিনে আজ তুমি,
নির্ভীক পায়ে সত্যের পথে পবিত্র কর' ভূমি।

ভয়ের দণ্ড হাতে লয়ে আসে মিথ্যা দানবাসুর,
দুর্লগনের দর্প তাহার কর তুমি আজ দূর।
অন্তঃপুরে শান্তির দেবী ছিলে তুমি এতদিন,
সময় এল যে, দ্বারপ্রাঙ্গনে কাঁদে শত দীনহীন :
ঘরের পুণ্য কল্যাণমধু অন্তর ভাণ্ডারে
বহে আনো নারী, পথের প্রান্তে আর্তজনের তরে।
ক্ষুধিত পীড়িত পিপাসু পথিক, আশ্রয়হীন কাঁদে,
অসুর-হিংসা অক্ষমা হয়ে শতপাকে তারে বাঁধে :
বরাভয় লয়ে মিথ্যাদলনী এসো আজ রণভূমে
পবিত্র হোক্ পথধূলি আজ তব পদতল চুমে।

পথে পথে হাহাকার,—
তোমার কুটীর-অঙ্গনে নারী সাড়া কি জাগেনা তার ?
যাতনাদিগ্ধ পথচারী ওরা,— আশ্রয়, সেবা মাগে,
কান পাতি' শোনো,— প্রতিধ্বনি যে তোমারি বক্ষে জাগে।
খোল, খোল দ্বার, প্রসারিয়া দাও গৃহচত্বরটাকে,
বিপুল বিশ্ব বড় বেদনায় আজিকে তোমাকে ডাকে।

আর্ত কাঁদিছে দ্বারে,—
এস নারী দাও, কি আছে অমিয় তব গৃহভাণ্ডারে।

অন্যায়-বলে অত্যাচারীর স্ফীত যে অহঙ্কার,
তীক্ষ্ণ আঘাতে নির্মম হাতে ধ্বংস করিও তার।
দুঃখী আহত পথ পাশে যারা,— চির অভিমানী দীন,
মর্মে যাদের শত অভিযোগ,— কণ্ঠ বাক্যহীন,—

যাদের হৃদয় শতাব্দী হতে অপমানে জর্জর,
বাঙ্গালার নারী, তুমি যে তাদের একান্ত নির্ভর !
তাদের ভরসা দিও,
জীবনে তাদের আনন্দ আনি' করে দিও বরণীয়।
অবলা বলিয়া তোমারে যাহারা চিরদিন রাখি' দূরে
নিজ-অগোচরে হেলায় হারাল জীবনের বন্ধুরে,
আজি দুদিনে প্রসন্ন মনে তাদের করিও ক্ষমা
স্নেহে-করুণায় অনাদি-যুগের তুমি চিরনিরুপমা !
শাসন করিও অপরাধী জনে যবে প্রয়োজন হবে,
মিথ্যাচারীর দণ্ডে তোমার অসি উদ্যত রবে।
কৃপাণ তোমার পাণিতে,—ললাটে সিন্দূর-রক্তিমা,—
জাতির জীবনে নবজাগরণে উদয়ের অরুণিমা !
অনেক যুগের হে অবহেলিতা, আজিকে দুঃখদিনে
বাহিরিয়া এস আপন জ্যোতিতে, দুর্গমে পথ চিনে'।
দীন চাহে তব মুখে,—
নয়নে আনিও প্রসাদ-শান্তি, সাহস আনিও বুকে।

রমণীর রাজ্য।

—বনস্পতি—

সম্প্রতি লাহোরে অল ইনডিয়া অলিম্পিক গেমস্‌এর দশম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। মেয়েরাও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষত্বের মধ্যে মহিলাদের 'লং জাম্প' এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুক্ত প্রদেশের কুমারী ই মাইকেল্ ১৫ ফিট ৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি দূর লাফ দিয়ে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন মেয়েদের মধ্যে।

* * * * *

মহিলামহলে বিয়ের খবর সব সময়েই মুখরোচক আলোচ্য বিষয়। সম্প্রতি খবরের কাগজে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যকুশলা কুমারী অমলা নন্দীর সঙ্গে বিবাহের যে সংবাদ বেরিয়েছিল তা নিয়ে বেশ জমে উঠেছে মেয়েদের আসর। সকলেই এ খবর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

* * * * *

পণ্ডিত জহরলালের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা নেহেরুর সঙ্গে শ্রীযুত ফিরোজ গান্ধীর বিবাহে আমরা নবদম্পতিকে শুভকামনা জানাচ্ছি।

মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও তদীয় পত্নীর ভারত আগমনে সর্ব্বত্র নানাপ্রকার জল্পনা, কল্পনা চলেছে। দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। নব্যচীনের আদর্শ-প্রতীক এই দুই অতিথি হয়তো ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মনখোলা অভিনন্দন পাননি। নিখিল ভারত মহিলা পরিষদ এর পক্ষে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মাদাম চাং কাইকে অভিনন্দন জানান।

* * * * *

বর্ত্তমান যুদ্ধ সঙ্কটে মেয়েদের অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ অনেক পরিবারই ইতিমধ্যে মেয়েদের স্থানান্তরিত করেছেন এবং করছেন। পেট্রল নিয়ন্ত্রণ ও সরকার কর্ত্তৃক স্কুলের বাসগুলি দখল করার ফলে মেয়েদের যাতায়াতের অসুবিধার জন্যও অনেক ছাত্রীরা স্কুল বা কলেজে যেতে পারছেন না। কয়েকটি বিদ্যালয় ইতিমধ্যে কলিকাতার বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছে ও কলিকাতাস্থিত অবশিষ্ট স্কুলগুলি ভেঙ্গে 'Regroup' করে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন। কয়েকটি স্কুল উঠে যাওয়ায় বহু শিক্ষয়িত্রী কর্ম্মচ্যুতা হয়েছেন।

সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন থেকে বহু অসহায় নরনারী ও শিশু কলকাতায় এসেছেন। অনেক মেয়েরা এসেছেন, যাঁদের আত্মীয় স্বজন নিখোঁজ অথবা মারা গিয়াছেন। এই সব 'Refugee' দের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় ও বাহিরে অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। আমরা তার মধ্যে দুটির কাজের সুপরিচয় পেয়েছি পাঠিকারা যদি কেউ উৎসাহিত হয়ে এ কাজে যোগ দেন, তবে আরও বিবরণের জন্য মেয়েদের কথা'র সম্পাদিকার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করুন। ব্যক্তিগত ভাবে যোগ না দিতে পারলেও আমার বিশ্বাস যে যা পারেন কিছু অর্থ সাহায্য একাজের জন্য পাঠাতে পারেন।

* * * * *

যুদ্ধ সঙ্কটের মধ্যেও যতদূর সম্ভব আড়ম্বর সহকারে ইণ্ডিয়ান উইমেনস্ ইউনিভার্সিটির "সিলভার জুবিলি" অনুষ্ঠান হয়ে গেছে কিছু দিন আগে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষার যে একটা বিশিষ্টধারা আছে, যা ধর্ম্মে, কর্ম্মে রুচিতে ও সৌন্দর্য্যে সব পরিবারে একটা নতুন জীবনের স্রোত এনে দিতে পারে—সেবিষয়ে অনেক বক্তৃতা হয়েছে। কিন্তু 'নিখিল ভারত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের' নামের সার্থকতা হবে সেইদিন, যেদিন উপরিউক্ত শিক্ষা প্রণালী সফল হবে।

বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগের পরিকল্পনাতেও দেখি "College of New Education for women" এর আভাষ। বাস্তবাকারে কবে সে প্রতিষ্ঠান কাজ সুরু করবে, তা জানতে ইচ্ছা করে। 'নিউ এডুকেশন' সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

* * * * *

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আজ গ্রেটব্রিটেনে সহস্রাধিক রাষ্ট্রপরিচালিত নার্সারি স্থাপিত হয়েছে এবং মেয়েরাই এ কাজ চালাচ্ছেন এ খবর আমরা পেয়েছি। রাশ্যার মেয়েরা শুধু সেবায় নয়, বীরাঙ্গনার বেশে অপূর্ব্ব সাহস ও সেবার আদর্শ তুলে ধরেছেন—তার কাছে আমরা মাথা নত করছি।

বঙ্গ-সাহিত্য মহামণ্ডল

১৩৪৮ সালের শারদোৎসবে গৃহীত

বঙ্গভাষায় উপাধি পরীক্ষার ফল।

গদ্য সাহিত্য

প্রথম বিভাগ

[গুণানুসারে]

উপাধি—"সাহিত্য-সরস্বতী"

কালীঘাট কেন্দ্র হইতে :—

*১। শ্রীসুষমা মজুমদার

দ্বিতীয় বিভাগ

উপাধি—"সাহিত্যপ্রভা"

কালীঘাট কেন্দ্র হইতে :—

১। শ্রীআশালতা সরকার

জলপাইগুড়ি কেন্দ্র হইতে :—

২। শ্রীঅরুণা সান্যাল

পদ্য সাহিত্য

প্রথম বিভাগ

[গুণানুসারে]

কালীঘাট কেন্দ্র হইতে :—

*১। শ্রীরুবি মল্লিক

বিশেষ উপাধি পরীক্ষা

দ্বিতীয় বিভাগ

উপাধি—"রত্নপ্রভা"

জলপাইগুড়ি কেন্দ্র হইতে :—

১। শ্রীঅরুণা সান্যাল

প্রাথমিক পরীক্ষা

প্রথম বিভাগ

জলপাইগুড়ি কেন্দ্র হইতে :—

*১। শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী

দ্বিতীয় বিভাগ

জলপাইগুড়ি কেন্দ্র হইতে :—

১। শ্রীমতী উষারাণী সরকার

২। শ্রীগৌরী মুখোপাধ্যায়

---

*"মহামণ্ডল" পদক প্রদান করা হইবে।

"মহামণ্ডল" কার্য্যালয়
বহরমপুর, পোঃ খাগড়া

সভাপতি—শ্রীকাশীশ্বর বিদ্যারত্ন, কাব্য স্মৃতিতীর্থ
সম্পাদক—শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, বিদ্যাবিনোদ

প্রাপ্ত-পত্র।

পরিচালিকা, ছায়াছবি, সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

গতমাসের 'মেয়েদের কথা'য় দেখলাম ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের 'সিনেমা'য় অভিনয় করবার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে চাই।

প্রথমত, ভদ্রঘরের মেয়েদের অভিনয়সম্পর্কে প্রশ্ন এই যে ভারতবর্ষের ফিল্মকোম্পানীর আবহাওয়া বা ব্যবস্থা কি নৈতিক সুস্বাস্থ্যের উপযোগী? সাধারণে অভিনয়ের বাঞ্ছনীয়তার আলোচনা ছেড়ে দিলেও 'ষ্টুডিও'র অনুপযোগিতার জন্যই হয়ত কোন কোন মহিলার পক্ষে এ ক্ষেত্রে অবতরণ করা অসম্ভব হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আপনার উক্তি, যে কেবলমাত্র সুশিক্ষিতা, মার্জিতবুদ্ধি অভিনেত্রীর অভাবেই 'ডিরেক্টর'রা শিব গড়তে বাঁদর গড়ছেন, সর্বৈব সত্য নয়। যে সমস্ত সমাজ ও যুগের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রের সংযোজনা করা হয়ে থাকে তার সঙ্গে অসম্পূর্ণ পরিচয়ই অনেক সময়ে অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সমস্ত ছবিটার সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকত্বের হানি ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আধুনিক সমাজের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অনেক সময়ে এমন সব কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় যা অনেকাংশে অসম্ভাব্য ও কৃত্রিম। পোষাক পরিচ্ছদের আদর্শের বিষয়েও ওই একই কথা বলা যায়; যখন দেখি সুন্দরী অভিজাতকন্যা দ্বিপ্রহরের সময়ে একখানা 'নেটে'র 'ক্লোক্' গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অথবা গাঁয়ের ধোপানী 'বান্' খোঁপা বেঁধে কাপড় কাচ্ছে, কিংবা কয়লাখাদের মজুরনীরা কানে ঝুমকো দুল দুলিয়ে বোম্বাইয়ের ছিটের শাড়ী পরে কাজ করতে যাচ্ছে তখন স্বতই মন আহত হয়।

বিলাতি 'ফিল্মে'র যুগোচিত আবহাওয়া এবং পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত করা হয়ে থাকে, আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা আছে কি?

ইতি—

শ্রী 'চিত্রলেখা'।

আমাদের কথা

বৎসরান্তে সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে সকলের শুভেচ্ছা কামনা করি। যখন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমরা হাতে নিয়েছিলাম তখন চারিদিকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠলেও দুর্যোগ

এসে ভারতবর্ষের আকাশ আচ্ছন্ন করেনি। আজ আমরা প্রবল ঝড়ের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র দীপ তুলে ধরেছি, প্রতিমুহূর্তে ই ভয় হয় শিখা বুঝি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেনা। আজকের বর্ষবিদায়ের বার্তা ক্লান্ত বসন্তের বিদায়বাণী নয়, আগামী বৎসরের আবাহনও বৈশাখের নবকিসলয়দলে হবেনা। চতুর্দিকে সর্বনাশ ব্যাপ্ত করে দিয়ে বিগত বৎসর বিদায় নিয়েছে আর নূতন বৎসরও আসছে তার প্রলয় পিণাক নিনাদিত করে। মহাসংকটের 'ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে' দাঁড়িয়ে রমণীকণ্ঠ কি তার 'প্রলয়গর্জনোচ্ছ্বাসে' নিমগ্ন হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ?

এই প্রশ্ন বারবার মনের মধ্যে জাগ্রত্ হলেও তার উত্তর দেবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছিনা ; উত্তরটি নির্ভর করছে নববৎসরে গ্রাহিকা ও পাঠিকাদের কাছে কতটা সহানুভূতি ও সহায়তা পাব তার উপর। আজ তাই করজোড়ে সকলের নিকট প্রার্থনা করছি যে এই সংকটের দিনে আমাদের যেন না ভুলে যান। বিপদ উপস্থিত প্রায় জানি, কিন্তু তার সম্মুখে দাঁড়াবার মত শক্তিও তো চাই। কলিকাতার গ্রাহিকাদের মধ্যে যাঁরা স্থানান্তরিত হয়েছেন তাঁদের অনেকের সংবাদ আমরা পাচ্ছিনা, তাঁরা যদি ১লা বৈশাখের মধ্যে তাঁদের ঠিকানা না জানান তবে আমাদের যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তা বহন করবার সাধ্য এই সংকটের সময়ে আমাদের নেই।

পরিস্থিতি যে বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই ; বিপদ যে কতদূর সাংঘাতিক হতে পারে তা কল্পনা করবার শক্তিও হয়ত আমাদের নেই, কিন্তু, তবু দৃঢ়তা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, শক্তিহীনের যে শক্তি সেই মানসিক সবলতাই এখন একমাত্র নির্ভর। সঙ্গে এই আশাও আছে যে হয়ত আমাদের উপস্থিত বিপদ থেকেই ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য এখন ঐশ্বর্য সঞ্চিত হবে যার জন্য এই যুগ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।

অনেকেই অনুমান করছেন যে ভারতবর্ষের ভাগ্যপরিবর্তনের সময় নিকটবর্তী। স্বাধীনতার আশাও অনেকে মনে পোষণ করছেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিনামূল্যে লভ্য নয়, কোন পরামর্শসভা অথবা আইনের কোন নির্ধারণ তা আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেনা, এ জিনিষ রক্তমূল্যে কিনতে হয়, স্বচেষ্টায় অর্জন করতে হয়, মানুষের অধিকারকে স্বীকার করে রক্ষা করতে হয়।

* * * * *

প্রবাসী সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্ধনা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হল ; তাঁর ভাষণও ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আমাদের অযোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবার সময়ে এই কথা বলে গর্ব করব যে আমাদের এই নগণ্য প্রচেষ্টাকে তিনি ক্ষুদ্র বলে অগ্রাহ্য করেননি, তাঁর স্নিগ্ধহস্তের আশীর্বাদে আমরা বঞ্চিত হইনি।

বিজ্ঞাপন।

"মেয়েদের কথা"র বর্ষ পূর্ণ হল। যে গ্রাহিকা অন্যরূপ না জানাবেন তাঁর বৈশাখের সংখ্যা বৎসরের জন্য ভিপি করে পাঠান হবে, ভিপি গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করবেন। যাঁরা স্থানান্তরসংবাদ জানাননি তাঁদের প্রতি অনুরোধ এই যে অবিলম্বে নূতন ঠিকানা জানিয়ে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হতে রক্ষা করুন।

Printed at Bhowanipur Art Press, 82-A, Ashutosh Mukherjee Road by Kalyan Kumar Chakravartty and Published by same from 172-3, Rashbehari Avenue, Ballygunj, Calcutta.